স্কট হর্টন

ফুল'স এরান্ড

আমেরিকাকে কেন আফগান যুদ্ধ সমাপ্ত করতে হলো

অনুবাদ:

আবু বকর সিদ্দীক

ফুল’স এরান্ড

ফুল’স এরান্ড

আমেরিকাকে কেন আফগান যুদ্ধ সমাপ্ত করতে হলো

স্কট হর্টন

ভাষান্তর
আবু বকর সিদ্দীক

সম্পাদনা
মোস্তফা আল হোসাইন আকিল

আদর্শ

প্রকাশক: আদর্শ
অফিস: ২০ বাবুপুরা, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা ১২০৫
সেলস: ৩৮ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০
(+০২-৯৬১২৮৭৭, ০১৭৯৩২৯৬২০২, ০১৭১০৭৭৯০৫০
Email: hello@adarsha.com.bd
Facebook Page: facebook.com/myAdarsha

ফুল’স এরান্ড
১ম প্রকাশ: ৫ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ; ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

© অনুবাদক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা: আদর্শ প্রিন্টার্স

অনলাইনে আদর্শ’র বই
www.adarsha.com.bd
www.rokomari.com/adarsha

Fool's Errand (Published in Bengali)
Translated by *Abu Bokor Siddeeq*
Published by Adarsha
38 P. K. Ray Road, Banglabazar (1st floor), Dhaka 1100

ISBN: 978-984-99454-4-4

অনুবাদকের অর্পণ

মালালা ইউসুফজাই হতে না পারা নাবিলা রেহমানকে

তালেবানের ভুক্তভোগী মালালা পশ্চিমের যুদ্ধের ফেরিওয়ালাদের কাছে রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার; তাদের অভিযানের ন্যায্যতার প্রতীক, তাদের রক্তপাতের পক্ষের যুক্তি, তাদের নগ্ন হস্তক্ষেপের মানবঢাল। পশ্চিমা মিডিয়াব্যক্তিত্ব, রাজনীতিবিদ এবং মানবাধিকারকর্মী সবাই মালালার বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নারীশিক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে বলায় মালালা ইউসুফজাইয়ের নোবেল শান্তি পুরস্কারও জুটেছে।

নাবিলা রেহমান মার্কিন দখলদারির ভুক্তভোগী লাখ লাখ নাম-পরিচয়বিহীন মানুষের একজন, বেঁচে থাকার অধিকার চাওয়ায় যাকে বলা হয়েছিল ফুটেজখোর।

সম্পাদকের কথা

স্কট হর্টন হলেন একজন আস্থাভাজন লেখক এবং ইতিহাসবিদ। তিনি গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্altবিবেককে সচেতন করতে কাজ করে যাচ্ছেন। আদর্শ, জাতি, ধর্ম কিংবা অঞ্চলের ভিন্নতার কারণে তিনি শুদ্ধ কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে বা নির্ভেজাল কালিতে ইতিহাসকে লিখতে ভুল করেননি। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন ইতিহাসের সঠিক বিচার করতে পারে, সে লক্ষ্যে তিনি ইতিপূর্বে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছেন, তার একটি স্মারকগ্রন্থ এ বইটি।

লেখকের প্রচুর পাদটীকা ব্যবহার বইটিকে সমৃদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য করেছে। বইটি পড়ার সময় পাঠক নিজেকে নন-ফিকশনের রাজ্য থেকে ইতিহাসের ভয়ংকর ট্রাজেডিতে আবিষ্কার করবেন। মার্কিন মুলুকের দখলদারির নেশা, পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের ভণ্ডামি, অস্ত্র নির্মাতাদের নির্মম বাণিজ্য, আফগানি দালালদের স্বদেশিদের প্রতি গাদ্দারি— সবকিছু একত্র করে লেখক বারবার প্রশ্ন করেছেন, ‘কেন এই যুদ্ধ?’ ‘আফগানিস্তানে এত দীর্ঘ যুদ্ধের অর্থ কী?’

বইটি আদতে আফগানিস্তানে মার্কিনদের নৃশংসতার একটি সংক্ষিপ্ত বয়ান। বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসের জুজু দেখিয়ে, সন্ত্রাস দমনের নামে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক আগ্রাসনের দলিল এটি। আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসী ও দখলদারির বিস্তৃত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বয়ান দিলেও, সংক্ষিপ্ত হওয়াটাই বইটির শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের আলোচনা যারা খুঁজছেন বা এ সম্পর্কে জানতে বিশেষ আগ্রহী, তাদের জন্য বইটি উপকারী হবে বলেই আমার ধারণা। এ বইয়ে স্কট হর্টনের স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ, ক্ষুরধার যুক্তি আফগান যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন দখলদারির পক্ষে যাবতীয় যুক্তিতর্ককে খারিজ করে দেয়। আফগানিস্তানের শুষ্ক ভূমিতে যাযাবর আফগানিদের রক্তপ্রবাহের অসারতাকে তীব্র নিন্দা ও ঘৃণার উদ্রেক

করে বইটি। এটা বোঝার আর বাকি থাকে না যে কাউন্টার-টেরোরিজমের নামে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া সন্ত্রাসের মূল কারিগর খোদ মার্কিন রক্তপিপাসু নীতিনির্ধারকেরা।

রাজনৈতিক নন-ফিকশনের বাংলা অনুবাদ নিয়ে পাঠকদের মধ্যে একধরনের হতাশা দীর্ঘদিনের। আবু বকর সিদ্দীকের সহজ ও প্রাঞ্জল অনুবাদ এবং ছোট ছোট বাক্যের গাঁথুনি পাঠকসমাজকে আনন্দিত করবে।

নীতিনির্ধারক, বিশ্লেষক, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং বৈশ্বিক রাজনীতির সম্পর্কে আগ্রহী সবার জন্য বইটি গুরুত্বপূর্ণ একটি পাঠ্য। শুধু আফগানিস্তান নয়, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সাধারণভাবে যুদ্ধের পেছনের চিত্র সম্পর্কে যারা জানতে চান, তাদের জন্য এটি অবশ্যপাঠ্য।

মোস্তফা আল হোসাইন আকিল
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩০ আগস্ট ২০২৪

অনুবাদকের কথা

ইতিহাসের শিক্ষা ভীষণ নির্মম! আফগানিস্তানেও ভিয়েতনামের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন এটাই প্রমাণ করে। একটানা ১০ বছর বোমা বর্ষণ করে এবং ৫০ হাজার মার্কিন সৈন্যের লাশের বিনিময়েও ভিয়েতনামকে পরাজিত করা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ তিক্ত স্মৃতি নিশ্চয়ই আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রকে ধাওয়া করছিল। স্বদেশি প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের মোকাবিলায় ভাড়াটে ও হানাদার বাহিনী বেশি দিন টিকতে পারেনি এবং পারে না। ইতিহাসে এর প্রমাণ একটি নয়, বহু।

বিশ্বের ইতিহাসে কোনো বিদেশি শক্তি আফগানদের বেশি দিন পদানত করে রাখতে পারেনি। খ্রিষ্টের জন্মের ৩৩০ বছর আগে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে ভারতে আগমন করেন। কিন্তু আফগানিস্তান দখল করে রাখার সাহস তিনি করেননি। ১৮৩৯ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আফগানিস্তান দখল করার দুঃসাহস দেখায়। কিন্তু ১৮৪২ সালে আফগান গেরিলাদের প্রতিরোধের মুখে তাদের পাততাড়ি গোটাতে হয়। ১২ হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র একজন সৈন্য জীবিতাবস্থায় ব্রিটেনে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের সব লাশই আফগানিস্তানের গিরিকন্দরে ফেলে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন ১ লাখ ৪০ হাজার সেনাসদস্য নিয়ে আফগানিস্তানে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। তারা পাহাড়-পর্বতে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে ১ কোটি শক্তিশালী মাইন পুঁতে রাখে। ১৫ লাখ আফগানকে তারা ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে। এত কিছু করেও কমপক্ষে ১৫ হাজার সৈন্যের লাশ ফেলে সোভিয়েত পরাশক্তিকে আফগানিস্তান ছাড়তে হয়। সুপার পাওয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো আমেরিকাও একইভাবে আফগানিস্তান ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

দেড় যুগ যুদ্ধের পর সেই তালেবানের সঙ্গেই চুক্তি করতে হয়েছে আমেরিকাকে। এই চুক্তির মাধ্যমে পরাশক্তি আমেরিকা তালেবানকে অনস্বীকার্য রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হলো। হানাদার ও আগ্রাসী বিদেশি শক্তির জন্য এ চুক্তিটি এক 'নির্ভুল বার্তা'। ভিয়েতনামের পর আফগানিস্তানেও আমেরিকার কার্যত পরাজয় তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি আর নানা ছলছুতায় বিভিন্ন দেশে সামরিক আগ্রাসন চালানোর উচ্চাভিলাষের লাগাম টেনে ধরতে সহায়ক হওয়ারই কথা।

আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের কারণ, এর বাস্তবসম্মততা, এর দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণ, এই যুদ্ধের শত্রু-মিত্র সবকিছুই তুলে ধরা হয়েছে এই বইটিতে। ২০১৭ সালে প্রকাশিত এই বইটিতে স্কট হর্টন এই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, কেন এই আগ্রাসন শুরু থেকেই একটি গুরুতর ভুল ছিল। আফগানিস্তানে মার্কিন যৌথ বাহিনীর বিভিন্ন নৃশংসতার পাশাপাশি বিভিন্ন মার্কিন নীতিমালা এবং পদক্ষেপের ব্যর্থতাও তুলে ধরা হয়েছে এই বইটিতে।

বইটির বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে এবং পাঠকের সুবিধার্থে পরিশিষ্ট আকারে একাধিক আর্টিকেল সংযুক্ত করা হয়েছে। তালেবানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তির অনুবাদ এবং আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক সময়সূচিও সংযুক্ত করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মাস্টার্স শিক্ষার্থী মোস্তফা আল হোসাইন আকিল ভাইয়ের সম্পাদনা বইটিকে প্রাঞ্জল করেছে। তাকে ছাড়া বইটি অসম্পূর্ণই থেকে যেত। বইটি অনুবাদে সব সময় পাশে থাকার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা সহপাঠী ইয়াসিন আরাফাতের প্রতি।

বইটি প্রকাশনায় যাদের চিন্তা ও পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে, তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সবশেষে প্রত্যাশা থাকবে বইটি সর্বমহলে সমাদৃত হোক এবং পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করুক, যেন এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে আরও বই উপহার দিতে পারি।

আবু বকর সিদ্দীক
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ
১৫ আগস্ট ২০২৩

সূচি

মুখবন্ধ ১৫

প্রথম অধ্যায়: সংকটের সূত্রপাত ২১

৯/১১ কি ইতিহাসের সূচনা? ২৩

পালটা আঘাত ২৭

পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ধর্ম ৩৬

আত্মঘাতী হামলার স্বরূপ সন্ধানে ৪২

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির আসল চেহারা ৪৭

রোনাল্ড রিগ্যানের মুজাহিদিন ৫১

নয়া বিশ্বব্যবস্থা ৫৬

বিন লাদেন বনাম আমেরিকা ৬০

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং বিল ক্লিনটন প্রশাসন ৬২

নিকটবর্তী শত্রু, দূরবর্তী শত্রু ৬৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: আগ্রাসনের সূচনা ৭৯

অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ ৮১

ফাঁদ ৮৬

অন্তহীন যুদ্ধ ৯০

মোস্ট ওয়ান্টেড আসলে কে বা কারা ৯৬

নয়া আইন ১০৯

তালেবান বনাম কারজাই ও অন্যান্য মিলিশিয়া ১২৯

তৃতীয় অধ্যায়: বিস্তীর্ণ লড়াই ১৩৯

সাম্রাজ্যবাদ ১৪১

শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনিচ্ছা ১৫০

দখলদারি ১৫৫
নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতিরাষ্ট্র নির্মাণ ১৬৪
আদিবাসীদের দেশ? ১৭৩
পাকিস্তান ও ক্ষমতাচ্যুত তালেবান ১৭৮
মৃত্যু উপত্যকা ১৮৪
সরাসরি হস্তক্ষেপের ভূত ১৮৭

চতুর্থ অধ্যায়: সর্বশক্তি প্রয়োগ ১৯৭
দেশ যখন নীতিনির্ধারকদের হাতে জিম্মি ১৯৯
কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির কুশীলববৃন্দ ২১৮
কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ২২৬
মাদকযুদ্ধ ২৩৩
কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি বাস্তবায়ন ২৩৯
যুদ্ধাপরাধের কিছু নমুনা ২৫৩
সর্বমুখী পরাজয় ২৬০

পঞ্চম অধ্যায়: অনিবার্য পতনের পূর্বাভাস ২৬৫
মার্কিন মদদপুষ্ট আফগান পুলিশবাহিনী ২৬৭
শান্তি প্রতিষ্ঠায় তালেবানের শর্ত ২৭১
তালেবানের পুনরুত্থানে মার্কিন ভূমিকা ২৭৩
গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার: ট্রয়ের ঘোড়া ২৮০
আফগানিস্তানে মার্কিন অবস্থান কি চিরস্থায়ী হচ্ছে? ২৮৩
যুদ্ধের ব্যয় এবং ফলাফল ২৯৩
ব্যাকড্রাফট ২৯৭
নতুন বিশ্বে স্বাগত ৩০৭
ম্যাটিস বনাম ম্যাকমাস্টার ৩১৫
ঘরে ফিরতেই হবে ৩৩৬

পরিশিষ্ট ১: শেষ কথা ৩৪০
পরিশিষ্ট ২: শান্তি চুক্তি ৩৪৩
পরিশিষ্ট ৩: আফগানিস্তান: একটি ঐতিহাসিক সময়সূচি ৩৪৮

অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধসমূহ ৩৪৯
স্বাধীন আফগানিস্তানের যাত্রা এবং অভ্যন্তরীণ উত্থান-পতন ৩৫১
সোভিয়েত যুদ্ধের দিনগুলো ৩৫৩
১৯৯০-এর দশক থেকে ২০০১: গৃহযুদ্ধ এবং তালেবান শাসন ৩৫৪
আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন ৩৫৮

পরিশিষ্ট ৪: ক্ষমতার মসনদ পুনরুদ্ধারে তালেবানের অগ্রযাত্রা ৩৬৬

পরিশিষ্ট ৫: যেদিন যে এলাকা মুক্ত হলো ৩৬৯

পরিশিষ্ট ৬: আফগান যুদ্ধে আমেরিকার লাভ-ক্ষতি ৩৭২

পরিশিষ্ট ৭: মুখ্য চরিত্রসমূহ ৩৭৪
আল-কায়েদা ৩৭৪
আইএসআইএস ৩৭৯
আফগান তালেবান ৩৭৯
আফগান মুজাহিদিন এবং মিলিশিয়া প্রধান ৩৮১
আঞ্চলিক রাজনীতিবিদ ৩৮৫
মার্কিন রাজনীতিবিদ, জেনারেল, গোয়েন্দা কর্মকর্তা, সাংবাদিক ৩৮৮

পরিশিষ্ট ৮: মার্কিন প্রশাসনের কারাবন্দি নির্যাতনবিষয়ক উল্লেখযোগ্য রচনাবলি ৩৯৭

পরিশিষ্ট ৯: আফগানিস্তানবিষয়ক অবশ্যপাঠ্য রচনাবলি ৪০১

মুখবন্ধ

২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন এবং সেখানকার সরকারব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলস্বরূপ যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল, তা আজও অবধি দেশটিকে বিধ্বস্ত করে চলছে। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১৪ সালের মধ্যেই মার্কিন এবং ন্যাটো ফোর্স প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই সময়সীমা বহু আগেই গত হয়েছে। কিন্তু মার্কিন সেনারা বিজয় ঘোষণা করে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারেনি। মার্কিন ডলার, বিমানবাহিনী, স্পেশাল অপারেশন ফোর্স এবং পদাতিক বাহিনীর সহায়তা ছাড়া সহসাই রাজধানী কাবুলের আমেরিকা স্থলাভিষিক্ত 'ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট'-এর পতন ঘটবে।

অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম, বর্তমানে যেটি অপারেশন ফ্রিডমস সেন্টিনেল নামে চলমান, শুরু থেকেই একটি বিপর্যয়কর ঘটনা ছিল। ৯/১১-র মাস্টারমাইন্ডদের আটক কিংবা হত্যা করার প্রাথমিক ব্যর্থতার পর প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ এবং জাতিরাষ্ট্র গঠনে তার নিজের সতর্কবার্তাকেই উপেক্ষা করেন। তিনি কাবুলে একটি যুক্তরাষ্ট্রবান্ধব সরকার স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে এই নতুন সরকার আফগানিস্তান থেকে সন্ত্রাসবাদ এবং ইসলামি মৌলবাদের শক্তিকে উৎখাতের মাধ্যমে আফগান জনগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। আফগানিস্তানে সাত বছরের বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে তিনি যখন অফিস ত্যাগ করছিলেন, তখন তার উপদেষ্টারা তাকে সতর্ক করছিল যে, '২০০১ সালে উৎখাত হওয়া তালেবান সরকার পূর্ণশক্তিতে প্রত্যাবর্তন করছে এবং কাবুলের যুক্তরাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষিত সরকার পতনের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে।'

আফগান যুদ্ধে বুশের অসাবধানতা এবং গাফিলতির সমালোচনা করে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ক্ষমতায় আসেন। তিনি আফগানিস্তান সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'এই যুদ্ধে জয়লাভ আবশ্যক।' তিনি এই কাজ সম্পন্ন

করার ওয়াদা করেন। এ জন্য প্রেসিডেন্ট ওবামা ধাপে ধাপে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি করলেও কোনো ফলাফল পাননি। যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি জেনারেল ডেভিড পেট্রিয়াস এবং 'সেন্টার ফর এ নিউ আমেরিকান সিকিউরিটি'র থিংক-ট্যাংক চিয়ার-লিডারদের আপডেটকৃত, বহুল প্রশংসিত এবং বারবার মূল্যায়নকৃত 'কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সি তত্ত্বও (COIN)' পুরোপুরি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। তারা বলেছিল, 'তারা সমগ্র সমাজকেই এমনভাবে পরিবর্তন করতে সক্ষম যে এটি যথোচিতভাবে আমেরিকার লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করবে।' এ জন্য তাদের আফগানিস্তানে নতুনভাবে হাজার হাজার সৈন্য প্রেরণ করতে হয়। এই সৈন্যদের কাজ ছিল দিনের বেলায় শিষ্টদের মন জয় করা এবং রাতের বেলায় স্পেশাল ফোর্স দিয়ে বাড়ি বাড়ি অভিযান চালিয়ে দুষ্টদের শিকার করা। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাদের এই 'কৌশল' এবং 'সূচনালগ্ন থেকেই আফগানিস্তান এবং এর স্থানীয় সরকার পুনর্গঠনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এর ঠিকাদারদের লম্ফঝম্প' সম্মিলিতভাবে দেশটিকে বাঁচিয়ে দেবে। দিনশেষে এই তথাকথিত কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সি তত্ত্বের আলোকে সেনা বৃদ্ধির একমাত্র অর্জন হলো— অতিরিক্ত হাজারো মার্কিন এবং এর মিত্রদের জীবননাশ এবং পাশাপাশি লাখ লাখ আফগানেরও। ক্রমবর্ধমানভাবে অতিরিক্ত মার্কিন সেনা মোতায়েন আফগান তালেবান, তাদের সহযোগী হক্কানি নেটওয়ার্ক কিংবা অন্যান্য বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সক্ষমতাকে মোটেও হ্রাস করতে পারেনি। এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরবর্তী যেকোনো সময়ের মতো বর্তমানেও তালেবান সমান ক্ষমতাধর। রাতের আঁধারে তারা দেশটির প্রায় অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করে এবং দিনের আলোতেও এই অংশ খুব বেশি কমে না।

জাতিসংঘ কর্তৃক জরিপ শুরু করার পর থেকে হিসাব অনুযায়ী, ২০১৬ সালে আফগানিস্তানে সবচেয়ে বেশি বেসামরিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সহিংসতা এতই মারাত্মক আকারে পৌঁছায় যে, প্রেসিডেন্ট ওবামা সেনাসংখ্যা কমিয়ে ৮ হাজার ৫০০-তে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেন। তবে যেটাও ছিল প্রাথমিকভাবে পরিকল্পিত সংখ্যার চেয়ে ৪ হাজার বেশি (পূর্বে সেনাসংখ্যা হ্রাস করে ৪ হাজার ৫০০-তে নিয়ে আসার কথা ছিল)। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দায়িত্ব পালনের শেষ সপ্তাহেও প্রেসিডেন্ট ওবামা আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানীর নিরাপত্তা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মরিয়া প্রয়াস হিসেবে অতিরিক্ত আরও ৩০০ মেরিন সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দেন।

যাহোক, ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই একই এলাকার (হেলমান্দের প্রাদেশিক রাজধানী) অচলাবস্থাকে নিরসনের জন্য আরও ১ হাজার সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দেন। বাস্তবিক পক্ষে, নতুন সেনাদের উচিত ছিল, মার্কিন পৃষ্ঠপোষিত সরকারের হাত থেকে স্থায়ীভাবে সেই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ার আগেই তালেবান মুভমেন্টের গতিবেগকে থামানোর চেষ্টা করা। এখন যদি মার্কিন বাহিনী সেই অচলাবস্থার কিছুটা উন্নতি করতেও পারে, তবে সেটা কোনো অর্জন নয়; বরং উন্নতি সাধন হবে।

কিছু কিছু বিশিষ্ট থিংক-ট্যাংক বিশেষজ্ঞরা 'হৃদয় এবং মন' বিজিত করা এবং জাতিরাষ্ট্র গঠনের কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সি তত্ত্ব বাস্তবায়নের আরও একটি প্রয়াসে পুনরায় পূর্ণমাত্রায় সেনা সম্প্রসারণ করে মোট সেনাসংখ্যা ১ লাখে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন! এই দখলদারি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা মার্কিন জেনারেলরা কেবল আসেন আর যান, কিন্তু তাদের পরামর্শের কোনো নড়চড় হয় না:

> আমরা এখনই চলে আসতে পারি না; অধিকন্তু আমরা কোনো দিনই চলে আসতে পারি না। যতক্ষণ না ড্রোন এবং স্পেশাল অপারেশন ফোর্সের সাহায্যে "সর্বাত্মক পরাজয়"কে এড়ানো না যাবে— আমেরিকা সেখানে অবস্থান করবেই এবং যুদ্ধ চলমান থাকবে।

***

আফগান যুদ্ধে সেনাসংখ্যা নির্ধারণ কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে না হয়ে মূলত ওয়াশিংটন ডিসির অফিস পলিটিকসের মাধ্যমে হয়। তাই সাইগনের মতো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে উপায়ান্তর না দেখে সেনা প্রত্যাহার সম্প্রতি কিংবা সামান্য দেরিতে হলেও ঘটা অবশ্যম্ভাবী।

নাইন-ইলেভেনের পাল্টা জবাব হিসেবে যে ধরপাকড় অভিযান শুরু হয়েছিল, তা শিগগিরই ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে সুদূর আফগানিস্তানে লুকিয়ে থাকা একটি ক্ষুদ্র সৌদি ও মিসরীয় জঙ্গিগোষ্ঠী (আল-কায়েদা) এবং তাদের আশ্রয়দাতাকে (তালেবান সরকার) লক্ষ্যবস্তু বানানোর নাম দিয়ে শুরু হওয়া এই প্রক্রিয়া শিগগিরই একটি বিস্তৃত সামরিক দখলদারি, জাতিরাষ্ট্র গঠন প্রকল্প এবং বিরামহীন যুদ্ধে পরিণত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজধানী কাবুলে যে সরকার স্থলাভিষিক্ত করেছে, সেটি আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের তাজিক, হাজারা, উজবেক, তুর্কমেন এবং অন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং দেশটির দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের পশতুন উপজাতীয়

রাজনৈতিক নেতা ও গুন্ডাদের একটি জোট সংগঠন। জনগণের নিরাপত্তা প্রদান তো দূরের কথা, তারাই স্বয়ং নিরাপত্তার প্রধান হুমকি।

তারা আফগান জনগণের বাস্তব প্রতিনিধিত্বও করে না। তাই মার্কিন দখলদারির একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এর মিত্রবাহিনী এবং পশ্চিমা মদদপুষ্ট আফগান সরকারের বিরুদ্ধে সাবেক তালেবান সরকারের নেতৃত্বে প্রধানত পশতু জাতিগোষ্ঠীকেন্দ্রিক একটি প্রতিরোধ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার জবাবে এই প্রতিরোধ যুদ্ধটি কেবলই শক্তিশালী হয়েছে। অধিকন্তু তালেবান বর্তমানে কোনো মিলিশিয়া গোষ্ঠী নয়; এমনকি তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজ করা কোনো ছায়া সরকারও নয়। বর্তমানে তালেবান আগের যেকোনো সময়ের মতোই পশতুন অধ্যুষিত অঞ্চলের একমাত্র এবং প্রকৃত কার্যকারী সরকার। এমনকি জেনারেল পেট্রিয়াসের মতো আমেরিকার সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কধারী কমান্ডাররাও স্বীকার করেছেন যে, ‘মার্কিন পৃষ্ঠপোষিত সরকারের চেয়ে বরং তালেবানের দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আইনের শাসন অনেক সুষ্ঠু।’ তাই প্রতিরোধযোদ্ধারা সেসব এলাকায় সরকারের চেয়ে অনেক বেশি জনসমর্থন উপভোগ করে। প্রায় দেড় যুগ পর এর ফলাফল ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হচ্ছে। মার্কিন সরকার আফগানিস্তানে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। আরও মারাত্মক ব্যাপার হলো, আফগানিস্তানে মার্কিন সরকার যে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, সেটি সম্পূর্ণ অস্থিতিশীল। আমেরিকা যখন দখলদারির ক্ষান্তি দিয়ে স্বদেশে ফিরে আসবে, তখন নিশ্চিতভাবেই এর পতন ঘটবে। এই বিরামহীন বিপর্যয়ের পেছনে অসংখ্য রাজনীতিবিদ, জেনারেল এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তা রয়েছেন। তারা সর্বদাই আমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে শুধু আর সামান্য কিছু সময়, অর্থ এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ করলেই তারা এসব সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান করতে পারবেন। কিন্তু তারা তাদের সকল বিশ্বাসযোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছেন।

***

একমাত্র সত্য হলো, আমেরিকার আফগান যুদ্ধটি একটি অনিরাময়যোগ্য বিপর্যয়। এটা সূচনালগ্ন থেকেই একটি ফাঁদ ছিল। আমেরিকা কেবল এর শত্রুদের পরাস্ত করতেই ব্যর্থ হচ্ছে না, বরং নিজেকেও ধ্বংস করে যাচ্ছে। ঠিক এমনটাই ওসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা কামনা করত।

ফুল'স এরান্ড মার্কিন জনগণের সামনে এই বিস্মৃত যুদ্ধের বাস্তবতাকে তুলে ধরার একটি প্রয়াস। অহংকার ও দাম্ভিকতা এবং তারা যে প্রতারিত হচ্ছে, এই

সত্যতাকে প্রত্যাখ্যান করা তাদেরকে এটা বুঝতে বাধা দিচ্ছে যে, তারা যে নীতিকে সমর্থন করছে, সেটি আমেরিকার জন্যই ধ্বংসাত্মক এবং পাশাপাশি আফগানিস্তানের জন্যও।

বইটির প্রথম অধ্যায়ে আল-কায়েদা মুভমেন্টের ইতিহাস এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে তাদের সন্ত্রাসী যুদ্ধের প্রকৃতি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আফগানিস্তানে আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়, ওসামা বিন লাদেন এবং অন্য আল-কায়েদার নেতাদের গ্রেপ্তার কিংবা হত্যা করতে ব্যর্থতা, এবং পাশাপাশি আইনের শাসনকে উপেক্ষা করা ও আরও কিছু জটিল বিষয়, যা সেখানকার চলমান সংঘাতকে জ্বালানি সরবরাহ করে যাচ্ছে। তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় আফগানিস্তানে তৎপর কতিপয় বহিঃশক্তি, আমেরিকার দুর্বল সিদ্ধান্ত, যেগুলো মার্কিন পৃষ্ঠপোষিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধকে আরও শক্তিশালী করেছে; পাশাপাশি এই অধ্যায়ে মার্কিন সেনা ও নিরপরাধ আফগান নাগরিকদের ওপর এই যুদ্ধের কতিপয় পরিণতির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়টি প্রেসিডেন্ট ওবামার সেনা সম্প্রসারণ এবং এর অনিবার্য ব্যর্থতার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সবশেষ, পঞ্চম অধ্যায় আমাদের সরকারের সেসব ব্যর্থ নীতিমালার ব্যয় এবং সেগুলোর পরিণতিকে ব্যাখ্যা করবে।

মার্কিন জনগণের কখনো যদি তাদের দেশকে এই জগাখিচুড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসার ইচ্ছা থাকে, তবে তাদের উচিত হবে সেনা প্রত্যাহারের জন্য চাপ প্রয়োগ করা এবং বাধ্য করা। অন্যথায়, নিশ্চিতভাবেই মার্কিন সরকার এবং তালেবান উভয়ে এই যুদ্ধটি আরও বহু বছর চালিয়ে যাবে। আসুন আমরা ক্ষান্ত হই এবং পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে ধাবিত হওয়ার আগে সেটি কীভাবে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হলো, সেটা নতুনভাবে জানার চেষ্টা করি।

প্রথম অধ্যায়

সংকটের সূত্রপাত

যদি আমরা জাতি গঠনের অভিযানে বিশ্বব্যাপী আমাদের সৈন্য পাঠানো বন্ধ না করি, তাহলে শিগগিরই আমাদের গুরুতর সমস্যায় পড়তে হবে।

— টেক্সাস গভর্নর জর্জ ডব্লিউ বুশ, ৩ অক্টোবর ২০০০

তারা আমাদের স্বাধীনতাকে ঘৃণা করে।

— প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১

৯/১১ কি ইতিহাসের সূচনা?

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখের আগপর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে আল-কায়েদার সদস্যসংখ্যা কয়েক শর বেশি ছিল না।[১] ৯/১১-এর হামলার পর সিআইএ'র আধা সামরিক বাহিনী, মার্কিন সেনাবাহিনীর ডেল্টা ফোর্স (সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ বাহিনী) এবং মার্কিন বিমানবাহিনী আল-কায়েদার ওপর তিন মাস ধরে বোমা বর্ষণ করে। তিন মাসের বোমাবর্ষণ এবং ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানে পলায়নের পর কোনো সতেরো জলদস্যু জাহাজ পূর্ণ করার মতো যথেষ্ট আল-কায়েদা সদস্যও হয়তো আর জীবিত ছিল না।[২]

কিন্তু সেই ত্বরিত ও একতরফা বিজয়ের দেড় যুগ পর নাইজেরিয়া থেকে ফিলিপাইনে অগণিত লাদেনপন্থি জিহাদি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ পররাষ্ট্র দপ্তর প্রাক্-৯/১১ যুগের চেয়ে অধিকহারে সন্ত্রাসবাদের সতর্কবার্তা প্রচার করছে।[৩] সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আল-কায়েদা, ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (ISIS) এবং তাদের অনুসারীরা ব্রাসেলস, প্যারিস, লন্ডন, স্যান বার্নারডিনো, অরল্যান্ডো, নিউইয়র্কসহ ডজনখানেকের অধিক পশ্চিমা শহরে একাধিক প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে। ২০১৪ সালে নেভি জেনারেল এবং বর্তমান হোয়াইট হাউস ফোর্স লিডার জন এফ কেলি সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির এক দশক আগের বক্তব্যের[৪] পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন, 'ভবিষ্যতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জঙ্গিবাদবিরোধী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।'[৫]

অতএব, নিশ্চয়ই আমাদের কোথাও ভুল হয়েছিল।

সেই ভুলটি হলো, আমাদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধে নামার প্রকৃত কারণগুলোকে উপেক্ষা এবং জনগণের সামনে সেগুলোর ভুল উপস্থাপন। জনগণের অজ্ঞতা ও আতঙ্ককে ব্যবহার করে আমাদের সরকার সর্বদাই নিজের বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী। ৯/১১-

এর প্রায় দেড় যুগের বেশি সময় পরও, আমেরিকা একটি নিদারুণ মিথ্যার চাদরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। এই মিথ্যাটি হলো "আল-কায়েদা ও ইসলামিক স্টেটের মতো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো কেবল মার্কিনদের হত্যা করতেই ইচ্ছুক। চরমপন্থি ইসলামের অনুসরণ এদেরকে পৃথিবীর নিরপরাধ, নিষ্পাপ মানুষ ও জিনিসকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে।[৬] এই হৃদয়হীন এবং অযৌক্তিক শত্রুর মোকাবিলায় আমাদেরকে কেবল একটি বিকল্পের কথাই বলা হয়েছে। সেটা হলো আল-কায়েদা অথবা ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে লড়াইটা ওখানে ওদের ভূখণ্ডেই করতে হবে, যেন তারা আমাদের এখানে (আমাদের ভূখণ্ডে) লড়াই করতে আসার সুযোগ না পায়।[৭] কিন্তু, এরপর কোনোভাবে ওদের পরিকল্পিত কিংবা সেখান থেকে অনুপ্রাণিত কোনো হামলা খোদ যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানলেও উপদেশ বরাবর আগের মতোই থাকে— 'জঙ্গিগোষ্ঠীর ভূখণ্ডগুলোতে লড়াইকে আরও জোরদার করো'।[৮] জঙ্গিবাদবিরোধী এই যুদ্ধ পাল্টা আঘাত হিসেবে ফিরে এলে আমাদের সরকার বলে, 'জঙ্গিরাই তো এটা প্রথম শুরু করেছিল! নিজেদের রক্ষা করাই কি আমাদের কর্তব্য নয়?'

এই বয়ান আগাগোড়া ভুল। প্রয়াত উদারপন্থি সক্রিয় কর্মী হ্যারি ব্রাউন বলতেন, 'ওয়ার অন টেররের বা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের পটভূমি হিসেবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে এই ইতিহাসের শুরু হয়েছে সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ থেকে'।[৯] কিন্তু প্রকৃত সত্যটি হলো, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন হস্তক্ষেপ অনেক আগে থেকেই আমেরিকার বিরুদ্ধে আল-কায়েদাকে প্ররোচিত করে আসছে। আমেরিকার এই হস্তক্ষেপই কথিত জঙ্গিবাদ সমস্যার প্রধান কারণ। অতঃপর আমাদের জঙ্গিদের হাত থেকে রক্ষা করার নামে আমাদের দায়িত্বশীলরা অন্তহীন যে কাজ করে চলছে, তার সবকিছুই সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।'

আমেরিকার কেন্দ্রস্থলে হানা দিয়ে মার্কিন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা, আমাদের সমাজব্যবস্থা ও স্বাধীনতাকে ধ্বংস করা কিংবা আমাদের তাদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে কোনো গোষ্ঠী ৯/১১ ঘটায়নি। বরং এই হামলাটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত সাবেক আরব মুজাহিদিনদের একটি ক্ষুদ্র দলের চূড়ান্ত পদক্ষেপ। তাদের জন্য এর কোনো বিকল্পও ছিল না। সেই সৌদি ও মিসরীয়দের ইতিপূর্বে আমাদের সরকারের নির্দেশেই আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতমালার গহিন প্রান্তরে নির্বাসিত করা হয়েছিল। এরপরই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় 'নিজ নিজ দেশে বিপ্লবসাধনের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেখানে টেনে নিয়ে যাওয়া।'

বামপন্থি সমাজকর্মী সোল অ্যালিনস্কি লিখেছিলেন, 'সকল অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং চরমপন্থি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত ফলাফল হলো পাল্টা আঘাত।'[১০] বিন লাদেন সেটা সম্ভবত সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তার পরিকল্পনাগুলোকে একসময় চরম মাত্রার অযৌক্তিক বলে মনে হলেও বিগত ১৫ বছরে ভিন্ন চিত্রই দৃশ্যমান হয়েছে। মূলত আমেরিকার 'ওয়ার অন টেরর' ইতোমধ্যেই আল-কায়েদার এমন অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে দিয়েছে, যা আল-কায়েদা কখনো নিজ শক্তিতে বাস্তবায়ন করার কল্পনাও করেনি।

৯/১১-এর আগে বছরের পর বছর ধরে বিন লাদেন সমগ্র বিশ্বকে স্পষ্টভাবে তার অসন্তোষের জায়গাগুলো বলে আসছিলেন। পাশাপাশি সেসব ব্যাপারে তিনি কী করতে যাচ্ছেন এবং কীভাবে সেই পরিকল্পনাগুলো সফল হবে, সেগুলোও বর্ণনা করেছেন। তার প্রথম সমস্যাই ছিল মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি। তার পরিকল্পনা ছিল মার্কিন সেনাবাহিনীকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে যুদ্ধকে উসকে দেওয়া এবং এরপর তাদের অনুপস্থিতিতে বিপ্লব ঘটানো। আল-কায়েদা এভাবেই তাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এবিসি নিউজের প্রতিবেদক জন মিলার (যিনি পরবর্তী সময়ে এফবিআইয়ের একজন কাউন্টার-টেরোরিজম এজেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন) ১৯৯৮ সালে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্ত মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন।[১১] বিন লাদেনের মার্কিনবিরোধী যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিপ্লব ঘটানোর অভিপ্রায়ের ব্যাপারে মিলারের প্রতিক্রিয়া ছিল— 'তার কথা শুনে আমি ভাবছিলাম, "আচ্ছা, আপনি বিপ্লব ঘটাবেন তা তো বুঝলামই, কিন্তু কোন সেনাবাহিনীর মাধ্যমে?"'[১২] উত্তরটি 'মার্কিন সেনাবাহিনী' বলেই পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯ জন আল-কায়েদা যোদ্ধা ৯/১১-র মাধ্যমে মার্কিন সেনাবাহিনীকে প্রলুব্ধ করে নিজেদের দলভুক্ত করে নিয়েছিল, যারা দিনশেষে আল-কায়েদার অ্যাজেন্ডাই বাস্তবায়ন করেছে।

তথ্যসূত্র

১. Cynthia Storer, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, March 13, 2017; Robert L. Grenier, 88 Days to Kandahar: A CIA Diary (New York City: Simon & Schuster, 2016), 43-44.

২. Robert Dreyfuss, "The Phony War," September 12, 2006, Rolling Stone; Gary Berntsen and Ralph Pezzullo, Jawbreaker: The Attack on Bin Laden and Al-Qaeda; A Personal Account by the CIA's Key Field Commander (Portland: Broadway, 2006), 308.

৩. "US State Department Country Reports on Terrorism," United States Department of State, accessed May 23, 2017.

৪. "US State Department Country Reports on Terrorism," United States Department of State, accessed May 23, 2017.

৫. Rowan Scarborough, "General: Millennial Marines Shun Self-absorbed Culture," Washington Times, May 7, 2014.

৬. George W. Bush, "Address Before a Joint Session of the Congress on the United States Response to the Terrorist Attacks of September 11," 37 Weekly Comp. Pres. Doc. 1347 (September 20, 2001).

৭. George W. Bush, "President's Radio Address," 39 Weekly Comp. Pres. Doc. 1329 (October 4, 2003).

৮. George W. Bush, "President's Radio Address," 39 Weekly Comp. Pres. Doc. 1329 (October 4, 2003).

৯. Harry Browne, "As Usual, the Wrong Question Is Being Asked," April 9, 2004.

১০. Saul David Alinsky, Rules for Radicals: A Practical Primer for Realistic Radicals (New York: Random House, 1971), 75.

১১. Osama bin Laden, interviewed by John Miller of ABC News, posted on Frontline website, May 1998.

১২. Peter L. Bergen, The Osama Bin Laden I Know: An Oral History of al Qaeda's Leader (New York: Free, 2006), 216.

পালটা আঘাত

ওবামা প্রশাসনের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যারি হার্ফের মতো উদার গণতন্ত্রপন্থির মতে, 'জঙ্গিদের আল-কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেটের মতো গোষ্ঠীতে একত্র হওয়ার কারণ হলো— নিজেদের ব্যস্ত রাখতে তাদের কোনো চাকরির প্রয়োজন।'[১] অপরদিকে টেক্সাস সিনেটর টেড ক্রুজের মতো কট্টর রিপাবলিকানরা এই মতে অনড় যে, 'সবকিছুর জন্য দায়ী হলো ইসলাম! উগ্রবাদী ইসলামি চরমপন্থা তাদের একত্র করেছে! তারা আমাদের ঘৃণা করে! তারা আমাদের হত্যা করতে চায়।'[২] বাস্তবে এই দুই ধরনের ব্যাখ্যা এবং উপলব্ধি পুরোপুরি হাস্যকর। কিন্তু সেগুলোই আমাদের জন্য বিভিন্ন প্রাণঘাতী নীতিমালা গঠনে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

আল-কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেট মৌলবাদী ইসলামের অনুসারী হতে পারে। কিন্তু মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিই সূচনালগ্ন থেকে আমেরিকার বিরুদ্ধে এই লড়াইকে উসকে দিয়েছে। তাদের প্রধান অভিযোগ— মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি। ওসামা বিন লাদেন নাইন-ইলেভেনের আগে থেকেই তার 'ফতোয়া' (ধর্মীয় ফরমান), বক্তৃতা এবং মিডিয়া সাক্ষাৎকারগুলোতে বারবার এই প্রেক্ষাপটগুলো ব্যাখ্যা করেছেন।[৩] ১৯৯৮ সালে তিনি তার ইহুদি ও খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণায় (Declaration of War Against Jews and Crusaders) বলেন:

> প্রথমত, সাত বছরেরও অধিক সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামি ভূখণ্ড এবং পবিত্রতম অঞ্চল আরব উপদ্বীপে তাদের দখলদারি চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এই অঞ্চলের ধন-সম্পদ লুটপাট করছে, এখানকার শাসকদের পরিচালনা করছে, এই জনপদের বাসিন্দাদের অবমাননা করছে, এর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে হুমকি-ধমকি দিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতিবেশী মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর আঘাত হানতে তাদের আরব উপদ্বীপের ঘাঁটিগুলোকে

সুসজ্জিত করছে। কিছু লোক অতীতে এই দখলদারি নিয়ে সন্দিহান থাকলেও বর্তমানে সবাই এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারছে। এর সর্বশেষ প্রমাণ আরব উপদ্বীপকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ইরাকি জনগণের ওপর আমেরিকার অব্যাহত আগ্রাসন।

দ্বিতীয়ত, ক্রুসেডার-জায়োনিস্ট জোট ১০ লক্ষাধিক নিরীহ ইরাকি হত্যা করার পরও ক্ষান্ত হয়নি। তারা আরেকটি গণহত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা ইরাকে ভয়ানক যুদ্ধ, চূর্ণবিচূর্ণ ও ধ্বংসযজ্ঞের পর দীর্ঘ অবরোধ আরোপ করেও পরিতৃপ্ত নয়। তাই তারা এই মানুষগুলোর শেষ অবলম্বনটুকুও ধ্বংস করতে এবং এর মুসলিম প্রতিবেশীদের অপদস্থ করতে পুনরায় এখানে ফিরে এসেছে।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণের পাশাপাশি মার্কিনদের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ইহুদিদের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকে টিকিয়ে রাখা, জেরুজালেম দখল ও ফিলিস্তিনি গণহত্যায় মদদ জোগানো। এর একটি প্রমাণ, ইসরায়েলের পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী আরব রাষ্ট্র ইরাককে ধ্বংস করতে তাদের ব্যগ্রতা। তারা ইরাক, সৌদি আরব, মিসর, সুদানসহ এই অঞ্চলের আরব রাষ্ট্রগুলোকে কাগজের মুদ্রার মতো খণ্ড-বিখণ্ড করে তাদের অনৈক্য ও দুর্বলতার সুযোগে ইসরায়েলের টিকে থাকা নিশ্চিত করতে চায়। এভাবেই তারা আরব উপদ্বীপে এই বর্বরোচিত ক্রুসেড দখলদারিকে অব্যাহত রাখতে চায়।[৪]

এটাই হলো সব কথার আসল কথা।

আমেরিকার বিরুদ্ধে আল-কায়েদার সবচেয়ে বড় ক্ষোভ— ১৯৯০ সালের প্রথম ইরাক যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় থেকে সৌদি আরব এবং আরব উপদ্বীপের অন্যান্য রাষ্ট্রে মার্কিন সেনা ও বিমানবাহিনীর স্থায়ী অবস্থান। আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার জাতীয় সীমানাগুলো বিন লাদেন এবং তার অনুসারীদের নিকট কেবল একটি বাহ্যিক বিভেদ রেখা। তাদের নিকট পুরো আরব উপদ্বীপটি কেবল তাদের মাতৃভূমিই নয়। তাদের নিকট এটি একটি পবিত্র ভূখণ্ড, যা নবি মুহাম্মাদ (সা.) এবং ইসলামেরও জন্মস্থান। ৯/১১-পরবর্তী সময়ে পরিচালিত একটি সৌদি জরিপে দেখা যায়, ২৫ থেকে ৪১ বছর বয়সের ৯৫ শতাংশ শিক্ষিত সৌদি নাগরিক বিন লাদেনের এই আরব উপদ্বীপ থেকে মার্কিনদের বিতাড়িত করার লক্ষ্যের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে।[৫]

বিন লাদেন বলতেন, ‘১৯৯০-এর দশকে ইরাকের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরদার করা এবং নো-ফ্লাই জোন-এ বোমা হামলা

করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আরব অঞ্চলের সামরিক ঘাঁটিগুলোকে ব্যবহার করেছে।' বিন লাদেন ইসরায়েলকে আমেরিকার নিঃশর্ত সমর্থনের কথাও নিয়মিতভাবে উল্লেখ করতেন। 'এই ইসরায়েল ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান জেরুজালেমের পাশাপাশি পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকার কয়েক মিলিয়ন ফিলিস্তিনির সম্পত্তি দখল করে রেখেছে।' এ ছাড়া তিনি ১৯৮২ সালে দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের আগ্রাসন এবং সেখানে পরবর্তী ১৮ বছরের স্থায়ী দখলদারিরও তীব্র সমালোচনা করতেন। এগুলোকে বিন লাদেন ইসরায়েলের শত্রুরাষ্ট্রসমূহ— যেমন ইরাককে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েলপন্থি পরিকল্পনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আল-কায়েদা আমেরিকার বিরুদ্ধে তাদের লড়াইকে ন্যায়সংগত প্রমাণের একটি যুক্তি হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য যেমন— জর্ডান, সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান, কাতার, ইয়েমেন এবং মিসরের দুর্নীতিবাজ স্বৈরশাসনের পক্ষে মার্কিন সমর্থনের কথা উল্লেখ করে। বিন লাদেন বলেন, 'আমেরিকা এসব দেশের স্বৈরশাসকদের সমর্থন প্রদানের বিনিময়ে বিভিন্ন শর্তারোপ করে।[৬] যেমন— কৃত্রিমভাবে জ্বালানি তেলের দাম নিম্নমুখী রাখতে হবে, জ্বালানি তেল রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব জনস্বার্থের পরিবর্তে মার্কিন অস্ত্র ক্রয়ে ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি।' বিপরীতে তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন, 'আরবের মানুষ তো তেল পান করে না। আমাদের তেল সর্বদাই বিশ্বের কাছে বিক্রয়যোগ্য থাকবে।' এমনকি যদি তিনি সমগ্র আরবের রাজাও বনে যান, তারপরও তিনি তেল বিক্রয় করবেন। কিন্তু, তখন সেটা হবে বাজার দরে।'[৭]

৯/১১-র মূল হোতাদের সবাই আমাদের সরকারের মিত্র সৌদি আরব, মিসর, লেবানন এবং আরব আমিরাতের মতো দেশগুলোর নাগরিক ছিল। তারা কেউই আমেরিকা স্বীকৃত শত্রুরাষ্ট্র যেমন ইরান, ইরাক বা সিরিয়ার ছিল না। তারপরও এটা কি অবাক করার মতো কোনো বিষয় ছিল?[৮]

যাহোক, অনেকেই বলতে চান, 'ওসামা বিন লাদেন কি একজন গণহত্যার ইন্ধনদাতা নন? তাহলে কেন আমরা তার কথা শুনব?' কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিন লাদেন আসলে কী বিশ্বাস করতেন সেটা কোনো ব্যাপার না হলেও তার অসন্তোষের এই তালিকাটি একটি সফল রিক্রুটমেন্ট হাতিয়ার। বিন লাদেনের এসব ব্যাখ্যা তরুণদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে। এসব ব্যাখ্যা দিয়েই তিনি ৯/১১ হাইজ্যাকারদের মতো যুবকদের আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেন।[৯]

সিআইএ’র বিন লাদেন ইউনিটের সাবেক প্রধান মাইকেল শয়্যার এই বিষয়টি জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘যখন ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনি ১৯৮০-র দশককে আমেরিকার নীতিভ্রষ্ট সংস্কৃতির সমালোচনা করছিলেন, তখন জবাবে সেই তরুণেরা কেবল হাই তুলেছিল। রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতারা হলিউড মুভির মাধ্যমে তরুণদের মনমানসিকতা কলুষিত হওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু এটা কি সেই তরুণদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কিংবা নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও মার্কিন নাগরিকদের হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট ছিল? অবশ্যই না। বিপরীতে বিন লাদেন বরং আরব দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তব, স্পষ্ট এবং ধ্বংসাত্মক নীতিসমূহ নিয়ে কথা বলেন। এগুলোই বিন লাদেনকে এমন একটি বাহিনী তৈরি করে দিয়েছে, যারা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে হলেও তার আদেশ পালনে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।’[১০]

৯/১১ হাইজ্যাকারদের প্রধান মোহাম্মদ আত্তা তার অসিয়তনামায় উল্লেখ করেছিলেন, ‘দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি গণহত্যার আসল কুশীলবদের বিরুদ্ধে চলমান এই যুদ্ধে আমি শাহাদাতবরণ করতে ইচ্ছুক।’ সাংবাদিক টেরি ম্যাকডার্মট মোহাম্মদ আত্তার নেতৃত্বাধীন ৯/১১ হাইজ্যাকারদের ‘হ্যামবুর্গ সেল’ নিয়ে লেখা বইয়ে উল্লেখ করেন, ‘হাইজ্যাকাররা সকলেই একমত ছিল যে ইসরায়েল যা করছে তার জন্য মূলত মার্কিনরাই দায়ী। কেননা মার্কিন সরকার ইসরায়েলকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সহযোগিতা দিয়ে থাকে।’

এর মাত্র কয়েক মাস পর, ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে ওসামা বিন লাদেন ‘Declaration of War Against the Americans Occupying the Land of the Two Holy Places’ শিরোনামে আমেরিকার বিরুদ্ধে তার প্রথম ‘ফতোয়া’ প্রকাশ করেন। এই ফতোয়ার একটি স্থানেও আমাদের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, অ্যাকশন মুভি, নারী স্বাধীনতা, কাউন্টি মেলা বা অন্য কোনো বিস্ময়কর জিনিসের প্রতি কোনো রকমের ঘৃণার উল্লেখ ছিল না। বরং এতে যা উল্লেখ ছিল তা হচ্ছে— আরব উপদ্বীপে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির উপস্থিতি; সেই ঘাঁটিগুলোর সাহায্যে ইরাকে বোমাবর্ষণ ও অবরোধ এবং ইসরায়েলের দখলদারি। বিশেষভাবে প্রথম ক্বানা গণহত্যা হিসেবে পরিচিত অপারেশন গ্রেপস অব রাথ (Operation Grapes of Wrath)-এর উল্লেখ ছিল সেখানে। এই অপারেশনে জাতিসংঘের একটি প্রাঙ্গণে আশ্রয়গ্রহণকারী ১০৬ জন লেবানিজ নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিক ইসরায়েলি বাহিনীর গোলাবর্ষণে নিহত হয়েছিল।[১১]

> জায়নিস্ট-ক্রুসেডার জোট ও তাদের সহযোগীদের আগ্রাসন, অন্যায় ও অবিচারের মুসলমানরা কতটা যন্ত্রণা ভোগ করছে, সেটা আপনাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। মুসলমানদের রক্ত এখন সবচেয়ে সস্তা জিনিস। মুসলমানদের সম্পদ এখন শত্রুর লুটপাটের বস্তু। ফিলিস্তিন ও ইরাকে আমাদের রক্ত ঝরেছে। লেবাননের ক্বানা গণহত্যার ভয়াবহ চিত্রগুলো এখনো আমাদের স্মৃতিতে তাজা রয়েছে।...
>
> তোমাদের (আমেরিকা) জায়নিস্ট দোসরদের পরিচালিত সব হত্যাকাণ্ড ও উচ্ছেদ এবং পবিত্র স্থানসমূহের পবিত্রতা লঙ্ঘনের জন্য লেবানিজ তরুণেরা তোমাদেরই দায়ী করে। তোমরাই সরাসরি ইসরায়েলকে অস্ত্র এবং অর্থ সরবরাহ করেছিলে।

জার্নালিস্ট জেমস বামফোর্ড উল্লেখ করেন, 'বিন লাদেন সেই সময়গুলোতে প্রায়ই ক্বানার ঘটনা উল্লেখ করতেন। আমেরিকার বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের ঘৃণাকে উসকে দেওয়ার জন্য এটি একটি জ্বালাময়ী উদাহরণ ছিল বটে।'[১২]

মোহাম্মদ আত্তা এবং তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী রমজি বিন আস-সিবহ আবিষ্কার করেছিলেন যে, ওসামা বিন লাদেনই সবচেয়ে গভীরভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির লালন করেন। তখনই তারা বিন লাদেনের যুদ্ধকে তাদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে ফেলেন। পরের বছরই আত্তা এবং আস-সিবহ বিন লাদেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আফগানিস্তানের প্রশিক্ষণ শিবিরে যাত্রা করেন। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তারা নিজেদের বিন লাদেনের কাছে অর্পণ করেন। তাদের সুপ্ত সম্ভাবনা আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কারণ জার্মানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া উচ্চ-মধ্যবিত্ত গ্র্যাজুয়েটরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সহজেই প্রবেশ করার সক্ষমতা রাখে।[১৩]

যাহোক, ৯/১১ ছিল ১৯৮২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ লেবানন দখলদারির ইসরায়েলের সহিংসতা এবং ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর থেকে ইসরায়েলি সামরিক অধিকৃত পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা এবং গোলান মালভূমিতে নির্মম বর্বরতার পক্ষে মার্কিন সামরিক, অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক সহায়তার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালের সীমান্ত ফিরে পেলে এবং স্বাধীন দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের মাধ্যমে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠা হলেই আল-কায়েদার নেতারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন না। তারা কখনো এমন কিছুর ইঙ্গিতও দেননি। বরং, বিন লাদেন শুরু থেকেই ইসরায়েল নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্বেরই বিরোধী।[১৪]

আধুনিক উচ্চ-প্রযুক্তির অস্ত্রশস্ত্র, পরিবহনব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ এবং কার্যত অন্যান্য যেকোনো মানদণ্ডে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে ইসরায়েল সামরিকভাবে অনেক বেশি উন্নত। এই রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই ইসরায়েলবান্ধব স্বৈরশাসক দ্বারা শাসিত; উদাহরণস্বরূপ: জর্ডান, মিসর ও সৌদি আরব।[১৫] সুতরাং, ইসরায়েলকে বৈদেশিক সাহায্য না দিলে আরবরা ইসরায়েলের ইহুদি জনগোষ্ঠীর ওপর আরেকটি গণহত্যা বা হলোকাস্ট চালাবে, এমন কোনো যুক্তি খুবই হাস্যকর। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুই বলেছিলেন, 'আমেরিকার ওপর নির্ভরশীলতা ইসরায়েলি রাষ্ট্রকে বরং দুর্বল করে।' মার্কিন সহায়তা তর্কসাপেক্ষে হিতে বিপরীত, এমনকি ইসরায়েল ও ইসরায়েলপন্থি আমলাদের দৃষ্টিকোণ থেকেও। ইসরায়েলিরা মার্কিনদের থেকে অনেক কম সন্ত্রাসবাদের শিকার। তারপরও ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের সামরিক দখলদারির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিলিয়ন ডলারের F-16s এবং M-16s পাঠানো হয়। বিনিময়ে মার্কিন হস্তক্ষেপের সব পরিণতি ভোগ করতে হয় আমাদের নিরীহ মার্কিনদের।[১৬]

সর্বোপরি, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড এবং লেবাননে ইসরায়েলের সহিংসতায় মার্কিন সমর্থনের জবাবে আল-কায়েদার বেসামরিক মার্কিন নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে। বিন লাদেন সিএনএনের পিটার আর্নেটের সঙ্গে তার ১৯৯৭ সালে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—

> আমরা মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছি, কারণ তারা নীতিহীন, সন্ত্রাসী ও নিপীড়ক। তারা সরাসরি নবিজি (সা.)-এর মিরাজের ভূমিতে [ফিলিস্তিন] ইসরায়েলি দখলদারিকে সমর্থনের মাধ্যমে চূড়ান্ত অন্যায়, বেআইনি এবং জঘন্য কাজে জড়িয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, ফিলিস্তিন, লেবানন এবং ইরাকে যারা নিহত হয়েছে, তাদের মৃত্যুর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি দায়ী। আমেরিকা নামটি সবকিছুর আগে আমাদের ক্বানায় গণহত্যার শিকার নিষ্পাপ শিশুদের কথা স্মরণ করায়। আমেরিকা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের কথা, যাদের মাথা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।[১৭]

সেপ্টেম্বর ইলেভেন্থ কমিশনের প্রশ্নের জবাবে এফবিআই এজেন্ট জেমস ফিৎসগেরাল্ড-এর দেওয়া জবাবও একই সাক্ষ্য দেয়। জেমস ফিৎসগেরাল্ড বলেছিলেন—

> আমি মনে করি, তারা আমেরিকার বিরুদ্ধে একটি ক্ষোভ অনুভব করে। তারা ফিলিস্তিনের সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা মনে করে। অত্যাচারী শাসকদের

> বিরোধিতা করা ব্যক্তিদের সঙ্গে তারা একাত্মতা পোষণ করে। আমি মনে করি, তারা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তাদের সব ক্ষোভ কেন্দ্রীভূত হয়েছে।[১৮]

এমনকি নাইন-ইলেভেনের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলেরও মনে হয়েছিল যে অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকায় একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসার জন্য এই আমেরিকাবিরোধী জঙ্গিবাদই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশ ইতোমধ্যেই আমলাদের 'ইসরায়েলিরাও আমাদের মতো ইসলামি জঙ্গিবাদের শিকার' গল্পে বুঁদ হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্টের কাছে সেই আমলারাই কদর পাচ্ছিলেন। তারা বুশকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে জেরুজালেমের পথ বাগদাদের ওপর দিয়ে গেছে! তাই ইরাকের শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন এই অঞ্চলে জঙ্গিবাদের সকল সমর্থনে ইতি টানবে। এমনটা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ভবিষ্যতে আরও শক্ত অবস্থান থেকে ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ পাবে।[১৯]

লিবারেল ন্যাশন পত্রিকার কলামিস্ট এরিক অলটারম্যান ইসরায়েলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অকুণ্ঠ সহায়তা এবং এর ফলাফল নিয়ে বলেন—

> আমি মনে করি, ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থন বিন লাদেনের ৯/১১-কে কিছুটা হলেও অনুপ্রাণিত করেছে। আমি মনে করি, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে যাওয়ার কারণেই তারা আমেরিকায় হামলা চালাতে চায়। আমি বলছি না যে এ কারণে আমাদের ইসরায়েলকে সহায়তা করা উচিত নয়। বরং ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ার জন্য যদি আমাদের এই মূল্য দিতে হয়, তবু আমরা এই মূল্য দিয়ে হলেও ইসরায়েলকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। ... বরং এই সহযোগিতার কারণেই যে আমরা হামলার শিকার হচ্ছি, আমি কেবল এটা স্বীকার করার মতো সৎ হতে বলছি।[২০]

এভাবে কেউ কেউ বাস্তবতা স্বীকার করার পরও এই বিশ্বাসে অটল থাকেন যে ইসরায়েলের দখলদারি সমর্থন দেওয়া, আরববিশ্বে সেনা মোতায়েন অব্যাহত রাখা, ইরাকে বোমাবাজি করা এবং আরও বিভিন্ন উপায়ে আমাদের শত্রুদের উসকে দেওয়া পুরোপুরি যৌক্তিক। তবে বিষয়টি মজার হয়ে দাঁড়ায় তখন, যখন আমাদের আমলারাও মাঝেমধ্যে এই সত্যকে স্বীকার করে যে 'শত্রুরা আমেরিকান সংখ্যাগরিষ্ঠদের ত্বকের বর্ণ, খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস, ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিংবা আমাদের আকাশচুম্বী উচ্চতার দালানের কারণে হামলা চালায় না। বরং এসব হামলার শিকড় আমাদের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দখলদারি এবং মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরশাসনের পক্ষে আমাদের এই অকুণ্ঠ সমর্থনই এক নম্বর ইস্যু।'[২১]

তথ্যসূত্র

১. Jessica Mendoza, “State Department Rep Says Jobs Could Be Key to Eradicating Islamic State,” Christian Science Monitor, February 17, 2015.

২. Julia Harte, “Cruz Chairs Contentious US Senate Hearing on ‘Radical Islam,’” Reuters, June 28, 2016.

৩. Osama bin Laden, Messages to the World: The Statements of Osama Bin Laden, ed. Bruce Lawrence, trans. James Howarth, annotated ed. (New York: Verso, 2005).

৪. Osama bin Laden, “Jihad Against Jews and Crusaders, World Islamic Front Statement,” February 23, 1998.

৫. Robert Pape, Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism (New York: Random House, 2005), 82.

৬. Michael Scheuer, Imperial Hubris: Why the West is Losing the War on Terror (Washington, DC: Potomac, 2007), 241.

৭. Abdul Bari Atwan, *The Secret History of al Qaeda*, updated ed. (Oakland: University of California Press, 2008), 33; Abdul Bari Atwan, “My Weekend with Osama bin Laden,” *Guardian*, November 11, 2001.

৮. “September 11th Hijackers Fast Facts,” CNN, last modified September 5, 2016; “Official: 15 of 19 Sept. 11 Hijackers Were Saudi,” USA Today, February 6, 2002.

৯. “Compilation of Usama Bin Laden Statements 1994-January 2004,” FBIS, January 2004; Osama bin Laden, Messages to the World.

১০. Scheuer, Imperial Hubris, 112, 211.

১১. Osama bin Laden, “Declaration of War Against the Americans Occupying the Land of the Two Holy Places,” PBS, August 1996.

১২. James Bamford, interviewed by author, Scott Horton Show, radio archive, August 14, 2004; Osama bin Laden, Messages to the World, 51, 114.

১৩. Ibid., 177-179.

১৪. Bin Laden, Messages to the World, 107, 114, 128, 162-163.

১৫. "Joint Press Conference with Secretary of Defense Ash Carter and Israeli Minister of Defense Moshe Ya'alon," United States Department of Defense, July 20, 2015; "Ensuring Israel's Qualitative Military Edge," Andrew J. Shapiro, remarks to Washington Institute for Near East Policy, November 4, 2011.

১৬. Shirl McArthur, "A Conservative Estimate of Total US Direct Aid to Israel: Almost $138 Billion," Washington Report on Middle East Affairs, October 2015.

১৭. "Transcript of Osama Bin Ladin Interview by Peter Arnett," Information Clearing House, March 1997.

১৮. James Bamford, "Intelligence Test," review of Without Precedent: The Inside Story of the 9/11 Commission, by Thomas H. Kean and Lee H. Hamilton, New York Times, August 20, 2006.

১৯. Karen DeYoung, Soldier: The Life of Colin Powell (New York: Vintage, 2007), 388.

২০. Jane Eisner et al., "Why We Need a Liberal Israel Lobby," YouTube Video, 1:16:54, from a panel discussion at the 92nd Street YMCA, New York, on March 16, 2009, uploaded March 18, 2009, posted by 92nd Street.

২১. Wright, The Looming Tower, 245-247; Berntsen, Jawbreaker, 67; Robert A. Pape, "It's the Occupation, Stupid," Foreign Policy, October 18, 2010; United States Department of Defense, "Report of the Defense Science Board Task Force on Strategic Communication," Federation of American Scientists, September 2004, p. 40; Stephen Zunes and Richard Falk, Tinderbox: U.S. Foreign Policy and the Roots of Terrorism (Monroe, ME: Common Courage, 2002); Johnny Spooner, "Islamic Terrorists, in Their Own Words," Drifters and Parking Spaces, November 16, 2015.

পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ধর্ম

অনেকেই আছেন, যারা কিনা শুধু ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়ায় মুসলমানদের যুদ্ধপ্রিয়, বর্বর, সন্ত্রাসী, সাইকোপ্যাথ ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বকে একটি সর্বাত্মক সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে চান।[১] আমরা বছরের পর বছর ধরে দিনরাত এই বার্তাটি ভিন্ন ভিন্নরূপে শুনে আসছি। প্রশ্ন হলো, 'ইসলামি চরমপন্থা' এবং 'আমেরিকাবিরোধী জঙ্গিবাদ'-এর মধ্যে কি আদৌ কোনো সম্পর্ক রয়েছে? উত্তর হলো, এই দুয়ের মাঝে কিছু সম্পর্ক থেকে থাকলেও আমাদের আমলারা যেভাবে দাবি করে, মোটেও সেভাবে নয়।

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ১.৬ বিলিয়ন। তারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের বেশি। তাদের মধ্যে কয়েক মিলিয়ন মার্কিন নাগরিকও রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে সুন্নি, শিয়াসহ আরও অনেক দল-উপদল রয়েছে। তারা কেউ মৌলবাদী, কেউ প্রগতিশীল, কেউ রক্ষণশীল আবার কেউ কট্টর। পৃথিবীজুড়ে তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। উল্লেখ্য, বিগত ১৫ বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার তৈরি বিশৃঙ্খলা এবং ইরাক ও সিরিয়ায় তথাকথিত ইসলামিক স্টেটের উত্থান সত্ত্বেও বিশ্বের দেড় শ কোটি মুসলমানদের মধ্যে হয়তো লাখেরও কম লাদেনপন্থি তৈরি হয়েছে।[২] অতএব, এখানে অবশ্যই ভিন্ন ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। উপরন্তু, সালাফি ও ওয়াহাবি মৌলবাদীদের একটি বিশাল অংশও শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানপ্রত্যাশী। তাদের অনেকেই সন্ত্রাসবাদ সমর্থন কিংবা এতে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী নয়।[৩]

আরও একটি স্পষ্ট বাস্তবতা হলো, অনেক আল-কায়েদা এবং আইএস জঙ্গিও ধর্মীয় মৌলবাদী কিংবা গোঁড়া নয়। বিগত ২৫ বছরে এসব বিন লাদেনপন্থিদের অনেকের ধর্মহীনতা দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলাকারীদের কয়েকজন, ৯/১১

হাইজ্যাকারদের কয়েকজন ইরাক ও সিরিয়ার অসংখ্য ইসলামিক স্টেট যোদ্ধা, ২০১৫ ও ২০১৬ সালের প্যারিস, ব্রাসেলস ও নিস-এর হামলাকারী প্রমুখ। এমনকি এসব সন্ত্রাসীর মধ্যে যাদের মৌলবাদী কিংবা ইসলামের কট্টর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী বলে ধরে নেওয়া যায়, তাদের মধ্যেও আমরা অনেক সময় ধর্মনিরপেক্ষ অনুপ্রেরণার চিহ্ন দেখতে পাই। যেমন, পশ্চিমা সরকারগুলোর সহিংস পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিশোধস্পৃহা। ২০০৮ সালে সন্ত্রাসবাদে জড়িতদের ওপর ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-ফাইভ পরিচালিত একটা গবেষণায় উঠে আসে—

> গোঁড়া ধার্মিক হওয়া তো দূরের কথা, বরং সন্ত্রাসবাদে জড়িতদের একটি বিরাট অংশ নিয়মিত ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করে না। তাদের অনেকেরই ধর্মীয় শিক্ষার অভাব রয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞানের বিষয়ে তাদের সর্বোচ্চ শিক্ষানবিশ বলা যেতে পারে। তাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক ধর্মীয় পরিবারে বেড়ে উঠেছে। এ ছাড়া তাদের মধ্যে ধর্মান্তরিতদের অনুপাতও গড়পড়তার চেয়ে বেশি। কেউ কেউ পূর্বে মাদকসেবন, অ্যালকোহল পান এবং অবৈধ সম্পর্কের সঙ্গেও জড়িত ছিল।[৪]

পাশাপাশি অনেক নিরাপত্তা সংস্থা জঙ্গি হামলার পেছনে চরমপন্থি আলেমদের ভূমিকা কম উল্লেখ করে জানায়, ‘সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্রিটিশ সন্ত্রাসীদের উগ্রপন্থিকরণে আলেমদের তেমন কোনো প্রভাব ছিল না।’ এমআই-ফাইভ বরং জোর দিয়ে জানায়, ‘বর্তমানের সবচেয়ে বড় হুমকি ইসলামকে রক্ষার্থে সহিংসতাকে ন্যায়সংগত করে তোলা ইসলামিক চরমপন্থি দলগুলো।’ তবে এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, অনৈসলামিক আন্দোলনেও বহু চরমপন্থি বিদ্যমান।

তবে সার্বিকভাবে ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো— আক্রান্ত গোষ্ঠী এবং তাদের হয়ে লড়াই করা গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সাধারণ পরিচয় বা পারস্পরিক সংহতির ভিত্তি সরবরাহ করা। যেমন, ৯/১১ হাইজ্যাকারদের কেউ ইরাকি না হলেও আল-কায়েদার সৌদি ও মিসরীয় হর্তাকর্তারা বছরের পর বছর ধরে স্বজাতি আরব ও ইরাকি মুসলিমদের রক্ষার জন্য এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমেরিকার সঙ্গে লড়াই করার কথা বলে আসছিল। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের তৈরি আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের সীমানাকে প্রত্যাখ্যান করে ইরাকি বেসামরিক ভুক্তভোগীদের আল-কায়েদা যোদ্ধারা উম্মাহ বা বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের অংশ বিবেচনা করে।[৫]

হ্যাঁ, এটাও সত্য যে আল-কায়েদা তাদের অবস্থান ও কার্যকলাপকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে। তাদের বার্তাসমূহ ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয়

নেতাদের উদ্ধৃত্তি দিয়ে ভর্তি থাকে। এটি প্রমাণিত যে ধর্মগ্রন্থের আক্ষরিক ব্যাখ্যা এবং পরকালের প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশ্বাসীরাই এসব লড়াইয়ের জন্য সর্বাগ্রে ছুটে যায়। তবে, শুধু খ্রিষ্টান অথবা ইহুদি কিংবা মুসলিমদের ক্ষেত্রেই এটি একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য বলে মনে করারও কোনো কারণ নেই। অন্য ধর্মের ক্ষেত্রেও গোঁড়া ধার্মিকেরাই ধর্মের নামে যুদ্ধে সবার আগে ছুটে আসবে। আমেরিকা যদি ভারত উপমহাদেশে বোমাবর্ষণ করত, অবরোধ চাপিয়ে দিত এবং দখলদারি চালাত, তবে খুব সম্ভব হিন্দু চরমপন্থিরাই এসব প্রতিরোধে সম্মুখভাগে থেকে নেতৃত্ব দিত। হিন্দুত্ববাদের হুমকি এবং প্রভাব নিয়ে আমরা তখন অনবরত সতর্কবার্তা শুনতে পেতাম। আমরা শুনতাম যে 'হিন্দুত্ববাদ মানুষকে উন্মাদ করে তোলে এবং কেবল স্বাধীন পশ্চিমা পৃথিবীতে বসবাসের অপরাধে হিন্দুরা পশ্চিমাদের হত্যা করতে চায়।'

ওসামা বিন লাদেন প্রায়শই তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বৈধতা হিসেবে ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে থাকেন। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ তার ১৯৯৮ সালের ঘোষণা। তিনি বলেন—

> আমেরিকানদের কৃত এসব অপকর্ম এবং পাপ আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা। মুসলিম ইতিহাসজুড়েই আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে বহিঃশত্রু কোনো মুসলিম দেশে হানা দিলে সেখানকার প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, "শত্রুকে প্রতিহত করার লড়াই ধর্ম রক্ষার লড়াই।" এই লড়াই অবশ্যকর্তব্য (ফরজে আইন) হওয়ার ব্যাপারে সব আলেম একমত। ধর্ম ও জীবনের ওপর আগ্রাসন পরিচালনাকারী শত্রুকে প্রতিহত করা ইমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্রতম দায়িত্ব (প্রথম ফরজ)। শাইখুল ইসলামের মতামতের ভিত্তিতে এবং আল্লাহর আদেশের অনুবর্তী হয়ে আমরা সব মুসলিমের জন্য নিম্নলিখিত ফতোয়া জারি করছি যে আল-আকসা মসজিদ (জেরুজালেমের) এবং পবিত্র মসজিদদ্বয়কে (মক্কা, মদিনা) মার্কিন থাবা থেকে মুক্ত করা মুসলমানদের ফরজ। মার্কিন সেনারা যেন কোনো মুসলমানের প্রতি হুমকি হিসেবে না থাকে এবং চূড়ান্তভাবে ইসলামি ভূখণ্ডগুলো থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে মার্কিন সামরিক ও বেসামরিক মিত্রদের হত্যা করাও সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।[৬]

এটি মূলত প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের আহ্বান, যা একটি অলঙ্ঘনীয় ধর্মীয় দায়িত্ব। নিজ ভূখণ্ডে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ না রাখা এই ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই

আমাদের দেশে জোরপূর্বক ইসলামি শাসনব্যবস্থা আরোপ করার জন্য লড়াই করছে না। এবার তাহলে আমাদের প্রেসিডেন্ট বা গভর্নরদের আমন্ত্রণে মার্কিন ভূখণ্ডে বিদেশি সামরিক ঘাঁটি বা বিদেশি সেনাবাহিনীর অবস্থান কল্পনা করে দেখুন তো। কেউ কি এটা মেনে নেবে? এমতাবস্থায় আমাদের জনগণও সেসব দখলদারদের বিতাড়িত করা অবধি লড়াই চালিয়ে যেত। ঠিক এমনিভাবে আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতার লড়াই করেছিলেন। অসংখ্য মন্ত্রী, যাজক, রাবাই ও নেতা আজ এই লড়াইয়ের গুণকীর্তন করেন।

সিআইএ'র সাবেক অ্যানালিস্ট এবং বিন লাদেন ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান মাইকেল শয়্যারের মতে, 'আল-কায়েদার যুদ্ধকৌশলকে "সন্ত্রাসবাদ" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সন্ত্রাসবাদের যথাযথ সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে আইনের চোখে নিষিদ্ধ সহিংসতার ব্যবহারই সন্ত্রাসবাদ, বিশেষত এই সহিংসতা যখন বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়।[৭] কিন্তু আমার মতে, মার্কিন দখলদারির বিরুদ্ধে ইসলামিস্টদের যুদ্ধকে বিদ্রোহ বলাই অধিক যুক্তিসংগত। তারা বরং সন্ত্রাসবাদকে একটি যুদ্ধকৌশল হিসেবেই ব্যবহার করে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধে সুন্নি আরবদের অভ্যুত্থান এবং আফগানিস্তানে তালেবান বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে তার এই মূল্যায়ন আরও সুস্পষ্ট হয়।'

যাহোক, নিঃসন্দেহে অসংখ্য আল-কায়েদা এবং আইএস সদস্য তাদের নিজ ধর্ম এবং বিশ্বব্যাপী স্বধর্মীয় লোকজনের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। তবে যুদ্ধের অস্থিতিশীল অরাজকতাই চরমপন্থি গোষ্ঠী সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা রাখে। ব্রিটিশ চলচ্চিত্র নির্মাতা অ্যাডাম কার্টিস তার ডকুমেন্টারি দ্য পাওয়ার অব নাইটমেয়ার-এ এটাই তুলে ধরেছেন। তিনি দেখান, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং আল-কায়েদা জঙ্গিবাদ একে অপরের দর্পণ। জনমত তৈরি করতে এবং জনগণকে সংগঠিত করতে সব উগ্রবাদী দলকেই শত্রুদের সহিংসতা ও অরাজকতা প্রচার করতে হয়। একই সঙ্গে জনগণকে রক্ষার জন্য অবশ্যম্ভাবী দুর্যোগের ত্রাণকর্তা হিসেবে নিজেদের চিত্রায়ণ করার প্রয়োজন হয়। এখানে উভয় পক্ষের মুখপাত্ররা অপর পক্ষের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলো তুলে ধরে নিজেদের ফায়দা হাসিল করে। গত শতাব্দীতে ইউরোপীয় কমিউনিস্ট সন্ত্রাসীরাও এই কৌশল কাজে লাগিয়েছিল। বামপন্থি ও ডানপন্থিদের মধ্যে লড়াইকে তীক্ষ্ণ করা, মধ্যপন্থিদের বিচ্ছিন্ন করা এবং উভয় পক্ষকে চরমপন্থি করে তোলার জন্য তারা বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলার কৌশল ব্যবহার করেছিল।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মার্কিন আমলা এখনো আমাদের সন্ত্রাসবাদ সমস্যার জন্য সরাসরি ইসলামকে দায়ী করে। আমলাদের এই উদ্দেশ্যমূলক প্রোপাগান্ডার ফাঁদে পড়ে পশ্চিমের অসংখ্য মানুষ দেড় বিলিয়নেরও বেশি মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। ফলশ্রুতিতে আমাদের সংঘাত আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এই পশ্চিমা আমলারা ইসলামি ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলো নিয়ে এক প্রকার খেলা করে। তারা এই যুদ্ধের জন্য ইসলামের ধর্মগ্রন্থকে দোষারোপ করতে চায়। কারণ, উগ্রবাদী মতাদর্শ সৃষ্টির পেছনে আমেরিকার সাম্প্রতিক যুদ্ধে ঘটে যাওয়া মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘনকে অব্যাহতি দিতে, এই মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিশ্ববাসীর মনোযোগ সরাতে এবং প্রতিপক্ষের ওপর সবকিছুর দায় চাপাতে দোষারোপের এই নীতি একটি সুবিধাজনক হাতিয়ার।

পশ্চিমে কোনো আক্রমণ হলেই এই আমলারা বলে ওঠেন, 'সন্ত্রাসবাদের নিন্দা জানানো মডারেট মুসলমানরা এখন কোথায়?' কিন্তু বাস্তবতা হলো, মুসলমান নেতারা সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করলেও মিডিয়াগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো এড়িয়ে যায়।[৮] মিডিয়াই এই ধারণা টিকিয়ে রেখেছে যে মুসলমানদের মধ্যে বহুলভাবে সন্ত্রাসবাদী সহিংসতার প্রতি সমর্থন রয়েছে। কিন্তু বাস্তবের চিত্র পুরোপুরি বিপরীত।

পশ্চিমা নেতারা দাবি করেন, তারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আলোকে আরব ও মুসলিম বিশ্বে একটি আলোকিত নতুন যুগের সূচনা করতে চান। কিন্তু বাস্তবেই এমনটা চাওয়া হলে বিশ্বের বিভিন্ন নিপীড়ক সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো না। আমাদের নেতারা তখন ভিনদেশে আগ্রাসন না চালিয়েই নীতি এবং আদর্শের বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেন।[৯] তা না করে পশ্চিমা নেতারা ভিনদেশে গণহত্যা চালায়, সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধ বাধায় এবং পরিশেষে মানুষকে চরমপন্থি আদর্শের দিকে ধাবিত করে।

তথ্যসূত্র

১. Wajahat Ali et al., "Fear, Inc.: The Roots of the Islamophobia Network in America," Center for American Progress, August 26, 2011; Max Blumenthal, "The Great Fear," TomDispatch, December 19, 2010; Nathan Lean, The Islamophobia Industry: How the Right Manufactures Fear of Muslims (London: Pluto, 2012); David Noriega, "Brigitte Gabriel Wants You to Fight

Islam," BuzzFeed News, September 27, 2016; Jack Shaheen, Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People, 3rd ed., (Northampton, MA: Olive Branch, 2014).

২. Ali Soufan, "Al Qaeda is Stronger Now Than When Bin Laden Was Killed," Daily Beast, May 7, 2017; "Al-Qaeda," GlobalSecurity.org; "Al Qaeda," Mapping Militant Organizations, Stanford University; Jim Sciutto et al., "ISIS Can 'Muster' Between 20,000 and 31,500 Fighters, CIA Says," CNN, September 12, 2014.

৩. John L. Esposito and Dalia Mogahed, Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think (Washington, DC: Gallup, 2008); Najam Haider, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, January 7, 2016.

৪. Travis, "MI5 Report Challenges Views on Terrorism in Britain."

৫. Osama bin Laden, "Full Text: Bin Laden's 'Letter to America,'" Guardian, November 24, 2002.

৬. Bin Laden, "Jihad Against Jews and Crusaders."

৭. "Definition of Terrorism in English," Oxford Dictionaries.

৮. Heraa Hashmi, comp., "Worldwide Muslims Condemn List"; Arwa Mahdawi, "The 712-page Google Doc That Proves Muslims Do Condemn Terrorism," Guardian, March 26, 2017; Ben Kentish, "25,000 Muslims Just Came Together to Condemn Extremism," Independent, October 14, 2016; Harriet Sherwood and Helen Pidd, "UK Muslim Leaders Condemn 'Cowardly' London Attack," Guardian, March 23, 2017; Heather Timmons, "Muslims Around the World Condemn Terrorism After the Paris Attacks," Quartz, November 14, 2015; Mary Kate Cary, "Pressing a Muslim Reformation: You Wouldn't Know It from the Press but Moderate Muslims Do Denounce Terrorism," U.S. News and World Report, December 18, 2015; Erica Pishdadian, "Paris Terrorist Attacks: Muslims, Iranian and Arab Leaders Condemn ISIS Violence in France," International Business Times, November, 14 2015; "Where Are the Muslim voices?" American Muslim, accessed May 16, 2017

৯. George W. Bush, "Inaugural Address," 41 Weekly Comp. Pres. Doc. 74 (January 20, 2005).

আত্মঘাতী হামলার স্বরূপ সন্ধানে

৯/১১ হামলার পর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট পেপ আত্মঘাতী সন্ত্রাসে উদ্বুদ্ধকারী ইসলামি উপাদান নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এই গবেষণার ফলাফল দেখে তিনি নিজেই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে তার পূর্বানুমান পুরোপুরি ভুল ছিল। তার অনুমানের বিপরীতে সেই গবেষণা প্রমাণ করেছিল যে 'আত্মঘাতী হামলা বিদেশি দখলদারির সরাসরি প্রতিক্রিয়া ভিন্ন কিছু নয়।' বিশ্বব্যাপী সাধারণ নাগরিক ও সৈন্যদের লক্ষ্য করে ইতিহাসজুড়ে এই ধরনের অগণিত হামলার প্রমাণ পেয়েছেন তিনি। কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে ইসলামের ন্যূনতম সম্পর্কও ছিল না। যেমন: প্রাচীনকালের রোমান দখলদারির বিরুদ্ধে ইহুদি সিকারাই[১] বা 'ছুরিমানব'দের (dagger man) ছুরি-তলোয়ার দিয়ে আত্মঘাতী হামলা; শিন্টো[২] ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী[৩] জাপানি কামিকাজি পাইলটদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলা; প্রায় দুই দশক ধরে বৌদ্ধ, সিংহলীদের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার হিন্দু-নাস্তিক-মার্ক্সবাদী তামিল টাইগারদের আত্মঘাতী হামলা। আত্মঘাতী হামলার কৌশল ব্যবহারে এই তামিল টাইগাররা ২০০৩ সালের আগে একপ্রকার 'বিশ্ব নেতৃত্বে' ছিল।

রবার্ট পেপের অধীনে তার শিক্ষার্থী ও কর্মীরা ১৯৮০ সাল থেকে সংঘটিত হওয়া পৃথিবীর প্রতিটি আত্মঘাতী হামলা এবং হামলাকারীর একটি ডেটাবেইস তৈরি করে।[৪] তার গবেষণা দেখিয়েছে, আত্মঘাতী হামলা আর সিরিয়াল কিলারদের মনোবিকারগ্রস্ত বা অযৌক্তিক হত্যাকাণ্ড মোটেও এক নয়। 'আত্মবাদী' ও 'অদৃষ্টবাদী' আত্মহত্যায় দেখা যায়, ব্যবসায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কোনো সফল ব্যবসায়ী জানালা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অথবা জীবন নিয়ে হতাশাগ্রস্ত যে কেউ যে কোনো উপায়ে নিজের জীবনকেই কেড়ে নেয়। এ ধরনের আত্মহত্যা আর যুদ্ধে কৌশলগত কারণে আত্মঘাতী হামলার মধ্যে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই।[৫]

পশ্চিমা সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞরা 'আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা'কে আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদ ব্যাখ্যার মডেল হিসেবে ব্যবহার করেন। তারা বলেন, এই বোমাবাজেরা অভাগা, তরুণ, দরিদ্র, অশিক্ষিত ও হতাশ। বেঁচে থাকার সব অবলম্বনকে হারিয়ে তারা নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। দুষ্ট ওয়াহাবি-সালাফিদের পাল্লায় পড়ে তারা বিশ্বাস করে যে এর মাধ্যমে তারা জান্নাতে কুমারী হুরদের সঙ্গলাভ করবে।[৬] কিন্তু পেপের গবেষণা মোতাবেক এই মডেল শতভাগ বর্জনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মঘাতী হামলাকারীরা মধ্যবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত, সুশিক্ষিত, সফল এবং সামাজিক হয়ে থাকে। তারা তাদের কর্মকাণ্ড এবং ফলাফল সম্পর্কে অবগত থাকে। রবার্ট পেপের গবেষণা প্রমাণ করে, কারও আত্মঘাতী হয়ে ওঠার পেছনে একক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো হামলাকারীর ভূখণ্ডে বিদেশি দখলদার বাহিনীর উপস্থিতি। জন্মভূমির বৃহত্তর কল্যাণ, স্বদেশ থেকে হানাদারদের উৎখাত এবং একটি কৌশলগত প্রচারাভিযান হিসেবে শত্রুকে হত্যা করার পাশাপাশি তারা নিজের জীবনকেও উৎসর্গ করে দেয়।[৭]

আত্মঘাতী হামলার এই স্ট্র্যাটেজিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনশীল উপাদান রয়েছে। এই উপাদানগুলো হামলার গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। যেমন, দখলদার ও দখলকৃত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের মাত্রা, দখলকৃত সমাজে দখলদার শক্তি কর্তৃক কোনো পরিবর্তন আনতে চাওয়ার প্রচেষ্টা ইত্যাদি। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, লাতিন এবং খ্রিষ্টান মার্কিনরা আরব, মুসলিম ইরাককে দখল করে সেখানকার সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। ফলাফল যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। অথচ ইতিপূর্বে আত্মঘাতী হামলার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। অন্যদিকে, কমপক্ষে ২ লাখ মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়া পশ্চিম সুদানের ভয়াবহ যুদ্ধে আজ অবধি কোনো আত্মঘাতী হামলার খবর পাওয়া যায়নি।[৮]

রবার্ট পেপ-এর গবেষণা অনুসারে, আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদের দিকে ধাবিত হওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হলো শত্রুদেশের সরকার বা জনগণের ওপর এর প্রভাব। 'এই কৌশল শত্রুদের পিছু হটতে বাধ্য করবে অথবা তাদের সর্বাত্মক যুদ্ধে প্রলুব্ধ করবে' এমনটাই মনে করে আত্মোৎসর্গকারীরা। যেমন, ২০০৪ সালে মাদ্রিদ হামলার পর জনদাবির মুখে স্পেন দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধ থেকে নিজ সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। অবশ্য স্পেনের মতো গণতান্ত্রিক সরকারগুলো তুলনামূলক বেশি পরিমাণে আত্মঘাতী হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে। অন্যদিকে চীনের মতো কর্তৃত্ববাদীরা কম পরিমাণে এই ধরনের হামলার ভুক্তভোগী হয়। তাদের সরকার এই ধরনের হামলার জবাবে প্রতিক্রিয়াহীন

এবং নির্বিকার থাকে। আত্মঘাতী হামলার প্রভাব দৃশ্যমান না হওয়ায় সম্ভাব্য হামলাকারীরা তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

২০০০ সালে ইসরায়েল লেবানন থেকে সরে আসার আগপর্যন্ত শিয়া সশস্ত্র বাহিনী হিজবুল্লাহ ১৬ বছর ধরে ইসরায়েল এবং এর মিত্রদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলার অভিযান চালিয়েছিল। কিন্তু লেবানন থেকে ইসরায়েলের সরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আত্মঘাতী হামলাও বন্ধ হয়ে যায়। পেপের ডেটাবেইস অনুসারে, ইসরায়েলের ওপর হিজবুল্লাহর সর্বশেষ আত্মঘাতী হামলা হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। অন্যদিকে, ফিলিস্তিনিরা পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকায় আজও ইসরায়েলি সামরিক শাসনের আওতাধীন।[৯]

২০১৫ সালে শুরু হওয়া তৃতীয় ফিলিস্তিনি অভ্যুত্থান বা নাইফ ইন্তিফাদা (Knife Intifada) সহস্রাব্দ পূর্বেকার রোমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি জিওলাটদের যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই নব্য অভ্যুত্থান অসংগঠিত তরুণদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। হামাসের সুসংগঠিত হামলার জায়গায় এই তরুণেরা ইসরায়েলি সৈনিক এবং দখলদার বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ব্যক্তিগতভাবে হামলা চালাচ্ছে।[১০] পশ্চিমাঘেঁষা ও নব্বইয়ের দশকে জন্ম নেওয়া এসব তরুণের আত্মঘাতী হামলার জন্য ইসরায়েলের সামরিক দখলদারি এবং উপনিবেশবাদকে দায়ী না করে ইসলামি চরমপন্থা ও মৌলবাদকে দোষারোপ করা একটা নির্জলা মিথ্যাচার।[১১] আমাদের গেলানো হয়, 'ফিলিস্তিনিরা ইহুদিদের ঘৃণা করে। তারা বলে, "দেখুন, দেখুন, ফিলিস্তিনিরা তাদের বাচ্চাদেরকেও ইহুদিদের ঘৃণা করতে শেখায়। তাই, এমন পরিস্থিতিতে ইসরায়েলিরা কি নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে না?"[১২]

যাহোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লাদেনপন্থিদের যুদ্ধও উপরিউক্ত চিত্রগুলোর ব্যতিক্রম নয়। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন হস্তক্ষেপের জেরেই মার্কিন ভূখণ্ডে তাদের পাল্টা হামলার উদ্ভব। মাইকেল শয়্যার বলেন, 'বিন লাদেন মুসলিম বিশ্বের প্রতি মার্কিন এবং পশ্চিমাদের নীতির পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, নেহাত আমেরিকাকে ধ্বংস করতে নয় কিংবা তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতাকেও ধ্বংস করতে নয়। তিনি ছিলেন একজন "বাস্তববাদী যোদ্ধা"।'[১৩]

বিল ক্লিনটন এবং জর্জ ডব্লিউ বুশের সময়কালের সিআইএ অ্যানালিস্ট সিন্থিয়া স্টোরার জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'মানুষকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করতে প্ররোচিত করা গোষ্ঠীগুলো শুধু ধর্মভিত্তিক নয়। এই গোষ্ঠীগুলো বরং রাজনৈতিক এবং "পুরোপুরিভাবে সর্বজনীন"।' সন্ত্রাসবাদ ইসলামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নয়। এটি কার্যত নিপীড়কের বিরুদ্ধে কিছু দুর্বল

মানুষের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিঘাত। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেই নিপীড়কদের সংস্কার করা যাবে না মর্মেই তাদের বিশ্বাস। ক্ষমতার প্রতি উদীয়মান কোনো শক্তির চ্যালেঞ্জ বিরুদ্ধে চলা সহিংসতাই এই সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমে প্ররোচনা দেয়। এরপর সেই কথিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সেই নিপীড়কের দমন-নিপীড়নের মাত্রা কেবল বাড়তেই থাকে। তখন অনিবার্যভাবে অসংখ্য নিরীহ বেসামরিক নাগরিক হতাহত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয় আরও সন্ত্রাসী। এভাবেই চক্রটি চলতে থাকে।[১৪]

অনেক প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমও এখন স্বীকার করছে যে ইয়েমেনে সিআইয়ের ড্রোন হামলার পর থেকে সেখানে আল-কায়েদা আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে! কিন্তু একই সঙ্গে তারা বলতে চায়, ৯/১১-ই সবকিছুর শুরু। তাদের উচিত ১৯৯০-এর দশকে ওসামা বিন লাদেনের সতর্কবার্তা এবং সন্ত্রাসী হামলাগুলো বিশ্লেষণ করা। তাদের কি জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশের প্রথম ইরাক যুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা স্মরণ নেই? স্পষ্টতই তারা মানুষের নিকট সত্য স্বীকার করতে চায় না।

দেড় যুগ আগের একটি হামলার জবাবে লাখ লাখ মার্কিন নারী-পুরুষ জীবনের ঝুঁকিকে উপেক্ষা করে মার্কিন সেনাবাহিনীতে নাম লেখাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে এটা কল্পনা করা কি আসলেই এত কঠিন যে আরববিশ্বের মতো মার্কিন পৃষ্ঠপোষিত স্বৈরশাসন, দখলদারি এবং যুদ্ধের গোলযোগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলে মার্কিনরাও ভিন্ন কোনো ৯/১১ ঘটাত না? মার্কিন সরকার ভাগ্যবান যে মধ্যপ্রাচ্যের বাসিন্দাদের অধিকাংশই আরব মুসলমান এবং অধিকাংশ মার্কিন এই অঞ্চল, তাদের ধর্ম, ভাষা বা এসব মানুষের সম্পর্কে কার্যত কিছুই জানে না।[১৫] গত শতাব্দীর জাপানি সাম্রাজ্যবাদী এবং রাশিয়ান, চীনা, কোরিয়ান ও ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট শত্রুদের মতো এই আরব মুসলমানরাও মার্কিনিদের কাছে অপরিচিত। তাই চলমান সংকটকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা সরকারের জন্য সহজ হয়ে গেছে। আমাদের সরকারের তৈরি সংঘাতকেও তাই জনগণ আনমনেই সমর্থন করে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১. Pape, Dying to Win, 33-34; Paul Christian, “Who Were the Sicarii?” Meridian Magazine, June 7, 2004; “Martyrdom and Murder,” Economist, January 8, 2004.

২. Bruce Wallace, “They’ve Outlived the Stigma,” Los Angeles Times, September 25, 2004.
৩. Christopher Harding, “Into Nothingness,” Aeon, November 10, 2014; Pape, Dying to Win, 35-36.
৪. Chicago Project on Security and Terrorism, “Suicide Attack Database.”
৫. Robert A. Pape, “The Strategic Logic of Suicide Terrorism,” American Political Science Review 97, no. 3 (August 2003), ; Pape, Dying to Win, 176.
৬. Adam Lankford, “Ron Paul Is Wrong About 9/11, Studies Show,” Huffington Post, September 19, 2011; “Robert A. Pape and Adam Lankford,” Scott Horton Show, radio archive, September 21, 2011.
৭. Pape, Dying to Win, 4, 21, 27, 42.
৮. Chicago Project on Security and Terrorism, “Suicide Attack Database.”
৯. Chicago Project on Security and Terrorism, “Suicide Attack Database.”; Pape, “It’s the Occupation, Stupid.”
১০. Peter Beaumont, “Israel-Palestine: Outlook Bleak as Wave of Violence Passes Six-Month Mark,” Guardian, March 31, 2016.
১১. Avi Issacharoff, “‘Lone Wolf Intifada’ is Not Driven by Religion, and for Now It Seems to be Waning,” Times of Israel, April 2, 2016; Shlomi Eldar, “This is Not Your Father’s Intifada,” alMonitor, January 27, 2016; Jodi Rudoren, “Leaderless Palestinian Youth, Inspired by Social Media, Drive Rise in Violence in Israel,” New York Times, October 13, 2015.
১২. “Gaza Kids Put on Play About Stabbing, Killing Israelis,” Times of Israel, April 27, 2016; Jodi Rudoren and Rami Nazzal, “Palestinian Anger in Jerusalem and West Bank Gets a Violent Soundtrack,” New York Times, October 22, 2015.
১৩. Scheuer, Imperial Hubris, xvii.
১৪. Storer, Scott Horton Show, March 13, 2017.
১৫. Michael Lipka, “Muslims and Islam: Key Findings in the US and Around the World,” Pew Research, February 27, 2017.

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির আসল চেহারা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেতে থাকে।[১] প্রথম দিকে, সমাজতন্ত্র থেকে সুরক্ষা এবং সোভিয়েত ও চীনা সম্প্রসারণবাদের দমননীতি হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে বৈধতা প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয়।[২] সবশেষ মার্কিন-সোভিয়েত স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর মার্কিনরা একটি পূর্ণমাত্রার বৈশ্বিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।[৩] অথচ কথিত রক্ষণশীল এবং বস্তুবাদী বিশেষজ্ঞরা এই মার্কিন আধিপত্যবাদকে হিতৈষী বিশ্ব-নেতৃত্ব কিংবা 'উপকারী আধিপত্য' আখ্যা দিতে পছন্দ করে![৪] পেন্টাগন বর্তমানে বিশ্বের ১৩৫টির বেশি দেশে ৮০০টির বেশি সামরিক ঘাঁটি পরিচালনা করছে।[৫] তারা ইউরোপ, এশিয়াসহ বিশ্বের অন্য সব ক্ষমতাধর দেশকে তার নিকটতম মিত্র বা ছায়ারাষ্ট্র মনে করে। সামরিক সক্ষমতা ও বিশালতার ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চীন[৬] ও রাশিয়ার[৭] চেয়ে বহুগুণ অগ্রসর। এই দেশটির অতুলনীয় নৌবাহিনী পৃথিবীর প্রতিটি মহাসাগর-সাগর-উপসাগরে আধিপত্য বিস্তার করে।[৮]

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের মতো পুরোদস্তুর ঔপনিবেশিক পদ্ধতি অনুসরণ করার পরিবর্তে আমেরিকা আধিপত্য বিস্তারের ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছে। সামরিক ঘাঁটি,[৯] পর্যায়বৃত্ত অভ্যুত্থান[১০] এবং পর্দার পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ানোর মাধ্যমে সৃষ্ট একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে আমেরিকা আধিপত্য বিস্তারের ব্যতিক্রমী পদ্ধতি বেছে নিয়েছে।[১১] পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলেই সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং প্রভাবশালী এই সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এমনকি সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিদ্যমান।[১২] বিশ্ব মোটাদাগে আজও ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মার্কিন নেতৃত্ব অনুসরণ করতে বাধ্য।[১৩] অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাম্রাজ্যবাদ স্পষ্টতই সন্ত্রাসীদের আমেরিকাবিরোধী যুদ্ধের চেয়েও অনেক পুরোনো।

২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল, ইতিহাসবেত্তা এবং রক্ষণশীল যুদ্ধ-সমালোচক অ্যান্ড্রু বাসেভিচ *America's War for the Greater Middle East: A Military History* নামক একটি বই প্রকাশ করেন। স্বাভাবিকভাবেই, তার বর্ণনা ৯/১১-এর অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে। বাসেভিচ উল্লেখ করেন, 'এই অঞ্চলে আমেরিকার যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনোই "তাদের বিরুদ্ধে তাদের দেশেই লড়াই করো, যেন তারা আমাদের দেশে এসে লড়তে না পারে"— এই নীতির আওতাভুক্ত ছিল না। বরং, এই যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল— বৈশ্বিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং এই আধিপত্য বজায় রাখা।[১৪] তাহলে সন্ত্রাসবাদ? বেশ, এটি কেবল একটি ক্ষুদ্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।' একজন উচ্চপদস্থ স্পেশাল অপারেশন কমান্ডারের বরাতে তিনি জানান, 'নব্বইয়ের দশকে পেন্টাগনের জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের নীতিনির্ধারকেরা বলত, "পরাশক্তি মর্যাদার বিপরীতে সন্ত্রাসবাদী কিছু আক্রমণ বাস্তবে বেশ ক্ষুদ্র একটি বিনিয়োগ"।'[১৫] এভাবে সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ের ঝান্ডা মার্কিন দখলদারিকে সম্প্রসারণের একটি সুবিধাজনক ঢাল বটে। এই সুবিধাবাদী নীতির কারণেই সন্ত্রাসবাদ সমস্যাটি শুরুতেই একটি শক্তিশালী ভিত্তি পেয়ে যায়।

সবকিছু বিবেচনায় বিন লাদেন আসলে একটি সহজ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বাজি ধরে বলেছিলেন, 'মার্কিন সরকার মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সাম্রাজ্যবাদী হাতকে সম্প্রসারণের জন্য আরও অজুহাত খুঁজছে। তারা সব ধরনের সুযোগকে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর।' তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন, 'এমনটা করার মাধ্যমে মার্কিনরা কেবল নিজেদের ধ্বংসের বীজই বপন করবে।' মোদ্দাকথা, সবই ছিল ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে একটি বিন লাদেনপন্থি ইসলামি রাষ্ট্রের বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার সহায়ক উপাদান। এ জন্যই অভিজ্ঞ অনুসন্ধানী প্রতিবেদক জেমস বামফোর্ড বলেছিলেন—

> বিন লাদেনের ডেপুটি আয়মান আল-জাওয়াহিরির যুক্তি ছিল 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও সরাসরি যুদ্ধে আমেরিকাকে প্ররোচিত করার জন্য আল-কায়েদার উচিত আমেরিকার অভ্যন্তরে হামলা করা।' (মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে হামলার মাধ্যমে) তারা এই যুদ্ধের দামামা বাধিয়েছিলেন। তারা ডিক্লারেশন অব ওয়ার অ্যাগেইনস্ট জিউস অ্যান্ড ক্রুসেডারস-এ স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল স্পষ্টতই কয়েক দশক ধরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি পরোক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। এ জন্য তারা মার্কিনদের আরেকটি ভিয়েতনামের দিকে প্রলুব্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেখানে বিন লাদেন হবেন হো চি মিন।[১৬]

তথ্যসূত্র

১. Chalmers Johnson, Nemesis: The Last Days of the American Republic (New York: Metropolitan, 2008); Paul Wolfowitz et al., "1992 Defense Planning Guidance," Office of the Secretary of Defense, February 1992.

২. [George F. Kennan], "The Sources of Soviet Conduct," Foreign Affairs, July 1947; James S. Lay, "A Report to the National Security Council - NSC 68," President's Secretary's File, Truman Papers, April 12, 1950.

৩. Jim Garamone, "Joint Vision 2020 Emphasizes Full-spectrum Dominance," American Forces Press Service, June 2, 2000.

৪. Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (Lebanon, IN: Basic, 1997).

৫. David Vine, Base Nation: How U.S. Military Bases Abroad Harm America and the World (New York: Metropolitan, 2015).

৬. David Axe, "Why China is Far from Ready to Meet the US on a Global Battlefront," Reuters, June 22, 2015.

৭. Jonathan Masters, "How Strong is the Russian Military?" Newsweek, December 12, 2014.

৮. "US Navy," GlobalSecurity.org.

৯. Vine, Base Nation.

১০. Stephen Kinzer, Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq (New York: Times, 2006).

১১. John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man (Oakland: Berrett-Koehler, 2004).

১২. Chalmers Johnson, The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic (New York: Metropolitan, 2004).

১৩. William Blum, "Overthrowing Other People's Governments: The Master List," February 2013.

১৪. Andrew J. Bacevich, America's War for the Greater Middle East: A Military History (New York: Random House, 2016).

১৫. Richard H. Schultz Jr., “Showstoppers: Nine Reasons Why We Never Sent Our Special Operations Forces After Al Qaeda Before 9/11,” Weekly Standard, January 26, 2004.

১৬. James Bamford, A Pretext for War: 9/11, Iraq, and the Abuse of America’s Intelligence Agencies (New York: Doubleday, 2004), 210-211.

রোনাল্ড রিগ্যানের মুজাহিদিন

বিন লাদেনের 'ভিয়েতনাম ফাঁদ' নতুন কোনো কৌশল ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই একই পদ্ধতিতে ওসামা বিন লাদেন তার প্রথম আফগান মিশন সফলভাবে সমাপ্ত করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্বিগনিফ ব্রজেনস্কি দম্ভ করে বলেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে আক্রমণ করামাত্রই তিনি তার ঊর্ধ্বতনের কাছে একটি ক্ষুদে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সেই বার্তায় বলা হয়েছিল, 'সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি ভিয়েতনাম উপহার দেওয়ার সুযোগ আমাদের নিকট এসেছে।'[১] ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় ভিয়েতনাম শব্দটি ছিল রক্তক্ষরণ, পরাজয়, গভীর ফাঁদে পা দেওয়া, সেনাবাহিনী এবং সরকার ধ্বংস, অপূরণীয় সামাজিক ক্ষতি ইত্যাদির একটি প্রতিশব্দ। তাই পরিকল্পনা করা হয়, এই ধরনের বিপর্যয় মার্কিন জনগণের ওপর আরোপিত হলে যুদ্ধের কলকাঠি নেড়ে সোভিয়েতকে ভিয়েতনামী ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া সম্ভব। এই কথাই ব্রজেনস্কি এবং রবার্ট গেটসের মতো অন্যান্য সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা দম্ভভরে বলেছিলেন। অবশেষে সিআইএকে আফগান মুজাহিদদের জন্য গোপন সহায়তার অনুমোদন দিয়ে ১৯৭৯ সালের ৩ জুলাই প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার একটি নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত আগ্রাসন প্ররোচিত করা! অতঃপর সোভিয়েত আগ্রাসনের পরপরই জিমি কার্টার বলেছিলেন, 'এই আগ্রাসন আফগানিস্তানে মার্কিন হস্তক্ষেপকে অপরিহার্য করে তুলেছে।'[২]

১৯৮০-র দশকে আফগান যুদ্ধকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা বৈদেশিক বার্তা প্রেরক এরিক মারগোলিসের মতে, 'পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে নিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোপন হস্তক্ষেপ শুরু করেছিল। সোভিয়েতরা সে সময় সব দিক থেকেই সংকট দেখতে পায়। আফগানিস্তানে সোভিয়েত সমর্থিত যুদ্ধবাজ নেতারাও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। এই উদ্ধত নেতারা ব্যাপক নিপীড়ন

চালাচ্ছিল এবং মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে গৃহযুদ্ধকে উসকে দিচ্ছিল। সমগ্র কাবুলে শাসনব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়লে ক্রেমলিন ভীত হয়েই আগ্রাসন চালিয়ে বসে।’[৩] বিশিষ্ট সোভিয়েত নেতা আন্দ্রেই শাখারোভ মার্কিন বিশ্লেষক মারগোলিসের সঙ্গে একমত হন। তার মতে, ‘আফগান প্রেসিডেন্ট হাফিজুল্লাহ আমিনের স্বাধীনচেতা এবং ধ্বংসাত্মক নীতিসমূহ তাকে মস্কোর নিকট অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। তাই, আফগানিস্তানে আগ্রাসনের পরপরই কেজিবি তাকে হত্যা করেছিল।’[৪]

অন্যদিকে ভবিষ্যৎকে ধর্তব্যের বাইরে রেখে কার্টার ও রিগ্যান প্রশাসন সৌদি এবং পাকিস্তানি মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বা মুজাহিদিনদের ব্যাপক অর্থনৈতিক এবং সামরিক সহায়তা প্রদান করে। সেসব প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে যেমন আফগানরা ছিল, তেমনি হাজার হাজার আরব ও আরব-আফগানদের[৫] বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামি গোষ্ঠীসমূহও ছিল। প্রায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে থেকেই এই গোষ্ঠীগুলো আফগানিস্তানে এসেছিল। উল্লেখ্য, মুসলিম ভূখণ্ডে কমিউনিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পবিত্র জিহাদ করতে তারা নিজ নিজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে হাজির হয়েছিল। মার্কিনিরা এমনকি আধুনিক প্রযুক্তির, স্বয়ংক্রিয়, কাঁধে বহনযোগ্য, মাটি থেকে নিক্ষেপযোগ্য মিসাইলও সরবরাহ করেছিল।[৬] এর মাধ্যমে মুজাহিদিনরা সোভিয়েত বাহিনীর হেলিকপ্টারগুলোকে ভূপাতিত করার সক্ষমতা অর্জন করে। শিগগিরই সেই অসম লড়াই সমানে সমান হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট রিগ্যান হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে কতিপয় মুজাহিদিন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সঙ্গে ছবিও তুলেছিলেন।[৭]

হলিউড এই আপাত গোপনীয় কিন্তু সর্বজ্ঞাত অভিযানকে মার্কিনদের সামনে তুলে ধরতে ১৯৮৮ সালে *র‍্যাম্বো থ্রি* চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করে। চলচ্চিত্রে নায়কের পরামর্শদাতা কর্নেল ট্রুটম্যান সোভিয়েতদের হাতে আটক হয়। তিনি তখন তাকে আটককারী কেজিবি অফিসারকে বলেছিল, ‘তোমরা কখনোই জিততে পারবে না। প্রতিদিনই তোমর দুর্বল অস্ত্রসজ্জিত স্বাধীনতাকামী যোদ্ধার হাতে মার খাচ্ছ। আসলে তোমরা তোমাদের প্রতিপক্ষকে সঠিকভাবে চিনতে পারোনি। ঠিকভাবে ইতিহাস পড়লে তোমরা দেখতে পেতে, এই লোকেরা কখনোই কাউকে ছেড়ে কথা বলেনি। তারা কোনো আগ্রাসী শক্তির দাস হয়ে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে বেশি পছন্দ করে। এই ধরনের লোকদেরকে তোমরা কখনোই পরাজিত করতে পারবে না। আমরাও চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের ভিয়েতনাম অভিজ্ঞতা রয়েছে। এবার তোমাদের পালা।’ সিনেমায় সিলভেস্টার স্ট্যালোনের চলচ্চিত্র

জন র‍্যাম্বো তো বটেই, এর সঙ্গে সকল দেশপ্রেমিক আমেরিকান সিনেমার বাইরে আফগান মুজাহিদিনদের আত্মোৎসর্গ এবং বিদেশি আগ্রাসন থেকে নিজ ভূখণ্ড ও জাতিকে রক্ষায় তাদের নির্ভীক লড়াইকে সাধুবাদ জানায়।[৮]

সোভিয়েত পতনে মুজাহিদিনদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সে সময় একদিকে অর্থনীতির সাধারণ সূত্রানুসারে সমাজতন্ত্র ধীরে ধীরে পতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল,[৯] অন্যদিকে সিআইএ, সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং মাঠপর্যায়ে আফগান ও অন্যান্য আরব বিদেশি মুজাহিদিনরা একে আরও অস্থিতিশীল করে তুলেছিল। নড়বড়ে সোভিয়েত সাম্রাজ্যকে এই সম্মিলিত শক্তি দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দেয়।[১০] সর্বশেষ আশির দশকের শেষ দিকে তেলের বাজারে ধস নামিয়ে সোভিয়েত কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেওয়া হয়।[১১] মাঠপর্যায়ে থেকে আল্লাহর ওপর ইমান এবং বিশ্বস্ত একে-ফোরটি সেভেনের সাহায্যে আফগান মুজাহিদরা ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী সাম্রাজ্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধসিয়ে দিয়েছিল।

আফগান জিহাদের অন্যতম আদর্শিক এবং প্রশাসনিক নেতা ছিলেন শাইখ আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযাম। তিনিই 'আফগানিস্তান সার্ভিস ব্যুরো'র প্রধান ছিলেন। এই সংস্থা থেকেই পরবর্তী সময়ে ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মারগোলিস ১৯৮৬ সালে পাকিস্তানে আযযামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আব্দুল্লাহ আযযাম তখন মারগোলিসকে বলেছিলেন, 'আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়িত করার পর আমরা মুজাহিদিনরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আরব ভূখণ্ড থেকে তাড়ানোর জন্য যাত্রা শুরু করব। আমরা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করবই।'[১২] তার এই মন্তব্যে মারগোলিস প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে কেবল সোভিয়েতপন্থি কমিউনিস্টদেরই আমেরিকাকে সাম্রাজ্যবাদী বলতে শুনেছেন। যেখানে আমেরিকা আব্দুল্লাহ আযযাম ও তার লোকজনের সহায়তা করার জন্য সৌদি আরব এবং পাকিস্তানকে সহায়তা দিয়েছিল, সেখানে তিনি কীভাবে এই মন্তব্য করতে পারলেন?

পরবর্তীতে মারগোলিসের কাছে এই মন্তব্যের যথার্থ স্পষ্ট হয়েছিল। কার্টার ডকট্রিনের আলোকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকা সামরিক ও বেসামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি করছিল। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের জবাবে এই ডকট্রিন ঘোষিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী বলতে আব্দুল্লাহ আযযাম এই দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা ১৯৪৪ সাল থেকেই বাহরাইনের মানামায় একটি ঘাঁটি পরিচালনা করছিল।[১২] ১৯৪৮ থেকে ১৯৬২

সাল পর্যন্ত সৌদি আরবের দাহরানে একটি মার্কিন ঘাঁটি ছিল।[১৩] কার্টার ডকট্রিনের অংশ হিসেবে রিগ্যান প্রশাসন ১৯৮০-র দশকের শুরু থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতিকে আরও সম্প্রসারিত করা শুরু করে। ১৯৮১ সালে ওমানের থুমরেইতে একটি বিমানঘাঁটি নির্মাণের মাধ্যমে এই সম্প্রসারণ শুরু হয়েছিল। এই ঘাঁটি নির্মাণ সৌদি আরবেও চলমান ছিল। আমেরিকা ওভারবিল্ডিং অ্যান্ড ওভারস্টকিং নীতির আলোকে ধীরে ধীরে সৌদি আরবের সামরিক ঘাঁটিগুলোর সম্প্রসারণ করতে থাকে। এটি নীতিটি ছিল আসন্ন মার্কিন উপস্থিতির একটি চাল। তবে তখনো সেখানকার উপকরণ এবং ঠিকাদাররা সৌদি নাগরিকই ছিল।[১৪] পরবর্তী সময়ে সৌদি এবং বাহরাইনের ঘাঁটিগুলোর পাশাপাশি কুয়েত, কাতার, ওমান, আরব আমিরাত ইত্যাদি দেশগুলোতে আরও ৭০টি স্থায়ী ঘাঁটি নির্মাণ করা হয়। এগুলোর অধিকাংশ ১৯৯০-৯১ সালের প্রথম ইরাক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে নির্মাণ করা হয়েছিল। একই সঙ্গে আগমন ঘটে নতুন নতুন মার্কিন অস্ত্র, ঠিকাদার এবং সামরিক উপদেষ্টাদেরও।

আরব উপদ্বীপে আমেরিকার ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি তখনই তীব্র অসন্তোষের জন্ম দেয়। প্রফেসর পেপ জোর দিয়ে বলেন, 'আরব জনগণের কাছে— বিশেষ করে যারা বিন লাদেনপন্থি— এসব রাষ্ট্রীয় সীমানা অর্থহীন। তারা আরব উপদ্বীপকে একটি পবিত্র ভূখণ্ড মনে করে, ঠিক যেমনটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যকে মার্কিনরা একটি দেশ হিসেবেই দেখে।'[১৫]

আর ১৯৮৬ সালে আব্দুল্লাহ আযযামও মুখ দিয়ে কেবল ফেনা তোলেননি। সর্বোচ্চ গতিবেগে মধ্যপ্রাচ্যের প্রজেক্টসমূহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তার অনুসারীদের নতুন শত্রুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া শুরু করেছিলেন।

তথ্যসূত্র

১. "The Brzezinski Interview with Le Nouvel Observateur," trans. William Blum and David N. Gibbs., interview conducted January 15-21, 1998, posted by David N. Gibbs to the University of Arizona website.

২. Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001 (London: Penguin, 2004), 46; Robert Gates, From the Shadows: The Ultimate Insider's Story of Five Presidents and How They Won the Cold War (New York: Simon & Schuster, 1996), 146.

৩. Eric S. Margolis, War at the Top of the World: The Struggle for Afghanistan, Kashmir and Tibet (Oxford: Routledge), 17.

৪. Andrei Sakharov, "Afghanistan, Gorky, and an Open Letter to Leonid Brezhnev, 1980," in The Case for Withdrawal from Afghanistan, ed. Nick Turse, (New York: Verso, 2010), 17.

৫. Steve Galster, "Afghanistan: The Making of US Policy, 1973-1990," National Security Archive, October 9, 2001; Steve Coll, Ghost Wars; George Crile, Charlie Wilson's War: The Extraordinary Story of the Largest Covert Operation in History (New York: Atlantic Monthly, 2003).

৬. Michael M. Phillips, "Launching the Missile That Made History," Wall Street Journal, October 1, 2011; Ernest May and Philip Zelikow, "Politics of a Covert Action: The US, the Mujahideen, and the Stinger Missile," Harvard Kennedy School of Government, November 9, 1999.

৭. "Reagan Meets Afghan Rebels," New York Times, June 17, 1986.

৮. Sylvester Stallone, David Morrell and Sheldon Lettich, Rambo III, directed by Peter MacDonald (1988; Vancouver: Lions Gate, 2004), DVD.

৯. Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis, 2nd ed. (Indianapolis: Liberty Fund, 2010).

১০. John Mueller, Overblown: How Politicians and the Terrorism Industry Inflate National Security Threats, and Why We Believe Them (New York: Free, 2009), 83-85.

১১. Rafael Reuveny and Aseem Prakash, "The Afghanistan War and the Breakdown of the Soviet Union," Review of International Studies 25 (1999): 693-708.

১২. Eric Margolis, "Bin Laden and Me: Freedom Fighters, Terrorists, and History," Toronto Sun, September 28, 2008.

১৩. John K. Cooley, "US Presence in Persian Gulf: A History," ABC News, March 13, 2002.

১৪. "King Abdulaziz Air Base," GobalSecurity.org.

১৫. Steve Coll, The Bin Ladens: An Arabian Family in the American Century (London: Penguin, 2008), 246.

নয়া বিশ্বব্যবস্থা

সর্বস্বান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহার করে।[১] এর মাত্র দুই বছর পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে যায়।[২] কিন্তু ওয়াশিংটনের যুদ্ধবাজেরা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া তো দূরের কথা, বরং এটিকে শক্তি ও প্রভাব বিস্তৃত করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। ব্যঙ্গাত্মক কৌতুক অভিনেতা ও সমাজ সমালোচক জর্জ কারলিন ১৯৯২ সালে এইচবিও স্পেশাল অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'আমরা পুরোপুরিভাবে স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার অপেক্ষাটুকু করতে পারিনি। স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সমুদ্রসৈকতে বিনোদনের সুযোগটুকুও পাইনি আমরা।'[৩]

কারণ, আমাদের যুদ্ধপ্রিয় প্রশাসন যুদ্ধের জন্য শিগগিরই একটি অজুহাত খুঁজে বের করে। ১৯৯০ সালের গ্রীষ্মে ইরাক ক্ষুদ্র প্রতিবেশী কুয়েত দখল করে নেয়। পরের বছরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের মিত্র কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনীকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম' নামক একটি সংক্ষিপ্ত ও আপাত সহজ যুদ্ধ[৪] পরিচালনা করে। কুয়েতের বাদশাহ জাবের আল-আহমাদ আল-সাবাহকে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে দিয়ে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়র দম্ভভরে ঘোষণা করেন, 'আমেরিকার জন্য এটি একটি গর্বের দিন। ঈশ্বরের কসম! আমরা ভিয়েতনামের ক্ষতকে নিরাময় করেছি।'[৫] প্রথম ইরাক যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়রের প্রতিরক্ষাসচিব ডিক চেনি ২০১৪ সালে উইকলি স্ট্যান্ডার্ড-এর সম্পাদক উইলিয়াম ক্রিস্টল-এর কাছে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। তিনি জানান, 'সৌদি আরবে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি নির্মাণ চুক্তিতে বাদশাহ ফাহাদ বিশেষ শর্ত দিয়েছিলেন। সেখানে বলা হয়, কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনীকে হটিয়ে দেওয়ার পর এবং সৌদি আরবের জন্য ইরাকি আগ্রাসনের 'তথাকথিত' হুমকি দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সৌদি আরব থেকে মার্কিন সৈন্য এবং বিমানবাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।'[৬]

কিন্তু ইরাকের পরাজয়ের পরও আমেরিকা তার সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নেয়নি। প্রথম ইরাক যুদ্ধ সমাপ্ত হতে না-হতেই স্থায়ী দখলদারির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন অজুহাত বানিয়ে নেয়। কুয়েতে মার্কিন অভিযানের সময় প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়র ভয়েস অব আমেরিকার[৭] মাধ্যমে একটি রেডিও বার্তা প্রচার করেছিলেন। মার্কিন বিমানবাহিনীও ইরাকি সামরিক ইউনিটগুলোতে এবং বেসামরিকদের ওপর বিমান থেকে একই বার্তা প্রচার করে লিফলেট বিতরণ করে। সেই বার্তায় সাদ্দাম হুসাইনের সুন্নি সমর্থিত স্বৈরতন্ত্রকে উপড়ে ফেলার জন্য আরব শিয়া ও কুর্দিদের উৎসাহিত করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই শিয়া ও কুর্দিদের মনে হয়েছিল যে আমেরিকা নিশ্চয়ই তাদেরকে সাদ্দাম হুসাইনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সহায়তা করবে।[৮] কিন্তু পরবর্তী সময়ে সিনিয়র বুশ কেবল এই সহযোগিতা করতেই অস্বীকৃতি জানায়নি, উল্টো আত্মসমর্পণের শর্ত হিসেবে সাদ্দাম হুসাইনের অ্যাটাক হেলিকপ্টারগুলোর বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আর এটা সবাই জানত যে এগুলো দিয়ে সাদ্দাম তার বিরোধীদের নির্বিচারে হত্যা করতে যাচ্ছে।[৯] সাংবাদিক ব্যারি ল্যান্ডো জানান, 'আমেরিকা এ সময় মূলত সাদ্দাম হুসাইনের পক্ষেই কাজ করেছিল। কাছাকাছি সময়ে একটি ইরাকি আর্মি ডিভিশন সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে রাজধানীর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু মার্কিন হেলিকপ্টারগুলোকে বাগদাদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেছিল!'[১০]

১৯৯১ সালের মরুভূমিতে লজ্জাজনকভাবে এই গাদ্দারি করা হয়েছিল। ইরাক বিশ্লেষক জোয়েল উইং লিখেন, 'সিনিয়র বুশ প্রশাসন একময় সত্যিকার অর্থেই কোনো সামরিক অভ্যুত্থান বা গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শিয়া ও কুর্দিদের মাধ্যমে সাদ্দামকে উৎখাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার যুদ্ধ পরিষদ শিগগিরই তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। কারণ তারা বুঝতে পারে যে এ রকম একটি অভ্যুত্থানে ইরানপন্থি সশস্ত্র যোদ্ধাদের উপস্থিতি সকল হিসাব-নিকাশ বদলে দিতে পারে। তাই বুশ সিনিয়র আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ইরাকি বিদ্রোহীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তার এই গাদ্দারির বলি হয়ে হাজার হাজার আরব শিয়া ও কুর্দি হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়।'[১১]

অতঃপর যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ব্রিটেন ইরাকের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে ইরাকি বিমানবাহিনীকে উড্ডয়ন থেকে বিরত রাখার জন্য স্থায়ী নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করে। অথচ কিছুক্ষণ আগেই সেখানকার বাসিন্দারা মার্কিন নীতির বলি হয়েছিল।[১২] সবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে, 'আমেরিকার অস্ত্রবিরতি

চুক্তির শর্তাবলি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত ইরাকের ওপর যুদ্ধ-পূর্ববর্তী আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাগুলো বলবৎ থাকবে।' এই ঘোষণার মাধ্যমেই সৌদি আরবে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো স্থায়ী হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র

১. "Soviet Withdrawal from Afghanistan," Tass, February 15, 2016.

২. Francis X. Clines, "Gorbachev, Last Soviet Leader, Resigns; US Recognizes Republics' Independence," New York Times, December 25, 1991.

৩. George Carlin, Jammin' in New York, directed by Rocco Urbisci, filmed at Paramount Theater, Madison Square Garden, New York, aired on HBO, 1992.

৪. George H. W. Bush, "Transcript of President Bush's Address on End of the Gulf War," delivered to a joint session of Congress, New York Times, March 7, 1991.

৫. George H. W. Bush, "Transcript of President Bush's Address on End of the Gulf War," delivered to a joint session of Congress, New York Times, March 7, 1991.

৬. "Vice President Dick Cheney: Personal Reflections on his Public Life," interviewed by Bill Kristol, Conversations with Kristol, October 12, 2014.

৭. "Bush Statement at Raytheon; Excerpts from 2 Statements by Bush on Iraq's Proposal for Ending Conflict," New York Times, February 16, 1991.

৮. Micah Zenko, "Who Is to Blame for the Doomed Iraqi Uprisings of 1991?," National Interest, March 7, 2016.

৯. Patrick E. Tyler, "After the War: Bush Aims Rebuke at Schwarzkopf for Truce Remark," New York Times, March 28, 1991.

১০. Barry M. Lando, Web of Deceit: The History of Western Complicity in Iraq, from Churchill to Kennedy to George W. Bush (New York: Other, 2007), 173-174; Barry Lando,

interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, January 15, 2015.

১১. Joel Wing, “When the US Helped Start a Rebellion in Iraq That It Didn’t Want,” Musings on Iraq, March 21, 2016.

১২. Michael R. Gordon, “British, French and US Agree to Hit Iraqi Aircraft in the South,” New York Times, August 19, 1992.

বিন লাদেন বনাম আমেরিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ জোটের যুদ্ধ এবং একই সঙ্গে আমেরিকার সৌদি আরবে অবস্থান করা ও ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বজায় রাখার সিদ্ধান্ত শুরু থেকেই ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। ধনকুবের সৌদি নির্মাণ ব্যবসায়ীর পুত্র ওসামা বিন লাদেন ১৯৮০-র দশকের আফগান যুদ্ধে অর্থ এবং সামরিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আহতও হয়েছিলেন। কুয়েত থেকে সাদ্দামকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য সৌদি বাদশাহ আমেরিকার সহায়তা প্রার্থনা করায় বিন লাদেন যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও নাখোশ হয়েছিলেন। এ সময় তিনি সৌদি সরকারকে তার মুজাহিদিন বাহিনীকে ভলান্টিয়ার হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। তার সেই প্রস্তাবে আহলে সাউদরা কর্ণপাত করেনি। তারপর পবিত্র আরব উপদ্বীপে ইরাক যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরও ক্রুসেডার মার্কিন সেনাবাহিনীর বিস্তৃত এবং অনির্দিষ্ট উপস্থিতি দেখে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। মার্কিন সরকারবান্ধব এবং স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা হিসেবে মার্কিনিদের প্রশংসা কুড়ানো আরব-আফগান মুজাহিদিনদের নিকট আমেরিকাই হয়ে প্রধান শত্রু। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত আগ্রাসীদের হটানোর পর এবার তারা আরব উপদ্বীপ থেকে যেকোনো উপায়ে মার্কিন বাহিনীকে বিতাড়িত করার শপথ নেয়।[১]

আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধে যোগদানের জন্য আরব দেশগুলো থেকে হাজার হাজার যুবক পাঠানোর ভয়ংকর ফলাফল তখনই অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়। সাংবাদিক এন্ড্রু ককবার্নের কাছে মিসরীয় আলেম আবু হামজা বলেছিলেন, 'নিজেদের ঘরের সমস্যাসমূহ থেকে তরুণদের বিমুখ রাখার জন্যই এই কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। বিষয়টা অনেকটা প্রেশারকুকারের মতোই। আপনি যদি প্রেশারকুকার পুরোপুরি বন্ধ করে রাখেন, তবে এটি বিস্ফোরিত হবে। তাই আপনাকে একটি নির্গমন পথের (প্রেশারকুকার ভেন্ট)

ব্যবস্থা করতে হবে। আফগান যুদ্ধই ছিল সেই নির্গমন পথ।' এন্ড্রু কর্কবান বলেন, 'শিগগরিই আরব দেশগুলো এই নকশার খুঁত বুঝতে পারে। মূলত সেই নির্গমন পথটি ছিল দ্বিমুখী। ১৯৯৪ সালে নীল নদের বুকে অনুষ্ঠিত একটি ডিনার পার্টিতে এই বিষয়টি আমি আরও স্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছিলাম। সেই ধনকুবের মিসরীয় জিহাদি গোষ্ঠীর জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় বাড়তি নিরাপত্তার স্বার্থে অনুষ্ঠানটি পানিতেই আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানটিতে ওসামা এ আই বায নামক হোসনি মোবারকের একজন জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা উপদেষ্টা আমার কাছে মন্তব্য করেছিলেন— 'এই সবকিছুর জন্য দায়ী সিআইএ'র নির্বোধ জারজগুলো। তারাই এদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং সোভিয়েতরা সরে যাওয়ার পরও তাদের আপন স্থানে বহাল রেখেছে। এখন আমাদেরকেই তাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।'[২]

জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশের উত্তরসূরিদের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলাফল বাস্তবে এরকমই ছিল।

তথ্যসূত্র

১. Steve Coll, Ghost Wars, 222-223; Abdel Bari Atwan, "Why bin Laden Was Radicalized," CNN, May 17, 2011; Clarke, Against All Enemies, 59; Lisa Beyer, "The Most Wanted Man in the World," Time, September 24, 2001; Atwan, *The Secret History of Al Qaeda*, 45-46.

২. Andrew Cockburn, "A Special Relationship," Harper's Magazine, January 2016.

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং বিল ক্লিনটন প্রশাসন

ক্ষমতায় আরোহণের পরপরই বিল ক্লিনটন প্রশাসন ইরাক ও ইরান উভয়ের ক্ষেত্রেই একটি দ্বৈত দমন নীতি গ্রহণ করে।[১] ইতিপূর্বে ১৯৮০-র দশকে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই উভয় রাষ্ট্রকে অস্ত্র সরবরাহ করার মাধ্যমে এক রাষ্ট্রকে অপরটির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল। ইরাকের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণমাত্রার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে এই দমন নীতির বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সমগ্র ইরাক-ইরান যুদ্ধে নিহতদের প্রায় সমান সংখ্যক মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। দ্বৈত দমন নীতির সারকথা ছিল— 'কখনোই কোনো স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছানো যাবে না এবং বিংশ শতাব্দীর অবশিষ্ট সময়কালটিতে এমনকি তারপরও ইরানের বিরুদ্ধে শীতল যুদ্ধ বা ইরাকের বিরুদ্ধে উষ্ণ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে না।' আর তাই, সৌদি আরবের আমেরিকান ঘাঁটিগুলোকেও বহাল রাখতে হবে। যে যুদ্ধটি আরেকটি ভিয়েতনাম হবে না মর্মে জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ শপথ করেছিলেন, সেই যুদ্ধটি চালু রাখার সব ধরনের বন্দোবস্ত করা হয়।[২] ইরাকের আকাশের ৩ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে ওয়াশিংটনের কোষাগার বোমা আকারে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে।

বিল ক্লিনটনের সময়কালকে মার্কিনরা শান্তির সময় মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তার সময়ে যুদ্ধ এবং এর খবরাখবর বহুলাংশে জনগণ থেকে আড়ালে রাখা হতো। সাংবাদিক জেরেমি স্কাইলের প্রতিবেদন অনুসারে, 'বিল ক্লিনটনের সময় মার্কিন বিমানবাহিনী ইরাকে প্রতি সপ্তাহে গড়ে তিন থেকে চার দফা বোমাবর্ষণ করেছে। এ সময় মার্কিন জনগণকে বলা হতো, মার্কিন বিমানবাহিনীর জন্য ইরাকি গ্রাউন্ড স্টেশনের রাডারগুলো হুমকি মনে হওয়ায় বোমাবর্ষণ করা হয়েছে!' নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, 'কোনো ধরনের

হুমকি না থাকা সত্ত্বেও ১৯৯৮ সালের পর মার্কিন বিমানবাহিনী আত্মরক্ষার নামে রাডার এবং অন্যান্য সামরিক স্থাপনাতে হামলার নীতি গ্রহণ করে।'[৩] প্রথম ইরাক যুদ্ধের পর পুরো দশক ইরাকি বাহিনী কোনো বিমান ভূপাতিত করা তো দূরের কথা, তাদের পক্ষ থেকে কোনো গুলিও চালানো হয়নি। অথচ প্রতিরক্ষার নামে 'বোমাবর্ষণ করে' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শত শত নিরীহ বেসামরিক লোকজন হত্যা করে।[৪]

নব্বইয়ের দশকে জাতিসংঘের অবরোধ ছিল আরও মর্মান্তিক ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের ওপর একটি বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই নিষেধাজ্ঞা প্রথম ইরাক যুদ্ধের পর ইরাকি অর্থনীতির অবশিষ্টাংশকেও ধ্বংস করে দেয়। কয়েক বছর পূর্বে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের লক্ষ্যে রাসায়নিক এবং জৈবিক অস্ত্র তৈরির জন্য সাদ্দাম হুসাইনের ডুয়েল ইউজ আইটেম আমদানি করার বিষয়ে আমেরিকা খুশি প্রকাশ করেছিল।[৫] কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় ইরাকি তেল ক্রয় নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি দেশটির বৈদ্যুতিক এবং সরবরাহ ট্রাক মেরামতের যন্ত্রাংশ আমদানিতেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। অভিযোগ করা হয়, এগুলো ডুয়েল ইউজ আইটেম হিসেবে ব্যবহৃত হবে! এমনকি পানি জীবাণুমুক্ত করার ক্লোরিনকেও নিষিদ্ধ করা হয়। বলা হয়, ইরাকিরা নিষিদ্ধ রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির জন্যই ক্লোরিন আমদানি করতে চায়।[৬] বিশ্বের অন্যত্র সস্তা ও সুলভ ওষুধগুলোও ইরাকে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। অপুষ্টি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। কলেরা ও টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাব মহামারির আকার ধারণ করে। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি ছিল সমস্ত ইরাকি পুরুষ, মহিলা ও শিশুর বিরুদ্ধে একটি নির্মম অর্থনৈতিক যুদ্ধ।[৭]

অন্যদিকে নানাবিধ শব্দের মারপ্যাঁচে মার্কিন জনগণকে এসব বিষয়ে উদাসীন করে রাখা হয়। যেমন, 'অর্থনৈতিক অবরোধ', 'নিষেধাজ্ঞা' প্রমুখ শব্দের আড়ালে সেই পূর্ণমাত্রার আকাশ ও ট্যাংক যুদ্ধ সম্পর্কে তাদেরকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। তারা উপলব্ধি করতে পারছিল না যে এই নতুন ব্যবস্থা তথা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা দেশটির বেসামরিক জনগণকে অনাহারে থাকতে বাধ্য করছে এবং তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে।[৮] পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ উদ্রেককারী বিষয়গুলোকেও 'রাজনৈতিক পক্ষপাত', 'বর্ণবাদ', এবং 'জাতীয়তাবাদের মুখোশে' মাটিচাপা দেওয়া হচ্ছিল।

নব্বইয়ের দশকজুড়ে একের পর এক অনুসন্ধান পরিচালনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে যেমন মার্কিন বিমানবাহিনী[৯], হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, জাতিসংঘ[১০] ইত্যাদি

অন্তর্ভুক্ত ছিল, তেমনি নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন[১১] থেকে শুরু করে যুক্তরাজ্যের ল্যানসেট[১২] প্রমুখও ছিল। তাদের রিপোর্টে কেবল ইরাকি জনগণের অসহনীয় দুর্দশা উঠে আসতে থাকে। কিন্তু এ সবকিছুকে দেখা হচ্ছিল নিষেধাজ্ঞার সাফল্য হিসেবে! বেসামরিক মৃত্যু ছিল এই নিষেধাজ্ঞা নীতিমালার প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য! যেমন: পেন্টাগনের কর্মকর্তারা ওয়াশিংটন পোস্টকে বলে, 'লোকজন বলে, 'আপনারা কি দেখছেন না, বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর বোমাবর্ষণের ফলে তাদের পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশনের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়ছে?' বেশ, আমরা কি তাহলে এই হামলা ও নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ইরাকি জনগণকে সাহায্য করতে চাচ্ছি? জবাব হচ্ছে না। বরং, আমরা এসব অবকাঠামোর ওপর বোমা হামলার মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার প্রভাবকে আরও ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছি। আমরা তাদেরকে জানাতে চাচ্ছি, এই লোকটির হাত থেকে মুক্ত হও। আমরাই এরপর তোমাদের পুনর্নির্মাণে খুশি মনে সহায়তা করব। আমরা সাদ্দাম হুসাইন বা তার শাসনব্যবস্থাকে কোনোভাবেই মেনে নিচ্ছি না। প্রথমে এই সমস্যাটির সমাধান করো। তাহলে আমরাও তোমাদের বিদ্যুৎ লাইন মেরামত করা মঞ্জুর করব।'[১৩]

তবে শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের অধীনে তেলের বদলে খাদ্য কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। জাতিসংঘের মতে, এই বঞ্চনার ফলে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, আদের অর্ধেকেরও বেশি ছিল শিশু। অথচ এই সময়কেই কিনা মার্কিনরা শান্তির সময় বলে অভিহিত করে![১৪]

ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনায় সহায়তা করার অনুশোচনায় এই নিষেধাজ্ঞার তদারককারী জাতিসংঘের দুজন কর্মকর্তা ডেনিস হ্যালিডে[১৫] ও হ্যান্স ভন স্পোনেক[১৬] পদত্যাগ করেন। এই সময়ে বৈদেশিক নীতিনির্ধারক গোষ্ঠীগুলোতে একটি জনশ্রুতি ছিল— তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির কঠোর নিয়মকানুন সত্ত্বেও তেল বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত লাভসমূহ সাদ্দাম নিজের প্রয়োজনেই ব্যয় করছেন। এই কর্মসূচিতে ইরাকি জনগণের ভোগান্তির কোনোই অবসান হচ্ছে না। বলা হচ্ছিল, সাদ্দাম তেল বিক্রির সম্পূর্ণ লভ্যাংশ তার প্রাসাদে ব্যয় করছেন। তারপরও ব্যাপারটিকে স্বৈরশাসককে চাপের মধ্যে ফেলার একটি হাতিয়ার হিসেবেই দেখা হচ্ছিল।

ইরাকি জনগণের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করার ধারণাটি কখনোই গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়নি। ২০০০

সালে জার্নালিস্ট রড নরল্যান্ড যথাযথভাবে ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপের আসল রূপকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেছিলেন—

> ওয়াশিংটনের একজন ব্যক্তিও বিশ্বাস করে না যে, এত কিছুর পরও সাদ্দাম হুসাইন তার গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করেছেন। জাতিসংঘের সাবেক অস্ত্রপরিদর্শক দলের প্রধান রিচার্ড বাটলার গত সপ্তাহেই ইসরায়েলের নেসেটকে জানান, কাঁচামাল পেলে ইরাক এক বছরের মধ্যেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা রাখে। নিষেধাজ্ঞার অবসান সাদ্দাম হুসাইনের রাজস্ব আয় ব্যাপক বৃদ্ধি করবে এবং আমদানির ওপর তাকে অবাধ স্বাধীনতা দেবে। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পারমাণবিক রসদ ক্রয় আরও সহজ হয়ে যাবে। অতএব, এই বিপর্যয়কর অচলাবস্থা, অর্ধেক যুদ্ধ-অর্ধেক শান্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য বজায় রাখতে হবে।[১৭]

লেখক জয় গর্ডন বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরাকের এই পরোক্ষ লড়াইয়ের মূল হাতিয়ার এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ব্যাপারে কারোরই কোনো কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রদানের কারণে একটি নতুন প্রস্তাবনা উত্থাপন করতে না পারায় অবরোধটি অনির্দিষ্ট সময় ধরে চলতে থাকে।'[১৮]

১৯৯০-এর দশকটিকে যুদ্ধ-পরবর্তী অস্ত্র বিরতি চুক্তির শর্তানুসারে জাতিসংঘের বিরামহীন অস্ত্র পরিদর্শনের একটি যুগও বলা চলে। সাদ্দাম হুসাইনের ইরাককে রাসায়নিক অস্ত্রমুক্ত করার অজুহাতে এই পরিদর্শন চলতে থাকে। অথচ এই অস্ত্রগুলো ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররাই সাদ্দামকে দিয়েছিল। সাদ্দাম হুসাইন আমেরিকার সহায়তায় ইরানি জনগণ এবং ইরাকি কুর্দিদের ওপর মাত্র এক দশক আগেই এই অস্ত্র ব্যবহার করেছিল।[১৯] কিন্তু বাস্তবে ১৯৯১ সালের শেষ দিকেই এই অস্ত্রসমূহ পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছিল।[২০] ১৯৯৫ সালের শেষ দিকে এসে জাতিসংঘ কর্মকর্তারা এই বিষয়টি নিশ্চিত করেন।[২১] কিন্তু আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা ব্যবস্থায় এই সার্টিফিকেট কোনো ভূমিকাই রাখেনি। উল্টো আমেরিকার উদ্দেশ্য পরিবর্তন হয়ে কথিত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ থেকে ইরাকের সরকার উৎখাতে মোড় নেয়। ১৯৯৭ সালে ইরাক সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিশেষ কমিশন ইরাককে গণবিধ্বংসী অস্ত্রমুক্ত ঘোষণা করতে প্রস্তুতি নিলেও ক্লিনটনের প্রতিরক্ষাসচিব ম্যাডেলিন অলব্রাইট এই পদক্ষেপকে নস্যাৎ করে দেন। তিনি ঘোষণা করেন, যা-ই হোক না কেন এই অবরোধ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ না ইরাকের জনগণ সাদ্দাম

হুসাইনকে উৎখাত করছে।[২২] অথচ ইরাকের জনগণ অনাহারে মারা যাচ্ছিল একসময়কার মার্কিন সমর্থিত সরকারের কারণেই। ১৯৯১ সালে ইরাকি জনগণ সাদ্দাম হুসাইনকে উৎখাতের চেষ্টায় অভ্যুত্থান করলেও আমেরিকা তাদের সঙ্গে বেইমানি করেছিল। ক্লিনটন প্রশাসনের কাছে ইরাকিদের জানমালের বিন্দুমাত্র মর্যাদাও ছিল না। শেষমেশ ১৯৯৬ সালে সিআইএ এবং এমআই-সিক্সের একটি যৌথ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাও বিপর্যয়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।[২৩]

তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইটকে নিষেধাজ্ঞার কারণে ৫ লাখ শিশুর জীবননাশের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি সিবিএস নিউজকে জঘন্যভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা মনে করি, বিনিময়ে আমরা যা পাচ্ছি তার তুলনায় এই মূল্য ঠিকই আছে।' অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক বলেছিলেন, 'সংখ্যাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা হামলায় নিহতদের চেয়েও অনেক বেশি।'[২৪] এই ঘটনার পর অলব্রাইট সেই অমার্জিত মন্তব্যের জন্য বারবার ক্ষমা চাইলেও এখনো অবধি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি যে এত নিরীহ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী এবং এত নতুন শত্রু সৃষ্টির জন্য দায়ী এই নীতি বাস্তবায়নের কারণে তিনি প্রকৃতপক্ষেই দুঃখিত কি না। কারণ তিনি এমনটা করতে মোটেও বাধ্য ছিলেন না।[২৫]

জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রশাসনের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাও স্বীকার করেন—

> নিষেধাজ্ঞার ফলে এই ইরাকি শিশুদের মৃত্যু এবং মার্কিন সেনাদের উপস্থিতি তার জিহাদকে বৈধতা দেওয়ার কাজে ভূমিকা রেখেছে। সত্যিকার অর্থে, ৯/১১ ছিল সাদ্দামের ইরাকে চালানো নিপীড়নের একটি জবাবও। এ ছাড়া সৌদিতে কোনো মার্কিন সেনা না থাকলে বিন লাদেন হয়তো-বা সুসজ্জিত মসজিদে বসে খাইবারপাসে লড়াইয়ের খোশগল্প করে তার বন্ধুদের বিরক্ত করে তুলতেন।[২৬]

তথ্যসূত্র

১. Barbara Conry, "America's Misguided Policy of Dual Containment in the Persian Gulf," Cato Institute, November 10, 1994.

২. George H. W. Bush, "Address to the Nation Announcing Allied Military Action in the Persian Gulf," American Presidency Project, January 16, 1991.

৩. Douglas Jehl, "Saudis Admit Restricting US Warplanes in Iraq," New York Times, March 22, 1999.

৪. Scahill, "No Fly Zones over Iraq."

৫. Christopher Dickey, "How Saddam Happened," Newsweek, September 22, 2002; Margolis, War at the Top of the World, 85;

৬. Joy Gordon, "Sanctions as Siege Warfare," Nation, March 4, 1999.

৭. "Iraq Sanctions: Humanitarian Implications and Options for the Future," Global Policy Forum, August 6, 2002.

৮. Les Roberts, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, March 8, 2011.

৯. Randy T. Odle, "UN Sanctions Against Iraq, Their Effects and Their Future," Air War College, April 1997.

১০. Barbara Crossette, "Iraq Sanctions Kill Children, U.N. Reports," New York Times, December 1, 1995.

১১. Harvard Study Team, "The Effect of the Gulf Crisis on the Children of Iraq," New England Journal of Medicine 325 (1991): 977-980.

১২. Mohamed M. Ali and Iqbal H. Shah, "Sanctions and Childhood Mortality in Iraq," Lancet 335, no. 9218 (2000): 1851-1857.

১৩. Barton Gellman, "Allied Air War Struck Broadly in Iraq," Washington Post, June 23, 1991.

১৪. Barbara Crossette, "Iraq Sanctions Kill Children, UN Reports," New York Times, December 1, 1995; "Special Report: United Nations' Food & Agriculture Organization and World Food Program Food Supply and Nutrition Assessment Mission to Iraq," Food and Agriculture Organization of the United Nations, October 3, 1997.

১৫. Mark Siegal, "Former UN Official Says Sanctions Against Iraq Amount to 'Genocide,'" Cornell Chronicle, September 30, 1999.

১৬. "UN Sanctions Rebel Resigns," BBC News, February 14, 2000.

১৭. Rod Nordland, "Saddam's Long Shadow," Newsweek, July 30, 2000.

১৮. Joy Gordon, Invisible War: The United States and the Iraq Sanctions (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010), 44.

১৯. Harris and Aid, "CIA Files Prove America Helped Saddam as He Gassed Iran."; Margolis, War at the Top of the World, 85; Dickey, "How Saddam Happened."

২০. "DCI Special Advisor Report on Iraq's WMD," CIA, September 30, 2004.

২১. Scott Ritter, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, February 5, 2005; "Transcript of Part One of Correspondent Brent Sadler's Exclusive Interview with Hussein Kamel," CNN, September 21, 1995.

২২. Andrew Cockburn, interviewed by author, Scott Horton Show, radio archive, April 18, 2007; Madeline K. Albright, "Policy Speech on Iraq," March 26, 1997.

২৩. Patrick Cockburn, "Iraqi Officers Pay Dear for West's Coup Fiasco," Independent, February 17, 1998; Jenifer Mattos, "Coup Attempt Against Saddam Fails," Time, July 12, 1996.

২৪. "Secretary of State Madeline Albright Interview," Leslie Stahl, 60 Minutes, CBS News, originally aired May 12, 1996, YouTube video, 0:53.

২৫. "Democracy Now! Confronts Madeleine Albright on Iraq Sanctions: Was It Worth the Price?," interviewed by Amy Goodman, Democracy Now!, November 30, 2004.

২৬. Walter Russell Mead, "The Revolutionary," Esquire, October 28, 2004, cited by Jon Schwarz in "Why Do So Many Americans Fear Muslims? Decades of Denial About America's Role in the World," Intercept, February 18, 2017.

নিকটবর্তী শত্রু, দূরবর্তী শত্রু

নব্বইয়ের দশকে মিসরীয় ইসলামিক জিহাদের অন্যতম নেতা, সাবেক সার্জন, ডাক্তার আইমান আল জাওয়াহিরি তার দলকে বিন লাদেনের দলের সঙ্গে একীভূত করা শুরু করেন। তারা একমত হয়েছিলেন যে, মিসর ও সৌদি আরবের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের প্রত্যাশিত স্থানীয় বিপ্লব এবং ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না, যতক্ষণ শক্তিশালী মার্কিন সামরিক বাহিনী তাদের আশ্রিত দেশগুলোর সরকারকে সহায়তা দিতে থাকবে।[১] এ জন্য সর্বপ্রথম দূরবর্তী শত্রুকে এই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করতে হবে।[২] জাওয়াহিরি বলেছিলেন, 'যারা আমাদের দেশে আগুন প্রজ্বালন করে যাচ্ছে, তাদের হাতসমূহ পুড়িয়ে দিতে এই যুদ্ধকে তাদের ভূখণ্ডে নিয়ে যেতে হবে। পশ্চিমারা কেবল ধ্বংসযজ্ঞের ভাষাই উপলব্ধি করতে সক্ষম।'[৩]

তাদের কৌশলটি ছিল নিতান্তই সাধারণ। বিন লাদেন এবং জাওয়াহিরি বারবার এই কৌশল ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেই অঞ্চলে সরাসরি আগ্রাসনে প্ররোচিত করে ইতিপূর্বেকার সোভিয়েত সাফল্যকে পুনরাবৃত্তি করা। তারা আগ্রাসন চালালেই মার্কিন সেনাবাহিনীকে চেপে ধরে তাদের কোষাগারকে দেউলিয়া করে দেওয়া সম্ভব হবে। দিনশেষে এই শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যাবে এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাদের সৈন্য-সামন্ত প্রত্যাহারেও বাধ্য হবে।[৪]

কিছু সশস্ত্র গোষ্ঠী এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিল। ১৯৯০ সালে এই গোষ্ঠীগুলো একীভূত হওয়া শুরু করেছিল। তাদেরকেই আমরা বর্তমানে সামগ্রিকভাবে আল-কায়েদা বলে জানি। আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীই ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি দখলদারির সমর্থক নিউইয়র্কের উগ্রপন্থি রেবাই মির কাহানেকে হত্যা করে।[৫] ১৯৯২ সালে ইয়েমেনে মার্কিন নৌ-সেনাদের লক্ষ্য করে একটি হোটেলে ব্যর্থ বোমা হামলা চালানো হয়।

১৯৯৩ সালের এপ্রিলে ইয়েমেনে হামলা প্রচেষ্টায় বিন লাদেনের ভূমিকা নিয়েও সিআইএ অবগত ছিল। ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ওপর প্রথম হামলাটিও সৌভাগ্যক্রমে ব্যর্থ হয়েছিল।[৬] এই ঘটনায় ছয়জন নিহত হলেও হামলাটি সফল হলে পরিস্থিতি এর চেয়ে অনেক ভয়ানক হতো। হামলাকারীরা একটি টাওয়ারকে অপরটির ওপর ভেঙে ফেলতে ব্যর্থ হয়। তারা সফল হলে তাৎক্ষণিকভাবে কয়েক হাজার মানুষ হতাহত হতো।[৭]

টুইন টাওয়ারে এই হামলার মূল হোতা মিসরের ইসলামিক জিহাদের অন্ধ শাইখ নামে পরিচিত ওমর আবদুর রহমান সিআইএ কর্মকর্তাদের কৃপাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন। তিনি আশির দশকের আফগান জিহাদের সময় থেকে আমেরিকার মিত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[৮] যাহোক, সেই জঙ্গিদের ষড়যন্ত্রকে শুরুতেই পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ করে দেওয়া যেত। কারণ তাদের মাঝে এফবিআইয়ের একজন গোপন তথ্যদাতা ছিল। তার দায়িত্ব ছিল অকেজো বিস্ফোরক দিয়ে একটি জাল বোমা তৈরি করা। কিন্তু এফবিআই কর্মকর্তা কারসন ডানবার তার এজেন্টকে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানান। সেই এজেন্টের তথ্যদাতা আহমাদ সালিমকেও দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করা হয়। দিনশেষে রমজি ইউসুফকে সেই সালিমের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিল।

রমজি ইউসুফের বক্তব্যসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলেও বোঝা যাবে, তার উদ্দেশ্য মার্কিনদের তার ধর্মে দীক্ষিত করা বা যারা ধর্মান্তরিত হবে না, তাদের হত্যা করার মতো কিছু ছিল না। রক্ষণশীল শরিয়া আইন কায়েম করে মার্কিন সংস্কৃতিকে নির্মূল করার কোনো ষড়যন্ত্রও ছিল না। রমজি ইউসুফের সর্বশেষ সাজা শুনানিতে তিনি মার্কিন সন্ত্রাসবাদী বৈদেশিক নীতি, ইসরায়েলের পক্ষ সমর্থন এবং ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ এবং তীব্র তিরস্কারমূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ফেডারেল জজ কেভিন ডাফি তার বক্তব্যকে পুরোপুরিভাবে প্রত্যাখ্যান করে সরকারের দাবিকেই যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন— 'আপনি কোনো পরিবর্তন প্রত্যাশী নন। আপনি শুধু নিরীহ মানুষের মৃত্যুই কামনা করেন। আপনার রব আল্লাহ নন। বরং আপনি মৃত্যু ও ধ্বংসের উপাসনা করেন।'[৯]

এরপর লিংকন ও হল্যান্ড টানেলে এবং নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে বোমা হামলার ব্যর্থ পরিকল্পনাসমূহ উন্মোচিত হয়েছিল।[১০] এ ছাড়া রমজি ইউসুফ পরিকল্পিত ১৯৯৫ সালে ফিলিপাইনে অনেকগুলো সিরিজ হামলার

পরিকল্পনা ফাঁস হয়েছিল। রমজি ইউসুফ ১৯৯৩ সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পর ফিলিপাইনে পালিয়ে যান।[১১] ফিলিপাইনে তাদের অ্যাপার্টমেন্টে একটি দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ডের পর রমজি ইউসুফ এবং তার দুই সহযোগী ওয়ালি খান আমিন শাহ ও আব্দুল হাকিম মুরাদ পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমিন শাহ এবং মুরাদ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করার জন্য ফিরে আসলে ইউসুফের একটি ল্যাপটপসহ আটক হন। এই ল্যাপটপ থেকেই প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং পোপ দ্বিতীয় জন পল-এর পূর্বনির্ধারিত ফিলিপাইন ভ্রমণের সময় তাদের হত্যার ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হয়েছিল। সেই ল্যাপটপ থেকেই বোজিঙ্কা প্লটের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তারা প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে যাতায়াতকারী ১০টি বা তার চেয়েও বেশি বিমানে টাইম বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিল। বোজিঙ্কা প্লটের একটি পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাও চালানো হয়েছিল। এই ঘটনায় বিমান বিধ্বংস না হলেও একজন জাপানি ব্যবসায়ী মারা যান। বিমানে সেই ব্যবসায়ীর সিটের নিচে রমজি ইউসুফ একটি বোমা পেতে রেখেছিলেন। এ ছাড়া আবদুল হাকিম। উরাদ একাধিক বিমান অপহরণ করে সেগুলোকে মার্কিন মুলুকের একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে বিধ্বস্ত করার পরিকল্পনা করেছিল। এই পরিকল্পনা অবশেষে ১১ সেপ্টেম্বর ইউসুফের চাচা খালিদ শেখ মোহাম্মদের হাত ধরে বাস্তবায়িত হয়।[১২]

যাহোক, টুইন টাওয়ারে প্রথম হামলার পর আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট যোদ্ধারা ১৯৯৫ সালে সৌদি ন্যাশনাল গার্ড ট্রেনিং সেন্টারে সফলভাবে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এই হামলায় পাঁচজন মার্কিন নিহত হয়।[১৩] এরপর ১৯৯৬ সালে সৌদি আরবের দাহরানের খোবার টাওয়ার বোমা হামলায় সেখানকার ব্যারাকে অবস্থিত ১৯ জন মার্কিন বৈমানিক নিহত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে মার্কিন সরকার খোবার হামলার জন্য ইরান সমর্থিত সৌদি হিজবুল্লাহকে দায়ী করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলস্বরূপ প্রকৃত অভিযুক্তরা আড়ালেই থেকে যায়। এর মাধ্যমে মার্কিন জনগণকে জঘন্যভাবে একটি সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সত্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মার্কিন নাগরিকদের জানতে দেওয়া হয়নি যে আমেরিকার গোলামি করা শাসকদের দেশে এমন কিছু মারাত্মক লোক আছে, যারা তাদের সামরিক বাহিনীকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। তারপরও পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয় যে খোবার টাওয়ার হামলাটি পুরোপুরিভাবেই আল-কায়েদার ওসামা বিন লাদেন এবং খালিদ শেখ মোহাম্মদের পরিকল্পিত ছিল।[১৪] বিন লাদেন নিজেই লন্ডনের আল কুদস আল আরাবি পত্রিকার ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ সম্পাদক আবদুল বারি আতওয়ানের কাছে এই হামলার দায় স্বীকার করেন।[১৫]

১৯৯৮ সালের ৭ আগস্ট আল-কায়েদা কেনিয়ার নাইরোবি এবং তানজানিয়ার দারুসসালামে বিধ্বংসী দ্বৈত ট্রাকবোমা হামলা চালায়। আবদুল বারি আতওয়ানের বরাতে জানা যায়— 'এই শহর দুটিকে বেছে নেওয়ার কারণ হচ্ছে, ১. তারা মার্কিন সেনাবাহিনীকে নিজেদের মাটিতে জায়গা দিয়েছে, ২. উভয় দেশই ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনে সমর্থন দিয়েছিল, এবং ৩. তারা উভয়েই ইসরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখে।' বিল ক্লিনটন বিন লাদেনের প্রশিক্ষণ শিবিরে টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মাধ্যমে এই হামলার পাল্টা জবাব দিয়েছিল। কিন্তু বিন লাদেন দুই দিন আগে সেখান থেকে সরে পড়ায় বেঁচে গিয়েছিলেন।[১৬]

নব্বইয়ের দশকে আমেরিকার বিরুদ্ধে আল-কায়েদার ক্রমবর্ধমান হামলার পরও সম্ভবত বিল ক্লিনটন প্রশাসনের বিশ্বাস ছিল, মুজাহিদিনরা আমেরিকার অন্যান্য অনেক বৈদেশিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে। বিন লাদেন যখন রাশিয়া, চীন, উজবেকিস্তান, ভারত প্রভৃতি দেশে মুসলিমদের ওপর সহিংস দমন-পীড়ন চালানোর ক্ষেত্রে আমেরিকার সমর্থনকে দায়ী করেন,[১৭] তখনো আমেরিকা প্রচ্ছন্নভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে চেচনিয়ার আল-কায়েদা মিত্রদের,[১৮] চীনের বিরুদ্ধে উইঘুরদের,[১৯] নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝিতে বসনিয়ান মুজাহিদিন গোষ্ঠীগুলোকে[২০] এবং ১৯৯৯ সালে কসভো যুদ্ধে আল-কায়েদা সমর্থিত কসভো লিবারেশন আর্মির মতো দলগুলোকে সহায়তা দিয়ে গেছে[২১]। বসনিয়া ও কসভোয় রুশ সমর্থিত সার্বদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আল-কায়েদার বন্ধুদেরকে সহায়তা দিয়ে গেছে। বিল ক্লিনটন একদিকে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'সন্ত্রাসবাদ আমাদের এই প্রজন্মের শত্রু এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই বিজয়ী হতে হবে।' অন্যদিকে, তারা নিজেদের সংজ্ঞায়িত সন্ত্রাসীদের যাবতীয় সহায়তা প্রদান করছিল।

ক্লিনটনের বলকান অঞ্চলের প্রধান মধ্যস্থতাকারী রিচার্ড হলব্রুক লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস পত্রিকাকে বলেছিলেন— 'আমি মনে করি, বসনিয়ান মুসলিমরা আশির দশকের আফগান যুদ্ধের আরব-আফগান মুজাহিদিনদের সহায়তা ছাড়া টিকতেই পারত না।'[২২] ৯/১১-র পরও ক্লিনটন এবং তার কিছু কংগ্রেস মিত্র বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, বলকান যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের সহায়তা করার পরেও আল-কায়েদা আমেরিকায় আঘাত হানতে পারে![২৩]

অথচ, এই সময়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতিসমূহে কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই স্বভাবতই মার্কিনদের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার যুদ্ধও

ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছিল। ক্লিনটন প্রশাসন জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর তৈরিতে সহায়তা করেছিল ঠিকই, কিন্তু তারা তাদের কিনে নিতে ব্যর্থ হয়। ১৯৯৮ সালে এই বৈশ্বিক মুজাহিদিনদের ব্যাপারে 'লো নোইভেল অবজারভেটর' ম্যাগাজিনকে দেওয়া মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির গডফাদার স্বিগনিফ ব্রজেন্সকির সাক্ষাৎকার ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, '১৯৮০-র দশকে মুজাহিদিনদের পক্ষে আমেরিকার সহায়তার পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম নেওয়া তালেবানই ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানের বেশির ভাগ অঞ্চল দখলে নিয়েছিল। ওসামা বিন লাদেনের মতো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের এই তালেবান আশ্রয় দিয়েছে। আশ্রয়দাতা এই তালেবান শাসনের উত্থানে সহায়তা করার জন্য আপনি কি আফসোস করেন?' ব্রজেন্সকি এর জবাবে বলেন, 'বিশ্বের ইতিহাসে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? তালেবানের উত্থান নাকি সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতন? কিছু উত্তেজিত মুসলমান নাকি মধ্য-ইউরোপের স্বাধীনতা ও স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি?'[২৪]

আশির দশকের মুজাহিদিন সমর্থক উটাহের রিপাবলিকান সিনেটর অরিন হ্যাচ একই বছর এনবিসি নিউজের রবার্ট উইন্ড্রেমকে বলেন, 'আমেরিকার বিরুদ্ধে আল-কায়েদার ক্রমবর্ধমান হামলা বিবেচনায় আনলেও, বিনিময়ে আমরা যা পেয়েছি, সে তুলনায় এসব হামলা কিছুই নয়।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'সোভিয়েতের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা বিষয়গুলোই আমাদের জন্য বেশি মূল্যবান।' হ্যাচ মনে করেন, আল-কায়েদা ব্যতীত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হতো না। তার ধারণামতে, সন্ত্রাসীদের এই উদীয়মান প্রজন্মের হাতে নিহত হওয়া, তাদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত লাখ লাখ ব্যক্তি এই ইস্যুতে তার মূল্যবান অভিমতটিই মেনে নেবে![২৫]

৯/১১ হামলার আগে নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে হওয়া হামলার সময়গুলোতে ক্লিনটন প্রশাসন তাদের প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত এবং ঘরোয়া রাজনৈতিক কেলেঙ্কারিগুলো নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত ছিল যে, তারা সেসবের যথাযথ প্রতিক্রিয়া জানানোর সময় পাচ্ছিল না।[২৬] যাহোক, বিল ক্লিনটন যেমন আল-কায়েদার টোপ গিলে আফগানিস্তান আক্রমণ করেননি; তেমনি তার যেসব নীতিমালা আল-কায়েদাকে প্ররোচিত করছিল, সেগুলোকেও তিনি পুনর্বিবেচনা করেননি। তিনি তার তৈরি শত্রুদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন।[২৭] ১৯৯৮ সালে মূলত ফাঁকা কিছু আফগান প্রশিক্ষণ শিবিরে এবং সুদানের অপরিহার্য আশ-শিফা অ্যান্টিবায়োটিক ফ্যাক্টরিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করা হয়েছিল। সুদানে সেই হামলাটির ব্যাপারে মিথ্যা দাবিও করা হয়। বলা হয়,

আশ-শিফা অ্যান্টিবোয়োটিক ফ্যাক্টরিতে রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করা হতো। এই হামলাগুলো উল্টো বিন লাদেনকে একজন হিরো বানিয়ে দিয়েছিল। এসব হামলার আরেকটি অর্জন ছিল মিডিয়াকে মুখরোচক সংবাদ সরবরাহ করা। অথচ সুদানের এই ফ্যাক্টরি থেকে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ উৎপাদন হতো।[২৮] এই অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ থেকে বঞ্চিত হয়ে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর কিছুই অর্জন করতে পারেনি।

১৯৮৩ সালে মার্কিন নৌ-সেনাদের ওপর বৈরুতে ট্রাকবোমা হামলা এবং ১৯৯৩ সালে সোমালিয়ায় বিপর্যয়কর 'ব্ল্যাক হক ডাউন' ঘটনার পর মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার নিয়ে বিন লাদেন প্রায়ই উপহাস করতেন। বিন লাদেন উপহাস করে বলেন, 'আমেরিকা একটি কাগুজে বাঘ।[২৯] এ রকম কিছু হামলার ভয় দেখিয়েই তাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।' তাই তারা মার্কিনদের বড় কিছু করে দেখানোর সিদ্ধান্ত নেয়।[৩০] তবে বিন লাদেনও খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্যের সামগ্রিক নীতি থেকে সরে যেতে বাধ্য করা আর লেবানন বা সোমালিয়ার মতো জায়গায় ছোটখাটো মিশন থেকে বিতাড়িত করা— দুটিতে অনেক ভিন্নতা রয়েছে।

অতএব, দৃশ্যপটে আগমন ঘটে নাইন-ইলেভেনের।

৯/১১ হামলায় প্রায় ৩ হাজারের মতো মানুষ নিহত হয়।[৩১] এই হামলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তান এবং অন্যত্রও একটি পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধে জড়াতে মার্কিন সরকারকে উসকে দেওয়া। সুনিপুণভাবে মার্কিন সরকারকে অতি মাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখাতে প্রলুব্ধ করাই ছিল তাদের মূল নকশা। মার্কিন সরকারের মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া সত্যিকারার্থেই তাদেরকে সেই ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে ফায়দা লোটার সুযোগ করে দিয়েছিল। মার্কিন জবাবই জঙ্গিদের এই ক্ষুদ্র দলটিকে অসম্ভব লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের অপূর্ব সুযোগ করে দিয়েছিল। তারা সাম্রাজ্যবাদী নগ্ন থাবা উন্মোচন এবং এই লক্ষ্যবস্তুতে আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন আধিপত্যের ইতি ঘটিয়ে একই সঙ্গে এই অঞ্চলে মৌলবাদী শক্তির বিকাশের স্বপ্ন দেখত। এ জন্য মার্কিন সমর্থিত স্বৈরাচারী সরকারগুলোকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করার দরকার দেখা দেয়। একই সঙ্গে জঙ্গিদের নিজস্ব শক্তি এবং প্রভাবের বিস্তৃতও প্রয়োজন ছিল।

সাবেক সিএইএ অ্যানালিস্ট মাইকেল শয়্যারের মতে, '৯/১১-র মাধ্যমে আল-কায়েদা সফলভাবে আমেরিকানদের তাদের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কিন্তু সরকার এবং টিভি চ্যানেলগুলো বলতে থাকে, এই সন্ত্রাসীদের উত্থানের

সময়েও মার্কিনদের নমনীয়তা এবং উদাসীনতার কারণেই দিনশেষে তারা মার্কিন ভূখণ্ডে হামলার সাহস পেয়েছে। ঘুমন্ত দানব আমেরিকা তাদের প্রতি চোখ তুলে তাকায়নি বলেই তাদের এত দুঃসাহস। তাই, মার্কিনরাও এখন থেকে আরও সক্রিয় হবে এবং বৈশ্বিক ব্যাপারগুলোতে মাথা ঘামাবে।' অর্থাৎ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া শত্রুদের পরিকল্পনার শতভাগ বাস্তবায়ন করে।[৩২]

২০১০ সালে রোলিং স্টোন সাময়িকী বিন লাদেনপুত্র ওমর বিন ওসামা বিন লাদেনের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছিল। বিন লাদেনপুত্র বলেছিল—

> আমার বাবার স্বপ্ন ছিল মার্কিনদের আফগানিস্তানে টেনে আনা। কেননা এমনটা হলেও এর মাধ্যমে তিনি মার্কিনদেরও সোভিয়েত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করতে সক্ষম হবেন। তাই মার্কিনদের এই টোপ গিলতে দেখে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ছিলেন খুবই স্মার্ট। তার প্রেসিডেন্সির সময় যখন আমার বাবার হামলার জবাবে তিনি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিলেন, তিনি কিন্তু আমার বাবাকে ধরতে আফগানিস্তানে চলে আসেননি। কিন্তু বর্তমানে আফগানিস্তানে পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধে নামার পরও তারা আমার বাবাকে কবজা করতে পারেনি। তারা সেখানে দৈনিক শত শত বিলিয়ন ডলার খরচ করছে। এই অর্থ নিজ অর্থনীতির পেছনে ব্যয় করাই ছিল মঙ্গলজনক। ক্লিনটনের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক কৌশলী ছিল। তারা লাল কাপড় দেখামাত্রই ছুটে আসা পাগলা ষাঁড়ের মতো ছিল না। বুশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভের সময়েও আমি আফগানিস্তানে ছিলাম। আমার বাবা বুশকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। কারণ এই ধরনের প্রেসিডেন্টই তার প্রয়োজন ছিল। তার প্রয়োজন ছিল এমন একজন প্রেসিডেন্ট, যে তার টোপ গিলে আক্রমণ চালাবে, টাকা ঢালতে থাকবে এবং তার দেশকে ধ্বংস করে ফেলবে। আমি নিশ্চিত, ২০০৮ সালের নির্বাচনে আমার বাবার পছন্দসই প্রার্থী ছিলেন ম্যাককেইন। ওবামার বিপরীতে ম্যাককেইনের মানসিকতাও বুশের মতোই ছিল।[৩৩]

এটি হয়তো ওবামা এবং ক্লিনটনকে নিয়ে একটি শিশুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। তবে মূলকথাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সেটা হলো, বিশ্বের বিভিন্ন অংশে আমেরিকা তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যত স্বল্পমেয়াদি যুদ্ধে জড়াবে, ওসামা বিন লাদেনের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণে সেগুলো ততই সহায়ক হবে।

সেই সাক্ষাৎকারে ওমর বিন লাদেনকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনি কি মনে করেন, আপনার বাবা আমেরিকায় আরও আক্রমণ চালাবেন?' জবাবে বিন লাদেনপুত্র বলেন, 'আমি মনে করি না যে ভবিষ্যতে এ রকম কিছু ঘটবে।

কারণ এটা করার কোনো প্রয়োজনই নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বাবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়ে গিয়েছে। তিনি তখনই এই লড়াইয়ে জয়লাভ করেছেন।'

তথ্যসূত্র

১. Ayman al-Zawahiri, "Knights Under the Prophet's Banner," Ash-Sharq al-'Awsaṭ, December 2001; Atwan, Secret History, 82-84.

২. Fawaz A. Gerges, The Far Enemy: Why Jihad Went Global, 2nd ed., (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

৩. Andrew Higgins and Alan Cullison, "Saga of Dr. Zawahiri Sheds Light on the Roots of al Qaeda Terror," Wall Street Journal, July 2, 2002.

৪. Osama bin Laden, "Declaration of War Against the Americans Occupying the Land of the Two Holy Places," PBS, August 1996.

৫. Peter Lance, "First Blood: Was Meir Kahane's Murder al Qaeda's Earliest Attack on US Soil?," Tablet: International Terrorism and the FBI—the Untold Story (New York: William Morrow, 2004), 33- 37.

৬. Peter Bergen, Holy War Inc.: Inside the Secret World of Osama Bin Laden (New York: Free, 2001), 176.

৭. "World Trade Center Truck Bombing," GlobalSecurity.org.

৮. Douglas Jehl, "CIA Officers Played Role in Sheik Visas," New York Times, July 22, 1993.

৯. "Excerpts from Statements in Court," New York Times, January 9, 1998.

১০. John J. Goldman and Robert L. Jackson, "Eight Suspects Seized in Plot to Bomb U.N., Other N.Y. Targets," Los Angeles Times, June 25, 1993.

১১. "Terrorists Plotted to Blow Up 11 US Jumbo Jets," Los Angeles Times, reprinted in Baltimore Sun, May 28, 1995.

১২. Lance, 1,000 Years for Revenge, 216, 233-244, 254-261.

১৩. “Ambassador: Car Bomb Destroyed Military Building,” CNN, November 13, 1995.

১৪. Gareth Porter, “Who Bombed Khobar Towers? Anatomy of a Crooked Terrorism Investigation,” Truthout, September 1, 2015; “William Perry: US Eyed Iran Attack After Bombing,” UPI, June 6, 2007; Wayne Barrett, “Rudy’s Ties to a Terror Sheikh,” Village Voice, November 20, 2007.

১৫. Abdel Bari Atwan, *The Secret History of al Qaeda*, 36-37, 54, 168-169.

১৬. Atwan, Secret History, 55.

১৭. Scheuer, Imperial Hubris, 212; Osama bin Laden, Messages to the World, 140.

১৮. Coleen Rowley, “Chechen Terrorists and the Neocons,” Consortium News, April 19, 2013; Kevin Cirilli, “Chechen Rebels’ Ties to Al Qaeda, Osama bin Laden,” Politico, April 19, 2013; John Laughland, “The Chechens’ American Friends,” Guardian, September 8, 2004.

১৯. Margolis, War at the Top of the World, 69; Eric Margolis, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, June 25, 2007.

২০. John R. Schindler, Unholy Terror: Bosnia, Al-Qaeda, and the Rise of Global Jihad (Minneapolis: Zenith, 2007); Brendan O’Neill, “How We Trained al-Qaeda,” Spectator, September 13, 2003.

২১. Brendan O’Neill, “The Bosnian Connection,” New Statesman, August 2, 2004; Terry McDermott, “The Mastermind: Khalid Sheikh Mohammed and the Making of 9/11,” New Yorker, September 13, 2010.

২২. Craig Pyes et al., “Bosnia Seen as Hospitable Base and Sanctuary for Terrorists.”

২৩. “Bill Clinton Goes ‘On the Record,’” interviewed by Greta Van Susteren, Fox News, June 7, 2005; Tom Lantos, “The Outlook for the Independence of Kosova: Hearing,” House Foreign Affairs Committee, April 17, 2007, p. 16; Brad Sherman, Proceedings and Debates of the 107th Congress Congressional Record, vol. 147, September 21, 2001.

২৪. “The Brzezinski Interview,” Le Nouvel Observateur.
২৫. Michael Moran, “Bin Laden Comes Home to Roost: His CIA Ties Are Only the Beginning of a Woeful Story,” NBC News, August 24, 1998.
২৬. Peter Baker, “Senate Launches Impeachment Trial; Rules Still Debated,” Washington Post, January 7, 1999.
২৭. Duncan Gardham and Iain Hollingshead, “The Bin Laden Hunter: Ex-CIA Man Had Bin Laden In His Sights 10 Times,” Daily Telegraph, May 21, 2011.
২৮. Daniel Pearl, “In Sudan Bombing, ‘Evidence’ Depends on Who Is Viewing It,” Wall Street Journal, October 28, 1998.
২৯. Osama bin Laden, “In His Own Words,” New York Times, August 23, 1998.
৩০. Jack Kelly, “Bin Laden Finds Out US Is No Paper Tiger,” Toledo Blade, November 25, 2001.
৩১. Grenier, 88 Days to Kandahar, 4-5.
৩২. Scheuer, Imperial Hubris, p. i; Michael Scheuer, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, October 22, 2005; Michael Scheuer, Scott Horton Show, March 22, 2007; Michael Scheuer, Scott Horton Show, radio archive, May 18, 2007.
৩৩. Guy Lawson, “Osama’s Prodigal Son: The Dark, Twisted Journey of Omar bin Laden,” Rolling Stone, January 20, 2010.

দ্বিতীয় অধ্যায়

আগ্রাসনের সূচনা

আমরা যদি আল-কায়েদার পতাকা উত্তোলনের জন্য সুদূর পূর্বে দুজন মুজাহিদকে পাঠাই, তাহলেই মার্কিনদের মানবিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন করতে তাদের জেনারেলরা একটি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে। সেখান থেকে তারা ব্যক্তিগত কিছু স্বার্থসিদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই অর্জন করতে পারবে না। নিপীড়ক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ এবং স্নায়ুযুদ্ধের পাশাপাশি এটি হবে আমাদের একটি নতুন সংযোজন। আমরা মুজাহিদিনদের সঙ্গে নিয়ে রাশিয়াকে ১০ বছর ধরে সর্বস্বান্ত করেছি। রাশিয়াও একসময় পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। একইভাবে আমেরিকাকে দেউলিয়া করার আগপর্যন্ত আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাব।

— ওসামা বিন লাদেন, অক্টোবর ২০০৪

আমরা রাগান্বিত, তার মানে এই নয় যে আমরা বেকুব।

— জর্জ ডব্লিউ বুশ, সেপ্টেম্বর ২০০১

অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ

নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে ৯/১১ হামলার পরপরই 'ওয়ার অন টেরর' বা আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ, আল-কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনের আশ্রয়দাতা তালেবান সরকারের ৯/১১ হামলায় কোনো ভূমিকা ছিল না। তালেবানও আমেরিকার সঙ্গে কোনো যুদ্ধ চায়নি। তারা এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আসন্ন আঘাত সম্পর্কে উজবেক জিহাদিদের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে জাতিসংঘ এবং মার্কিন দূতাবাসকে সতর্ক করতে চেয়েছিল। ২০০১ সালের জুলাই মাসে তালেবান সরকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াকিল আহমাদ মুত্তাওয়াকিলের মাধ্যমে আমাদের সতর্ক করেছিল। কিন্তু তার সতর্কবার্তা উপেক্ষা করা হয়েছিল। তালেবান সুনির্দিষ্টভাবে ৯/১১ হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানত বলে কোনো প্রমাণও নেই।[১]

১৯৯৬ সালে বিন লাদেন আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তালেবান সরকারের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর এবং তালেবান নেতৃত্বের অনেকেই বিন লাদেন থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছিল বলে জানা যায়। বিশেষ করে বিন লাদেনের ফতোয়া এবং বিদেশি মিডিয়ায় দেওয়া সাক্ষাৎকার নিয়ে তালেবানের অনেকেই ক্ষুব্ধ ছিল। ১৯৯৮ সালে পূর্ব-আফ্রিকার দুটি মার্কিন দূতাবাসে আল-কায়েদা হামলার প্রতিশোধ নিতে আমেরিকা আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছিল। সেই দফাও বিন লাদেন বেঁচে যান। উল্টো আফগান জনগণের মাঝে বিন লাদেনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন তালেবান সরকারের জন্যও তাকে বলি দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। তারপরও কিছু তালেবান নেতা এই চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল।[২]

২০০১ সালের ২৯ অক্টোবর 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৯৮ সালে জোড়া দূতাবাস হামলার পর ওসামা বিন লাদেনের প্রত্যার্পণের বিষয়ে মার্কিন কর্মকর্তারা তালেবানের সঙ্গে কমপক্ষে ২০ বার বৈঠক করে।

'ওয়াশিংটন পোস্ট' অনুযায়ী, আলোচনাটি ৯/১১ হামলার 'একেবারে আগের দিন পর্যন্ত' অব্যাহত ছিল। ১৯৯৯ সালের শুরুর দিকে আমেরিকা সতর্কবার্তা দিয়েছিল যে 'বিন লাদেন সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য তালেবানও দায়ী থাকবে।' এই সতর্কবার্তার পর বিন লাদেন সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে তালেবান আরও জোরেশোরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। এমনকি একজন তালেবান প্রতিনিধি সমস্যাটির সমাধানকল্পে বিন লাদেনকে হত্যার জন্য আমেরিকাকে পর্যন্ত আহ্বান করেছিল।[৩]

যদিও অনেকের মতে, বাস্তবে তালেবান কেবল সময়ক্ষেপণ করেছে। তারা কখনোই সত্যিকারার্থে বিন লাদেনকে হস্তান্তরে ইচ্ছুক ছিল না। ১৯৮০-র দশকে আমেরিকার গোপন আফগান যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া সাবেক সিআইএ স্টেশন প্রধান মিল্টন বিয়ার্ডেন '*ওয়াশিংটন পোস্ট*'-কে বলেন, 'তারা (তালেবান) উল্লেখ করার মতো কিছু করেছে বলে আমরা কখনোই শুনতে পাইনি। আমরা কখনোই কোনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারিনি। আমরা বলতাম, বিন লাদেনকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করো। তারা বলত, তোমরাই কোনো উপযোগী পন্থা বাতলে দাও। প্রতিবারই আফগানরা নানা ধরনের গড়িমসি করত। তাকে হাতছাড়া করে ফেলার কথা বলত অথবা অন্যান্য আরও অনেক অজুহাত দিত। কখনো-বা বলত, সে আর এখন আমাদের জিম্মায় নেই।'[৪]

আফগান সরকার এবং তাদের সৌদি ও মিসরীয় আল-কায়েদা অতিথিদের মধ্যকার সম্পর্কও ছিল বেশ অদ্ভুত। যেমন: তালেবান প্রধান মোল্লা ওমর এবং আল-কায়েদা প্রধান বিন লাদেনের আদর্শ ছিল ভিন্ন, তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল ব্যাপক ভিন্ন, তাদের ব্যক্তিজীবন ছিল ভিন্ন এবং তাদের মাঝে ঐতিহাসিক দূরত্বও ছিল। এসব উল্লেখ করে স্ট্রিক ভ্যান লিন্সকোটেন এবং ফেলিক্স কুয়েন লিখেছিলেন, 'তারা দুজন যেন পৃথিবীর দুই ভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দা ছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল ভিন্ন, রীতিনীতি ছিল ভিন্ন, পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। ১১ সেপ্টেম্বরের আগপর্যন্ত তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও ছিল ভিন্ন।' এসব প্রমাণাদি একটি যৌথ পরিকল্পনা অথবা বিন লাদেনের পরিকল্পনায় তালেবানের সম্পৃক্ত থাকার সম্ভাবনা অনেকটাই নাকচ করে দেয়।[৫]

৯/১১-র তিন মাস আগে 'ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল প্রেসের' প্রধান সম্পাদক আরনড ডি বোরচগ্রেভ তালেবান প্রধান মোল্লা ওমরের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। মোল্লা ওমর আরনডকে বলেছিলেন, '(আফ্রিকান দূতাবাস হামলা) মামলার রায় মুলতবি রেখে পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক

নিয়োগ করতে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘকে আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু আজ অবধি আমি কোনো উত্তর পাইনি।' বিন লাদেনের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনঃপূত হয়নি। অথচ আরও এক যুগ বিন লাদেনকে পালিয়ে থাকতে দেওয়ার চেয়ে নিঃসন্দেহে সেই প্রস্তাবটি অনেক ভালো ছিল।

নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে হামলার পরপরই আমেরিকা যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিল। তখন তালেবান নেতৃবর্গ আরেকবারের মতো বিন লাদেনকে হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা করার সদিচ্ছা প্রকাশ করে। মার্কিনদের জন্য তালেবানের শর্তসমূহ জেদি হলেও বিবেচনাযোগ্য ছিল। তালেবান প্রথমে বিন লাদেনের অপরাধসংক্রান্ত প্রমাণাদি সরবরাহ করার দাবি জানায়। প্রমাণ উপস্থাপনের শর্তে তারা বিন লাদেনকে OIC অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশে হস্তান্তর করার প্রস্তাব দিয়েছিল।[৬] বাহরাইন, জর্ডান কিংবা মালয়েশিয়ার মতো কোনো মার্কিনবান্ধব সরকারকে এ জন্য বিবেচনায় রাখা হয়েছিল। এই সরকারগুলো তাৎক্ষণিকভাবেই বিন লাদেনকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বাহ্যত স্বাভাবিক শর্তসমূহ প্রত্যাখ্যান করলে তালেবান সরকার পাকিস্তানের কাছে বিন লাদেনকে হস্তান্তরের প্রস্তাব দিয়েছিল। এই প্রস্তাব মেনে নিলেও কয়েক দিনের মধ্যেই বিন লাদেনকে মার্কিন হেফাজতে নেওয়া সম্ভব হতো। বিপরীতে, এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ সামান্য হলেও 'পশতুন'দের মুখরক্ষা করত। 'পশতুন' রীতি অতিথিদের পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষা নিশ্চিত করে। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এই প্রস্তাব পাকিস্তানি স্বৈরশাসক পারভেজ মশাররফের একটি ক্ষুদ্র অজুহাতের কারণে নস্যাৎ হয়ে যায়। তিনি জানিয়েছিলেন যে, বিচারের মুখোমুখি হওয়ার মাঝের সময়টুকুতেও পাকিস্তান বিন লাদেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারবে না।[৭]

যাহোক, অক্টোবরের শুরুর দিকে আমেরিকা আফগানিস্তানে বোমা হামলা শুরু করে। কয়েক দিন পরই তালেবান বিন লাদেনের অপরাধের প্রমাণ ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য যেকোনো দেশে তাকে হস্তান্তরের সর্বশেষ প্রস্তাব দিয়েছিল।[৮] কিন্তু আগ্রাসনে ক্ষান্ত দিতে আমেরিকার কাছে এই প্রস্তাবকে উপযুক্ত মনে হয়নি।

২০০১ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখের '*গার্ডিয়ান*'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী—

> পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নেতৃস্থানীয় একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র মোতাবেক, তালেবান সরকার বিন লাদেনের অপরাধের প্রমাণ সরবরাহ করার শর্ত

ছাড়াই তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোনো দেশে হস্তান্তরের প্রস্তাব দিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তাদের শর্ত ছিল প্রথমে বোমা হামলা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু মার্কিন কর্মকর্তারা সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয় এবং তালেবান নেতৃত্বের মাঝে একটি ফাটল সৃষ্টির অপেক্ষা করতে থাকে। বরং তারা স্পষ্টতই তালেবানপ্রধান মোল্লা মুহাম্মদ ওমর এবং তার শাসনব্যবস্থার অন্য চরমপন্থিদের ক্ষমতা থেকে উৎখাতে বদ্ধপরিকর ছিল।

সেই প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা ওয়াকিল আহমাদ মুত্তাওয়াকিল। পশ্চিমের কাছে তিনি তালেবান শাসনব্যবস্থায় একজন মধ্যপন্থি নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি সোমবারে ইসলামাবাদের সিআইও এবং আইএসআই কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন... যদিও আজ অবধি তালেবান সরকার অব্যাহতভাবে বলে গেছে যে এই সৌদি ধনকুবেরের কোনো অপরাধে সম্পৃক্ত থাকার কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ তারা পায়নি।[৯]

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ঘোষণা করেন, ‘যখন আমি বলি কোনো আলোচনা নয়, এর মানে কোনো আলোচনা নয়।’[১০] মার্কিনরা আসলে প্রতিশোধ চেয়েছিল। মার্কিন সরকার আসলে যুদ্ধই চেয়েছিল।

তথ্যসূত্র

১. Kate Clark, “Revealed: The Taliban Minister, the US Envoy and the Warning of September 11 That Was Ignored,” Independent, September 6, 2002.

২. Alex Strick van Linschoten and Felix Kuehn, An Enemy We Created: The Myth of the Taliban-Al Qaeda Merger in Afghanistan (Oxford: Oxford University Press, 2012), 152-153; Ahmed Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia (New Haven, CT: Yale University Press, 2010), 75; Gareth Porter, “Taliban Regime Pressed on Anti-US Terror,” Inter Press Service, February 11, 2010; Esposito and Mogahed, Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think.

৩. David B. Ottaway and Joe Stephens, “Diplomats Met with Taliban on Bin Laden,” Washington Post, October 29, 2001.

৪. Alan Cullison and Andrew Higgins, “A Once-Stormy Terror Alliance Was Solidified by Cruise Missiles,” Wall Street Journal, August 2, 2002.

৫. Van Linschoten and Kuehn, An Enemy We Created, 170.
৬. Gareth Porter, “US Refusal of 2001 Taliban Offer Gave bin Laden a Free Pass,” Inter Press Service, May 3, 2011.
৭. Patrick Bishop, “Pakistan Blocks bin Laden Trial,” Telegraph, October 4, 2001.
৮. “US Rejects New Taliban Offer,” ABC News, October 14, 2001; Kathy Gannon, “Bush Rejects Taliban Bin Laden Offer,” Washington Post, October 14, 2001; Rory McCarthy, “New Offer on Bin Laden,” Guardian, October 16, 2001.
৯. McCarthy, “New Offer on Bin Laden.”
১০. Elizabeth Bumiller, “President Rejects Offer by Taliban for Negotiations,” New York Times, October 15, 2001.

ফাঁদ

তালেবান বিন লাদেন এবং আল-কায়েদাকে আশপাশের কোনো সিআইএ স্টেশনে হস্তান্তর করার উপায় অবলম্বন করেনি। মোল্লা ওমর এবং তালেবান বিন লাদেনকে হস্তান্তর না করে নিজেদের ক্ষমতা এবং দেশকে বিসর্জন দেওয়া বেছে নিয়েছিল। তেমনি যুক্তরাষ্ট্রও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিন লাদেনকে হস্তগত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে আফগানিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপের মতো মারাত্মক ভুল করে বসে। আমেরিকার এই ভুলই বিন লাদেনের চূড়ান্ত পরিকল্পনাকে সবচেয়ে দ্রুত এবং সবচেয়ে সহজ উপায়ে বাস্তবায়ন করার সুযোগ করে দিয়েছে। আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন পুরোপুরিভাবে বিন লাদেনের প্রত্যাশিত এবং পরিকল্পিত ছিল। যদিও এই সংক্ষিপ্ত সময়ে সিআইএ এবং মার্কিন বিমানবাহিনী যে এত বেশি ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আসবে, সেটা হয়তো বিন লাদেন বুঝতে পারেননি।

ওয়াল স্ট্রিট প্রতিবেদক এলান কুলিসন ৯/১১ হামলার ঠিক দুই সপ্তাহ পর কাবুলে আল-কায়েদার দুটি কম্পিউটার আবিষ্কার করেছিলেন। একটি কম্পিউটারে তিনি আল-কায়েদার নথি এবং চিঠিপত্রের খনি খুঁজে পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় কম্পিউটারটি মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তরের আগে তিনি চালু করে দেখতে পারেননি। ২০০৪ সালে 'আটলান্টিক'-এর একটি প্রতিবেদনে কুলিসন প্রথম কম্পিউটার থেকে প্রাপ্ত একটি চিঠির অংশবিশেষ প্রকাশ করেছিলেন। সেই চিঠিটি ছিল বিন লাদেনের। চিঠিটি তিনি মোল্লা ওমর এবং তালেবান নেতৃবর্গকে উদ্দেশ্যে করে লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি মোল্লা ওমরকে ৯/১১ উপলব্ধি করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বিন লাদেন লিখেছিলেন, 'অনুগ্রহ করে ধৈর্য ধরুন। ১০ বছরের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চরম ধাক্কা খাবে, তারা ছারখার হয়ে যাবে, দেউলিয়া হয়ে যাবে এবং অসহায় হয়ে পড়বে। অতীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে পরিণতি হয়েছিল, আমেরিকারও তা-ই হবে।' চলমান মার্কিন বিমান হামলার মধ্যেও পাশে থাকার জন্য তালেবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর পর বিন লাদেন তার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তার প্ল্যান 'এ'

ছিল— ‘হয়তো আমেরিকা তার মনোভাব পরিবর্তন করবে এবং সামান্য ক্ষয়ক্ষতির করার পর বৈরুত ও সোমালিয়া ঘটনার মতো সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেবে।’ প্ল্যান ‘বি’ ছিল— ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি দীর্ঘ ও নিষ্ফল যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। যে যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফলও একই হবে, অর্থাৎ, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার। কিন্তু এই ফলাফল আমেরিকার জন্য অত্যধিক বেদনাময় হবে। বিপরীতে এটাই দীর্ঘ মেয়াদে তালেবানের জন্য মঙ্গলজনক হবে।’ বিন লাদেন লিখেছিলেন—

> আমরা আপনাদের বার্তাসমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এগুলো ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং বর্তমানের কুফরি শক্তিসমূহের মোকাবিলায় আপনাদের দৃঢ় এবং বীরত্বপূর্ণ অবস্থানের প্রকাশ। মুসলিম বিশ্বে আপনাদের বার্তাসমূহের প্রভাব অসামান্য। আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, আমেরিকার অবস্থান এবং বক্তব্যসমূহের বিপরীতে আপনাদের দৃঢ় জবাব তাদের এমন ভয়াবহ ক্ষতির মুখে ফেলছে, যেটা অন্য কোনো কিছু করতে পারেনি। আমেরিকার প্রতিটি হুমকি এবং দাবির প্রত্যুত্তর দেওয়া আমিরাতের জন্য অতিশয় জরুরি।... আপনাদের আরও বলা উচিত, ইসরায়েলের জন্য আমেরিকান সহায়তা বন্ধ করতে হবে এবং সৌদি আরব থেকেও মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালানোর হুমকির মোকাবিলায় আপনাদেরও উপযুক্ত হুমকি দেওয়া উচিত। মুসলিমরা নিরাপত্তা উপভোগ করতে না পারলে আমেরিকাও কখনো নিরাপত্তা প্রত্যাশা করতে পারবে না। আফগানিস্তানে এবং ফিলিস্তিনের অশান্তির দাবানল আমেরিকাকেও স্পর্শ করাতে হবে। মনে রাখবেন, আমেরিকা বর্তমানে দুটি পরস্পরবিরোধী সমস্যার সম্মুখীন। প্রথমত, আমাদের জিহাদের ময়দানে প্রতিপক্ষ হিসেবে না নামলে তাদের প্রতিপত্তি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তখন তাকে বহির্বিশ্ব থেকে সেনা প্রত্যাহার করে কেবল নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। ফলস্বরূপ আমেরিকা একটি পরাশক্তি থেকে রাশিয়ার মতোই তৃতীয় শ্রেণির শক্তিতে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, এসবের বিপরীতে তারা আফগানিস্তানে অভিযান পরিচালনা করলে তাদেরকে একটি ব্যাপক এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক বোঝা বহন করতে হবে। এই বোঝা তাদেরকে ভয়ংকর অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি করবে। আল্লাহর ইচ্ছায়, আমেরিকা তখন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মতোই আফগানিস্তান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করবে। পরিশেষে সার্বিক অভ্যন্তরীণ বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা তাদের সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করবে।
>
> আমরা প্রার্থনা করি, আপনার নেতৃত্বাধীন মুসলিম আফগান জাতিকে আল্লাহ আমেরিকান কাফেরদের ওপর বিজয় দান করুক। তিনিই তো এই জাতিকে কমিউনিস্ট কাফেরদের ওপর বিজয় দান করার মাধ্যমে সম্মানিত করেছিলেন।

২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক ভাইস অ্যাডমিরাল থমাস আর উইলসন মার্কিন সিনেটের ইন্টেলিজেন্স কমিটির কাছে স্বীকার করেন যে '৯/১১ হামলার প্রথম কৌশলগত উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার ওপর এমন আঘাত হানা, যাতে করে মার্কিনরা নিজেদের মধ্যপ্রাচ্য নীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। অন্যথা, আমেরিকাকে একটি অসংগত প্রতিক্রিয়া দেখাতে বাধ্য করা এবং পশ্চিমা শক্তি ও ইসলামের মধ্যে দ্বন্দ্বকে উসকে দেওয়া যায়।'[১] অর্থাৎ, আমরা আমাদের শত্রুদের খেলার বস্তুতে পরিণত হয়েছিলাম। এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের নিক্ষেপের কারণে দুই দিকেই আমাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

বিন লাদেনের চিঠিটি আল-কায়েদার কৌশলের একটি উদাহরণ। মার্কিন আধিপত্য থেকে মধ্যপ্রাচ্যকে মুক্ত করার উপায় হিসেবে তারা ১৯৮০-র দশকের সোভিয়েত যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। উল্লেখ্য, এই যুদ্ধে প্রায় এক মিলিয়ন আফগান মারা গিয়েছিল।[২]

বিন লাদেন একবার আবদুল বারি আতওয়ানকে বলেছিলেন যে, ১৯৯৩ সালে সোমালিয়ায় 'ব্লাক হক ডাউন' ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন সেখান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়ায় তিনি 'খুব দুঃখ' পেয়েছিলেন! পরবর্তীতে বিন লাদেন আমেরিকাকে একটি দুর্বল প্রতিপক্ষ প্রমাণের সোমালিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার উদাহরণ হিসেবে দেখাতেন। প্রথম ইরাক যুদ্ধ সমাপ্তির দুই বছর পর আল-কায়েদা প্রধান দাবি করেছিলেন যে সোমালিয়াতেই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি 'বিধ্বংসী যুদ্ধে' জড়িয়ে ফেলে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন।

'আটলান্টিক' পত্রিকার কুলিসন আল-কায়েদার কাঠামো, এর নেতৃবর্গের মতাদর্শ, যুক্তিতর্ক এবং পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপক গবেষণার পর লিখেছিলেন—

> ইরাক বা অন্য কোনো শক্তিশালী সরকারের সঙ্গে আল-কায়েদার যোগাযোগের কোনো প্রমাণ কম্পিউটার থেকে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া তাদের মাঝে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। মার্কিনদের বিরুদ্ধে এই হামলা ছিল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অবসানের একটি উপায়ও। ৯/১১-এর সফলতার পরে কাবুল এবং আল-কায়েদার অন্য শাখাগুলো থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানায়। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক জবাব নিয়ে আল কায়দা নেতারা উদ্বিগ্ন থাকলেও তারা জানত যে আমেরিকা জবাব দিতে এলে তালেবান তাদের যথাযথ আপ্যায়ন

> করবে। তারাও অতীতে আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। তারা সস্নেহে সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণা করে। এই সোভিয়েত লড়াই প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত একটি পশ্চিমা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদাসীন আরব বিশ্বকে জাগিয়ে তুলেছিল।
>
> জিহাদি গোষ্ঠীগুলো বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতোই একটি আনাড়ি প্রতিপক্ষ মনে করে। পাশাপাশি তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, আফগানিস্তান আবারও ধীরে ধীরে আরেকটি পরাশক্তির সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষার কবরস্থান হবে।
>
> সন্ত্রাসবাদ ব্যবহারের প্ররোচনামূলক অধ্যায়ের রচয়িতা রাশিয়ান নৈরাজ্যবাদীদের অভিজ্ঞতা থেকে আল-কায়েদা জানে, তাদের এই হামলাগুলো কোনো পরাশক্তিকে সহসাই পতনের দিকে ঠেলে দেবে না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল পরাশক্তির পাল্টা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বাদবাকি বিশ্বের সহানুভূতি অর্জন করা।

তবে আল-কায়েদা আরববিশ্বের কেন্দ্রে সংঘটিত ইরাক যুদ্ধ থেকে যে ব্যাপক ফায়দা লাভ করেছিল, সে তুলনায় আফগান যুদ্ধ থেকে তারা কমই অর্জন করতে পেরেছে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরবদের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ায় আল-কায়েদা একটি গেরিলা জঙ্গিগোষ্ঠী থেকে গণ-আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে। এই গোষ্ঠীটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিহ্নিত শত্রু গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে (ইরাক, কাশ্মীর, মিন্দানাও, চেচনিয়া... প্রভৃতি জায়গায়) সংঘবদ্ধভাবে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে। এখন সবাই অবাক হয়ে ভাবছে, তাহলে কি সেই কম্পিউটারে পাওয়া আমেরিকার জন্য তৈরি করা পরিকল্পনা তারা নিজেরাই স্বহস্তে বাস্তবায়ন করতে মাঠে নেমেছে?[৩]

তথ্যসূত্র

১. Thomas R. Wilson, “September 11, 2001: Attack on America Statement Before the Senate Select Committee on Intelligence,” Defense Intelligence Agency, February 6, 2002.

২. Alan Taylor, “The Soviet War in Afghanistan, 1979 - 1989,” Atlantic, August 4, 2014.

৩. Alan Cullison, “Inside Al Qaeda’s Hard Drive.”

অন্তহীন যুদ্ধ

যুক্তির খাতিরে এই মিথ্যা অনুমানকে স্বীকারও করে নেওয়া হলো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কখনোই 'দুষ্টের সঙ্গে আপস' করা উচিত নয়। একই সঙ্গে ৯/১১-এর পরে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে যুদ্ধ পরিচালনা করা পুরোপুরি যুক্তিসংগত ছিল। তারপরও বলতেই হবে, বুশ প্রশাসনের সুপারিশকৃত 'সেনাবাহিনী ব্যবহারের অনুমোদন' প্রস্তাব অনুমোদন করে কংগ্রেস একটা বড় ভুল করে বসে।[১] কংগ্রেসে এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়া অনেকেই হয়তো মনে করেছিল যে তারা কেবল আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালানোর অনুমোদন দিচ্ছে। কিন্তু এই প্রস্তাব পরবর্তী দেড় দশকে কমপক্ষে আরও ছয়টি পৃথক এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হস্তক্ষেপকে বৈধতা দেওয়ার চাবিকাঠি হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।[২]

৯/১১-এর রাতে ওভাল অফিস থেকে দেওয়া বিবৃতির প্রথমাংশে প্রেসিডেন্ট বুশ আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন: 'এই গণহত্যা হচ্ছে আমাদের জাতিকে বিশৃঙ্খল করে দেওয়ার জন্য এবং আমাদেরকে পশ্চাৎপসরণের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে এবং আমাদের দেশ শক্তিশালী অবস্থানেই রয়েছে।' এভাবেই বিন লাদেনকে লাল কাপড় নাড়াতে দেখেই আমেরিকান ষাঁড় হঠকারিতার সঙ্গে ধ্বংসের পথে প্রবল গতিতে ধাবমান হয়।

৯/১১ হামলার কুশীলবদের চিনলেও প্রেসিডেন্ট বুশের সেই বিবৃতিতে আল-কায়েদার কোনো উল্লেখই ছিল না।[৩] সেই বক্তব্যে শত্রুর সংজ্ঞায়নে বুশ হামলায় সরাসরি জড়িতদের সঙ্গে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকেও অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। তিনি বলেন, 'এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এবং সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা— উভয়ের মাঝে আমরা কোনো তফাত করব না।'[৪] প্রেসিডেন্ট বুশ ৯/১১-হামলার ৯ দিন পর কংগ্রেসে তার ভাষণে 'ওয়ার অন টেরোরিজম' বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বুশের এই অধ্যাদেশটি

এতটাই উন্মুক্ত ছিল যে, এটাতে বিশ্বের যেকোনো সহিংস রাজনৈতিক দলকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব ছিল। তখন আমাদের বলা হয়েছিল, 'সবকিছু পাল্টে গেছে।' বিশ্বব্যাপী 'দুষ্টের অবসানে' এই যুদ্ধ একটি 'নতুন যুগ' সূচনা করতে যাচ্ছে। কিন্তু, সংঘাতটিকে এমন রূপ দেওয়ার কারণ আমরা এখন জানি। ৯/১১-এর দিনই প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তার চেলা-চামুণ্ডারা আল-কায়েদা নেতাদের শিকার অভিযানের বদলে একটি বৃহত্তর প্রকল্প প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারা ঠিক করে, এই 'ওয়ার অন টেরর' হবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের মতোই। এখানেও একটি বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট যুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কংগ্রেসে জর্জ ডব্লিউ বুশ মিথ্যুকের মতো বলেন, 'এ রকম হাজার হাজার জঙ্গি বিশ্বব্যাপী ৬০টির বেশি দেশজুড়ে রয়েছে। আমাদের 'ওয়ার অন টেরর' আল-কায়েদা দিয়ে শুরু হয়েছে। কিন্তু এটি এখানেই থেমে থাকবে না। এটি ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হবে না, যতক্ষণ না বিশ্বব্যাপী সব জঙ্গিগোষ্ঠীকে খুঁজে বের করা হবে, তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হবে এবং সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করা হবে।'[৫]

১১ সেপ্টেম্বরের সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই এবং এমনকি আমেরিকার ওপর হামলা সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়েই প্রতিরক্ষাসচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড তার কর্মকর্তাদের ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ছক আঁকতে বলেন। গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিরক্ষাসচিব স্টিফেন ক্যামব্রোন তখন প্রতিরক্ষাসচিবের বক্তব্যের নোট টুকে নিচ্ছিলেন: 'ভালো কেস পাওয়া কঠিন... দ্রুত অগ্রসর হতে হবে... স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যবস্তু প্রয়োজন... শক্তিশালী আঘাত হানতে হবে... সংশ্লিষ্ট থাকুক বা না থাকুক, সবকিছু উপড়ে ফেলতে হবে... সাদ্দাম হুসাইনের ওপর একই সঙ্গে আঘাত হানা উপযুক্ত কি না, তা বিবেচনায় রাখতে হবে... কেবল ওসামা বিন লাদেনই নয়... বাড়তি সহায়তার জন্য (পেন্টাগনের জেনারেল কাউন্সেল) জিম হেইনেসকে (ডেপুটি সেক্রেটারি অব ডিফেন্স পল ওলফউইটজ) পি ডব্লিউ-এর সঙ্গে কথা বলতে হবে...।'

কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান রিচার্ড ক্লার্ক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে জোরগলায় বিন লাদেনের ওপর হোয়াইট হাউসের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। বিন লাদেনের সঙ্গে ইরাক সরকারকেও আক্রমণ করতে প্রতিরক্ষা উপসচিব পল ওলফউইটজের দেওয়া পরামর্শের বিরোধিতা করেন তিনি। ওলফউইটজ অনেক আগে থেকেই লেখক লোরি মিলরোয়ির

হাতুড়ে সাংবাদিকতায় প্রভাবিত ছিলেন। মিলরোয়ি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার সামগ্রিক যুদ্ধের গোপন মদদদাতা হিসেবে ইরাককে অভিযুক্ত করেছিলেন। ইতিপূর্বে ১৯৯৩ সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্রথম বোমা হামলার ঘটনা এবং পরের বছর সিআইএ হেডকোয়ার্টারের সামনে গোলাগুলির জন্য তিনি সাদ্দাম হুসাইনকে অভিযুক্ত করেছিলেন। অথচ এই গোলাগুলি ছিল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ১৯৯৫ সালে ওহামা সিটিতে বোমা হামলা[৬] এবং পরবর্তী বছরগুলোতে আল-কায়েদার অন্যান্য হামলার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই ছিল না।[৭] এমনকি সিআইএ, এফবিআই এবং সরকারের অন্যান্য অনেক সংস্থা তার এই প্রলাপসমূহকে খারিজ করে দেয়।[৮] যাহোক, এসব প্রলাপের ভিত্তি ছিল একটি মিথ্যাচার। সেটা হলো, আল-কায়েদা কুশলী রমজি ইউসুফ প্রকৃতপক্ষে একজন ইরাকি সিক্রেট পুলিশ এজেন্ট এবং এই এজেন্ট বাস্তবের রমজি ইউসুফের পরিচয় চুরি করেছে।[৯]

ওলফউইটজের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রক্ষণশীল নেতা এবং আরও কিছু সমমনা কর্মকর্তা সেটিকে সমর্থন করেছিল।[১০]

ইউরোপে ন্যাটোর সাবেক কমান্ডার এবং অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন সেনাপ্রধান ওয়েসলি ক্লার্ক পরবর্তী সময়ে ৯/১১ হামলা পরবর্তী পেন্টাগনের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন। সেখানে তিনি প্রতিরক্ষাসচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ডের কর্মকর্তাদের নিকট একটি তালিকা দেখতে পান। নব্য ওয়ার অন টেররের অংশ হিসেবে সেই তালিকাতে সাতটি দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল! তারা এই দেশগুলোর সরকার পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছিল। সেই দেশগুলো ছিল: ইরাক, লিবিয়া, লেবানন, সোমালিয়া, সুদান সিরিয়া ও ইরান।[১১] এসব দেশগুলোর কোনোটিই আল-কায়েদার সহযোগী ছিল না বা তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আগ বেড়ে কোনো হুমকিও দেয়নি। এই প্রেক্ষাপটে একটি প্রশ্ন চলে আসে। সেটা হলো, যারা এই প্রাণঘাতী ৯/১১ হামলার জন্য দায়ী ছিল, তাদের এবং আফগানিস্তানে তাদের গোপন ঘাঁটিসমূহের ব্যাপারে কী ভাবা হচ্ছিল? উত্তরটি হলো, আফগানিস্তান ছিল একটি গৌণ ইস্যু। যেমনটা ডোনাল্ড রামসফেল্ড মন্তব্য করেছিলেন: 'সেখানে আসলে কোনো ভালো টার্গেট নেই।'[১২]

প্রেসিডেন্ট বুশের কয়েকজন উপদেষ্টা হামলার পরের দিনগুলোতে ইরাকের 'ভালো টার্গেটে' আক্রমণ হানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। অনেকে এমনকি আফগানিস্তানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা অভিযুক্ত আল-কায়েদা সদস্যদের বিরুদ্ধে

ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই সাদ্দাম হুসাইনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে চেয়েছিল।[১৩] ৯/১১-এর এক সপ্তাহ পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। কিন্তু সেই আলোচনাটি ছিল বহুলাংশে ইরাককেন্দ্রিক। সে সময় টনি ব্লেয়ার প্রেসিডেন্ট বুশকে এটা মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন যে, 'এভাবে বিক্ষিপ্ত হওয়া যাবে না। আমাদের আল-কায়েদা, আফগানিস্তান এবং তালেবানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।'[১৪]

টেক্সাসের রিপাবলিকান প্রতিনিধি রন পল এসবের বিরুদ্ধে গিয়ে সীমিত প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। তিনি কেবল আল-কায়েদা এবং সরাসরি তাদের পক্ষ হয়ে লড়াইকারীদের বিরুদ্ধে অভিযানকে সীমাবদ্ধ রাখতে বলেন। যদি এই অভিযানকে সীমিত রাখো হতো, অর্থাৎ কেবল প্রকৃত শত্রুদের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা হতো, তাহলে হয়তো ২০০১ সালের ক্রিসমাসের আগেই আমাদের অভিযান সম্পন্ন হয়ে যেত। সে সময় ড. পল সীমিত অভিযানের অনুমোদন কীভাবে দেশকে বিব্রতকর সমস্যাসমূহ থেকে রক্ষা করবে, সে সম্পর্কে কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভে চমৎকার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন—

> আমরা মধ্যপ্রাচ্যের ওপর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি চাপিয়ে দেওয়া ব্যতীত এই আক্রমণের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারি। মধ্যপ্রাচ্যে হামলা উদারপন্থি আরবদেরও বিন লাদেন এবং অন্য জঙ্গিদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেবে। তবে (এই প্রস্তাব অনুসরণের মাধ্যমে) আমরা সেই অঞ্চলের বাসিন্দাদের দেখাতে পারি যে আমাদের লড়াই তাদের সঙ্গে নয়। আমাদের লড়াই ওসামা বিন লাদেন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে। যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদী কার্যকলাপের সাহস রাখে, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের এই লড়াই।[১৫]

কিন্তু এই কংগ্রেসম্যানের যৌক্তিক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। বড় বড় যুদ্ধ অনুমোদিত হতে এবং যুদ্ধ ক্রমশ বিস্তৃত হতে লাগল। অপরদিকে বিন লাদেনও ৯/১১-এর পর থেকে ২০১১ সালে নিহত হওয়ার আগপর্যন্ত প্রায় এক দশক তার কাজ চালিয়ে যান। তার সহযোগী আইমান আল জাওয়াহিরি পরবর্তী সময়ে আল-কায়েদার হাল ধরেছেন।[১৬] মার্কিন প্রশাসনের পরিকল্পনা এতটাই ব্যাপক ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ ছিল যে, তারা মূল লক্ষ্যবস্তু থেকেই সরে যায়। ৯/১১-কে একের পর এক যুদ্ধ শুরুর ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়।

তথ্যসূত্র

১. Authorization for Use of Military Force, Pub. L. No. 107-40, 155 Stat. 224 (2001); Tom Daschle, “Power We Didn’t Grant,” Washington Post, December 23, 2005.

২. Gregory D. Johnsen, “60 Words and a War Without End: The Untold Story of the Most Dangerous Sentence in US History,” Buzzfeed News, January 16, 2014.

৩. Bob Woodward, Bush at War (New York: Simon & Schuster, 2002), 4.

৪. George W. Bush, “Address to the Nation on the Terrorist Attacks,” 37 Weekly Comp. Pres. Doc. 1301 (September 11, 2001).

৫. George W. Bush, “Address Before a Joint Session of the Congress on the United States Response to the Terrorist Attacks of September 11,” 37 Weekly Comp. Pres. Doc. 1347 (September 20, 2001).

৬. Peter Bergen, “Armchair Provocateur: Reading Laurie Mylroie, the Neocons’ Favorite Conspiracy Theorist,” Washington Monthly, December 2003.

৭. Clarke, Against All Enemies, 30, 32, 95, 231-233, 237; Laurie Mylroie, “Who is Ramzi Yousef? And Why It Matters,” National Interest, Winter 1995/96; Laurie Mylroie and Judith Miller, Study of Revenge: Saddam Hussein’s Unfinished War Against America (Washington, D. C.: AEI, 2000); Laurie Mylroie, The War Against America: Saddam Hussein and the World Trade Center Attacks; A Study of Revenge, 2nd rev. ed., (New York: Harper Paperbacks, 2001).

৮. Andrew C. McCarthy, “Still Willfully Blind After All These Years,” National Review, April 30, 2008.

৯. Michael Isikoff, “Terror Watch: The Enemy Within,” Newsweek, April 20, 2004.

১০. Peter Bergen, “Armchair Provocateur.”

১১. “Gen. Wesley Clark Weighs Presidential Bid,” interview by Amy Goodman, Democracy Now!, March 2, 2007.

১২. Andrea Stone, “Ex-aide: Bush Ignored Terror Threat,” USA Today, March 20, 2004.

১৩. Lawrence Wilkerson, email message to author, April 8, 2017; Andy McSmith, "Chilcot Report: The Inside Story of How Tony Blair Led Britain to War in Iraq," Independent, July 4, 2016.

১৪. Bryan Burrough et al., "The Path to War," Vanity Fair, December 19, 2008.

১৫. Ron Paul, "Air Piracy Reprisal and Capture Act 2001," remarks delivered before the United States House of Representatives, October 10, 2001; September 11 Marque and Reprisal Act of 2001, H.Res. 3076, 107th Cong. (2001).

১৬. Philip Issa, "Al Qaeda Leader Tells Fighters to Prepare for Long Syria War," Chicago Tribune, April 24, 2017.

মোস্ট ওয়ান্টেড আসলে কে বা কারা

৯/১১-এর পর গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের পেছনের গল্প ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক বব এডওয়ার্ড তার 'বুশ অ্যাট ওয়ার' বইয়ে তুলে ধরেন। তিনি জানান, 'সিআইএ প্রথমত মোল্লা ওমরকে তালেবানের নেতৃত্ব থেকে অথবা তালেবানকে আল-কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চেয়েছিল। কিংবা একত্রে উভয়টিই নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রতিরক্ষাসচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড প্রাথমিক লক্ষ্যবস্তুর তালিকায় তালেবানকে যুক্ত করতে চাইছিলেন। রামসফেল্ডের মতে, প্রাথমিক শত্রু আল-কায়েদার নির্দিষ্ট কোনো অবস্থান না থাকায় এই যুদ্ধকে 'অর্থহীন কাজ' মনে হবে। অন্যদিকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কন্ডোলিৎসা রাইস এবং প্রশাসনের অনেকে মত দেন যে, এই দুই গোষ্ঠীর ওপর যুগপৎভাবে আক্রমণের মাধ্যমে যুদ্ধের সূচনা করলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার তৈরি হবে। এমনকি তালেবানের একটি অংশ আল-কায়েদার সঙ্গে যোগ দেবে। তখন তাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির প্রচেষ্টা অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে।[১] তবে শেষপর্যন্ত আফগানিস্তানে বোমা হামলা শুরুর পর তালেবান শেষবারের মতো আল-কায়েদাকে ত্যাগ করতে চাইলেও বুশ আপস করতে রাজি হননি।' সাংবাদিক আনন্দ গোপালের মতে, 'এই ঘটনার পর মধ্যস্থতার সব সম্ভাবনাই শেষ হয়ে যায়।'[২]

৯/১১ হামলার দুই সপ্তাহ পর এবং আফগানিস্তানে বোমা হামলা শুরুর এক সপ্তাহ আগে হোয়াইট হাউসে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে প্রেসিডেন্ট বুশ বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন, 'ওসামা বিন লাদেনকে ধরতে পারার ওপর অভিযানের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করবে না।' প্রতিরক্ষাসচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ডও এই বক্তব্যের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'সূচনা কিংবা পরিসমাপ্তি সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরও বিস্তৃত করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য আল-কায়েদা

কিংবা বিন লাদেন নয়। বিন লাদেনের মুণ্ডু পেলেই এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে না। আর তাকে ধরতে না পারাও কোনোভাবেই ব্যর্থতা নয়।' আসন্ন যুদ্ধকে টেনে ইরাক পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থেকেই রামসফেল্ড মন্তব্য করেছিলেন, 'কেবল আফগানিস্তানই যেন সাফল্য, ব্যর্থতা কিংবা অগ্রগতির মানদণ্ড না হয়। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের অংশ হিসেবে আফগানিস্তান ছাড়াও অন্য দেশে আক্রমণ করা কি উচিত নয়?'[৩]

বব এডওয়ার্ড লিখেছেন, 'হামলার ঠিক পরদিনই রামসফেল্ড এই ভেবে চিন্তিত ছিলেন যে, তারা আফগানিস্তানে সফল হলেই আল-কায়েদাকে পরাজিত করার লক্ষ্যে গঠিত জোট ভেঙে যাবে। ফলে জঙ্গিবাদের নাম ভাঙিয়ে অন্য কোথাও যুদ্ধে নামা কঠিন হয়ে পড়বে। অন্যভাবে বললে, আমেরিকা যদি শত্রুকে পরাজিত করে ফেলে, তাহলে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাই যখন-তখন যুদ্ধ শুরু করার সুবিধার্থে শত্রুর পরিচয় অস্পষ্ট রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।'[৪]

এই নীতি প্রশাসনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, উডওয়ার্ড তা-ও দেখিয়েছিলেন। যুদ্ধের শুরুতে সিআইএ'র অভিযান চলাকালে বুশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন আলোচনা এবং এমনকি বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছিল। কিন্তু ওসামা বিন লাদেনের শতাধিক সহযোদ্ধা আফগানিস্তানের কোথায় লুকিয়ে রয়েছে— এই প্রশ্নটি কেউ করেনি। বুশ প্রশাসন তালেবানকে নির্মূল করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেও ধারণা করা হয়েছিল যে শুরুতেই আল-কায়েদার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই মাস ব্যয় করে সুদূর উত্তরের উজবেকিস্তান সীমান্তসংলগ্ন মাজার-ই-শরিফ এবং রাজধানী কাবুলের দখল নেয়। 'জ ব্রেকার: দ্য অ্যাটাক অন বিন লাদেন অ্যান্ড আল-কায়েদা: অ্যা পারসোনাল অ্যাকাউন্ট বাই দ্য সিআইএস কি ফিল্ড কমান্ডার' বইয়ের লেখকের কাছে আগ্রাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে আফগানিস্তানে সিআইএ উপপ্রধান গ্যারি বার্নস্টেন জানান, 'মার্কিন গোয়েন্দা ও সামরিক বাহিনীর প্রতি (সেন্টকম) অধিনায়ক টমি ফ্র্যাংকস-এর সুস্পষ্ট একটি নির্দেশনা ছিল। সেটা হলো, সর্বপ্রথম উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতা জেনারেল রশিদ দোস্তুমকে আফগানিস্তানের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের মাজার-ই-শরিফ, কুন্দুজ এবং তালোকান শহর দখল নিতে সাহায্য করতে হবে। এটা সম্পন্ন হলেই কেবল রাজধানী কাবুলের উত্তরে অবস্থিত শোমালি সমভূমিতে অভিযুক্ত আল-কায়েদা গোষ্ঠীর আরব ব্রিগেডের ওপর হামলা শুরু করতে হবে।'[৫] স্পষ্টতই এটা ছিল দোস্তুমের স্বার্থে। কিন্তু এতে মার্কিনদের কী লাভ? ফ্র্যাংকস জানান, তারা যত দ্রুত সম্ভব উজবেকিস্তানের সঙ্গে স্থলপথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা

করছিলেন। কিন্তু কেন? আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের জালালাবাদের নিকটস্থ বিন লাদেনের কথিত 'সিংহের ডেরা' তোরাবোরাই তো প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র হওয়া উচিত ছিল। এমনকি শোমালি সমভূমির পূর্বপ্রান্তে বাগরাম বিমানঘাঁটিও মার্কিন সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। আরব যোদ্ধাদের ঘাঁটির পাশেই মার্কিন বাহিনী মজুত থাকার পরও ফ্রাংকস কেন শত মাইল দূরের লক্ষ্যবস্তুতে গুরুত্বারোপ করলেন? এই প্রশ্নের জবাব এখনো পাওয়া যায়নি।

বার্নস্টেন জানিয়েছেন, তাকে প্রশাসনের তরফ থেকে 'তালেবানকে পরাজিত করার পাশাপাশি বিন লাদেনকে আটক করা' এবং 'বিন লাদেনের সন্ত্রাসী সংগঠনকে যতটুকু সম্ভব ধ্বংস করার' দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অথচ তালেবানকেই আল-কায়েদার বিরুদ্ধে ব্যবহারের সুযোগ তখনও শেষ হয়ে যায়নি। শোমালির এক তালেবান নেতা সিআইএ ও উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কাছে তার দলবলসহ আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। ৭০০-র অধিক লোকসহ আত্মসমর্পণের আগে বার্নস্টেনের নির্দেশে সেই নেতার অধীন ২০ জন আরব যোদ্ধাকে আল-কায়েদা ভেবে হত্যা করা হয়েছিল। নিজেরা টিকে থাকতে আফগান-আরব মিত্রতাকে বলি দিতে কোনো কোনো তালেবান নেতার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ছিল এই ঘটনা।

যাহোক, সামগ্রিকভাবে বিন লাদেন ও আল-কায়েদার মূল দলকে আটক করার অভিযানে সহায়তার ব্যাপারে তালেবান নেতারা রাজি হয়ই। কিন্তু অন্তত প্রধান শত্রুকে খুঁজে বের করা, আটক বা হত্যা করার আগপর্যন্ত আমেরিকা তালেবানকে এড়িয়ে যেতে পারত। অথচ ৯/১১ হামলার জন্য দায়ী ওসামা বিন লাদেন ও তার আল-কায়েদা সহযোদ্ধারা পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার আগেই তাদেরকে দ্রুত খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নেয়নি তারা। অজ্ঞাত কোনো উদ্দেশ্যে তালেবানের বিরুদ্ধে লড়তে স্থানীয় যুদ্ধবাজদের ভাড়া করা হয়। যাহোক, শেষপর্যন্ত ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে সিআইএ, আর্মির ডেলটা ফোর্স ও তাদের উত্তরাঞ্চলীয় জোটের মিত্ররা আল-কায়েদাকে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের সাদা পাহাড়ে ও তোরাবোরায় অবরুদ্ধ করে। ঠিক এই মুহূর্ত থেকেই উত্তরাঞ্চলীয় জোট ও অন্য যুদ্ধবাজদের আমেরিকার যুদ্ধে ভাড়া খাটানোর সিদ্ধান্তটি বিপর্যয়ে পরিণত হয়। যুদ্ধবাজ হাজী জামান সিআইএ'র কাছ থেকে লাখ লাখ ডলার হাতিয়ে নেওয়ার পরও ওসামা বিন লাদেন ও তার মিত্রদের নিরাপদে পাকিস্তানে পৌঁছাতে সাহায্য করে। মার্কিনদের বোকা বানানোর এই ঘটনা সে গর্বভরে প্রচার করত।[৬] পরবর্তীকালে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের যুদ্ধবাজ, আশির দশকের যুদ্ধে সিআইএ'র সাবেক সহযোগী, হিজব-

ই-ইসলাম প্রধান গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারও বিন লাদেনের পলায়নে সহযোগিতা করার দাবি করেছিলেন।[৭]

২০০৬ সালে প্রকাশিত এক ভিডিওতে বিন লাদেনের সহযোগী আয়মান আল জাওয়াহিরিও স্বীকার করেন যে, 'মার্কিন সেনারা অবশিষ্ট আল-কায়েদা সদস্যদের মাত্র এক বর্গ কিলোমিটারের মতো এলাকায় অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল।' অর্থাৎ তারা প্রায় নিশ্চিত পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছিল সে সময়। বিপরীতে মার্কিন সেনারা শেষ কাজটুকু করার ঝুঁকি নিতে চায়নি।[৮] জেনারেল ফ্র্যাংকস তোরাবোরায় সিআইএ, উত্তরাঞ্চলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় জোটকে আরও শক্তিশালী করতে নৌ বা সেনাবাহিনী পাঠানোর অসংখ্য অনুরোধে সাড়া দেননি। নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, তৎকালীন নেভি জেনারেল এবং বর্তমানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিরক্ষাসচিব জেমস ম্যাটিসের অধীনে ৪ হাজার নেভি সদস্য কাছাকাছি অবস্থান করছিল। তাদের সীমান্ত সুরক্ষার কাজে লাগানো যেত। কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলে 'তাকে নিষেধ করা হয়'। এর 'প্রায় এক সপ্তাহ পরে' ওসামা বিন লাদেন পালিয়ে যান।[৯]

বার্নস্টেন পরবর্তী সময়ে অভিযোগ করেন, তোরাবোরায় যুদ্ধরত ডেলটা ফোর্স ও সিআইএ'র আধা সামরিক বাহিনীকে সহায়তার জন্য পদাতিক সেনাদল পাঠাতে তিনি বারবার অনুরোধ করেছিলেন। তিনি জানান, 'আমি ৮০০ মার্কিন সেনার অনুরোধ জানিয়ে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করছিলাম। হেডকোয়ার্টারে বারবার বলছিলাম: এখনই সেনা পাঠাও! বিন লাদেন ও তার লোকজনদের ধরার সুযোগ চলে যাচ্ছে!!!' কিন্তু তার অনুরোধ আমলে নেওয়া হয়নি।[১০] ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে তোরাবোরার যুদ্ধ চলাকালে বার্নস্টেনকে ফেরত পাঠানো হয়।[১১] জেনারেল ও রাজনীতিবিদেরা সেনা পাঠানোর ব্যাপারে এতটা অনাগ্রহী থাকার কারণ তিনি তখন বুঝতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে 'জ ব্রেকার' বইতে এই ঘটনাবলি তুলে ধরেছিলেন। দিনের পর দিন বার্নস্টেন ও তার সেনারা সহায়তার জন্য বারবার অনুরোধ, এমনকি অনুনয়ও করেছিল।[১২] বিন লাদেনকে ধরতে না পারার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে জেনারেল ফ্র্যাংকস কংগ্রেসকে জানান, তিনি আশা করেছিলেন যে পাকিস্তান তাদের সীমান্তে পর্যাপ্ত সীমান্তরক্ষী নিযুক্ত করবে এবং সিআইএ, ডেলটা ফোর্স ও বিমানবাহিনীর আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া জঙ্গিরা তাদের হাতে ধরা পড়বে।[১৩] কিন্তু সামরিক স্যাটেলাইট থেকে ওই সময়ের প্রাপ্ত ছবিতে দেখা গিয়েছিল যে পাকিস্তানি সেনারা সীমান্তেও পৌঁছায়নি। সাংবাদিক রন সাসকাইন্ডের ভাষায়, 'নিকটতম সময়ে পৌঁছানোর সম্ভাবনাও ছিল না।'[১৪] পাকিস্তানি সেনারা তোরাবোরা থেকে পলায়নরত ১৩০

জনের মতো আল-কায়েদা যোদ্ধাদের আটক করলেও তাদের মধ্যে কেউই নেতৃত্বস্থানীয় ছিল না। শীর্ষ নেতারা এর দু-এক দিন পরই পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করেন।[১৫]

পাকিস্তানি সেনাদের ওপর নির্ভর করার দায় অবশ্যই ফ্র্যাংকসের। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে নিঃসন্দেহে ঊর্ধ্বতনরাও জড়িত। বার্নস্টেনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আফগান যুদ্ধে সিআইএ প্রধান হেনরি ক্রাম্পটন বারবার জেনারেল ফ্র্যাংকসের কাছে নেভি মোতায়েনের কথা বলেছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট বুশ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট চেনিকে ব্যক্তিগতভাবে আফগান সেনাদের 'অক্ষমতা' এবং বাড়তি সেনা মোতায়েন গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই কোনো লাভ হয়নি।[১৬] ২০০১ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বিন লাদেন ও জাওয়াহিরি পালিয়ে যাওয়ার সময় আল-কায়েদার ২০০ জনেরও কম কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বেঁচে ছিল।[১৭] আল-কায়েদার শক্তি বাড়িয়ে দেখানোর জন্য কাবুলের উত্তরে শোমালি সমভূমিতে তালেবানের পক্ষে যুদ্ধরত পদাতিক আরব ব্রিগেডকে অনেক সময় আল-কায়েদার সদস্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মার্কিন বিমানবাহিনীর হামলার সামনে এরাও টিকতে পারেনি।[১৮] বুশ প্রশাসন যদি তোরাবোরায় নেভি সদস্যদের পাঠাত, তাহলে হয়তো সীমিত সময়ের মধ্যেই আল-কায়েদার সদস্যদের আটক কিংবা হত্যা করা সম্ভব হতো। কিন্তু আল-কায়েদাকে ধরার মিশনে সফল হলে, বিচার করা হয়ে গেলে, বিন লাদেন মারা গেলে, আমেরিকান জনগণ বিন লাদেনের সঙ্গে ইরাকি স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেনের জড়িত থাকার মিথ্যাচারে আর পাত্তা দিত না।

আল-কায়েদার নেতারা নিহত হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য আফগানিস্তান আক্রমণকে আর কে সমর্থন করত? বিন লাদেনকে ধরতে ব্যর্থতার ব্যাপারে বুশ প্রশাসনের দেওয়া অজুহাতগুলোর কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। তাদের দাবি অনুসারে, বিন লাদেন ও তার সহযোগীদের পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় তারাও আশাহত। তারা বলে, পাকিস্তান সীমান্ত বড় রহস্যময়ী এবং দুর্ভেদ্য! অর্থাৎ, আরবরা সেই সীমান্ত অতিক্রম করতে পারলেও, তাদের ধাওয়া করা মার্কিন ডেল্টা ফোর্স, পদাতিক কিংবা নৌ-সেনাদের পক্ষে সেটা অতিক্রম করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি![১৯] ৩ হাজার মার্কিনের জীবন কেড়ে নেওয়া বিধ্বংসী হামলার জন্য দায়ী আল-কায়েদার পিছু নিতে অচেনা এক দেশে ছোট অনুসন্ধানী দলকে পাঠানো যেতেই পারে। কিন্তু এতে কেন বাধা দেওয়া হয়েছিল? প্রশাসনের মতে, এই কাজটি করলে ভিন্ন ধরনের গন্ডগোল সৃষ্টি হতো। প্রশাসন এই ভেবে ভীত ছিল যে এই কাজে পর্যাপ্ত পদাতিক সেনা নিযুক্ত

করলে স্থানীয় আফগান গোত্রগুলোর সঙ্গে বিবাদ তৈরি হতে পারত। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ফ্র্যাংকসের সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাইক ডিলং 'ইনসাইড সেন্টকম' এ লিখেছেন, 'বাস্তবতা এটাই ছিল যে সেখানে সৈন্য প্রেরণ করলে সেই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে আফগানদের চরম ক্ষুব্ধ হয়ে উঠত। শেষপর্যন্ত হয়তো আফগান জনতার বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হতো, যা কখনোই কাম্য ছিল না।'[২০] কিন্তু, এই যুক্তি কোনোভাবেই যুক্তিসংগত হতে পারে না। বাদামি জোব্বা পরিহিত সাড়ে ৬ ফুটের একজন আরব ও তার কজন সহযোগীকে আমেরিকা ধরতে চায় এবং শান্তি চায়— এই কথাটুকু কি গোত্রপতিদের বোঝানো যেত না? তাদেরকে নম্রতার সঙ্গে বিন লাদেনের ডেরার ঠিকানা জিজ্ঞেস করা যেত না? এগুলোও সম্ভব না হলে ডেল্টা ফোর্স আফ-পাক সীমান্তে বিন লাদেনকে সহায়তাকারীদের ওপর বিমান হামলা করতে পারত না? অথচ সহকারী স্টেট সেক্রেটারি রিচার্ড আর্মিট্যাজ আগেই পাকিস্তান সরকারকে হুমকি দিয়েছিল যে, আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনে সহযোগিতা না করলে তাদেরকে বোমা মেরে 'প্রস্তর যুগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে'।[২১] ইসলামাবাদ কেন্দ্রের সিআইএপ্রধান রবার্ট গ্রেনিয়ারের মতে, 'এই ঘোষণার পর মার্কিন সেনাবাহিনীর অভিযানে পাকিস্তান কেবল প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সমর্থনই দেয়নি, বরং তদন্ত ও গোয়েন্দা সহযোগিতার জন্য আইএসআইকে যা বলা হচ্ছিল, তা-ই করছিল।' এমনকি, মার্কিন সৈন্যরা আল-কায়েদার সদস্যদের ধাওয়া করতে পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করলেও যেন পাকিস্তানি সেনারা ভুল করে গুলি চালিয়ে না বসে, সে জন্য গ্রেনিয়ার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের পরিকল্পনা করেছিলেন।[২২] কিন্তু পুরোনো দিনের সিনেমায় ব্যাংক ডাকাতরা রাজ্যের সীমানা পার করলেও পুলিশের গাড়িকে যেমন থেমে যেতে হতো, এ ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছিল। সীমান্ত অতিক্রমের ব্যাপারে আমেরিকার জন্য পাকিস্তানি মিত্রদের থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। শুধু স্থানীয় কিছু গোত্র কী বলবে, এই ভয়েই মার্কিন সেনারা পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করেনি। ওসামা বিন লাদেন ও তার সহযোগীদের পাকিস্তানে 'পালাতে দেওয়ার' মাধ্যমে তাদেরকে আটক করার সব সম্ভাবনাকে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল। অথচ আজ পর্যন্ত কোনো প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমে বুদ্ধিজীবীরা এই কথাটুকু বলেননি।[২৩]

ডিলং পরবর্তী সময়ে ইন্টার প্রেস সার্ভিসকে জানান, '১৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত টহল দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত নেভি সদস্য না থাকাই তাদের ব্যর্থতার কারণ। এটা স্পষ্টভাবেই একটি খোঁড়া যুক্তি। কারণ, সীমান্তে টহল দেওয়ার কথা কেউই বলেনি। নাঙ্গারহার প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শুধু তোরাবোরার

আশপাশের এলাকাই ছিল আসল লক্ষ্যবস্তু। মার্কিন সেনাদের বিশ্বাস ছিল, তারা তাদের ভূখণ্ডে হামলাকারীদের বিচার করতেই আফগানিস্তানে এসেছে এবং নিজের জীবন দিয়ে হলেও তা করবে। কিন্তু, ৯/১১ কী সেটাও না জানা দুর্গম আফগানিস্তানের যাযাবরদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েই ২০১৭ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি পর্যন্ত ২ হাজার ৪০০-রও অধিক মার্কিন সেনা ও নৌ-সেনা এবং প্রায় ১ হাজার ন্যাটো সেনা নিহত হয়েছে।[২৪] এ ছাড়া, পাকিস্তানে বিস্তৃত হওয়া এই যুদ্ধে নিহত হাজার হাজার পাকিস্তানির কথা না বলাই শ্রেয়।[২৫] অভিযানের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য সামরিক ও সিআইএ কর্মকর্তা পরবর্তী সময়ে এই একই অভিযোগ জানিয়েছেন। ডেলটা ফোর্সের থমাস গ্রিয়ার নামক একজন কমান্ডার ২০০৮ সালে 'ডাল্টন ফিউরি'[২৬] ছদ্মনামে CBS নিউজের সিক্সটি মিনিটস অনুষ্ঠানে বলেন, 'তোরাবোরায় বিন লাদেনের অবস্থান নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। এমনকি আল-কায়েদার সদস্যরা পালিয়ে যাওয়ার পরও ডেলটা ফোর্স তাদেরকে তাড়া করতে প্রস্তুত ছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের উপত্যকায় তাদেরকে ঘিরে ফেলার একাধিক পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। ঊর্ধ্বতন কর্মকতাদের কারণে দুইবার তাদের এই পরিকল্পনাও ব্যাহত হয়। স্থানীয় আফগান যুদ্ধবাজদের কারণেও একাধিকবার সেই প্রচেষ্টা বিফল হয়। এই আফগান যুদ্ধবাজদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও ছিল না আমাদের।'[২৭] গ্রিয়ার পরবর্তী সময়ে সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটিকে বলেন, 'ওসামা বিন লাদেনকে ধরতে সৈন্যদের উচিত ছিল তোরাবোরায় স্থল অভিযানের ঝুঁকি নেওয়া। বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে বিন লাদেনের চাইতে বড় টার্গেট আর কী হতে পারে?'[২৮] তোরাবোরায় সিআইএ ও ডেলটা বাহিনীকে সহায়তা করার মতো সৈন্য না থাকার অজুহাত দেয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। কিন্তু, এটা প্রমাণিত যে জেনারেল ম্যাটিসের অধীনে ৪ হাজার নেভি সদস্যা ছাড়াও লড়াই এবং স্থানান্তরের জন্য উপযুক্ত অসংখ্য পদাতিক সেখানে উপস্থিত ছিল। পাশাপাশি মার্কিন জনগণের মনে এই প্রশ্ন জাগাও স্বাভাবিক যে প্যারাট্রুপাররা তখন কোথায় ছিল? সিআইএ কাউন্টার টেরোরিজম প্রধান কোফার ব্ল্যাকের ভাষায়, 'বিন লাদেনের "কল্লা কাটা"[২৯] বা বিন লাদেনকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো[৩০] কি আদৌ এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল?'

প্রতিরক্ষা বিভাগের দাবি অনুসারে, বড় কোনো বাহিনী পাঠানোর অর্থ ছিল অনির্দিষ্টকালের জন্য আফগানিস্তানের পাহাড়ে আটকে যাওয়া। যদিও এই দাবির কোনো ব্যাখ্যা তারা দেয়নি। পর্যাপ্ত সেনা মোতায়েন করে আল-কায়েদাপ্রধানকে আটকের পর তাৎক্ষণিকভাবে কি সেনা প্রত্যাহার করা যেত না? এ অভিযানের

মূল লক্ষ্য বিন লাদেন এবং তার সহযোগীরা তোরাবোরাতে থাকার পরও রাজধানী কাবুলে তালেবানের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর দরকারই-বা কী ছিল? মার্কিন সেনারা ক্ষমতাসীন তালেবানের সঙ্গে লড়ার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু, আমাদের জন্মভূমিতে হামলাকারী আল-কায়েদাকে মোকাবিলার সামর্থ্য রাখত না? এ রকম উদ্ভট যুক্তি ও সীমান্ত পেরিয়ে আল-কায়েদাকে ধাওয়া করে পাকিস্তানের কোনো উপজাতিকে ক্ষুব্ধ করতে না চাওয়া থেকে বোঝা যায় যে 'প্রশাসনই ওসামা ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাদের আসল উদ্দেশ্যই ছিল তালেবানের পতনের পর ইরাক আগ্রাসন শুরু করা।'[৩১]

যুদ্ধের মনোযোগ সাদ্দাম হুসাইনের ইরাকের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার পর ২০০২ সালের ১৩ মার্চের সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বুশ একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের সম্মুখীন হন।

প্রশ্ন: আপনার ভাষণে আজকাল বিন লাদেনকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। এর কারণ কী? আর বিন লাদেন বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে, সে বিষয়ে মার্কিন জনগণকে আপনি কী বলতে চান? এবং শেষ প্রশ্ন: আপনি কি বিশ্বাস করেন যে বিন লাদেনকে নিশ্চিতভাবে হত্যা না করলে সন্ত্রাসের...

বুশ: আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি, বেঁচে থাকলেও সে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কে জানে, সে হয়তো কোনো গুহাতে লুকিয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ তার কোনো সাড়াশব্দ নেই। আর কেবল একজন ব্যক্তির ওপর এত বেশি মনোযোগ দিয়ে রাখা মানে জনগণ আসলে এই অভিযানের লক্ষ্যই এখনো বুঝে ওঠেনি। জঙ্গিবাদ ব্যক্তির ঊর্ধ্বে। আর সে এখন গুরুত্বহীন এক ব্যক্তি। তার সব নেটওয়ার্ক এবং তাকে আশ্রয় দেওয়া সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে। আমি আগেও বলেছি, সে তরুণদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে নিজের বন্দোবস্ত করা একজন লোক। সে আসলে কোথায় আছে তা আমি জানি না। দেখো কেলি, সত্যি বলতে তার পেছনে আমি এত সময় নষ্টও করব না। আমাদের সেনাদের পর্যাপ্ত রসদ সরবরাহ, কার্যকর পরিকল্পনা করা এবং জোটকে শক্তিশালী রাখাই আমার মূল চিন্তার বিষয়। যাতে, শত্রুর (তালেবান) সম্মুখীন হলে তারা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে, যেমনটা শাহিকোটের পাহাড়ে হয়েছিল। আফগানিস্তানে আরও যুদ্ধ হবে। শাহিকোটের মতো আরও লড়াই হবে। আমাদের সেনারা প্রচণ্ড সাহসিকতা দেখাচ্ছে এবং শাহিকোটের মতো সেগুলোর সফলতার ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত। আমরা শক্তিশালী এবং সামর্থ্যবান। আমাদের সেনারা উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। গেরিলা যুদ্ধে কীভাবে চিরাচরিত পদ্ধতিতে লড়াই করতে হয়, আমরা তা বিশ্বকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

প্রশ্ন: কিন্তু আপনি কী মনে করেন না যে, বিন লাদেনকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরার আগপর্যন্ত তার ভীতি রয়েই যাবে?

বুশ: আমি আগেও বলেছি, তার ব্যাপারে তেমন কিছু শোনা যাচ্ছে না। আমি অবশ্যই তাকে এখন গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। সে কোথায় আছে, তা আমি জানি না। এই কথা আমি আবারও বলছি যে তার ব্যাপারে আমি চিন্তিত নই। সে এখন পলায়ন করছে। সে যখন পুরো একটা দেশকে নিয়ন্ত্রণ করছিল, তখন আমি চিন্তিত ছিলাম। বিন লাদেনই আফগানিস্তানকে পরিচালনা করছে এবং তালেবানের মাধ্যমে হামলা চালাচ্ছে জেনে আমি চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু, আমরা আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা মাত্রই সে তার কর্মফল ভোগ করা শুরু করেছে। আল-কায়েদা সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য আর কোনো জায়গা অবশিষ্ট নেই। কোনো প্রশিক্ষণকেন্দ্র খুঁজে পেলে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করা হবে। হয় আমরাই করব, নয়তো আমাদের মিত্ররাই করবে।[৩২]

তৎকালীন মার্কিন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কী ভাবছিলেন, তা জানা সম্ভব না হলেও প্রেসিডেন্টের এই উক্তিই তার মনোভাবকে স্পষ্ট তুলে ধরেছে। অর্থাৎ, ৯/১১ হামলার মূল কারিগরকে ধরার অভিযান বাতিল করা হয়েছিল। মাত্র ৬ মাস সেই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। বুশ পরবর্তীতে বব উডওয়ার্ডের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, ৯/১১-এর পূর্বে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ৮ মাস দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিন লাদেন বা আল-কায়েদার ব্যাপারে 'চিন্তিত ছিলেন না' এবং এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ার 'প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি'।[৩৩] প্রকৃতপক্ষে, ৯/১১-এর আগে আল-কায়েদাকে নিয়ে সিআইএ'র ৪০টি বার্তাকে তিনি একপ্রকার উড়িয়ে দিয়েছিলেন।[৩৪]

বিন লাদেন ও তার সহযোগীরা পালিয়ে যাওয়ার পর অপারেশন এন্ডিউরিং ফ্রিডমের মার্কিন সেনাদের ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়। বলা হয়, নয়তো আল-কায়েদা ফিরে আসবে এবং আফগানিস্তান থেকে আমেরিকায় হামলা চালাবে। আফগানিস্তানের ছোট বাচ্চাদের জন্য স্কুল তৈরির কথা বাদ দিলে, পৃথিবীর ইতিহাসে সামরিক আগ্রাসনের সবচেয়ে বাজে অজুহাত ছিল আফগানিস্তানে 'সেইফ হেভেনের' গল্প। প্রথম দফা বোমা হামলায় বেঁচে যাওয়া আল-কায়েদার অল্প কয়েকজন কেন্দ্রীয় সদস্য ২০০১-এর শেষ নাগাদ আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যান। তালেবানের তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ এবং পরবর্তীকালে দখলদারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আল-কায়েদার উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা ছিল না। তাদের কেউ ফিরে এলেও কোনো সমস্যা ছিল না। আধুনিক সভ্যতা থেকে যত দূরে

যাওয়া সম্ভব, আফগানিস্তান ঠিক তত দূরেই। এক অর্থে নির্বাসন। পশ্চিমা লক্ষ্যবস্তুতে হামলার জন্য আফগানিস্তান থেকে অনুপ্রবেশ করা অসম্ভব। ৯/১১-এর অপহরণকারীদের কেউই আফগান ছিল না। সাধারণ পর্যটক এবং স্টুডেন্ট ভিসায় তারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিল।[৩৫] তারা ম্যাসাচুসেটস, ভার্জিনিয়া ও নিউ জার্সি থেকে হামলা শুরু করেছিল। তারা এই হামলার পরিকল্পনা করেছিল মালয়েশিয়া, জার্মানি, স্পেন, ফ্লোরিডা আর মেরিল্যান্ডে বসে। শত্রুদের মোকাবিলায় আফগানদের একমাত্র সুবিধা হচ্ছে এর দূরত্ব। তাই আমেরিকার জন্যও এই অভিযান কষ্টসাধ্য ছিল। তারপরও ২০০২ সাল নাগাদ সেখানে বোমা হামলা চালানোর মতো কোনো লক্ষ্যবস্তু অবশিষ্ট ছিল না। বেঁচে থাকা আল-কায়েদার সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের অধিকাংশই পাকিস্তান থেকে ওই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ইয়েমেন, সৌদি আরব ও কাতারে হামলার পরিকল্পনা করছিল। পাকিস্তানে আত্মগোপনে থাকা আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ সেসব অঞ্চলে নতুনভাবে তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা শুরু করে। এফবিআইয়ের সাবেক কাউন্টার টেরোরিজম কর্মকর্তা আস-সাওফানের ভাষায়, আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে আগ্রহীদের জন্য তারা 'মাধ্যম' এবং 'অনুপ্রেরণাদাতা'য় রূপান্তরিত হচ্ছিল।[৩৬]

আসল কথা হলো, আফগানিস্তানের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নিয়ে বুশ[৩৭] ও ওবামা প্রশাসন[৩৮] প্রচণ্ড রকমের বাড়াবাড়ি করেছে। তাই মার্কিন জনগণের জন্যও একে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। আফগানিস্তান ছেড়ে গেলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে, আফগান সরকারের পতন ও তালেবানের পুনরুত্থান ঘটলে আল-কায়েদাও ফিরে আসবে— এসব যুক্তি দেখিয়ে তারা আফগানিস্তান ত্যাগ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। যুদ্ধের শুরুর দিনগুলোতে আল-কায়েদা ও তালেবান শব্দদ্বয়কে পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ওসামা বিন লাদেনের দলের সঙ্গে মোল্লা ওমরের সরকারকে মেলানোর চেষ্টা করা হতো। অথচ, ২০০-এরও কম আল-কায়েদা সদস্য পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল এবং মোটাদাগে তাদের আফগানিস্তানে ফেরত আসা অসম্ভব ছিল। কেননা পুলিশ ও গোয়েন্দারা[৩৯] অনেককেই আটক করতে সক্ষম হয়েছিল। বাকিরা হয়তো নিজ নিজ দেশে বিদ্রোহে যোগ দিতে ফেরত গিয়েছিল।[৪০] নয়তো পাকিস্তানে সিআইএ'র ড্রোন হামলায় নিহত হয়েছিল।[৪১] ইরানও প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তৎপরভাবে কাজ করেছিল এবং তাদের সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী আরবদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠাচ্ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, অল্প কজন কেন্দ্রীয় আল-কায়েদা নেতা পালিয়ে গেলেও যুক্তরাষ্ট্র আল-কায়েদার লক্ষ্যবস্তুগুলোতে বেশ ভালোভাবেই আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু অভিযান চালিয়ে যাওয়াকে যৌক্তিক প্রমাণ করতে মার্কিন সরকার বিভিন্ন বিভ্রান্তি উসকে দেয়। সেইফ হেভেনের গল্প দিয়ে তারা প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে রাখে।

সর্বোপরি কেবল বিন লাদেন এবং তার অধীন কয়েক শ লোকের বিরুদ্ধে সীমিত আকারে অভিযান চালালে সেটা হয়তো ২০০১ সালেই শেষ হয়ে যেত। এই চিন্তাকে ঝুঁকিপূর্ণ ভাবা হলেও বর্তমানে গ্যারি বার্নস্টেনও সেটা মেনে নিয়েছেন। তোরাবোরায় সিআইএ ও ডেলটা ফোর্সকে সহায়তার জন্য পদাতিক ও নেভি সদস্যদের পাঠাতে বুশের অস্বীকৃতির কথা জানিয়ে ২০১৬ সালে সাংবাদিক মাইকেল হার্স বলেন, 'খুব দ্রুতই এই যুদ্ধ শেষ হতে পারত। আল-কায়েদার নেতৃত্বস্থানীয় সবাইকেই আমরা খতম করতে পারতাম। জঙ্গিবাদও পাকিস্তানকে বিধ্বস্ত করতে পারত না। বর্তমানে এটা প্রমাণ করা কার্যত অসম্ভব। কী হলে কী ঘটত সেই প্রশ্ন এখন অবান্তর। দুঃখজনকভাবে আমরা সব সুযোগই হারিয়ে ফেলেছি।'[৪২]

তথ্যসূত্র

১. Woodward, Bush at War, 123-128.

২. Ibid., 121-137.

৩. Ibid., 48.

৪. Ibid., 293-311.

৫. Berntsen and Pezzullo, Jawbreaker, 90-91.

৬. Coll, Ghost Wars, 120.

৭. "Afghan Warlord Says He Helped Bin Laden Escape," Reuters, January 11, 2007.

৮. Stephen Ulph, "Al-Zawahiri's New Video Calls on Muslims to Support the Mujahideen," Terrorism Focus, vol. 3 iss. 15, April 18, 2006.

৯. Mary Anne Weaver, "Lost at Tora Bora," New York Times Magazine, September 11, 2005.

১০. Berntsen and Pezzullo, Jawbreaker, 290.

১১. Ibid., 297-298.

১২. Ibid., 277, 306.

১৩. Ibid., 314-315.

১৪. Ron Suskind, The One Percent Doctrine: Deep Inside America's Pursuit of Its Enemies Since 9/11 (New York: Simon & Schuster, 2006), 58-59.

১৫. Grenier, 88 Days, 290.

১৬, Ibid., 58.

১৭. Berntsen and Pezzullo, Jawbreaker, 307-308.

১৮. Woodward, Bush at War, 123; Berntsen and Pezzullo, Jawbreaker, 168-169. Berntsen and Pezzullo, Jawbreaker, 307-308.

১৯. United States Senate Committee on Foreign Relations, "Tora Bora Revisited: How We Failed to Get Bin Laden and Why It Matters Today," report to members of the Committee on Foreign Relations, United States Senate, November 30, 2009.

২০. Mike DeLong and Noah Lukeman, Inside CentCom: The Unvarnished Truth About the Wars in Afghanistan and Iraq (Washington, DC: Regnery, 2004), 57.

২১. "US Threatened to Bomb Pakistan, says Musharraf," Daily Telegraph, September 22, 2006.

২২. Grenier, 88 Days, 271, 289.

২৩. Berntsen and Pezzullo, Jawbreaker, 308; Susan Glasser, "The Battle of Tora Bora: Secrets, Money, Mistrust," Washington Post, February 9, 2002; Annie Lawrey, "How Osama bin Laden Escaped," Foreign Policy, December 11, 2009; Peter Bergen, "The Account of How We Nearly Caught Osama bin Laden in 2001," New Republic, December 29, 2009.

২৪. Paul Tait, "Few Afghans Know Reason for War, New Study Shows," Reuters, November 19, 2010.

২৫. "Drone Strikes in Pakistan," The Bureau of Investigative Journalism, retrieved July 7, 2017.

২৬. Dalton Fury [Thomas Greer], Kill Bin Laden: A Delta Force Commander's Account of the Hunt for the World's Most Wanted Man (New York: St. Martin's, 2009).

২৭. "Elite Officer Recalls Bin Laden Hunt," 60 Minutes, CBS News, October 2, 2008.

২৮. US Senate Committee on Foreign Relations, “Tora Bora Revisited.”

২৯. “‘Bring Me the Head of Bin Laden,’” BBC News, May 4, 2005.

৩০. Acts of Terrorism Transcending National Boundaries, 18 U.S. Code § 2332b (2012).

৩১. Ibid.

৩২. George W. Bush, “The President’s News Conference,” 38 Weekly Comp. Pres. Doc. 407 (March 13, 2002).

৩৩. Woodward, Bush at War, 39.

৩৪. Clarke, Against All Enemies, 1.

৩৫. Martha Raddatz, “State Dept. Lapses Aided 9/11 Hijackers,” ABC News, October 23, 2002.

৩৬. Ali Soufan, The Black Banners: The Inside Story of 9/11 and the War Against al-Qaeda (New York: W. W. Norton, 2011), 346-348.

৩৭. George W. Bush, “Remarks in a Discussion on Education in Springfield, Ohio,” 40 Weekly Comp. Pres. Doc. 2152 (September 27, 2004); George W. Bush and Hamid Karzai, “The President’s News Conference with President Hamid Karzai of Afghanistan,” 41 Weekly Comp. Pres. Doc. 857 (May 23, 2005).

৩৮. Barack Obama, “Remarks at the United States Military Academy at West Point, New York,” DCPD200900962 (December 1, 2009); Ben Feller, “Obama in Afghanistan: No Terror ‘Safe Haven,’” Press Democrat, December 3, 2010.

৩৯. “Top al-Qaeda Leaders Captured or Killed on Pakistani Soil,” News International, May 3, 2011.

৪০. Soufan, The Black Banners, 346-348.

৪১. Stephen Tankel, “Going Native: The Pakistanization of al Qaeda,” War on the Rocks, October 22, 2013; David Sanger and Eric Schmitt, “US Weighs Taliban Strike into Pakistan,” New York Times, March 18, 2009.

৪২. Michael Hirsh, “An Anniversary of Shame,” Politico, September 11, 2016.

নয়া আইন

৯/১১ হামলার দিন বিকেলেই ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এবং তার অ্যাটর্নি বন্ধু ডেভিড এডিংটন সন্ত্রাসী হামলা মোকাবিলায় দোষী সাব্যস্ত ও শাস্তি প্রদানের আগেকার সব আইন থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই হামলাকে তারা শুধু অপরাধ হিসেবে নয়, বরং যুদ্ধের আহ্বান হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। একটি নতুন ধরনের যুদ্ধই হবে এর উপযুক্ত জবাব।[১] এই সবকিছুর জন্য প্রশাসনের প্রয়োজন ছিল একটা নতুন আইনি ধারা, যার নামকরণ করা হয় 'দ্য নিউ প্যারাডাইস'।[২] এই তত্ত্বে বলা হয়, 'জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধে' জন্মভূমির সুরক্ষায় প্রেসিডেন্ট বুশ সংবিধানের 'কমান্ডার ইন চিফ' ধারা অনুসারে যেকোনো নিয়ম, আইন, চুক্তি, এমনকি সংবিধানের যেকোনো অংশকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন। এই কপট আইনি ধারা চেনি ও এডিংটনের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর মাধ্যমে তারা সাংবিধানিক সীমার ঊর্ধ্বে এবং সংবিধানের পরিবর্তন করলেও যে কেউ তাদের কিছু করতে পারবে না! এই ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য তারা যুদ্ধে বেআইনি হয়রানি ও গোয়েন্দা কার্যক্রম নীতিমালা প্রণয়ন করেন।[৩] সাংবাদিক চার্লি স্যাভেজ লেখেন, কংগ্রেস সেপ্টেম্বর ১৪ রেজল্যুশনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বুশের যুদ্ধকালীন ক্ষমতাকে সীমিত করার চেষ্টা করলেও নির্বাহী বিভাগে এসে সেটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। কংগ্রেস যদি ভেবেও থাকে যে তারা ৯/১১-র পর বুশকে সীমিত যুদ্ধকালীন ক্ষমতা দিচ্ছিল, কিন্তু গোপনে বুশ-চেনি প্রশাসন অসীম ক্ষমতা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন।

সে সময় অ্যাটর্নি জেনারেল জন য়ো বলেছিলেন, 'আমরা বৃত্তের বাইরে চিন্তা করছি। কোনো সন্ত্রাসী হুমকির মোকাবিলায় সৈন্যসংখ্যা, আক্রমণের প্রকৃতি, পদ্ধতি, সময় ইত্যাদি বিষয়ে প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার ওপর কংগ্রেস কোনোরূপ বাধা প্রদান করতে পারবে না। এসব সিদ্ধান্ত পুরোপুরি প্রেসিডেন্টের ইচ্ছাধীন।...

বুশ-চেনি সমর্থকগোষ্ঠীর যুক্তি ছিল, সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষমতাকে সংকুচিতকারী আইন ও চুক্তি অসাংবিধানিক। কেননা, নবগঠিত একক নির্বাহী বিধান অনুসারে দেশের সুরক্ষার জন্য নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কে কেবল প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।...' বন্দি নির্যাতনবিষয়ক আইন অমান্য করার অভিযোগ থেকে জিজ্ঞাসাবাদকারীকে রক্ষা করার লক্ষ্যে অ্যাটর্নি জেনারেল জন য়ো সেগুলোর আশ্রয় নেন। কেউ আইন অপব্যাখ্যার অভিযোগ উত্থাপন করলে অ্যাটর্নি জেনারেল জন য়ো তার চিরাচরিত ট্রাম্পকার্ড ব্যবহার করতেন। সেটি ছিল, 'প্রেসিডেন্টের অনুমোদনে হওয়া জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতনবিরোধী আইন প্রয়োগ অসাংবিধানিক, কেননা শত্রুসেনাদের জিজ্ঞাসাবাদের মানদণ্ড কেবল প্রেসিডেন্টই নির্ধারণ করতে পারেন।'[৪]

অর্থাৎ, আমাদের প্রশাসনের কাছে তখন 'পুরো বিশ্বই যুদ্ধক্ষেত্র'। স্থায়ী জরুরি অবস্থার নামে পুরাতন আইনের স্থলে নতুন আইন বানানো হলো। প্রশাসন আদালতে এই দাবিও করে যে, ভুল করে কোনো নিরপরাধ বৃদ্ধাও যদি কোনো ফিলিস্তিনি দাতব্য সংস্থায় দান করে বসে, সিআইএ কিংবা সেনাবাহিনী কোনো তদন্ত ছাড়াই সে বৃদ্ধাকে গুম ও আটকে রাখতে পারবে।[৫] রাষ্ট্রপতির অসীম ক্ষমতাকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করতে এবং 'অচল' ও 'অযৌক্তিক' জেনেভা কনভেনশন ও অন্যান্য যুদ্ধাপরাধবিরোধী আইন যেন সেনাবাহিনীকে মানতে না হয়, সে জন্য প্রশাসনের আইনজীবীরা কুখ্যাত একটি স্মারকলিপিও তৈরি করেছিল![৬] তালেবান সরকার ও আমেরিকা উভয়ই জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী হওয়া সত্ত্বেও সেসব আইনজীবীরা আইনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এই কনভেনশন তালেবানের জন্য প্রযোজ্য নয় বলে দাবি করে। বলা হলো, আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ চলমান থাকায় এটি 'জরুরি রাষ্ট্র' হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্যদিকে তালেবানের ক্ষেত্রে এই কনভেনশন প্রযোজ্য হলেও আল-কায়েদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলে প্রেসিডেন্ট বুশ সিদ্ধান্ত নেন। একই সঙ্গে এই আইনের বিধিনিষেধ অমান্য করার কৌশল হিসেবে বুশ ঘোষণা দেন— তালেবান একটি ধর্মীয় সংগঠন এবং তাদের কোনো নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম না থাকায় যুদ্ধবন্দির পরিবর্তে তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' এবং 'অবৈধ শত্রু সেনা' হিসেবে বিবেচিত হবে।[৭] ফলস্বরূপ তাদেরকেও পৃথিবীর অপর পাশের গুয়ানতানামো বে কারাগারে পাশবিক নির্যাতন ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দি রাখা বৈধতা পেয়ে যায়।

ওবামা প্রশাসনের অধীনে তালেবান 'অবৈধ শত্রুসেনা' থেকে 'দরিদ্র যুদ্ধমান শত্রু'তে পরিণত হলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি একই থাকে।[৮] প্রেসিডেন্টের আইনজীবীরা বন্দি নির্যাতনের নতুন সংজ্ঞা হাজির করে। এই সংজ্ঞা মোতাবেক

এমনকি কোনো বন্দিকে অঙ্গহানি করার সমপর্যায়ে ব্যথা দেওয়ার বৈধতা পেয়ে যায়। সিআইএ'র জিজ্ঞাসাবাদকারীদের হাতে শেষতক কারও মৃত্যু হতেই পারে— এই অজুহাতে এসব ভবিষ্যৎব্য খুনকে স্বপ্রণোদিতভাবে ক্ষমার অনুমোদন দেওয়া হয়। সাংবাদিক জেমস বোভার্ড লেখেন, 'জিজ্ঞাসাবাদের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে করা খুনকেও বৈধ প্রমাণ করতে বিচার বিভাগ চাপ দেয়।'[৯]

আইন পরিষদের আইনজীবীরা লিখেছিলেন, 'চলমান পরিস্থিতিতে আমাদের প্রতিরক্ষাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শুধু নির্দিষ্ট কিছু সম্ভাব্য ক্ষতি এড়ানোতে আমাদের প্রতিরক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। বৃহত্তর ক্ষতি এড়ানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে করা খুনও প্রয়োজনের খাতিরে ক্ষমাযোগ্য অপরাধ।'[১০]

পরবর্তী সময়ে এটাই সোনালি সুযোগ বা 'গোল্ডেন টিকিট' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই 'গোল্ডেন টিকিট' হত্যার জন্য দায়ীদের জেল থেকে ছাড়া পাওয়া থেকেও লাভজনক প্রমাণিত হয়েছিল। 'দেশের গোপনীয়তা রক্ষায়' কোর্টের দেওয়া রায় ও উপরিউক্ত স্মারক সম্মিলিতভাবে হত্যায় অভিযুক্ত বন্দিকেও শাস্তির বদলে মুক্তি দেওয়ার আইনে পরিণত হয়। এমনকি এই আইন প্রত্যাহারের পরও পরিস্থিতি একই থাকে। কারণ, সিআইএ'র নিপীড়করা সম্ভবত এই আইনের প্রতি পরম 'আস্থা রেখে' অপরাধ করছিল।[১১] তবে এটা প্রমাণিত যে, ২০০২-এর আগস্টে এই স্মারকলিপি অনুমোদনের বহু আগে থেকেই এসব বন্দি নির্যাতন চলছিল।[১২] পাশাপাশি তালেবানের জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষর করা বা না করায় কোনো তফাত হতো না। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, কেন্দ্রীয় সরকারের আইন এবং সেনাবাহিনীর নির্দেশনা মোতাবেক আন্তর্জাতিক চুক্তির আগ থেকেই যুদ্ধবন্দিদের অত্যাচার করা নিষিদ্ধ ছিল।[১৩] পরবর্তী সময়ে বিশ্বজুড়ে একই আইন বাস্তবায়ন করা হয়। আগের যুদ্ধগুলোতে সিআইএ এবং মার্কিন সেনারা বন্দি নির্যাতন করলেও সেটা আইন অমান্য করেই করেছে।[১৪] কিন্তু এখন, সিআইএ এবং সেনাবাহিনীর কাছে এই নির্দেশ পৌঁছেছিল যে 'তালেবান ও তাদের মিত্র আল-কায়েদার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কোনো আইন প্রযোজ্য নয়। সুতরাং, যাকে আটক করা প্রয়োজন, তাকে আটক করো, যা করতে ইচ্ছে হয় সেটাই করো। এটাই এখন আইন।'[১৫] ফলস্বরূপ, যুদ্ধবন্দি পরিচয় না দিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ ব্যক্তি, তালেবান পদাতিক যোদ্ধা ও বিদ্রোহীকে আল-কায়েদা ও জঙ্গি আখ্যায়িত করে চূড়ান্ত নির্যাতন, অমানবিক ব্যবহার ও নিপীড়ন করা হয়। শাস্তি হিসেবে তাদের বেদম প্রহার করা হতো। মধ্যযুগীয় পন্থায় বেঁধে রাখা হতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনকি কয়েক দিনের জন্য কয়েদখানার ছাদ, দেয়াল কিংবা দরজায় কবজি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখাসহ

নানাবিধ অস্বাভাবিক ‘পীড়াদায়ক পদ্ধতিতে’ শাস্তি দেওয়া হতো। প্রচণ্ড গরম বা তীব্র শীতল তাপমাত্রায় রাখা হতো। দীর্ঘদিনের জন্য ঘুম বঞ্চিত করে রাখা হতো। নকল ফাঁসিতে ঝুলানোসহ এত দীর্ঘ সময়ের জন্য বেঁধে রাখা হতো যে তারা কাপড়েই মলমূত্র ত্যাগ করে ফেলত। সিআইএ অতি দ্রুতই থাইল্যান্ড, মরক্কো, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপ ডিয়েগো গার্সিয়ার ঘাঁটি, এমনকি মহাসাগরে বিভিন্ন নৌযানে ‘অজ্ঞাত’ অসংখ্য অবৈধ জেলখানা তৈরি করেছিল।[১৬] বহু বছর পর্যন্ত এগুলো সবার চোখের আড়ালে ছিল।[১৭]

সিআইএ প্রমাণ করেছে, বন্দিদের থেকে মিথ্যা সাক্ষ্য আদায় করতে নির্যাতন বেশ ভালো কাজে দেয়। তারা বেনিয়াম মোহাম্মদ নামক এক ব্রিটিশ নাগরিককে পাশবিক নির্যাতন করে। মার্কিন আল-কায়েদা সদস্য হোসে পেডিলার বিরুদ্ধে তেজস্ক্রিয় ‘ডার্টি বোমা’ দিয়ে আমেরিকায় হামলা করার মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করতে তারা ব্লেড দিয়ে বেনিয়ামের অণ্ডকোশ কেটে দিয়েছিল।[১৮] আফগানিস্তানে আটক হওয়া আল-কায়েদা সদস্য ইবনে আল-শাইখ আল-লিবিবিকে নির্যাতন করে স্বীকার করতে বাধ্য করা হয় যে তাদেরকে ইরাক সরকার রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।[১৯]

৯/১১ হামলার মূল হোতা খালিদ শেখ মুহাম্মদ[২০] এবং আবু জুবায়দাকে[২১] সিআইএ নির্যাতন করে আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলার অসংখ্য গল্প ফাঁদতে বাধ্য করেছিল। পরবর্তীকালে সিআইএ স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে আবু জুবায়দার সঙ্গে এমনকি আল-কায়েদার কোনো সংশ্লিষ্টতাই ছিল না।[২২] আবু জুবায়দাকেও ইরাকের বিরুদ্ধে অসংখ্য মিথ্যা অভিযোগ করতে বাধ্য করা হয়। এই গল্পগুলো ‘হোমল্যান্ড’ নিরাপত্তা দপ্তর এবং অন্য বিভাগগুলো থেকে অসংখ্য ‘অরেঞ্জ সিগন্যাল’ জন্ম দেয়। এগুলো সামগ্রিকভাবে একটি ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করে। বিশেষত সাদ্দাম হুসাইনের কথিত হুমকি ২০০৩ সালে ইরাক আগ্রাসনে রূপ নেয়।[২৩] সিআইএ ক্লিনটনের সময়ে শুরু হওয়া ‘বাছবিচারহীন অপরাধী হস্তান্তর’ কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছিল।[২৪] সহজ ভাষায় যার অর্থ ছিল, নিরপরাধ লোকজনের অপহরণ করা। তারপর তাদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা মিসরের তৎকালীন স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের মতো মিত্রদের কাছে নিপীড়িত বা খুন হতে ফেরত পাঠানো হতো।[২৫] এই কার্যক্রমটি কীভাবে কাজ করত, সেটা সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা রবার্ট বেয়ার আমাদের জানিয়েছেন: ‘গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জর্ডানে, নির্যাতন করতে চাইলে সিরিয়াতে আর কাউকে গুম করে দিতে চাইলে তাকে মিসরে পাঠানো হয়।[২৬] আমার দেখা কমপক্ষে ৫ জন ব্যক্তিকে নির্যাতনের পর হত্যার জন্য সিআইএ দায়ী

ছিল। এদের মধ্যে গুল রহমান নামক এক ব্যক্তিকে কাবুলের বাইরে 'কোবাল্ট' সাংকেতিক নামের একটি গোপন 'সল্ট পিট' নিপীড়নকক্ষে ঠান্ডায় জমিয়ে হত্যা করা হয়।'[২৭] পররাষ্ট্রসচিব কলিন পাওয়েলের সাবেক সেনাপ্রধান কর্নেল লরেন্স উইকারসনের মতে, আফগানিস্তান ও ইরাকে সেনাবাহিনীর হেফাজতে কমপক্ষে ১০০ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ন্যূনতম ২৫ জনের মৃত্যুকে সামরিক তদন্তকারীরাই 'হত্যা' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। উইল্কারসন ২০০৮ এর ১৮ জুন কংগ্রেসে দেওয়া সাক্ষ্য প্রদানে বলেন, 'সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই সংখ্যা (হেফাজতে মৃত্যু) ১০৮ এবং সেনাবাহিনী, সিআইএ, অন্যান্য তদন্ত সংস্থা, সিআইডি (ইউনাইটেড স্টেইটস আর্মি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন কমান্ড) প্রভৃতির মতে, হেফাজতে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ২৫, ২৬ অথবা ২৭।'[২৮] 'দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' পরবর্তীতে বিভিন্ন সামরিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উইল্কারসনের দাবির সত্যতা প্রমাণ করেন। কাবুলের উত্তরে বাগরাম বিমানঘাঁটিতেও নিপীড়ন কক্ষ ছিল। মার্কিন সেনাসদস্যদের হাতে নিরপরাধ আফগান তরুণ ট্যাক্সিচালক দিলাওয়ার ইয়াকুবির মৃত্যুর ওপর নির্মিত অ্যালেক্স গীবনির ডকুমেন্টারি 'ট্যাক্সি টু দ্য ডার্কসাইড'-এর সুবাদে এটি কুখ্যাতি অর্জন করেছিল।[২৯] শিশু নির্যাতনের শিকার এবং পরবর্তী সময়ে গুয়ানতানামোর তথাকথিত অভিযুক্ত 'যুদ্ধাপরাধী' কানাডার নাগরিক ওমার খাদরের ওপর বাগরামে হওয়া নির্যাতন নিকৃষ্টতম ধর্ষণকর্মের চিত্রকে তুলে ধরে। মার্কিন সেনারা নাইন-ইলেভেনের প্রতিশোধের লালসা মেটাতে বন্দিদের ওপর এমনকি নিরপরাধ ১৫ বছরের কিশোরের ওপরও অমানুষিক নির্যাতনে লিপ্ত হয়।[৩০] পরবর্তী সময়ে খাদর-এর আইনজীবী জানান, 'মলমূত্র ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে ক্রুশের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হতো। তার চুল ধরে টেনে সেগুলো পরিষ্কার করা হতো'। তারা তাকে ধর্ষণ করতে করতে মেরে ফেলার হুমকি দিত। হাজারো সামরিক বন্দিকে খাদর-এর মতোই কিংবা আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিল। অথচ ৯/১১-এর সঙ্গে তাদের দূরতম সম্পর্কও ছিল না।[৩১] শুরু থেকেই 'সল্ট পিট' এবং বাগরামের কারাগার ছিল নিরপরাধ ও সাধারণ লোকজনে পূর্ণ। যুদ্ধের শুরুতেই সিআইএ কর্মকর্তা গ্যারি বার্নস্টেন শত্রু ও বেসামরিক লোকজনের মধ্যে পার্থক্য করতে অধস্তন কর্মকর্তাদের নিষেধ করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন: 'আমরা আফগানিস্তানে আছি, কোনো মার্কিন আদালতে নয়। অপরাধী প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিরপরাধ হিসেবে মেনে নেওয়ার নীতি এখানে চলবে না। যেসব আরব, চেচেন, চায়নিজ উইঘর, বার্মিজ মুসলিম কিংবা অ-আফগানদের

মুখোমুখি হব, তারা কেউই ব্যবসায়ী কিংবা আমাদের সহায়তাকারী নয়। ভিন্ন কিছু প্রমাণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা শত্রু হিসেবেই বিবেচিত হবে এবং তা প্রমাণ করার দায়িত্বও আমাদের।’[৩২]

উত্তরাঞ্চলীয় জোট এবং অন্য যুদ্ধবাজরা নিজেদের স্থানীয় শত্রুদের দমন করতে মার্কিন এজেন্টদের ব্যবহার করতে থাকে। তাদের শত্রুদের অধিকাংশই তালেবান সরকারের সদস্য ছিল না এবং তালেবান আন্দোলনের সঙ্গে কোনোভাবে জড়িতও ছিল না। আফগানিস্তান সম্পর্কে এবং এর ভাষা, রীতিনীতি, গোত্র, দলাদলি কিংবা ইতিহাস সম্পর্কে কোনো পূর্বজ্ঞান না থাকা মার্কিন সৈন্য ও গোয়েন্দারা ‘তথ্যের’ বিনিময়ে অর্থ প্রদান শুরু করে। ফলস্বরূপ নিরীহ লোকজনকে আক্রমণ, গ্রেপ্তার, নিপীড়ন, বন্দি কিংবা হত্যার মহাসমারোহ শুরু হয়। এ জন্য পুরোনো বিবাদ, বৃহৎ পুরস্কার, এমনকি ভিত্তিহীন গুজবই যথেষ্ট ছিল।

কিউবার গুয়ানতানামো বেতে মার্কিন সংবিধান প্রযোজ্য নয়— এই যুক্তিতে সামরিক জেলখানা তৈরি করা হয়।[৩৩] দ্রুতই সেটা প্রায় ৮০০ জন বন্দি দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায়। এই বন্দিদের অধিকাংশই ছিল ছাগলের রাখাল এবং তালেবান পদাতিক যোদ্ধা। ৯/১১ হামলার সঙ্গে কোনো দূরতম সম্পর্কও ছিল না তাদের। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল আল-কাহতানিই। কাতহানি ২০তম অপহরণকারী হওয়ার কথা থাকলেও ২০০১ সালের আগস্ট মাসে সে আমেরিকায় প্রবেশ করতে পারেনি। আল-কাহতানির পরিচয় না জেনেই আফগানিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গুয়ানতানামো কারাগারে আনা হয়।[৩৪] বুশ প্রশাসনের সামরিক কমিশনের আহ্বায়ক বিচারপতি সুজান জে ক্রফোর্ডের বক্তব্য অনুযায়ী, আল-কাহতানিকে এত বেশি নির্যাতন করা হয়েছিল যে, তিনি কাহতানির মামলা পরিচালনার সুপারিশ করতে অস্বীকার করেন।[৩৫]

মার্কিন আগ্রাসনের সময় আফগানিস্তানে অসংখ্য বিদেশি যোদ্ধা ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল। অনেকেই মধ্য-এশিয়া, চীন এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের বিতর্কিত কাশ্মীর অঞ্চলের স্থানীয় জিহাদ আন্দোলনের জন্য প্রশিক্ষণ নিতে এসেছিল।[৩৬] কিন্তু ২০০১-২০০২ সালে আফগানিস্তানে যেকোনো বিদেশি, বিশেষত অন্য কিছু হওয়ার প্রমাণ না থাকলেই আল-কায়েদা সদস্য বিবেচনা করা হতো। নির্বিচারে তাদেরকে গুম করে দেওয়া হতো। আজও গুয়ানতানামো কারাগারে এমন একশ্রেণির বন্দি রয়েছে। অথচ, বিচারকদের মতে তাদেরকে অভিযুক্ত করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ নেই। তারপরও গুয়ানতানামো বের সাজানো

সামরিক আদালত তাদের কখনোই মুক্তি দেবে না।[৩৭] উল্লেখ্য, তাদের ২০০৬ সালের পূর্বে সিআইএ'র 'অজ্ঞাত' কারাগার থেকে গুয়ানতানামো বেতে আনাও হয়নি।[৩৮] একপর্যায়ে জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রশাসনের অসীম ক্ষমতার ওপর সুপ্রিম কোর্ট বাধা দেওয়া শুরু করে[৩৯] এবং গুয়ানতানামোর ৭০০-র অধিক বন্দির অধিকাংশকে নিজ দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।[৪০]

যাহোক, গোয়েন্দা তথ্যের ক্ষেত্রেও মার্কিনরা শুরু থেকেই ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল।[৪১] আফগানিস্তানজুড়ে আক্রমণ ও গ্রেপ্তার চালানো সৈন্যরা অপরাধীদের আলাদা করতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করছিল। অথচ, সেই কর্মকর্তারা ভাবছিলেন যে শুধু অপরাধীদেরই গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে, আল-কায়েদার তথ্য থাকতে পারে এরূপ ন্যূনতম সন্দেহজনক ব্যক্তিদেরও সিআইএ'র কাছে ইতোমধ্যেই হস্তান্তর করা হয়েছিল।[৪২] ২০০২ সালে সিআইএ'র এক সমীক্ষায় দেখা যায়, 'গুয়ানতানামোতে বন্দিদের বড় অংশই ছিল নিম্নশ্রেণির যোদ্ধা, তালেবানকে রক্ষা করতে আফগানিস্তানে ছুটে যাওয়া অতি আবেগি জিহাদি কিংবা ভুল সময়ে ভুল জায়গায় থাকা নিরপরাধ ব্যক্তি।'[৪৩]

যাহোক, গুয়ানতানামো কারাগার লোকদেখানো প্রচেষ্টা হিসেবে খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়। মার্কিন জনগণকে দেখানো হয়, বহির্বিশ্বে এখনো বিপুলসংখ্যক শত্রুসেনা বিদ্যমান। বুশ প্রশাসন দাবি করে যে গুয়ানতানামোর বন্দিরা ছিল 'নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর'।[৪৪] যৌথ বাহিনীর প্রধানের চেয়ারম্যান জেনারেল রিচার্ড মায়ার্স দাবি করেন, 'এরা হচ্ছে এমন লোক, যারা সি-১৭ এর পেছনে হাইড্রোলিক তার পেঁচিয়ে হলেও সেটিকে ভূপাতিত করবে'।[৪৫] কারাগারের কর্মকর্তা ও কর্মীদের মার্কিন জনতার মতো একই বক্তব্য গেলানো হয়েছিল। বিমানে বন্দিদের প্রথম চালান আসার সময় কারাগারের কর্মীরা কমিক বইয়ের ১০ ফুট লম্বা লম্বা শয়তান আশা করছিল।[৪৬] কয়েক বছর পর 'নিউইয়র্ক টাইমস' স্বীকার করে যে 'প্রশাসনের প্রবীণ কর্মকর্তাদের বারবার বললেও গুয়ানতানামো বে কারাগারের কেউই আসলে আল-কায়েদার নেতা কিংবা নীতিনির্ধারক পর্যায়ের ছিল না... কেবল হাতে গোনা কয়েকজন, কারও মতে ডজনখানেক, কারও মতে দুই ডজন আল-কায়েদার শপথ নেওয়া মাঠপর্যায়ের সদস্য ছিল। গুটি কয়েক অন্য কোনো জঙ্গি সংগঠনের সদস্যও ছিল'। এটাই ছিল সেখানকার ৭৭০-এর অধিক বন্দিদের আসল পরিচয়।

প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা বর্তমানে স্বীকার করেন যে গুয়ানতানামোতে প্রেরণের জন্য সম্ভাব্য বন্দিদের প্রাথমিক যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়াটি চরম

ত্রুটিপূর্ণ ছিল। সামরিক কর্মকর্তাদের মতে, ততক্ষণে শত শত বন্দি সেখানে পৌঁছায়। অনেকের একমাত্র অপরাধ ছিল এটা যে তারা ভবিষ্যতে আমেরিকার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। বন্দিদের অনেকেই ছিল বৃদ্ধ ও দুর্বল। এদের মধ্যে একজন ছিলেন লম্বা দাড়িওয়ালা সজ্জন বৃদ্ধ ফয়েজ মুহাম্মদ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদকারীরা 'আল-কায়েদা ক্লজ (সান্তা ক্লজের অনুকরণে)' নাম দিয়েছিল।[৪৭] পরিচয়ের ভুলের কারণেও অনেকের গুয়ানতানামোতে ঠাঁই হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে আব্দুল জহিরের কথা বলা যায়। তাকে আফগানিস্তানে তার নিজ পরিবার থেকে ১৪ বছর যাবৎ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। অবশেষে সরকার স্বীকার করেছিল যে ভুল ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। জহির ছিল তালেবানের অনুবাদক। একই নামের এক আল-কায়েদা সদস্য মনে করে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে একগুচ্ছ 'রাসায়নিক ও জৈব উপাদান' উপস্থাপন করা হয়। প্রায় এক যুগ পর সরকার স্বীকার করে যে সেগুলো ছিল লবণ, চিনি আর পেট্রোলিয়াম জেলির কৌটা। জহিরের উকিল এবং মার্কিন বিমানবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টারলিং থমাস পরবর্তী সময়ে মন্তব্য করেন, ১৪ বছর যাবৎ বন্দি করে রাখার ক্ষেত্রে 'চিনতে ভুল করার' অজুহাত অবান্তর। উল্লেখ্য, জহিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেওয়া সত্ত্বেও তাকে আজও গুয়ানতানামো বে কারাগারে বন্দি থাকতে হচ্ছে।[৪৮] কর্নেল উইলকারসন বলেন, জেনারেল রশিদ দোস্তমের মতো উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতারাই যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ের অধিকাংশ বন্দিকে গ্রেপ্তার করেছিল। সিআইএ'র আধা সামরিক এবং বিশেষ সেনা দল স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিকেই আটক করেছিল। সেনাবাহিনী একেবারে শুরুতেই বুঝতে পেরেছিল যে তারা গুরুত্বহীন লোকজনকে আটক করছে। বন্দিদের ৮০-৮৫ শতাংশ শুরু থেকেই ওসামা বিন লাদেন তো দূরের কথা, তালেবান সম্পর্কেও কিছু জানত না। অনেক বন্দিকে গ্রামে গ্রামে তল্লাশি চালানোর সময় ধরা হয়েছিল। অনেক সময়, ৫ হাজার ডলার পুরস্কারের লোভে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আফগান গুন্ডারা তাদেরকে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। অনেক সাধারণ অরাজনৈতিক ব্যক্তিকেও প্রতিবেশীর প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে মার্কিনদের কাছে বন্দি হতে হয়েছিল।[৪৯] কিন্তু, ২০০২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট বুশের স্মারকলিপির মাধ্যমে আল-কায়েদা এবং তালেবানের ক্ষেত্রে জেনেভা কনভেনশন বাতিল করা হয়।[৫০] একই সঙ্গে 'স্ট্যাটাস রিভিউ ট্রাইব্যুনাল'-এর মাধ্যমে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করার পূর্বেকার পদ্ধতিকেও বাতিল করা হয়।

বন্দিদের মাঝে বেসামরিক লোক, গোয়েন্দা, গেরিলা প্রভৃতি আলাদা করা এবং তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন সম্পর্কেও মার্কিন সেনারা জানত। উইলকারসনের মতে, পুরোনো আইন বাতিলের ফলে দ্রুতই কয়েকজনকে আটক করে বিচারের জন্য প্রেরণ করতে সেনাবাহিনীর ওপর চাপ বাড়ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দ্রুত নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে গোপনে পুনর্বাসন শুরু করা সত্ত্বেও মার্কিন জনগণের সামনে গুয়ানতানামোর বন্দিদের দুনিয়ার ভয়ংকরতম সন্ত্রাসী হিসেবে তুলে ধরা অব্যাহত ছিল। গুয়ানতানামোর বিশেষ আদালত কংগ্রেসের অধীন থাকাকালীন এতটাই জঘন্য ছিল যে ৭ বিচারপতি এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা থেকে পদত্যাগ করে।[৫১] বন্দিদের ওপর আনা 'অভিযোগগুলো' দুনিয়াজুড়ে হাসির খোরাকে পরিণত হয়। ওসামা বিন লাদেনের বাবা[৫২] এবং গাড়িচালকের[৫৩] বিরুদ্ধে 'যুদ্ধাপরাধের' অভিযোগ আনা হয়। তালেবানের পক্ষে লড়াই করা অস্ট্রেলীয় যোদ্ধা ডেভিড হিকসকে 'যুদ্ধাপরাধের' অভিযোগ মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময় সাজা ভোগের পর এই শর্তে তাকে মুক্তি দেওয়া হয় যে সে তার ওপর করা নির্যাতনের কথা কাউকে বলে আমেরিকাকে 'লজ্জিত' করবে না। তাকে অভিযুক্ত করা আইনগুলো বাতিল করে প্রেসিডেন্ট ওবামা নতুন আইন করলে হিকস একটি বই লিখে তার কাহিনি বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয়।[৫৪]

আফগানিস্তান ও কিউবায় কদাচিৎ ক্যানসার ধরা পড়লেও সেগুলো কখনো প্রাণঘাতী ছিল না।[৫৫] তারপরও বন্দিদের প্রতিষেধকের স্থলে ক্ষতিকর অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া ওষুধ মেফ্লোকুইন বা ল্যারিয়ামের ভারী ডোজ দেওয়া হয়েছিল। এতে বন্দিদের দীর্ঘমেয়াদি এলএসডি ট্রিপ-টাইপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষতি দেখা যায়। সাংবাদিক জেসন লিওপোল্ড ও জেফ্রি কায় লিখেছেন, 'একেবারে শুরু থেকেই মেফ্লোকুইনের সঙ্গে অবসাদ, উদ্বেগ, প্যানিক অ্যাটাক, আবেশ, হ্যালুসিনেশন, উদ্ভট স্বপ্ন, বমি বমি ভাব, বমি করা, ক্ষত, খুন ও আত্মহত্যার চিন্তাসহ বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া গেছে।'[৫৬] 'মেফ্লোকুইনের ব্যবহার বন্ধের পরও দীর্ঘদিন এসব লক্ষণ দেখা যায়' বলে প্রস্তুতকারীরা সতর্ক করেছিল। তারা আরও জানায়, 'বর্তমানে অবসাদগ্রস্ত বা অতীতে অবসাদে ভোগা রোগী, সাধারণ বিষণ্ণতা সমস্যা, সাইকোসিস, স্কিজোফ্রেনিয়া বা বড় ধরনের মানসিক রোগের ক্ষেত্রে মেফ্লোকুইন ব্যবহার করা উচিত নয়।' মেফ্লোকুইন ব্যবহারের সম্ভাব্য বিপদ এবং পূর্বেকার কোনো রোগের অবনতির ঝুঁকি সত্ত্বেও গুয়ানতানামোর বন্দিদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ইতিহাস না জেনেই মেফ্লোকুইন প্রয়োগ করা হয়। লিওপোল্ড

এবং কায় এর প্রতিবেদনে এমন তথ্যই প্রকাশিত হয়। অবসাদ কিংবা অন্যান্য মানসিক রোগের চিকিৎসা নেওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মেফ্লোকুইনের ভয়াবহ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়েছিল। বন্দিদের আইনজীবী এবং প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, অসংখ্য বন্দিকে এসব মেডিসিন প্রয়োগ করা হয়েছিল। ২০০২ সালে প্রথমবারের মতো মেফ্লোকুইন ব্যবহারের পর অনেক বন্দিই আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। একই সময়ে প্রতিরক্ষা বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স) আত্মহত্যার ঘটনাগুলোও প্রকাশ করা বন্ধ করে দেয়। অথচ, ঘাঁটিতে কর্মরত মার্কিন সেনা এবং ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকা থেকে আগত লোকজনের এসব ওষুধের কোনোটিই দেওয়া হয়নি। যদিও সেনাবাহিনীর মতে, এসব মেডিসিন চিকিৎসার জন্য জরুরি ছিল। মেডিকেল জার্নালে 'ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য'বিষয়ক প্রবন্ধের লেখক এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর চিকিৎসক রেমিংটন নেভিন এবং সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট জোসেফ হিকম্যান গুয়ানতানামোতে তাদের হেফাজতে থাকা তিনজন বন্দির মৃত্যু তদন্ত করে একটি বই লিখেছিলেন।[৫৭] তাদের মতে, মেফ্লোকুইনের 'বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া' থাকার কারণেই নিষ্ঠুর জিজ্ঞাসাবাদের সময় বন্দিদের ওপর এটি প্রয়োগ করা হতো।[৫৮]

জবরদস্তিমূলক ওষুধ প্রদান ছাড়াও অনেক বন্দির ওপর নানাবিধ পাশবিক নির্যাতন করা হতো। অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, গুয়ানতানামোর বৈঠকগুলোতে কারাগারের কর্মীরা কয়েদিদের নির্যাতন করার নতুন নতুন পদ্ধতি বের করত। ড. স্ট্রেইঞ্জলাভ কিংবা জর্জ লুকাসের সায়েন্স ফিকশন সিনেমা THX 1138-এর মতো নির্যাতন করা হতো বন্দিদের। কেউ কেউ ফক্স টিভির টোয়েন্টি ফোর নামক নাটকে দেখা নির্যাতনের কৌশলগুলো অনুকরণ করত।[৫৯] এই নাটকের নির্মাতার মতে, মার্কিন জনগণের কাছে এই নির্যাতনগুলো স্বাভাবিক করে তুলতেই এই অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়েছিল![৬০] মোটের ওপর, গুয়ানতানামোর শত শত বন্দি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে এবং ন্যূনতম তিনজন সফলও হয়েছে। ২০০৬ সালের জুন মাসে আরও তিনজন বন্দি সিআইএ হেফাজতে তাদের গোপন ক্যাম্প 'নো' কিংবা 'পেনি লেইনে' মৃত্যুবরণ করে। সেনাবাহিনী এই সুস্পষ্ট খুনকেও আত্মহত্যা বলে ধামাচাপা দেয় এবং এসব খুনের জন্য কাউকে দায়ীও করা হয়নি।[৬১] ২০০৪ সালে, নৌবাহিনীর জেনারেল কাউন্সেল আলবার্তো মোরা গুয়ানতানামোতে সেনাবাহিনীর নির্যাতন নিয়ে প্রশ্ন তুললে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়।[৬২] তারপরও উচ্চ স্বরে অপ্রীতিকর গান বাজিয়ে ঘুমবঞ্চিত করা, গালিগালাজ, বন্দিদের মনে নৈরাশ্যের জন্ম দিতে

বিচ্ছিন্ন করে রাখা ইত্যাদি বন্ধ হয়নি। পরবর্তী সময়ে জেফ্রি কায় প্রমাণ করেন যে ২০০৪ সালের পরেও গুয়ানতানামোতে নতুন নতুন পদ্ধতিতে 'নিয়মিত নির্যাতন কার্যক্রম' চলছিল। বন্দিদের কোনো রকম স্থির থাকতে না দিয়ে এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে সর্বদা হাঁটানো হতো। বিনা অভিযোগ ও বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দি করে রাখার ওপরে এসব ছিল বাড়তি নির্যাতন। পেনি লেন অন্ধকূপে সিআইএ যেসব 'পরিবর্ধিত জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল' অবলম্বন করেছে, তা এখনো অজানা।

২০০৯ সালে ওবামা ক্ষমতায় আসার পর প্রেসিডেন্ট আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত না করে বরং সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের উল্টো ঘোষণা দেন। তিনি বলেন যে, আইন ভঙ্গ করে পূর্ববর্তী প্রশাসনের নির্যাতন নিয়ে তার প্রশাসনের বিচার বিভাগ 'অতীতকে না ঘেঁটে ভবিষ্যতের কথা ভাববে'।[৬৩] ইরাকের আবু গারিব কারাগারে সিআইএ'র নির্যাতনে মানাদিল আল-জামাদি এবং আব্দুর রহমান নামক দুজনের মৃত্যুর প্রাথমিক অনুসন্ধান ব্যতীত সিআইএ এবং সেনাবাহিনীর অন্য অপরাধগুলো ওবামা প্রশাসন এড়িয়ে যায়। কিন্তু এই অনুসন্ধানটিও সিআইএ'র পক্ষেই যায়।[৬৪] এমনকি প্রেসিডেন্ট ওবামা গুয়ানতানামো বে বন্ধ করার ঘোষণা দেওয়ার পর নির্যাতনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তল্লাশি আর কক্ষ পরিবর্তনের নামে তারা বন্দিদের আরও বাজেভাবে প্রহার করা শুরু করে।[৬৫] নতুন ধারার নির্যাতনের বিরুদ্ধে বন্দিদের অনশন-ধর্মঘটকেও কঠোরভাবে দমন করা হয়েছিল। বন্দিদের জোর করে নাকে মোটা রাবারের টিউব দিয়ে এনশিওর নামীয় তরল খাবার গেলানো হতো। সেটাও আবার অনেক সময় রাবার টিউবে আগের বন্দির রক্ত ও শ্লেষা মিশ্রিত অবস্থাতেই।[৬৬] এসব নিষ্ঠুর কার্যকলাপ এবং অধিক পরিমাণে বন্দিদের নির্জন কারাবাসে রাখার ফলে অনশন-ধর্মঘট বিফল হয়ে যায়।[৬৭] দিনশেষে মিডিয়ার মনোযোগও সরে যায়।

প্রেসিডেন্ট ওবামার শাসনামলে বাগরাম বিমানঘাঁটির বন্দিশালা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের কথিত জিহাদি ও জঙ্গিবাদে অভিযুক্তদের জন্য অন্ধকূপে পরিণত হয়েছিল। অভিযুক্তরা কখনো আফগানিস্তানে গিয়েছে কি না, সেটা বিবেচনা করাও জরুরি ছিল না। সাবেক প্রশাসনের মতো ডেমোক্র্যাটরাও গুয়ানতানামো বে কারাগারের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা আর ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার অজুহাত দেখিয়ে বন্দিদের আইনের শাসন থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করছিল। এ পর্যায়ে ২০০৫ সালে এসে সিনেটর জন ম্যাককেইন বন্দি সামলানোর লক্ষ্যে প্রণীত আর্মি ফিল্ড ম্যানুয়ালকে পুনর্বহাল করতে 'ডিটেইনি ট্রিটমেন্ট অ্যাক্ট' সিনেটে পাস করান। কিন্তু এই আইনে বুশ-চেনি প্রশাসনের ইচ্ছানুযায়ী দুটি ফাঁক রাখা

হয়। প্রথমটি হলো, এই আইন সিআইএ'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।[৬৮] দ্বিতীয়টি হলো, আর্মি ফিল্ড কার্যক্রমকে নতুন করে লেখা হবে। এই কার্যক্রমের তালিকায় ঘুমবঞ্চিত করা, অসহনীয় তাপমাত্রায় অত্যাচারসহ সেনাবাহিনীর অন্যান্য 'লঘু' নির্যাতনকে বৈধতা দেওয়া হয়।[৬৯] প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরই ওবামা কোনো রকম বিবেচনা ছাড়াই সিআইএ এবং প্রতিরক্ষা বিভাগকে এই নতুন নীতিমালা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ নতুন নির্যাতনগুলো এমনকি পুরোনো নীতিমালাতেই নিষিদ্ধ ছিল![৭০] ওবামার শাসনামলের শেষে মূলধারার সাংবাদিকেরাও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে গুয়ানতানামো নিয়ে এই সবকিছুই ছিল ধাপ্পাবাজি। সম্প্রতি প্রকাশিত পিরিওডিক রিভিউ বোর্ডের জন্য সেনাবাহিনীর প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টের ভিত্তিতে 'দ্য মায়ামি হেরাল্ডে'র ক্যারোল রোজেনবার্গ লেখেন, 'এটা প্রায় শতভাগ সুনিশ্চিত যে 'ডার্টি ৩০'-এর সবাই ওসামা বিন লাদেনের দেহরক্ষী ছিল না। 'করাচি ৬' ও আল-কায়েদার পক্ষে পাকিস্তানে বোমা হামলার পরিকল্পনাকারী কোনো দলও গুয়ানতানামোতে ছিল না। ১৪ বছর আগে রাসায়নিক বোমা তৈরির অভিযোগে ভুল করে গ্রেপ্তারকৃত একজন আফগানকেও সেখানে রাখা হয়েছিল।' রোজেনবার্গের তথ্য মোতাবেক, এমন অনেক ব্যক্তিকেই এভাবে নিপীড়ন করা হয়েছিল এবং বিনা বিচারে বহু বছর আটকে রাখা হয়েছিল। অনেককে কেবল ক্যাসিও ব্র্যান্ডের ঘড়ি পরার কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কারণ, ১৯৯৫ সালে সিনেমা হল এবং ফিলিপিন এয়ারলাইনস-৭৪৭-এ পরীক্ষামূলক বোমা হামলার সময় রমজি ইউসুফও একই ব্র্যান্ডের ঘড়ি পরেছিলেন।[৭১]

২০১৬ সালে গুয়ানতানামোর একজন ডিটেকটিভ অ্যানালিস্ট রোজেনবার্গকে জানান, 'সবাই গোপন সহায়তার কথা বলে। চারপাশে অসংখ্য ষড়যন্ত্রতত্ত্ব ভেসে বেড়াচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে বাতাসে ভেসে কোনো সংবাদ এলেও তারা সেগুলোকে ওহির মতো বিশ্বাস করা শুরু করে। সেগুলোর অধিকাংশই সাধারণ বিষয় নয়তো মিথ্যা তথ্য।'[৭২] আমাদের সাম্প্রতিক জঙ্গিবাদ সমস্যার পেছনে বন্দিদের ওপর করা নির্যাতনও বহুলাংশে দায়ী। আজকের দুনিয়ার কুখ্যাত দুই মোস্ট ওয়ান্টেড বিন লাদেনের সহযোগী ও আল-কায়েদার বর্তমান প্রধান আইমান আল জাওয়াহিরি[৭৩] এবং ইরাকে আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধান আবু মুসআব আল-জারকাভি[৭৪] মার্কিন মিত্র মিসর ও জর্ডানে পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। আইএসপ্রধান আবু বকর আল-বাগদাদির ক্ষেত্রেও এ রকম ঘটনা ঘটেছিল। মার্কিন সেনাবাহিনী বর্তমানে স্বীকার করেছে যে, আমেরিকার নির্যাতিত ব্যক্তিদের প্রকাশিত ছবিগুলো যে

সময় তোলা হয়েছিল, সে সময়ে আবু বকর আল-বাগদাদি কুখ্যাত আবু গারিব কারাগারে বন্দি ছিল।[৭৫] 'ম্যাথিউ অ্যালেক্সান্ডার' ছদ্মনামে লিখিত 'হাউ টু ব্রেক এ টেরোরিস্ট: দ্য ইউএস ইন্টারোগেটরস হু ইউজড ব্রেইনস, নট ব্রুটালিটি, টু টেকডাউন দ্য ডেডলিয়েস্ট ম্যান ইন ইরাক' বইয়ের লেখক টনি ক্যামেরিনোর মতে, দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধে আবু গারিব কারাগারের নির্যাতনের ছবি এবং গুয়ানতানামো বে কারাগারের কমলা জাম্পস্যুট আর হুডির ছবি স্থানীয় বিদ্রোহ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে চরমভাবে উসকে দিয়েছে। ক্যামেরিনো বলেন, এসব নির্যাতনই ইরাক যুদ্ধে মার্কিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইরাকি ও বিদেশি যোদ্ধাদের নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে।[৭৬]

জনগণের সুরক্ষার জন্য মার্কিন সরকার সব ধরনের মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে নির্যাতনকে একটি রাষ্ট্র অনুমোদিত নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই নীতিই নতুন প্রজন্মের বিন লাদেনপন্থিদের জন্ম দিয়ে আমাদের আরও বড় বিপদের মুখে নিক্ষেপ করেছে। এ কারণেই ২০১৩ সালে 'দ্য আটলান্টিক' গুয়ানতানামো বে কারাগারকে জিহাদি মিডিয়া ও প্রোপাগান্ডা সেল নামকরণ করে। তাদের প্রতিবেদনে উঠে আসে, 'সাম্প্রতিক সময়েও তালেবান মুখপাত্র গুয়ানতানামো বেতে চলমান অনশন ধর্মঘটের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিবৃতি দিয়েছে।... ২০১০ সালে আল-কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা তাদের ইংরেজি ম্যাগাজিন, ইনসপায়ারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেছিল... সেখানে গুয়ানতানামো বে কারাগারের বন্দিদের দুর্দশার চিত্র একাধিক সংখ্যায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। ইনসপায়ারের ২০১০-এর উদ্বোধনী সংখ্যায় প্রকাশিত ওসামা বিন লাদেনের বিবৃতিতে বলা হয়, 'আবু গারিব ও গুয়ানতানামোতে হওয়া অপরাধ...মনুষ্য বিবেককে কাঁপিয়ে দিয়েছে'। বিন লাদেন গুয়ানতানামো সম্পর্কে আরও বলেন, 'সেখানে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি'। কারাগারটি সম্বন্ধে একই সংখ্যায় আরও লেখা প্রকাশিত হয়।... দুজন সাবেক কয়েদি আবু সুফিয়ান আল-আজদি এবং উসমান আল-গামিদি মুক্তির পর আল-কায়দায় যোগদান করে। তারা তাদের লেখালেখির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে জিহাদে যোগ দিতে তরুণদের আহ্বান জানায়। সপ্তম সংখ্যায় ইয়াহিয়া ইব্রাহিম লেখেন, গুয়ানতানামো বে 'পশ্চিমের আসল চেহারা প্রকাশ করেছে' এবং 'বিশ্বের কাছে মার্কিন মানবাধিকারের স্বরূপ উন্মোচন করেছে।'[৭৭]

তালেবানের হাতে দেড় বছরের বেশি সময় বন্দি থাকা নিউইয়র্ক টাইমস রিপোর্টার ডেভিড রোড জানিয়েছেন, 'সেনাবাহিনীর বিমান হামলায় আফগান, ইরাকি, ফিলিস্তিনি নাগরিকদের মৃত্যু এবং বিনা অপরাধে মুসলিম বন্দিদের

বছরের পর বছর আটক রাখার ঘটনা তালবান কমান্ডারদের মনোবলকে আরও শক্তিশালী করে।’[৭৮]

আমেরিকা, ইউরোপ আর ইসরায়েল দাবি করে, তারা মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচার প্রচার করছে। বাস্তবে তারা বিন্দুমাত্র এসব নীতির পরোয়া করে না। বুশ প্রশাসনের ভাবনা ছিল, ‘শক্তিমত্তা ও কর্তৃত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে মার্কিন শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের জন্য শত্রুদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।’ কিন্তু বাস্তবতা হলো, স্থানীয় আফগানদের প্রতি তাদের পাশবিক দুর্ব্যবহার মার্কিনদের কথিত দাক্ষিণ্য, সদিচ্ছা ও উচ্চাশাকে হাতে-কলমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এসবই মার্কিন সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধে আফগান প্রতিরোধকে জোরালো করে তুলছে।[৭৯]

তথ্যসূত্র

১. John Barry et al., “The Roots of Torture,” Newsweek, May 24, 2004.

২. Jane Mayer, “The Hidden Power: The Legal Mind Behind the White House’s War on Terror,” New Yorker, July 3, 2006.

৩. Charlie Savage, “Hail to the Chief,” Boston Globe, November 26, 2006.

৪. Charlie Savage, Takeover: The Return of the Imperial Presidency and the Subversion of American Democracy, reprint ed. (New York: Back Bay, 2008) 121-122, 124, 155-156.

৫. Jennifer K. Elsea, “Enemy Combatant Detainees: Habeus Corpus Challenges in Federal Court,” Congressional Research Service.

৬. “Torturing Democracy, Key Documents,” National Security Archive at George Washington University.

৭. George W. Bush, “Memorandum to National Security Council Principles’ Committee,” February 7, 2002; Mayer, “The Hidden Power.

৮. Joanne Mariner, “A First Look at the Military Commissions Act of 2009, Part One,” FindLaw, November 4, 2009.

৯. James Bovard, Attention Deficit Democracy (New York: Palgrave MacMillan, 2005), 115-116.

১০. "Memorandum for Alberto R. Gonzales Counsel to the President: Standards of Conduct for Interrogation Under U.S.C. 2340-2340A," Office of the Assistant Attorney General, August 1, 2002; "Memos from George W. Bush's Justice Department's Office of Legal Counsel," National Security Archive at George Washington University.

১১. "Statement of Attorney General Eric Holder on Closure of Investigation into the Interrogation of Certain Detainees," United States Department of Justice, August 30, 2012.

১২. Andy Worthington, "CIA Torture Began in Afghanistan 8 Months Before DoJ Approval," April 27, 2009.

১৩. Robert A. Nowlan, The American Presidents, Washington to Tyler (Jefferson, NC: McFarland, 2012), 43.

১৪. Barbara Myers, "The Secret Origins of the CIA's Torture Program and the Forgotten Man Who Tried to Expose It," Nation, June 1, 2015; James LeMoyne, "Testifying to Torture," New York Times, June 5, 1988.

১৫. Seymour M. Hersh, "The Gray Zone: How a Secret Pentagon Program Came to Abu Ghraib," New Yorker, May 24, 2004.

১৬. Adam Zagorin, "US Used UK Isle for Interrogations," Time, July 31, 2008.

১৭. Duncan Campbell and Richard Norton-Taylor, "US Accused of Holding Terror Suspects on Prison Ships," Guardian, June 2, 2008.

১৮. David Rose, "How MI5 Colluded in My Torture," Mail on Sunday, March 8, 2009; William Glaberson, "Questioning 'Dirty Bomb' Plot, Judge Orders US to Yield Papers on Detainee," New York Times, October 30, 2008; Rose, "Tortured Reasoning."

১৯. Dana Priest, "Al Qaeda-Iraq Link Recanted," Washington Post, August 1, 2004; Peter Finn, "Detainee Who Gave False Iraq Data Dies in Prison in Libya," Washington Post, May 12, 2009.

২০. Helen Duffy, "The CIA Tortured Abu Zubaydah, My Client. Now Charge Him or Let Him Go," Guardian, December 15, 2014.

২১. Marcy Wheeler, "KSM Had the CIA Believing in Black Muslim Convert Jihadist Arsonists in Montana for 3 Months," Emptywheel, December 15, 2014.

২২. Rose, "Tortured Reasoning."

২৩. Jonathan S. Landay, "Abusive Tactics Used to Seek Iraq-al Qaeda Link," McClatchy Newspapers, April 21, 2009.

২৪. Clarke, Against All Enemies, 143-144; Stephen Grey, "Five Facts and Five Fictions About CIA Rendition," Frontline, PBS, November 4, 2007.

২৫. Jane Mayer, "Outsourcing Torture: The Secret History of America's 'Extraordinary Rendition' Program," New Yorker, February 14, 2005.

২৬. Stephen Grey, "America's Gulag," New Statesman, May 17, 2004.

২৭. Jason Leopold, "Barbaric Conditions That Led to a Detainee's Death Are Laid Bare in CIA Reports," Vice, June 14, 2016.

২৮. From the Department of Justice to Guantánamo Bay: Administration Lawyers and Administration Interrogation Rules Part II: Hearing Before the Subcommittee on the Constitution, Civil Rights and Civil Liberties, 110 Congress (2008).

২৯. Taxi to the Dark Side, directed by Alex Gibney, (2008; Velocity/Thinkfilm).

৩০. Omar el Akkad, "Khadr Couldn't Have Thrown Grenade That Killed US Soldier: Defense Lawyer," Globe and Mail, December 12, 2008.

৩১. Jeff Tietz, "The Unending Torture of Omar Khadr," Rolling Stone, August 24, 2006.

৩২. Berntsen and Pezzullo, Jawbreaker, 207.

৩৩. Scott Packard, "How Guantanamo Bay Became the Place the US Keeps Detainees," Atlantic, September 4, 2013.

৩৪. Schmidt, Susan, and Dan Eggen, "Man Refused Entry May Have Been 9/11 Plotter," Washington Post, January 21, 2004.

৩৫. Bob Woodward, "Guantánamo Detainee Was Tortured, Says Official Overseeing Military Trials," Washington Post, January 14, 2009.

৩৬. Eric Margolis, American Raj: Liberation or Domination? Resolving the Conflict Between the West and the Muslim World (Toronto: Key Porter, 2008), 202.
৩৭. Ed Pilkington, "US Government Identifies Men on Guantánamo 'Indefinite Detainee' List," Guardian, June 17, 2013.
৩৮. Jonathan Karl, "'High-Value' Detainees Transferred to Guantanamo," ABC News, September 6, 2006.
৩৯. Rasul v. Bush 542 U.S. 466 (2004).
৪০. Andy Worthington, The Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America's Illegal Prison (London: Pluto, 2007).
৪১. Friedrich A. Hayek, "The Use of Knowledge in Society," American Economic Review 35, no. 4. (1945): 519-30.
৪২. Lawrence Wilkerson, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, July 2, 2010.
৪৩. Tim Golden and Don Van Natta Jr., "US Said to Overstate Value of Guantánamo Detainees," New York Times, June 21, 2004.
৪৪. Ibid.
৪৫. "Shackled Detainees Arrive in Guantanamo," CNN, January 11, 2002.
৪৬. Brandon Neely, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, November 1, 2011.
৪৭. Golden and Van Natta Jr., "US Said to Overstate Value of Guantánamo Detainees."
৪৮. "Abdul Zahir, Mistakenly Detained by US for 14 Years, Cleared for Release from Guantánamo Bay," Gitmo Watch, July 20, 2016; Britain Eakin, "'Wrong Guy' Who Spent 14 Years in Gitmo Gets Transfer Hearing," Graver News, June 11, 2016; Sterling Thomas, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, July 21, 2016.
৪৯. Lawrence Wilkerson, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, March 27, 2009.

৫০. George W. Bush, “Humane Treatment of al Qaeda and Taliban Detainees,” White House Memorandum, February 7, 2002.

৫১. Peter Finn, “Guantánamo Prosecutor Quits, Says Evidence Was Withheld,” Washington Post, September 25, 2008.

৫২. Jane Sutton, “Bin Laden’s Cook Gets 14-year Sentence,” Reuters, August 11, 2010.

৫৩. “Bin Laden’s Driver Convicted of Terror Charges,” ABC News, August 6, 2008.

৫৪. “David Hicks Gives Graphic Account of Torture at Guantánamo,” Independent Australia, May 23, 2001.

৫৫. “Health Information for Travelers to Cuba,” Centers for Disease Control and Prevention; William Winkenwerder Jr., “Department of Defense Memo to John M. McHugh, Chairman, Subcommittee on Military Personnel,” Truthout, September 13, 2002.

৫৬. Jason Leopold and Jeffrey Kaye, “Controversial Drug Given to All Guantanamo Detainees Akin to ‘Pharmacologic Waterboarding,’” Truthout, December 1, 2010.

৫৭. RL Nevin, “Mass Administration of the Antimalarial Drug Mefloquine to Guantánamo Detainees: A Critical Analysis,” Tropical Medicine & International Health 17 (August 2010): 1281-1288.

৫৮. Jeffrey Kaye, “New Book: Antimalarial Drugs Part of Secret Program to Torture Detainees at Guantanamo,” Shadow Proof, April 5, 2015.

৫৯. Philippe Sands, “The Green Light,” Vanity Fair, May 2008.

৬০. Mark P. Denbeaux et al., “Uncovering the Cover Ups: Death in Camp Delta,” Seton Hall Law School, Public Law & Legal Theory Research Paper Series, Paper No. 2437423, May 17, 2014, Revised: June 19, 2014.

৬১. Alberto J. Mora, “The Mora Memo,” United States Department of the Navy, July 7, 2004.

৬২. “James Hetfield Is ‘Honored’ Metallica’s Music Was Used by US Military to ‘Help Us Stay Safe,’” Blabbermouth, March 3, 2017.

৬৩. US Const. art. II, § III.

৬৪. Eric Holder, “Statement of Attorney General Eric Holder on Closure of Investigation into the Interrogation of Certain Detainees,” United States Department of Justice, August 30, 2012.

৬৫. Jeremy Scahill, “Little Known Military Thug Squad Still Brutalizing Prisoners at Gitmo Under Obama,” Alternet, May 14, 2009.

৬৬. Kent Sepkowitz, “The Writhing, Miserable Reality of Force Feeding at Guantánamo Bay,” Daily Beast, May 2, 2013.

৬৭. Charlie Savage, “Guantánamo Hunger Strike Is Largely Over, US Says,” New York Times, September 23, 2013.

৬৮. R. Jeffrey Smith and Josh White, “Cheney Plan Exempts CIA from Bill Barring Abuse of Detainees,” Washington Post, October 25, 2005.

৬৯. Jeffrey Kaye, “How the US Army’s Field Manual Codified Torture— and Still Does,” Alternet, January 6, 2009.

৭০. From the Department of Justice to Guantanamo Bay: Administration Lawyers and Administration Interrogation Rules Part 1: Hearing before the Subcommittee on the Constitution, Civil Rights, and Civil Liberties, 110 Congress. (2008) (Congressional Testimony of Marjorie Cohn on Torture Policy).

৭১. Lance, 1,000 Years for Revenge, 236-244, 254-261.

৭২. Carol Rosenberg, “New Guantánamo Intelligence Upends Old 'Worst of the Worst' Myths,” Miami Herald, October 7, 2016.

৭৩. Wright, The Looming Tower, 55.

৭৪. Gerges, The Far Enemy, 256.

৭৫. Joshua Eaton, “US Military Now Says ISIS Leader Was Held in Notorious Abu Ghraib Prison,” Intercept, August 25, 2016.

৭৬. Matthew Alexander, “I’m Still Tortured by What I Saw in Iraq,” Washington Post, November 30, 2008; Tony Camerino [Matthew Alexander] and John R. Bruning, How to Break a Terrorist: The U.S. Interrogators Who Used Brains, Not

Brutality, to Take Down the Deadliest Man in Iraq (New York: Free, 2008);

৭৭. Thérèse Postel, “How Guantanamo Bay’s Existence Helps Al-Qaeda Recruit More Terrorists,” Atlantic, April 12, 2013.

৭৮. David Rhode, “7 Months, 10 Days in Captivity,” New York Times, October 17, 2009.

৭৯. For more on the CIA and military torture programs in Afghanistan, Iraq, Guantánamo Bay and various black sites under both the Bush and Obama administrations, see Appendix 3.

তালেবান বনাম কারজাই ও অন্যান্য মিলিশিয়া

১৯৭৯ সালে সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীরা তাদের সামরিক মন্ত্রিসভাকে আফগানিস্তানে অভিযানের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল।[১] তারাও বলেছিল, যুদ্ধবিধ্বস্ত গোত্রীয় সমাজে জাতিরাষ্ট্র নির্মাণ অসম্ভব। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড শুরুতে আফগানিস্তানে জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের পক্ষে না থাকলেও পরবর্তী সময়ে তার মতামত পরিবর্তন করেন। আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর দ্রুতই ১০ হাজার মার্কিন সেনা আফগানিস্তানের মাটিতে পা রাখে। তবে সেটা বিন লাদেন কিংবা তার সহযোগী আইমান আল-জাওয়াহিরিকে আটক করার মতো দ্রুত ছিল না।[২] আমৃত্যু লড়াইপ্রিয় একটি দেশে জাতিরাষ্ট্র গঠনের কাজে মিলিটারিকে নামানো হয়। সেটাও কিনা নবগঠিত সরকারের মিত্রদের সঙ্গে জোট বেঁধে আফগানিস্তানের ভূমিপুত্রদের আক্রমণ করার মাধ্যমে!

আমেরিকার নতুন আফগান মিত্র উত্তরাঞ্চলীয় জোট ছিল মূলত ১৯৮০-র দশকের যুদ্ধে সোভিয়েত কমিউনিস্ট সহযোগীদের একটি জোট।[৩] উপরন্তু সেই জোটপ্রধান এবং সিআইএ'র প্রিয়পাত্র আহমেদ শাহ মাসুদ সোভিয়েত যুদ্ধে কেজিবি ডাবল এজেন্ট ছিল।[৪] তবে আমেরিকার পাল্টা আক্রমণের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে আল-কায়েদা এই জোটশক্তিকে এড়াতে চেয়েছিল। তাই তারা ৯/১১-এর দুই দিন আগে আহমাদ শাহ মাসুদকে আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে হত্যা করে।[৫] মাসুদকে হত্যার এই দিনক্ষণ সম্পূর্ণ কাকতালীয়ও হতে পারে। কারণ হামলার আয়োজন করতে অনেক কালক্ষেপণ হয়েছিল।[৬] শেষতক এই কালক্ষেপণই আল-কায়েদার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ মাসুদের যুদ্ধবাজ সাঙ্গপাঙ্গরা দ্রুতই যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাইকে কেন্দ্র করে জোটবদ্ধ হতে পেরেছিল।[৭]

কিন্তু দিনশেষে তালেবানবিরোধী আফগান কমিউনিস্টদের জোটবদ্ধ করে নতুন সরকার গঠনের এই মার্কিন সিদ্ধান্ত বিপর্যয়কর প্রমাণিত হয়েছে। উজবেক

গুন্ডা-সরদার আব্দুল রশিদ দোস্তম আশির দশকে মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ক্রেমলিন অনুগত আফগান সেনাবাহিনীর জেনারেল ছিল।[৮] ৯/১১-এর পরপরই পরিস্থিতি বুঝে দোস্তম দ্রুতই ক্রেমলিন থেকে ওয়াশিংটন ব্লকে চলে আসে। সিআইএও তাকে সাদরে বরণ করে নেয় এবং অজস্র টাকাপয়সা ঢালতে শুরু করে। ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে দাশত-ই-লেইলিতে ধাতব শিপিং কনটেইনারে আটক শত শত তালেবান বন্দিকে দোস্তমের নির্দেশেই হত্যা করা হয়।[৯] সে সময় দোস্তম মার্কিন বিশেষ বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছিল। দোস্তমের লোকজন কনটেইনারগুলোতে অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে নির্বিচারে গুলি করে অগণিত বন্দিকে হত্যা করে।[১০] এটাই ছিল আমেরিকার আফগান কমিউনিস্ট কসাইদের পুনর্বাসনের আসল চিত্র।

দোস্তমকে ২০০১ সালের ডিসেম্বরে উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী, ২০১০ সালে সেনাপ্রধান এবং বর্তমানে আফগানিস্তানের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দোস্তম এবং তার গুন্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র বেসামরিক পশতুনদের গণহত্যাসহ অসংখ্য যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্যাট্রিসিয়া গুসম্যান আফগান সরকারের কাছে ফৌজদারি মামলার আবেদন করে। তাদের মতে, 'দোস্তমের মিলিশিয়ার নৃশংসতার দীর্ঘ তালিকায় ফারয়াব প্রদেশের গণহত্যা সর্বশেষ সংযোজন। কিন্তু উত্তর-আফগানিস্তানে নিরাপত্তাহীনতার আসল কালপ্রিট এই গুন্ডাবাহিনী এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট দোস্তমকে কখনোই জবাবদিহি করতে হয়নি।'[১১]

প্রেসিডেন্ট বুশ এবং ওবামার সময়কালে এই আফগান ভাইস-প্রেসিডেন্ট দোস্তমের মিলিশিয়ার কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলেই তাকে এই পদে বসানোর পটভূমি উপলব্ধি করা যায়। উপরন্তু দোস্তমের মিলিশিয়ার মাঝে ভাঙন কিংবা মূলধারায় একীভূতকরণের উদ্দেশ্য অথবা ক্ষমতা আফগান ন্যাশনাল আর্মি ও যুক্তরাষ্ট্র— কারোরই ছিল না। একজন সাবেক প্রাদেশিক গভর্নরকে গুম ও ধর্ষণের নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে ২০১৭ সালের গ্রীষ্মে সাময়িকভাবে দোস্তম দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল।[১২] এর আগপর্যন্ত বিচারের ঊর্ধ্বে থাকার কারণে বছরের পর বছর তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে জেনারেল দোস্তম পশতুন বেসামরিক লোকজনকে হত্যা করেছে।

৯/১১-র পর রাজধানী কাবুলের অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে মার্কিনদের প্রথম পছন্দ ছিল আব্দুল হক। কিন্তু তালেবানের সঙ্গে লড়াইয়ে আব্দুল হক যুদ্ধক্ষেত্রের

গভীরে চলে যায়। যুদ্ধের পরিস্থিতি খারাপ দিকে মোড় নিলে সে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তালেবানের হাতে আটক হওয়ার পর তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হয়। তাই ২০০১ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিনের সিআইএ এজেন্ট, অধুনা রক্ষণশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জালমে খালিলজাদের অনুগত এবং প্রবাসী তেল কোম্পানির লবিস্ট হামিদ কারজাইকে অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়।[১৩] কারজাই শপথ অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেছিলেন যে দেশব্যাপী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সে নামমাত্র রাষ্ট্রপতি পদে থাকবে এবং আগামী কোনো নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করবে না। কিন্তু ২০০৪ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কারজাই সেটাতে অংশ নেয় এবং জয়লাভও করে। বাস্তবে এই নির্বাচন ছিল আমেরিকা এবং কারজাইয়ের গুন্ডাদের ব্যাপক জালিয়াতি ও জবরদস্তিমূলক প্রহসনের নির্বাচন।[১৪] বিবিসির রিপোর্টে বলা হয়, গ্রামবাসীকে পেটানো হচ্ছিল আর বলা হচ্ছিল, 'কারজাইকে ভোট দাও, নয়তো তোমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবো।'[১৫] এত কিছুর পরও কারজাইয়ের রাষ্ট্রপতিত্ব অচিরেই একটি কৌতুকে পরিণত হয়। কারণ কারজাই 'কাবুলের মেয়র' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[১৬] নবগঠিত 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র আফগানিস্তান'-এর বাকি অংশের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না বললেই চলে।[১৭]

আফগানিস্তানে পশতুনরাই (বা পাঠান) সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ।[১৮] যদিও পূর্বে ধারণা করা হতো যে পশতুনরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ। অন্যদের মধ্যে তাজিক, হাজারা, উজবেক, তুরক প্রভৃতি নৃগোষ্ঠী অন্যতম। প্রতিটি নৃগোষ্ঠীই ভৌগোলিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে বাস করে। আবার ব্রিটিশদের আঁকা ডুরান্ড লাইন প্রতিবেশী পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানের পূর্ব ও দক্ষিণের সংখ্যাগরিষ্ঠ পশতুনদের আলাদা করে রেখেছে।[১৯] আফগানিস্তানের উত্তরে কুন্দুজ অঞ্চলেও কিছু পশতুন জনগোষ্ঠী রয়েছে। বহু বছর ধরে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে এবং এরপরের গৃহযুদ্ধে এই নৃগোষ্ঠী বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানে নিহত কান্দাহার প্রদেশের একজন প্রভাবশালী গোত্রনেতার পুত্র কারজাই ছিলেন পোপালজাই গোত্রভুক্ত পশতুন।[২০] তারপরও নতুন সরকারে পশতুনদের প্রতিনিধিত্ব যে কমই থাকবে, সেটা পর্যবেক্ষকেরাও আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুরুতেই সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠী জোটের পক্ষ নেয় এবং আফগান ন্যাশনাল আর্মির অধিকাংশ অফিসার পদে তাজিকদের নিয়োগ দেয়।[২১] ২০০৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তান আন্তঃসংস্থা অপারেশন টিমের একজন পর্যবেক্ষক ক্রিস ম্যাসন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আফগান

সেনাবাহিনীতে নিয়োগে কোটা পদ্ধতি চালু করতে চেয়েছিল। কিন্তু, আফগান পশতুনদের ওপর আফগান ন্যাশনাল আর্মির নিপীড়নের ক্ষোভ থেকে তারা সেনাবাহিনীতে যোগদানের অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।[২২]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে আফগান ন্যাশনাল পুলিশের পশতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভাগ তৈরির প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু দিনশেষে এটিও সেসব লোকজনেরই ক্ষমতায় বসিয়েছে, যাদের নিজেদেরই জেলে থাকার কথা ছিল। আগ্রাসনের শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন অপরাধীদের পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছিল। এই বিষয়টিও সাধারণ জনগণকে বিদ্রোহী করে তোলার অন্যতম কারণ।[২৩]

আমেরিকা-জাতিসংঘ-ন্যাটো-এনজিও জোটের আফগানিস্তান আগ্রাসনে ও জাতিরাষ্ট্র নির্মাণ পরিকল্পনার প্রথম প্রতিজ্ঞাই ছিল কাবুলে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা। পশ্চিমারা সর্বজনীনভাবে নিজেদের দেশে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতী। কিন্তু আফগানিস্তানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ পশতুন জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে কাবুল সরকার গঠনে মনোযোগী হয়। অথচ এ রকম একটা সরকার নিয়োগের অর্থ ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে সহিংসতাকে আরও উসকে দেয়।

‘তালেবানের মতো স্বৈরাচারী ও ধর্মীয় নির্বোধরা আফগান জনগণের কাছে অজ্ঞতা ও মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্রতীক এবং নিকৃষ্টতম’ এই ধারণা মার্কিন প্রশাসন ও জনগণের মানসে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এ জন্যই মার্কিনরা মনে করে, ‘আমাদের সরকার সেখানে যা-ই করুক না কেন, সেটা নিশ্চয়ই ভালোর জন্য করছে! তালেবানদের পক্ষে কে কথা বলবে?’ শেষোক্ত প্রশ্নের জবাব হলো, অগণিত আফগান সোভিয়েত প্রত্যাহারের পর ক্ষমতার জন্য লড়াইরত যুদ্ধবাজদের অত্যাচার ও দুর্নীতি থেকে রেহাই পেতে তালেবান শাসনকেই স্বাগত জানিয়েছিল। সোভিয়েত জিহাদের পর অরাজক পরিস্থিতির সুযোগে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বিভিন্ন গুন্ডাবাহিনী ও মিলিশিয়াদের সামনে সাধারণ জনগণ অসহায় হয়ে পড়েছিল। এটাই ধর্মীয় নেতাদের বাধ্য করেছিল কিছু একটা করতে।[২৪] ১৯৯০-এর মাঝামাঝি সময়ে বাচ্চা ছেলেমেয়ে ও মহিলাদের গুম ও ধর্ষণ থেকে রক্ষা করতে এবং গুন্ডাদের অনাচার থামাতে তালেবানের অভ্যুদয় হয়েছিল।[২৫] তালেবান কান্দাহারের সাধারণ জনগণের প্রত্যক্ষ সমর্থন পেয়েই তৈরি হয়েছিল। তালেবান সদস্যদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল পাকিস্তানি শরণার্থী শিবিরে বড় হওয়া আফগান যুবক। সোভিয়েতবিরোধী

লড়াইয়ে অংশ নেওয়া মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর ও অন্যান্য প্রবীণ পশতুন যোদ্ধারা তাদেরকে একত্র করে বিভিন্ন অপরাধীচক্র ও চলমান গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। পরবর্তী সময়ে তারা পাকিস্তান ও সৌদির সমর্থন পায়। তালেবানরা চরমপন্থি ও কঠোর হলেও দুর্নীতিবাজ ছিল না। পশতুন ছাড়াও অধিকাংশ আফগানই নৃগোষ্ঠী তালেবানের এই কঠোর শাসনকে সোভিয়েত যুদ্ধ-পরবর্তী যুদ্ধবাজ, যেমন: মাসুদ, দোস্তম, জেনারেল মুহাম্মদ ফাহিম, গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ারসহ অন্যদের শাসনের তুলনায় শান্তিপূর্ণ মনে করত। তালেবান সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল এবং অধিকাংশ সংঘবদ্ধ অপরাধীদের উচ্ছেদ করেছিল। তারা যুদ্ধরত বিভিন্ন মিলিশিয়াদের নিরস্ত্র করে এবং গুরুতর অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। তবে পশ্চিমের দৃষ্টিতে তাদের সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশ এবং বৈধ ছিল না। পশ্চিমাদের মতে, তালেবান জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করেছে এবং তালেবানের নির্দয় শাসনে বহু লোক জুলুমের শিকার হয়েছে। এই অভিযোগ রাজধানী কাবুল ও উত্তরাঞ্চলের ক্ষেত্রে আংশিক হলেও সত্য। তালেবানের কঠোর ও স্বৈরাচারী শাসনকে পশতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার মতো কাবুল ও উত্তরাঞ্চলের লোকজন স্বাগত জানায়নি। তবে মাসুদ বাহিনীর নৃশংস মিলিশিয়া গুন্ডাদের তাড়ানোর কারণে কাবুলের মতো বহুজাতিক ও তুলনামূলক মিশ্র সমাজও শুরুর দিকে তালেবানকে স্বাগত জানিয়েছিল।[২৬] আনন্দ গোপালের ভাষ্যে, 'তালেবান কখনোই কোনো অচেনা-অজানা গোষ্ঠী ছিল না। তারা ততটাই আফগান, যতটা কাবাব কিংবা হিন্দুকুশ। মার্কিন সৈন্যরা এটা নির্মমভাবে টের পেয়েছিল।'[২৭]

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তালেবান শাসনামল ও ২০০৪ সালে পুনর্জাগরণের পর থেকে তালেবানের বিরুদ্ধে কর্তৃত্বমূলক আচরণের অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আফগান জনসাধারণ মার্কিন মদদপুষ্ট ও দুর্নীতিগ্রস্ত গুন্ডাদের চেয়ে তালেবানকেই বেশি পছন্দ করে।[২৮] দেশের একমাত্র জনপ্রিয় শাসকদল পশতুন তালেবানকে ক্ষমতাচ্যুত করে মার্কিনরা সত্যিকারার্থে একদল গুন্ডাবাহিনী ও অপরাধীদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল। শাসনকাজে তাদের সামর্থ্য কিংবা জনসাধারণের মাঝে জনপ্রিয়তা, কোনোটাই ছিল না। সুস্পষ্ট ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক বিভাজন ছাড়াও উপজাতীয়, গোত্রীয় এবং পারিবারিক বিভক্তির কারণে আফগানিস্তান বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত।[২৯] তাই অনেকের কাছে রাজনৈতিক বা সামরিক শক্তি বলতে শুধু তালেবান কিংবা তাদের যুদ্ধংদেহি মিত্র হক্কানি নেটওয়ার্কের নাম উচ্চারিত হয়।[৩০] সেনাবাহিনীর সহায়তায় আমেরিকা কাবুলে যে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সেটা কস্মিনকালেও সমগ্র

আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে না। গোত্রীয় ও ধর্মীয় শক্তির বিপরীতে মার্কিন ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অধুনা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ফলপ্রসূ হবে না।[৩১] এমতাবস্থায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও স্থানীয় আফগান জনগণের ভাগ্যে তালেবান কিংবা গুন্ডাদের মাঝে আটকে থাকা ছাড়া বিকল্প দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে তাজিক, উজবেক, হাজারা ও অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং গোত্রগুলোর মাঝে নানাবিধ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। সাধারণ শত্রু তালেবানের কারণেই তারা আজ জোটবদ্ধ। সোভিয়েত-পরবর্তী আফগান গৃহযুদ্ধে যুদ্ধবাজদের ধোঁকাবাজি ও বারবার দলবদলের ইতিহাস বিবেচনায় বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতি সরকার গঠনকারী এই দলগুলো পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে কাবুলের 'জাতীয় জোট সরকার'-এর পতন ঘটাবে। পরবর্তী সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন করে গৃহযুদ্ধ শুরু হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কতিপয় ওয়াশিংটনের বিশেষজ্ঞদের মতে, এই কারণেই মার্কিন সেনাদের আফগানিস্তান ত্যাগ করা উচিত হবে না। সেনাবাহিনী প্রত্যাহার নতুন সহিংসতার জন্ম দেবে। এ জন্য আফগানরা যত দিন না নিজেদের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ না করে, তত দিন পর্যন্ত আমেরিকার উচিত আফগানিস্তানে অবস্থান করে লড়াই চালিয়ে যাওয়া![৩২] তবে এযাবৎ পর্যন্ত আফগানিস্তানে বিভিন্ন মার্কিন নীতি সব পক্ষের মধ্যকার সম্পর্ককে আরও তিক্ত করেছে। তাই আজ কিংবা বহু বছর পরও যদি মার্কিনরা যখন সেনা প্রত্যাহার করে, কোনো ফলাফলই খুব বেশি ভিন্ন হবে না।

আফগানিস্তান দখলের চেষ্টা পূর্বেও যেমন আত্মবিধ্বংসী পদক্ষেপ ছিল, এখনো তা-ই রয়েছে। যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, ৯/১১-এর পর আফগানিস্তানে হামলা এবং তালেবানকে ক্ষমতাচ্যুত করা যথার্থ ছিল। তারপরও এটা স্পষ্ট যে স্থিতিশীল রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে বিকল্প খুঁজে বের করার দায়িত্ব আফগান জনগণেরই হাতেই ন্যস্ত করাই ছিল বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কিন্তু এটা না করে যুক্তরাষ্ট্র সর্বত্র হস্তক্ষেপ করেছে। মেকি ও অপ্রতুল তথ্যের ভিত্তিতে বিজয়ী-বিজিত নির্ধারণ করেছে। গুরুতর অপরাধীদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা করে দ্বন্দ্বের বীজ বপন করেছে। গুন্ডা ও হেরোইন সম্রাটদের সহায়তা করেছে। জোসেফ হেলারের ক্যাচ-22-এর মতো করে তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জ্বালানি, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্য দেশব্যাপী পরিবহন করতে তালেবানকেই লাখ লাখ ডলার নিরাপত্তা কর দিতে হয়েছে।

মার্কিন মদদপুষ্ট আফগান ন্যাশনাল আর্মির দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের থেকে অস্ত্র কিনতে তালেবান পুনরায় সেই টাকাই ব্যয় করেছে। চূড়ান্তভাবে সেই ক্রয়কৃত অস্ত্র দখলদারদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হয়েছে।[৩৩]

অর্ধপৃথিবী দূরে 'সাম্রাজ্যবাদের গোরস্তান' হিসেবে বিখ্যাত একটা দেশ, যার কলোরাডোর মতো পাহাড় এবং ক্যালিফোর্নিয়ার মতো মরুভূমি রয়েছে, যা ইউরেশিয়ার কেন্দ্রে স্থলবেষ্টিত, মেসিডোনিয়া, ব্রিটিশ কিংবা সোভিয়েতের সামরিক আগ্রাসন যার লড়াকু জাতিকে বশ করতে পারেনি, সেই আফগানিস্তানে নিজ হাতে আরেকটি 'ভিয়েতনাম' সৃষ্টি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের বিপদ ডেকে এনেছে। এই যুদ্ধে ভিয়েতনামের চেয়ে সফল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের প্রতিপক্ষরা এখনই আমেরিকার এই উদ্দেশ্যহীন আত্মঘাতী কার্যক্রম দেখে বিদ্রুপের হাসি হাসছে।[৩৪] সেনাবাহিনী হয়তো এই আপাত স্থবিরতা স্বল্প মেয়াদে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ১৮তম বারের মতো জেনারেল পরিবর্তন খুব বেশি পরিবর্তন নিয়ে আসবে না।[৩৫] মার্কিন সামরিক বাহিনী একটি ভয়াবহ অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পড়েছে। তারা না পারছে বিজয় ঘোষণা করতে, আবার না পারছে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে। আফগানিস্তানে থেকে যাওয়ার জন্য ওয়াশিংটন ডিসি ও পেন্টাগনের কূটনৈতিক চাপ বিদ্যমান রয়েছে। তবু দিনশেষে আমাদের যুদ্ধ সমাপ্তির ঘোষণা নিঃসন্দেহে মার্কিন জনগণের জন্যই কল্যাণকর হবে।[৩৬] মানবিক কিংবা কূটনৈতিক দিক বিবেচনায় আমরা অবশ্যই তালেবানের উত্থান চাই না। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার জনগণকে ভবিষ্যৎ হামলা থেকে রক্ষার্থে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন। কারণ, পশতুন জনগণকে বশে আনা কিংবা কাবুলের সরকার ও তাদের বৈদেশিক মিত্রদের প্রতি পশতুনদের অনুগত করার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১. Alexander Lyakhovsky, The Tragedy and Valor of Afghan (Moscow: GPI Iskon, 1995), 109-112. Excerpt available at the National Security Archive; Eric Margolis, email message to the author, October 24, 2016.

২. Woodward, Bush at War, 190, 276.

৩. Van Linschoten and Kuehn, An Enemy We Created, 206.

৪. Margolis, War at the Top of the World, 53-55.

৫. Alan Cullison and Andrew Higgins, “Forgotten Computer Reveals Thinking Behind Four Years of al Qaeda Doings,” Wall Street Journal, December 31, 2001.

৬. “Massood Murder Plotters Convicted,” BBC News, May 17, 2005.

৭. Mark Oliver, “The New Afghan Administration,” Guardian, December 5, 2001; “Who Are the Northern Alliance?,” BBC News, November 13, 2001.

৮. Aldous Huxley, Ends and Means: An Inquiry into the Nature of Ideals and into the Methods Employed for Their Realization (New York: Harper Brothers, 1937), 10.

৯. Patrick Cockburn, “Rashid Dostum: The Treacherous General,” Independent, November 30, 2001.

১০. “State Department FOIA Release to Physicians for Human Rights Regarding Dasht-e-Leili Massacre,’” Wikileaks.

১১. “Afghanistan: Forces Linked to Vice President Terrorize Villagers,” Human Rights Watch, July 31, 2016.

১২. Sune Engel Rasmussen, “Vice-President Leaves Afghanistan Amid Torture and Rape Claims,” Guardian, May 19, 2017.

১৩. Margolis, American Raj, 207; Berntsen and Pezzullo, Jawbreaker, 81.

১৪. Paul Watson, “US Hand Seen in Afghan Election,” Los Angeles Times, September 23, 2004.

১৫. Crispin Thorold, “Vote Threat to Afghan Tribesmen,” BBC News, September 24, 2004.

১৬. Henry Schuster, “Kabul Comes Undone,” CNN, June 1, 2006.

১৭. Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan, ratified January 26, 2004.

১৮. US State Department, “Afghanistan,” Country Studies; Nancy Hopkins, ed., “Afghanistan in 2012: A Survey of the Afghan People,” Asia Foundation.

১৯. Zaman Stanizai, “From Identity Crisis to Identity in Crisis in Afghanistan,” Pacifica Graduate Institute, December 16, 2009.

২০. “Abdul Ahad Karzai, 77, Afghan Official, Dies,” Washington Post, July 25, 1999.

২১. Heidi Vogt, "Ethnic Divisions Plague Afghan Army," NBC News, July 28, 2010.

২২. Gareth Porter, "Tajik Grip on Afghan Army Signals New Ethnic War," Inter Press Service, November 28, 2009.

২৩. Danny Singh, "The Afghan National Police: A Study on Corruption and Clientelism," Security Sector Reform Resource Center, November 3, 2015; Gareth Porter, "Afghanistan: Child Rapist Police Return Behind US, UK Troops," Inter Press Service, July 29, 2009.

২৪. Gopal, No Good Men Among the Living, 79-82.

২৫. Margolis, American Raj, 197; Rashid, Taliban, 25; van Linschoten and Kuehn, An Enemy We Created, 114-115.

২৬. Rashid, Taliban, 49-51.

২৭. Gopal, No Good Men, 82.

২৮. Bob Woodward, Obama's Wars (New York: Simon & Schuster, 2010), 243.

২৯. Isaac Kfir, "The Role of the Pashtuns in Understanding the Afghan Crisis," Perspectives on Terrorism, Vol 3, No 4 (2009).

৩০. Gopal, No Good Men, 118-131; Gareth Porter, "Afghanistan: Child Rapist Police Return Behind US, UK Troops," Inter Press Service, July 29, 2009.

৩১. Matthieu Aikins and Anand Gopal, "The Ghost Polls of Afghanistan," Harper's, April 7, 2014; Gopal, No Good Men, 151-168.

৩২. Christopher D. Kolenda, "Focused Engagement: A New Way Forward in Afghanistan," Center for a New American Security, February 21, 2017; "Afghan Government Could Collapse After NATO Pullout, Report Warns," Telegraph, October 8, 2012; Ryan Browne, "Top US General: 'Shortfall of a Few Thousand' Troops in Afghanistan," CNN, February 9, 2017.

৩৩. Gopal, No Good Men, 206; The Wikileaks Files, [Reference ID AFG20071109n1067]; C. J. Chivers, "Arms Sent by US May Be Falling into Taliban Hands," New York Times, May 19, 2009.

৩৪. Osama bin Laden, "Full Transcript of bin Laden's Speech," AlJazeera, November 1, 2004.

৩৫. List of ISAF-Resolute Support Commanders, NATO; Tom Bowman, "Next Afghan War Commander to Re-Evaluate US Response," NPR News, January 28, 2016.

৩৬. "CNN Poll: Afghanistan War Arguably Most Unpopular in US History," CNN Political Unit, December 30, 2013; Frank Newport, "More Americans Now View Afghanistan War as a Mistake," Gallup, February 19, 2014.

তৃতীয় অধ্যায়

বিস্তীর্ণ লড়াই

আমাদের সম্মুখে একটি দীর্ঘ লড়াই অপেক্ষা করছে।

— জেনারেল জন আবিজাইদ, জুলাই ২০০৪

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্থানের পর আফগান জনগণের পাশে না দাঁড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভুল করেছে, পুনরায় সে ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না। এবার মার্কিন মিত্রদের দীর্ঘ সময়ের জন্য পাশে পাওয়ার ব্যাপারে আফগানরা নিশ্চিত থাকতে পারে।

— সেক্রেটারি অব স্টেট কন্ডোলিৎসা রাইস, মার্চ ২০০৫

সাম্রাজ্যবাদ

এই যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল? উত্তরটি হলো, কখনোই আফগান জনগণ নয়। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইউরেশিয়া অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন। আফগানিস্তানে আগ্রাসনের সূচনালগ্ন থেকেই এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতিয়ার ছিল অপরাজনীতি। উডওয়ার্ড লেখেন, 'আফগানিস্তান যেন আবারও পরাশক্তিগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত না হয়, সেখানে যাতে অন্য কেউ প্রভাব বিস্তার করতে না পারে— সে জন্য পররাষ্ট্র বিভাগ এবং পররাষ্ট্রসচিব কলিন পাওয়েল আফগানিস্তানে মার্কিন মদদপুষ্ট শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল।'[১] ওয়াশিংটন সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে আফগানিস্তান ত্যাগ করার চিন্তা করাও অবান্তর একটি বিষয়।

ওয়াশিংটন ডিসি, বিভিন্ন থিংক ট্যাংক এবং মার্কিন জনগণের মাঝে একটি প্রচলিত ধারণা হলো, আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত প্রত্যাহারের পর আমেরিকার সরে আসা ৯/১১ হামলার অন্যতম কারণ। তাদের মতে, আফগানিস্তান ছেড়ে আসা ছিল একটি মারাত্মক ভুল। বরং যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ছিল আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এর পুনর্নির্মাণ করা, আধুনিক ও পশ্চিম ইউরোপীয় ঘরানার উদারবাদী ও গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র গড়ে দেওয়া। এমনটা করলে আফগানিস্তান হতো আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র। আমাদেরও তখন ৯/১১-র সম্মুখীন হতে হতো না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের অবহেলার কারণেই আফগানিস্তানে অগণিত সমস্যা তৈরি হয়েছে। অতএব, পুনরায় একই ভুল করা যাবে না।[২]

কিন্তু বাস্তবতা হলো, আশির দশকের গোপন অভিযান শেষে মার্কিনরা আফগানিস্তান থেকে কখনোই সরে আসেনি। সে সময় মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ান অববাহিকার তেল ও গ্যাস পাইপলাইনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলোর মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। পাকিস্তানি সাংবাদিক আহমেদ রশিদ ১৯৯৭ সালে একে 'দ্য নিউ গ্রেট গেইম' নামকরণ

করেছিলেন। আহমেদ রশিদের তথ্য মোতাবেক, নব্বইয়ের দশকে পাকিস্তান ও সৌদি আরবের সহায়তায় তালেবানের উত্থানে ক্লিনটন প্রশাসনেরও সমর্থন ছিল। এই খেলার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের করাচি বন্দর পর্যন্ত তেল পাইপলাইন স্থাপন করার পরিকল্পনা করে। এ জন্য তারা কেবল তালেবানকে সমর্থন করেই থেমে থাকেনি। পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বিরুদ্ধে তালেবানের লড়াইয়ে সহায়তাও করেছিল তারা। গৃহযুদ্ধের শেষ দিকে আপস-মীমাংসা ও ক্ষমতা ভাগাভাগির বদলে সমগ্র আফগানিস্তানজুড়ে তালেবানের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতেও তাদের ভূমিকার কথা প্রচলিত রয়েছে। ১৯৯৫ সালে তালেবান আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের হেরাত শহর দখলে নিলে মার্কিন কর্মকর্তারা বেশ খুশিই হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে রাজধানী কাবুলের পতনের পর একজন মার্কিন কূটনীতিক সাংবাদিক আহমেদ রশিদের কাছে মন্তব্য করেছিল যে, তালেবান সমগ্র আফগানিস্তানের দখল নিলে সেটা আরও চমৎকার একটি বিষয় হবে। উচ্চপদস্থ একজন কূটনীতিকের অভিমত ছিল, ‘সৌদিদের মতো তালেবানও উন্নতি করবে। আফগানিস্তানেও শিগগিরই আরামকো, পাইপলাইন, একজন আমির আর গুটিকয়েক শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন হবে।’ যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র পাকিস্তান ও সৌদি আরবের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় মার্কিনরাও সে সময় তালেবানকে সহায়তা দিতে কার্পণ্য করেনি।[৩]

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ স্ফিগনিফ ব্রজেন্সকি মার্কিন ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী হ্যালফোর্ড ম্যাকাইন্ডারের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ব্রজেন্সকি মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাধর নৌবাহিনীর উচিত ‘বিশ্ব-দ্বীপের’ ‘মূল ভূমি (Heartland)’ পূর্ব ইউরোপে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। অন্যথায়, রাশিয়া স্বাভাবিকভাবেই এর দখল নেবে। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত ‘দ্য গ্র্যান্ড চেসবোর্ড: আমেরিকান প্রাইমেসি অ্যান্ড ইটস জিও স্ট্র্যাটেজিক ইম্পারেটিভস’ বইয়ে ব্রজেন্সকি আধুনিক ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে ম্যাকাইন্ডারের তত্ত্ব তুলে ধরেন। ম্যাকাইন্ডারের মতে, ‘পূর্ব ইউরোপ’, যার নিয়ন্ত্রণে, ‘মূল-ভূমি’ তার নিয়ন্ত্রণে। ‘মূল-ভূমি’ যার নিয়ন্ত্রণে, ‘বিশ্ব-দ্বীপ’ তার নিয়ন্ত্রণে। ‘বিশ্ব-দ্বীপ’ যার নিয়ন্ত্রণে, ‘সমগ্র বিশ্ব’ই তার নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু, মূল ভূমিকে নিয়ন্ত্রণ করার পূর্বশর্ত হলো আফগানিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার ‘অপরিহার্য ভূমি’কে দখলে রাখা। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে অভূতপূর্ব এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে মাঠে নামে। দ্রুতই আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি বৈশ্বিক রূপ লাভ করে। তাই সমগ্র পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ইউরেশিয়া

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভূ-রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ময়দান ইউরেশিয়াতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীর উত্থান হওয়ার আশঙ্কাও ছিল। এ জন্যই বলা হতো, ভূ-রাজনীতিতে নিজেদের দীর্ঘকালীন স্বার্থ রক্ষার্থে ইউরেশিয়ান ভূখণ্ড ত্যাগ করার পূর্বে পরাশক্তিগুলোর ওপর নজরদারি এবং আঞ্চলিক রাজনীতির যথাযথ বিশ্লেষণকে মার্কিন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে।

প্রাচীন বর্বর সাম্রাজ্যগুলোর ইতিহাস ঘাঁটলে সাম্রাজ্যবাদী ভূ-রাজনীতির তিনটি প্রধান ধারা পাওয়া যায়। সেগুলো হচ্ছে—

১. অনুগতদের নিরাপত্তা শঙ্কায় রাখা ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধা দেওয়া,

২. করদ রাজ্যকে বশীভূত রাখা এবং

৩. বিদেশি শত্রুদের একতাবদ্ধ হতে না দেওয়া।

অন্যভাবে বলতে গেলে, আমাদের বিশ্বাস করে যেতে হবে যে গ্রহের অন্য প্রান্তের মানুষেরা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং যেকোনো মূল্যে তাদের প্রতিহত করতে হবে। পাশাপাশি পূর্ব ইউরোপে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনার যথার্থতা মেনে নিয়ে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে মধ্য এশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হলেই এই পরিকল্পনা সফল হবে। সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো নাবিক বা ভ্রষ্ট রাজনীতিবিদ হলে এগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়তো আমাদের জন্য সহজ হতো। দুঃখজনকভাবে আমাদের আইন প্রণেতারা এ সবকিছু আমাদের সবার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।[৪]

ক্লিনটনের সময়ে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এনার্জি এক্সপার্ট শিলা হেসলিন জানান, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাস্পিয়ান অঞ্চলের তেলের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে চাইছিল। একই সঙ্গে ওই অঞ্চল থেকে তেল পরিবহনে রাশিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্যকে খর্ব করাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পশ্চিমে জ্বালানির সরবরাহ বন্দোবস্ত করে জ্বালানির সুরক্ষা নিশ্চিত করাই ছিল চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ জন্য তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর স্বাধীনতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উৎসাহের কমতি ছিল না।'[৫] কিন্তু, নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে তেলের দরপতন ও আফ্রিকান দূতাবাসে আল-কায়েদার হামলার প্রতিশোধ হিসেবে আফগান প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ক্যালিফোর্নিয়ার কোম্পানি ইউনোক্যাল তাদের পাইপলাইনের আশা ত্যাগ করে।[৬] তারপরও সিনিয়র বুশ প্রশাসন আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে সহায়তা করছিল।[৭] ইরানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং চীন ও সাবেক সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তালেবানকে

সম্ভাব্য মিত্র ভাবা হচ্ছিল সে সময়।[৮] শেষ পর্যন্ত বর্তমান দখলদার শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পাইপলাইন নির্মাণ করতে সক্ষম হবে কি না, সেটা নিশ্চিত নয়। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে সোভিয়েত আগ্রাসন আর মার্কিন আগ্রাসনের মাঝের সময়টাতে আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের উদাসীন থাকার অভিযোগ একটি ভয়ংকর মিথ্যাচার।

বিল ক্লিনটনের সময়কালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করেছে। সেই হস্তক্ষেপ আফগান জনগণকে তালেবানের হাত থেকে রক্ষার জন্য ছিল না। বরং সেই হস্তক্ষেপ ছিল তালেবানের উত্থানে সৌদি ও পাকিস্তানি মিত্রদের সহায়তার জন্য। কারণ এটাই তখন মার্কিন স্বার্থের অনুকূলে ছিল। বর্তমানে আফগানিস্তানের দখল মার্কিন পরাশক্তির হাতে। সেখানে সার্বক্ষণিক উপস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী কুৎসিত অবয়বকে সবার সামনে উন্মোচন করে রেখেছে। এত কিছুর পরও আফগানিস্তানের খনিজ সম্পদ ও বাণিজ্যিক পথের ওপর অন্যান্য পরাশক্তির হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কঠিনই রয়ে গেছে।

২০০৯-২০১২ সালে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের কার্যকারিতা নিয়ে জনগণের মাঝে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল। তখন মার্কিন সেনাবাহিনীর জেনারেল ডেভিড পেট্রিয়াস দখলদারি চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে খনিজ সম্পদের অজুহাত দেন। ২০১০ সালে নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, আফগানিস্তানে প্রায় ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যমানের খনিজ সম্পদ রয়েছে। পেট্রিয়াস জানান, ‘পেন্টাগনের কর্মকর্তা ও মার্কিন ভূতাত্ত্বিকগণ প্রচুর পরিমাণে লোহা, তামা, কোবাল্ট, সোনা এবং লিথিয়ামের মতো বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর সন্ধান পেয়েছেন। সেখানে অপার সম্ভাবনা বিদ্যমান। অবশ্যই সেখানে অনেক ‘যদি’ ‘কিন্তু’ আছে। তবে এটা খুবই সম্ভাবনাময়। আমাদের পক্ষে এখনই সেনা প্রত্যাহার করা অনুচিত। যদি এমনটা করা হয়, তবে চীনা ব্যবসায়ীরা মূলধন নিয়ে হাজির হবে। আমাদের পরিবর্তে তারাই এই সম্পদ আহরণ শুরু করবে। এমনটা হলে খুবই ভয়াবহ একটি ব্যাপার হবে।’[৯]

আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৯/১১ পরবর্তী অভিযান ২০০৪ সাল নাগাদ মার্কিন-ইউরোপীয় ন্যাটো সামরিক জোটের জন্য একটি দল বাছাইয়ের অনুশীলনে পরিণত হয়েছিল।[১০] ১৯৯৯ সালে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর এটিই ছিল ন্যাটোর প্রথম বৃহত্তর প্রকল্প এবং অনেকের মতে, ‘জোটের একাগ্রতার পরীক্ষা’।[১১] আফগানিস্তানের সামরিক মিশনকে ন্যাটোর অধীনে পরিচালনার

জন্য ২০০৩ সালে ন্যাটোর সর্বাধিনায়ক মেরিন কোর জেনারেল জিম জোনস ও ন্যাটোর সঙ্গে জড়িত পেন্টাগনের কর্মকর্তারা সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ডকে সুপারিশ করেন। আফগানিস্তানে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার বিরুদ্ধে কিছু একটা করার চাপে তিনি ন্যাটোর ওপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং ইউরোপীয় সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন।[১২] সাংবাদিক গ্যারেথ পোর্টারের মতে, জোনস তার দাবি-দাওয়া নিয়ে যথেষ্ট স্পষ্টভাষী ছিলেন।[১৩] জেনারেল জোনস আমেরিকান ফোর্সেস প্রেস সার্ভিসকে বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ জোটের ভাঙনের পর 'ন্যাটো কিছুটা বেকায়দায় ছিল'। কিন্তু, ৯/১১-এর হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো মিত্রদের জন্য কূটনীতি এবং জোটবদ্ধ হওয়ার জন্য নতুন বিষয় পাওয়া যায়।[১৪] পরবর্তী সময়ে জেনারেল কার্ল এইকেনবেরিও কংগ্রেসকে জানান, 'আফগানিস্তানে আগ্রাসনের ব্যাপারে দীর্ঘদিন যাবৎ এ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে এটা ন্যাটোকে টিকিয়ে রাখারই লড়াই।'[১৫] গবেষক আস্ত্রি সুর্খ এখানে একটি ভয়ংকর 'বাগাড়ম্বর ফাঁদ' খুঁজে পান। কারণ দাবি করা হচ্ছিল যে, আফগানিস্তানে বিজয়ের ওপরই ন্যাটো জোটের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। 'আমরা যদি এখানে সফল না হই, তাহলে ন্যাটো এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে পতিত হবে।'[১৬] জেনারেল জোনসের এই দাবি একটি অসম্ভব ও আশাতীত কাজকে অনিবার্য করে তোলে। যদিও এই দাবির পেছনের যুক্তি কখনোই বলা হয়নি।

ন্যাটো মূলত পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার প্রতিরক্ষা জোট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হয়ে আফগানিস্তানে জাতিরাষ্ট্র নির্মাণকাজের অংশ হওয়ার মাধ্যমে এর অস্তিত্ব ঝুঁকির সম্মুখীন। যাহোক, ন্যাটোর অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। আফগানিস্তানে ন্যাটোর ব্যর্থতার পরও জোটের সদস্যসংখ্যা বেড়েছে এবং পূর্ব ইউরোপে মার্কিন দখলদারি আগের মতোই চলছে। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের এই সামরিক মিত্রতার কূটনীতির উদ্দেশ্যই ছিল, আফগানিস্তানের জনগণের প্রতিরোধ সত্ত্বেও তাদের 'সাহায্য করা'(?)। এত মেঘের আড়ালে যদি কোনো সূর্য থেকে থাকে, তবে সেটা হলো কতক ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ ও সমরবিদ। তারা আফগানিস্তানে তাদের বাহিনীর সর্বশক্তি নিয়োগকে বাতিল করেন। সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হওয়ার পেছনে এটিও একটি কারণ।[১৭] তবে এর একটি ব্যতিক্রম ছিল দক্ষিণাঞ্চলের হেলমান্দ প্রদেশে তালেবানের বিরুদ্ধে ব্যর্থ ব্রিটিশ অভিযান। মার্কিন নৌ-সেনারা ব্রিটিশদের সাহায্যার্থে পৌঁছানোর আগে ২০০৫ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ৭ হাজার ব্রিটিশ সেনা তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াই করেও

সেখানে কোনো প্রকারের অগ্রগতি করতে পারেনি। মার্কিন সহায়তার পরও তাদের ঘাঁটি, রাজধানী লস্করগহ, সাংগীন শহর এবং যেসব গ্রাম বা উপত্যকায় তারা দখল করছিল, সেগুলো বাদ দিয়ে পুরো প্রদেশের আর কোনো অংশই এই সম্মিলিত বাহিনী নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি।[১৮]

যাহোক, যৌক্তিকতা খুঁজতে গিয়ে সামরিক ঘাঁটিগুলো বিভিন্ন প্রকল্পে পরিণত হয়। ১৯৭০ সালে একটি সিনেট বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির প্রতিবেদনে এমনটাই বলা হয়েছে: 'ভিনদেশে কোথাও মার্কিন ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হলে তা নিজ থেকেই জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রাথমিক অভিযানের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে নতুন অভিযান প্রস্তুত করা হয়। ঘাঁটিকে সচল রাখতেই নয়, বরং এর উদ্দেশ্য থাকে লড়াইকে আরও সম্প্রসারিত করা। বৈদেশিক ঘাঁটির সংখ্যা হ্রাস করা বা বন্ধ করার বিষয়ে সরাসরি জড়িত পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিভাগের নির্দেশনা আমরা খুবই কম পেয়েছি।'[১৯]

স্নায়ুযুদ্ধের সাবেক বিশ্লেষক এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কট্টর সমালোচক চালমার্স জনসনের বিশ্লেষণ মোতাবেক, 'এই দীর্ঘদিনের ঘাঁটিগুলোর ওপর স্থানীয় জনগণের অধিকার চর্চা বা দখল নেওয়া প্রতিহত করতে পেন্টাগন কাজ করে। নিয়ন্ত্রণ হারানো কিংবা ফেলে আসা ঘাঁটির ওপর পুনর্নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যও পেন্টাগন কাজ করে। (উদাহরণস্বরূপ ফিলিপাইন, তাইওয়ান, গ্রিস ও স্পেনের মতো জায়গাগুলোতে)।'[২০] মার্কিন জনগণের কাছে বাগরাম বিমানঘাঁটির কোনো গুরুত্ব না থাকলেও সেনাদের কাছে এটি 'সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ' ছিল। তাই এটাকে তারা যেকোনো মূল্যে সচল রাখতে চায়।[২১] পাশাপাশি আঞ্চলিক প্রতিপক্ষ ইরান, রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে সামরিক প্রতিযোগিতা তো রয়েছেই। তাই সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়াও কঠিন। অন্যদিকে, এই সামরিক ঘাঁটিগুলোর উপস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উপরিউক্ত দেশগুলোর সংঘাত উসকে দিচ্ছে। শেষোক্ত দুই দেশের পারমাণবিক অস্ত্র শুধু ঘাঁটিগুলোতে কর্মরত কর্মকর্তাদের জীবন নয়, মার্কিন জনগণের জীবনকেও ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। এক্ষেত্রে সর্বশেষ এবং হয়তো সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো, সদা চলমান 'দ্য রিয়েল গ্রেইট গেইম' বা অস্ত্র বিক্রয় ও প্রতিরক্ষা বাজেটের নিয়ন্ত্রণ।

আমেরিকাকে আফগানিস্তানের প্রান্তরে টেনে আনতে বিন লাদেনের সৈন্যদের ৯/১১ হামলার পর খুব বেশি প্ররোচনা দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। তারপরও লকহিড, নর্থরুপ গ্রুম্যান, রেয়থিওন ও জেনারেল ডায়নামিকস প্রভৃতি অস্ত্র

নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ডলারের ব্রিফকেস নিয়ে হাজির হয়। তাদের হাত ধরেই নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনভিত্তিক বিভিন্ন চাপ প্রয়োগকারী সংস্থার আগমন ঘটে। এই কোম্পানিগুলো অস্ত্র বিক্রির মুনাফার একটা অংশ অনুদান হিসেবে থিংক ট্যাংক ও 'পররাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞদের' প্রতিষ্ঠানে পাঠায়। বিনিময়ে বিশেষজ্ঞরা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা দেখিয়ে অসংখ্য 'গবেষণা' করে। অস্ত্র নির্মাতাদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি কংগ্রেসকে তদবির করতে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করা হয়।[২২] এটা হচ্ছে সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা, অস্ত্র প্রস্তুতকারক, কংগ্রেসম্যান, তদবিরকারী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমন্বিত 'ডিপ স্টেট' বা 'আয়রন ট্রায়েঙ্গেল'। এরা এই পুরো প্রকল্পকে চলমান রেখেছে। এটাই সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা 'মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স', যেটা প্রেসিডেন্ট ডুয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার তৈরি করেছিলেন এবং পরবর্তীদের এই সম্পর্কে সতর্কও করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে এ দানবকে কেউ থামাতে পারেনি। সর্বোপরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক সরকারব্যবস্থা শিগগিরই জাতীয় নিরাপত্তা কূটনীতির মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হতে যাচ্ছে। জনগণের কথা ভাবা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকবে না, যেমনটা আইসেনহাওয়ার বলেছিলেন। জরুরি অবস্থার প্রয়োজনীয়তাই তাদের ক্ষমতায় থাকার চাবিকাঠি এবং তারা কখনোই ক্ষমতা ছাড়বে না। এসব কিছুর সঙ্গে আফগানিস্তানের জনগণকে সাহায্য করা কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোনো সম্পর্ক নেই। উপরন্তু, এই অস্ত্র অর্থনীতির রাজনীতি এমন হাজার হাজার স্বার্থ এবং উদ্দেশ্যের জন্ম দেয়, যেগুলো কূটনৈতিক অচলাবস্থাকেই আরও গুরুতর করে তোলে।

তথ্যসূত্র

১. Woodward, Bush at War, 321.

২. Astri Suhrke, When More is Less: The International Project in Afghanistan (Oxford: Oxford University Press, 2011), 20.

৩. Rashid, Taliban, 5-6, 168-180.

৪. Brzezinski, The Grand Chessboard, 38-40; David Gordon, "The Hegemonic Imperative," review of The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, by Zbigniew Brzezinski, Mises Review 4, No. 4 (Winter 1998).

৫. Sheila Heslin, Testimony before the US Senate, September 17, 1997, cited in Rashid, Taliban, 174.

৬. Rashid, Taliban, 175.

৭. Elise Labott, "US Gives $43 Million to Afghanistan," CNN, May 17, 2001.

৮. Margolis, American Raj, 202-203.

৯. James Risen, "US Identifies Vast Mineral Riches in Afghanistan," New York Times, June 13, 2010.

১০. Suhrke, When More is Less, 11.

১১. Paul Gallis, "NATO in Afghanistan: A Test of the Transatlantic Alliance," Defense Technical Information Center, August 22, 2006.

১২. David Rohde and David Sanger, "How a 'Good War' in Afghanistan Went Bad," New York Times, August 12, 2007.

১৩. Gareth Porter, "How Afghanistan Became a War for NATO."

১৪. Jim Garamone, "NATO, EUCOM Transforming for New Threats," American Forces Press Service, August 26, 2011.

১৫. Gareth Porter, "How Afghanistan Became a War for NATO."

১৬. Woodward, Obama's Wars, 127.

১৭. Craig S. Smith, "NATO Runs Short of Troops to Expand Afghan Peacekeeping," New York Times, September 18, 2004; C. J. Chivers, "Dutch Soldiers Stress Restraint in Afghanistan," New York Times, April 6, 2007.

১৮. Ann Scott Tyson, "British Troops, Taliban in a Tug of War over Afghan Province," Washington Post, March 30, 2008.

১৯. US Senate Subcommittee on Security Agreements and Commitments Abroad, Committee on Foreign Relations, December 21, 1970; cited by Chalmers Johnson in, Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy and the End of the Republic, (New York: Metropolitan), p. 151, cited in "US Military Bases and Empire," Monthly Review 53, no. 10 (March 2002).

২০. Chalmers Johnson, Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy and the End of the Republic, (New York; Metropolitan, 2004), 151-152.

২১. Kevin Baron, “Afghanistan Needs ‘Thousands’ More Troops, US General Says,” Defense One, February 9, 2017.

২২. Sam Stein, “Top Defense Contractors Spent $27 Million Lobbying at Time of Afghan Surge Announcement,” Huffington Post, March 23, 2010; Jeremy Scahill, “Bipartisan Mercs? Blackwater Hires Powerful Democratic Lobbyist,” Nation, May 14, 2010; C. Wright Mills, The Power Elite (Oxford: Oxford University Press, 2000).

শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনিচ্ছা

দুঃখজনক সত্য হলো, ৯/১১-র পর আফগানিস্তানে একটি প্রাথমিক হামলা বা সীমিত পরিসরে অভিযান ও দখলদারিকে কেউ কেউ যৌক্তিক মনে করলেও তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার ন্যূনতম প্রয়োজন ছিল না। আনন্দ গোপাল জানান, '২০০১ সালের শেষ দিকে এবং ২০০২ সালের শুরুর দিকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তালেবান নেতাই আমেরিকা এবং নব্য কারজাই সরকারের শর্তাবলি মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিল। তারা আফগানিস্তানের নতুন সরকার এবং অন্তর্বর্তীকালীন শাসক হিসেবে হামিদ কারজাইকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি চিঠিও পাঠিয়েছিল। সেই তালেবান নেতারা এটাও জানিয়েছিল যে, তাদের আত্মসমর্পণ মোল্লা ওমরের পূর্ণ অনুমোদন রয়েছে। তারা তাদের গোপন অস্ত্রভান্ডার এবং নিজ নিজ অস্ত্র জমা দিতেও সম্মত হয়েছিল। আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের কান্দাহার শহর থেকে নিজেদের প্রত্যাহার এবং জোট বাহিনীর হাতে এর নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরের প্রস্তাবও দিয়েছিল তারা।... এই দলের তালেবান নেতৃবৃন্দের মূল শর্ত ছিল রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসরের বিনিময়ে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। সেই সন্ধিক্ষণে এই শীর্ষস্থানীয় তালেবান সদস্যরা (পদমর্যাদার দিক দিয়ে) কারজাই সরকার এবং এর বৈদেশিক পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে আশির দশকের মতো আরেকটি জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কিছু সদস্য এমনকি এই নতুন সরকারকে ইসলামিক এবং বৈধতার স্বীকৃতিও দেয়। মোল্লা ওবায়দুল্লাহ এবং আরও কিছু উচ্চপদস্থ তালেবান কর্মকর্তা ২০০২ সালের শুরুতে আফগান কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু কারজাই এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তারা প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের চাপ এবং তালেবানের প্রাচীন শত্রু উত্তরাঞ্চলীয় জোটের চাপের কারণে এই আত্মসমর্পণ নামঞ্জুর করে। অতঃপর এই তালেবান সদস্যদের ওপর ব্যাপক হুমকি ও হয়রানি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যায়।'

সরকারের সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গ তখন জালালউদ্দিন হক্কানি এবং সেই দলের অন্য সদস্যদের আফগানিস্তান ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কারণ আফগানিস্তানে তখন তারা আর নিরাপদ ছিল না। শেষ পর্যন্ত সেসব ব্যক্তি সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে অদৃশ্য হয়ে যান। কারজাইয়ের কাছে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা জানিয়ে প্রেরিত সেই চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের অনেকেই পরবর্তীতে বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারী শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিযুক্ত নতুন আফগান সরকার কান্দাহার প্রদেশে রয়ে যাওয়া তালেবানদের ব্যাপক হয়রানি, হত্যা, জুলুম এবং অন্যান্য নির্যাতন শুরু করে। ফলস্বরূপ দ্রুতই সেসব নিষ্প্রভ প্রতিপক্ষরা স্থায়ী সক্রিয় প্রতিপক্ষে রূপান্তরিত হয়। আনন্দ গোপাল লিখেছেন, 'পরবর্তীকালে মোল্লা ওমরের মৃত্যুর পর তালেবান প্রধানের স্থলাভিষিক্ত মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর 'নতুন সরকারকে এক রকম মেনে নিয়েছিলেন এবং আফগানিস্তানেই অবস্থান করছিলেন'। কিন্তু মার্কিন মদদপুষ্ট আফগান সরকার এবং বিশেষ বাহিনী কান্দাহার প্রদেশে তালেবানের বিরুদ্ধে সহিংস অভিযান পরিচালনা করে। আখতার মনসুরও তাই উপলব্ধি করেন যে আফগানিস্তানে অবস্থান তার জন্য মারাত্মক ফলাফল বয়ে আনবে'। আইনজীবী আহমদ শাহ আচেকজাইয়ের সঙ্গে এক সাক্ষাতে মনসুর বলেছিলেন, এই সরকার তাকে কখনোই শান্তিতে থাকতে দেবে না। তাই পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় তালেবানে সরাসরি যুক্ত হওয়া মোটেও আশ্চর্যজনক কিছু ছিল না।

দখলদারির প্রথম তিন বছর মোল্লা ওমর ব্যতীত তালেবানের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ শান্তিপূর্ণভাবে আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তনের জন্য আপস-মীমাংসার নানাবিধ প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু প্রতিবারই কাবুলের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং মার্কিন নেতৃত্বের বিরোধিতা তাদের এসব প্রচেষ্টা ভন্ডুল করে দিয়েছে। এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে তাদের যেকোনো সদিচ্ছা সর্বদাই উপেক্ষিত হবে। পেন্টাগন এবং সিআইএ তালেবানকে আল-কায়েদার সমকক্ষ গণ্য করতে থাকে। তারা এসব তালেবান নেতাদের গ্রেপ্তার করে গুয়ানতানামোতে পাঠানোর পক্ষপাতী ছিল। অথচ আত্মসমর্পণ উদ্যোগ থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে তারা প্রচলিত জঙ্গিগোষ্ঠী নয়।

কিন্তু অব্যাহতভাবে লক্ষ্যবস্তু হওয়ায় তারা একসময় প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। প্রতিরোধের অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া ব্যতীত তাদের কাছে অন্য

কোনো বিকল্পও ছিল না।[১] আনন্দ গোপাল তার ‘নো গুড মেন অ্যামোং দ্য লিভিং’— বইয়ে এই ট্র্যাজেডির বিবরণ দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলা শুরুর দুই মাস পর যখন তার পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছিল, তখন মোল্লা ওমর নির্বাচিত অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাইকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। ওই চিঠিতে মোল্লা ওমর তালেবানের মন্ত্রীবর্গ, ডেপুটি এবং সমর্থকদের আত্মসমর্পণে সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি কান্দাহারের গোত্রনেতাদের কাছে নিজ যানবাহন, বই এবং অন্যান্য সম্পত্তি হস্তান্তরকেও আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দেন। ৫ ডিসেম্বর একটি তালেবান প্রতিনিধিদল আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কান্দাহারের উত্তরে মার্কিন বিশেষ বাহিনীর ক্যাম্পে আগমন করে। সেই প্রতিনিধিদলের সদস্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা ওবায়দুল্লাহ, মোল্লা ওমরের বিশ্বস্ত সহযোগী তায়েব আগা এবং আরও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার এবং নিজ গ্রামে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে এসেছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তালেবান প্রতিনিধিদল তাদের সামরিক কার্যক্রমে আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করতেও সম্মত হয়েছিলেন। অর্থাৎ নতুন শাসনতন্ত্রের জন্য তালেবানের কাছ থেকে কোনো হুমকি না থাকার নিশ্চয়তা নিয়ে এসেছিলেন তারা। এমনকি, আল-কায়েদা নেতারা পবিত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হওয়ার পরও তালেবান তাতে অংশগ্রহণ না করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। তালেবান ও আল-কায়েদার মধ্যকার তৎকালীন পার্থক্য হয়তো কখনো এতটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতো না। কিন্তু ওয়াশিংটনের বিজয় ঘোষণা এই বিরোধকে স্থায়িত্ব দেয়নি।[২]

আসন্ন ৯/১১ হামলার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করার চেষ্টা চালানো তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা মুত্তাওয়াকিল ২০০২ সালের জানুয়ারিতে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি সাবেক অর্থমন্ত্রী আগা জান মুতাশিমের মতো পুনরায় সংঘবদ্ধ হওয়ার যেকোনো প্রচেষ্টা ত্যাগ করার এবং নতুন কারজাইয়ের সরকারকে সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন। আনন্দ গোপাল জানান, ‘এটিই ছিল মোল্লা ওমরের হয়ে কাজ করা পুরো তালেবান মন্ত্রিসভা, মিলিটারি কমান্ডার, গুরুত্বপূর্ণ গভর্নর, কূটনীতিক এবং শীর্ষ কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত।’[৩]

ডাচ সাংবাদিক বেটি ড্যামের মতে, তালেবান নেতা মোল্লা ওমর তাঁর অনুসারীদের আত্মসমর্পণের চিঠি অনুমোদনের পরে সাদাসিধাভাবে বাড়িতে চলে যান। কিন্তু মার্কিনদের বোঝানো হয়েছিল যে মোল্লা ওমর তালেবান আন্দোলনের চিরন্তন নেতা। তাকে সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করা

হতে থাকে। অথচ তার সে সময় মার্কিনদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সক্ষমতা ছিল না। বেটি ড্যাম জানিয়েছেন, সে সময় মোল্লা ওমর সক্রিয় ছিলেন না বলাই চলে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একগুঁয়েভাবে ওসামা বিন লাদেন এবং মোল্লা ওমরকে এক এবং অভিন্ন হিসেবে গণ্য করতে থাকে। আনন্দ গোপালের বরাতে বেটি ড্যাম লিখেছেন, 'তালেবান অনেক আগেই বিন লাদেনের আন্তর্জাতিক জিহাদে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রমাণ হিসেবে সেগুলো যথেষ্ট ছিল না। তারা আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়েই মনোযোগী ছিল।'[৪]

অ্যালেক্স স্ট্রিক ভ্যান লিন্সকোটেন এবং ফেলিক্স কুয়েনের 'অ্যান এনিমি উই ক্রিয়েটেড' বইটি আল-কায়েদা এবং তালেবানের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আজ অবধি সবচেয়ে বিস্তৃত গবেষণা। তারা লিখেছেন, 'মোল্লা ওমর ব্যক্তিগতভাবে ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তানের অতিথি হিসেবে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি বিন লাদেনকে তালেবানের নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বলেন। তাকে জানানো হয়, তালেবান কোনো আঞ্চলিক বিপ্লব নয়, বরং এটি আফগানিস্তানকেন্দ্রিক বিপ্লব। ৯/১১-এর আগেও মোল্লা ওমরের একজন সহযোগী যুক্তরাষ্ট্রকে তালেবানের এই অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন।'[৫]

বেটি ড্যামের মতে, 'মার্কিন দখলদারির বড় ত্রুটিগুলোর একটি হলো প্রতিরোধ যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক প্রশ্ন করতে না চাওয়া অথবা প্রতিরোধ যুদ্ধের কারণ জানতে না চাওয়া। আফগান সমাজব্যবস্থায় 'চরমপন্থি ইসলাম' উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখে না। আফগান সমাজ বরং 'পরিবার, গোষ্ঠী এবং উপজাতি' দ্বারা বিভক্ত এবং তারা প্রায়ই পক্ষ অদল-বদল করে। চিরস্থায়ী যুদ্ধ, চরম দারিদ্র্য ও অস্থিতিশীলতায় পতিত একটি বিপর্যস্ত রাষ্ট্রে আফগানরা 'পশ্চিমাদের তাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিল এবং বেঁচে থাকার জন্য সহায়ক একটি সরঞ্জাম হিসেবেই দেখে।' তাহলে প্রেসিডেন্ট বা কোনো নির্দিষ্ট গভর্নর কেন যেখানে-সেখানে মার্কিন বাহিনী পাঠায়? আফগানদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা গোত্রীয় বিরোধ নিষ্পত্তি করতে আমাদের সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়নি।' (স্থানীয়রা) সেখানে যাকে-তাকে দেখিয়ে বলে, 'ওই যে তালেবান!' তারা ভালোভাবেই জানে, আমাদের কীভাবে বোকা বানাতে হয়।... মার্কিন সেনারা হেলমান্দ বা হেরাত প্রদেশের মতো কোনো এক জায়গায় পাঁচ কিংবা ছয় মাসের জন্য উড়ে যেত এবং জিজ্ঞাসা করে, 'তালেবান কোথায়?!' তখনই গোত্রনেতারা স্থানীয় বিরোধসমূহ নিষ্পত্তির জন্য মার্কিন ও মিত্রবাহিনীকে তাদের মতো করে ব্যবহার করতে শুরু করে।

মার্কিন বাহিনীকে আফগান গোত্রগুলো নিজেদের শত্রুপক্ষীয় গোত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। প্রতিটি সংঘাতকে ভালো এবং খারাপের লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করে মার্কিন নীতিমালা তৈরি। এভাবেই তারা নতুন নতুন শত্রু তৈরি করে রেখে আসে এবং পরবর্তী সেনাদল তাদের মোকাবিলায় রওনা হয়।[৬]

২০০২ সালের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র এবং এর সহযোগী আফগান ভূপতিরা তালেবানকে অব্যাহতভাবে হয়রানি ও নিপীড়ন শুরু করেছিল। নতুন আফগানব্যবস্থায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ না পেয়ে তালেবান সরকারের অবশিষ্ট সদস্যরা 'কোয়েটা শুরা' হিসেবে পুনর্গঠিত হতে বাধ্য হয়। দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া তালেবান নেতাদের আশ্রয়স্থল পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর কোয়েটার নামানুসারে নতুন কাউন্সিলের নামকরণ করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে তালেবান পুনরায় ক্ষমতায় আরোহণের দীর্ঘ ও ধীর যাত্রার শুরু করে।[৭]

তথ্যসূত্র

১. Anand Gopal, "Missed Opportunities in Kandahar," Foreign Policy, November 10, 2010.

২. Anand Gopal, "Missed Opportunities in Kandahar," Foreign Policy, November 10, 2010.

৩. Ibid., 104-105.

৪. Bette Dam, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, August 24, 2016.

৫. Van Linschoten and Kuehn, An Enemy We Created, 140-41, 155.

৬. Dam, Scott Horton Show, August 24, 2016.

৭. Gopal, No Good Men, 195-196.

দখলদারি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্বাচীন পদক্ষেপ শুরুতেই একটি মারাত্মক সংঘাতকে টেনে এনেছিল। এ রকম নতুন নতুন অর্বাচীন কর্মপন্থা সমগ্র আফগান অভিযানজুড়েই একটি চিরন্তন সুর হিসেবে বিদ্যমান ছিল। এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন জাতি এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর পশ্চিমা মিত্রদের সামরিক দখলদারি। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ দুঃসাহসের সঙ্গে বারবার আফগানিস্তান সরকার এবং আফগান জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রা পদ্ধতি পরিবর্তন করে দেওয়ার অভিপ্রায় ঘোষণা করে। স্বাভাবিকভাবেই এসব কাণ্ডকারখানা খোদ আমেরিকার যেকোনো রাজ্য অথবা বিশ্বের অন্য যেকোনো রাষ্ট্রের জনসাধারণকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উসকে দেবে। অথচ একের পর এক এমন ঘটনার পরও জালালউদ্দিন হক্কানির মতো অনেক তালেবান নেতাও আমেরিকার প্রাথমিক দখলদারি এবং নতুন সরকারকে মেনে নিতে চেয়েছিলেন। তারা মার্কিনদের সঙ্গে আলোচনার এবং সমঝোতার প্রচেষ্টাও চালিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো না কোনো উপায়ে তারা মার্কিন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান করেন।

তালেবান প্রশ্নাতীতভাবে একটি ধর্মীয় আন্দোলন। এটি কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে? অবশ্যই না। বরং এটিই তাদের সামগ্রিক পরিচয়। কিন্তু তারা যে কেবল তাদের ধর্মের জন্যই লড়াই করছে, ব্যাপারটা তাও নয়। তারা পুরুষ এবং সব সংস্কৃতির পুরুষেরাই ভিনদেশি দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইকে বেছে নেবে। হানাদাররা সেখানে অবস্থানের জন্য শত শত যুক্তি উপস্থাপন করলেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। এরিক মার্গোলিস জানান, 'আফগানরা ঐতিহাসিকভাবে একটি যোদ্ধা জাতি। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকেই তারা তাদের দেশে আগ্রাসন চালানো সকল বিদেশি

দখলদারদের পরাজিত করেছে। বিদেশি দখলদারি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পশতুনরা প্রয়োজনে আরও এক শতাব্দী লড়াই করবে কিংবা প্রয়োজন হলে দুই শতাব্দীও। সময় কাটানোর জন্য পছন্দসই চিত্তবিনোদন অর্থাৎ নিজেরা নিজেরা ঝগড়া-হাঙ্গামায় পুনরায় লিপ্ত হওয়ার জন্য হলেও তারা দখলদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে![১] ইসলামের আবির্ভাবেরও অনেক আগে থেকে চলে আসা প্রাচীন গোষ্ঠীগত পশতুনওয়ালি রীতিনীতিও দখলদারদের প্রতি এই আফগান মনোভাবকে সত্যায়ন করে। এটিকে অস্বীকার করা কিংবা উপেক্ষা করা মার্কিন জনগণের জন্যই ক্ষতিকর। সরকার, মিডিয়া এবং সামরিক বাহিনী আমাদের যা-ই বলুক না কেন, মার্কিন সেনাদেরকে আফগানরা কখনোই হিতৈষী শক্তি হিসেবে দেখে না। আফগানরা তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী দখলদার শত্রু হিসেবেই দেখে এবং তাদেরকে প্রতিরোধ করা অত্যাবশ্যক মনে করে। যাহোক, 'অভ্যুত্থান' শব্দটি একটি বৃহত্তর এবং প্রভাবশালী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিরোধকে ব্যক্ত করে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে অভ্যুত্থান নিজেই একটি সম্মানজনক অভিধায়। তালেবান মার্কিন দখলদারির বিরুদ্ধে একটি গণ-অভ্যুত্থান গড়ে তুলেছে।

বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা এবং আটককৃতদের হত্যার কারণে কখনো কখনো তালেবানকে ইতর এবং যুদ্ধাপরাধী আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু বাস্তবে মার্কিনরা তালেবানের চেয়ে বহুগুণে যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত। ন্যাশনাল পত্রিকার আফগান সংবাদদাতা ক্রিস স্যান্ডসের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, কান্দাহারে তালেবানের হাতে কোনো বেসামরিক মানুষ নিহত হলেও স্থানীয়রা তালেবানের পরিবর্তে (মার্কিন সমর্থিত) সরকারকেই দোষী করে। এসব পরিস্থিতিতে তালেবান জনগণের ক্রোধের শিকার হয় না বললেই চলে।[২]

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে আমাদের পররাষ্ট্রবিষয়ক 'বিজ্ঞ ব্যক্তিরা' তাদের যুদ্ধের পক্ষে এই বলে সম্মতি এবং ঐক্য নির্মাণ করেছিল যে, 'ভিয়েতনামিরা কমিউনিস্ট বলেই আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ভিয়েতনামেই তাদের থামিয়ে দিতে হবে। নয়তো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মাওবাদী চীনারা আশপাশের সব রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের রাজত্ব কায়েম করবে।' অতএব, যারাই ওই পক্ষের হয়ে লড়াই করছে, তাদের সকলে একই অ্যাজেন্ডার জন্য লড়াই করছে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।[৩] অথচ চীনের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামিদের একাধিক সফল প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের ইতিহাস রয়েছে। অন্যান্য দখলদার বিদেশি হানাদারদের পরাভূত করা ভিয়েতনামিদের গর্ব করার মতো ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস বিদ্যমান।[৪]

১৯৬২ সালে শুরুর দিকে ‘স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট প্রোগ্রাম’ নামে চালু হওয়া কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি কৌশল ‘ক্লিয়ার, হোল্ড, বিল্ড’ দিয়ে স্থানীয় জনগণকে বশ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই কৌশল উল্টো দক্ষিণ ভিয়েতনামি প্রতিরোধ যুদ্ধকে হ্রাস করার পরিবর্তে আরও তীব্র করেছিল। আসল বিষয়টি হলো, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ডিসির বৈদেশিক নীতিনির্ধারক গোষ্ঠী কমিউনিজমের প্রতি নমনীয় হয়ে পড়ার অভিযোগকে এড়াতে চেয়েছিল।[৫] মজার ব্যাপার হলো, দক্ষিণ ভিয়েতনামি কমিউনিস্ট প্রধান ভিয়েত মিনও শুরুতে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার এবং আমেরিকার প্রতি নীরব বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল, যেমনটা পরবর্তীকালে তালেবানও দেখা যায়। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপ্রধান মো এনজিও দিন দেইম নির্মমভাবে তাদের ওপর চড়াও হয় এবং তাদের সহিংস প্রতিরোধের দিকে চালিত করে।[৬] এরপর মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠা ভিয়েতনামি প্রতিরোধের প্রেরণাকে বিবেচনায় রেখে মার্কিন নীতিনির্ধারকেরা সিদ্ধান্ত নেয়নি। তাই সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার আগপর্যন্ত বছরের পর বছর ধরে মার্কিনরা ভিয়েতনামের কর্দমাক্ত জলাশয়ের গভীর থেকে গভীরে পতিত হয়েছিল।

আফগানিস্তানের প্রতিরোধ যুদ্ধটিও এর থেকে ভিন্ন নয়। একটি বিদেশি সেনাবাহিনীর আগ্রাসন ও দখলদারির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার কারণেই তারা লড়াই করছে। যদি তারা ক্যাথলিক, তাওবাদী বা বৌদ্ধ, রুশ, ফিলিপিনো কিংবা ব্রাজিলিয়ান হতো, তবু এই প্রতিক্রিয়া বিন্দুমাত্র ভিন্ন হতো না।

আফগানিস্তানে প্রারম্ভিক লড়াই শেষ হওয়ার পরের প্রথম কয়েক বছর রণক্ষেত্রে তালেবান ও আল-কায়েদার কোনো উপস্থিতি ছিল না। আফগান ভূখণ্ডকে দখল করে বসা মার্কিন সেনারা শত্রুর অভাবে বসে থাকতে থাকতে বিরক্তি এবং একঘেঁয়েমিতে ভুগতে থাকে। তাই তারা বৃহত্তর সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে নতুন নতুন শত্রু তৈরি করা আরম্ভ করে।[৭] এই ব্যাপারগুলো ভয়াবহ হয়ে উঠতে কিছুটা সময় লেগেছিল। তালেবান শাসনের অবসান দেখে বিভিন্ন উপজাতি ও নৃগোষ্ঠীর লোকজন খুশিই হয়েছিল। সেখানকার সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। শত্রুদের উপড়ে ফেলে মার্কিন মুলুকে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে তারা তখন দখলদারির দিকে হাত বাড়ায়। সাবেক সেনাসদস্য ররি ফ্যানিং জানান: ‘২০০২ সালের শেষ দিকে আমার আফগানিস্তানে যাওয়ার কয়েক মাস আগেই তালেবান আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু রাজনীতিবিদদের গলাবাজি বন্ধ করে দেশে ফিরে আসা এবং

জেনারেলদের নির্দেশনা বন্ধ করার জন্য এটি যথেষ্ট ছিল না। আমাদের নতুন কাজ হয়ে দাঁড়ায় সেখানকার লোকজনকে লড়াইয়ের ময়দানে ফিরিয়ে আনা!'[৮]

তালেবানের সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা জালাল উদ্দিন হক্কানির নেতৃত্বাধীন হক্কানি নেটওয়ার্কও বিগত দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আফগান সরকারের জন্য একটি বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হক্কানি নেটওয়ার্ক তালেবানের সঙ্গে জোটবদ্ধ এবং এককভাবে প্রায় তালেবানের সমপরিমাণ ক্ষমতার অধিকারী। আনন্দ গোপাল জানান, 'হক্কানি নেটওয়ার্কের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধটি শুরুতেই ভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে পারত। আল-কায়েদা তখন ধ্বংসপ্রায় ছিল। তাদের সব নেতাই ছিল আত্মগোপনে। তালেবানরাও রণক্ষেত্র ত্যাগ করে নতুন সরকারের সঙ্গে আপসের চেষ্টা চালাচ্ছিল।'

৯/১১-র পর হাজার হাজার মার্কিন সেনা কেবল একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আফগানিস্তানের মাটিতে অবতরণ করেছিল। এই উদ্দেশ্যটি ছিল কেবল 'জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই'। কিন্তু এরকম কোনো শত্রুর উপস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধটি চালিয়ে গেছে। আফগানিস্তানে আমেরিকার লড়াইটি এই দীর্ঘ সময় ধরে কীভাবে ভুল পথে চালিয়ে নেওয়া হলো, সেটা বোঝার জন্য আমাদের (গোপন) ইতিহাস জানতে হবে।

'বিশ্ব জঙ্গিবাদী ও অ-জঙ্গিবাদী শিবিরে বিভক্ত'— এই নীতিতে ২০০১ সালের পরের কয়েকটি বছর ওয়াশিংটন আফগান গুন্ডাবাহিনী এবং প্রভাবশালীদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। অতএব, তাদের শত্রুরা আমাদেরও শত্রু হয়ে যায়। তারা ভুল-ভাল গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিবাদসমূহ আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে থাকে। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ শত্রুদের নির্মূল করার বদলে নতুন নতুন শত্রু তৈরি হয়। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জালাল উদ্দিন হক্কানির আমেরিকার সম্ভাব্য মিত্র থেকে বৃহত্তর শত্রুতে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা।

মার্কিন আক্রমণের পরপরই সিআইএ'র পুরোনো মুজাহিদিন মিত্রদের কাছে একটি আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। এই প্রস্তাবে আত্মসমর্পণ বিনিময়ে কারাবাস এড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়। হক্কানি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে কেবল প্রতিশোধ নিতে যুক্তরাষ্ট্র তার বাড়িতে বোমা হামলা চালায়। এতটুকুতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। দরিদ্রদের জন্য হক্কানি প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুলেও মার্কিনরা বোমাবর্ষণ করে। সেই হামলায় হাক্কানির পরিবারের একজন সদস্যসহ সর্বমোট ৩৪ জন নিহত হয়েছিল। আনন্দ গোপালের তথ্য মোতাবেক, 'তাদের

অধিকাংশই ছিল শিশু।’ এই হামলার পরও হক্কানি আত্মসমর্পণের বিষয়ে সাধারণ কিছু শর্ত জুড়ে দেয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পরিবর্তে গুন্ডা সরদার পাচা খান জাদরানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। সে মার্কিনদের হয়ে হক্কানিকে পরাজিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। গোপাল আরও জানান:

> ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর মার্কিন পৃষ্ঠপোষিত হামিদ কারজাই আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেদিন বিকেলে লয়া পাকতিয়ার প্রায় ১০০ জন শীর্ষস্থানীয় প্রবীণ গোত্রনেতা হামিদ কারজাইকে অভিনন্দন জানাতে এবং আনুগত্যের ঘোষণা দিতে কাবুলের উদ্দেশে একটি শোভাযাত্রা করে রওনা দেয়। এটি সাধারণ জনগণের মাঝে কারজাইয়ের শাসনকে বৈধতা প্রদানে ভূমিকা রাখতে পারত। পাকিস্তান থেকে হক্কানি তার পরিবারের কিছু সদস্য, ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং রাজনৈতিক সহযোগীদের সেই মোটর-শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পাঠিয়েছিলেন।[৯] এটা ছিল নতুন সরকারের প্রতি হক্কানির পক্ষ থেকে শান্তির বার্তা। কিন্তু পাচা খান জাদরান কয়েক শ সশস্ত্র মিলিশিয়া সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা পথ আটকে দেয়। এই পরিস্থিতিতে হক্কানি গোত্রের মালেক সরদার নামক একজন প্রবীণ নেতা তার সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে আসেন। তখন পাচা খান তাদের নিকট তাকে লয়া পাকতিয়ার নেতা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানায়। সে সেখানে এবং সেই সময়েই তাদের টিপসই এবং স্বাক্ষর চেয়ে বসে। মালেক সরদার শপথ অনুষ্ঠানের পরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে চাইলেও সে তাতে রাজি হয়নি। কোনো মীমাংসা না হওয়ায় তাদের শোভাযাত্রা পিছিয়ে এসে ভিন্ন পথ ধরে কাবুলের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল।
>
> স্যাটেলাইট ফোনে সাহায্য চেয়ে মালেক সরদার আফগানিস্তানের রাজধানী এবং পাকিস্তানের পেশোয়ারের মার্কিন দূতাবাসে যোগাযোগ করলেও অনেক দেরি হয়ে যায়। মার্কিন সামরিক কর্মকর্তাদের কাছে পাচা খান বার্তা পাঠায়, ‘হক্কানি ও আল-কায়েদার একটি মিলিত অশ্বারোহী বাহিনী কাবুল অভিমুখে যাত্রা করেছে।’ মালেক সরদার বলেন, ‘এর কিছুক্ষণ পরই কানে তালা লাগানো বিস্ফোরণের শব্দ শুরু হয়। গাড়িগুলো একের পর এক বিস্ফোরিত হতে শুরু করে। আমরা সর্বত্র আগুন এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পাই। চারদিকে ব্যাপক চিৎকার-কান্নাকাটি চলছিল। আমরা এদিক-সেদিক পালাতে শুরু করি।’ আমেরিকার সেই বিমান হামলা কয়েক ঘণ্টা ধরে চলমান থাকে। মালেক সরদার ও অন্যরা তখন নিকটস্থ দুটি গ্রামে

আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু বিমানগুলো পুনরায় ফিরে এসে সেখানেও হামলা চালায়। এবারের হামলায় দুই গ্রামের প্রায় ২০টি বাড়িঘর পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং কয়েক ডজন বাসিন্দা নিহত হন। এই হামলায় বহু বিশিষ্ট গোত্রনেতাসহ মোট ৫০ জন মারা যায়। এই গণহত্যার তদন্তের জন্য গঠিত গোত্রীয় কমিশনে এই তথ্য উঠে আসে, পাচা খানই মার্কিনদের এই গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করেছিল যে কালায়ে-নিয়জিতে একটি হক্কানি দুর্গ রয়েছে। জাতিসংঘের তদন্ত মোতাবেক, নিহত ৫২ জনের মধ্যে ১৭ জন ছিল পুরুষ, ১০ জন মহিলা এবং ২৫ জনই শিশু।'

এরপর হক্কানি এবং তার লোকজন পাকিস্তানের উপজাতীয় অঞ্চলে আত্মগোপনে চলে যান। ২০০২ সালে হক্কানি পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তার ভাই ইব্রাহিম ওমারি ও তার অনেক যোদ্ধাকে নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকারের জন্য আফগানিস্তানে প্রেরণ করেন। তারা সিআইএ'র 'কাউন্টার টেরোরিজম পারাস্যুট টিমস' নামক সন্ত্রাসবিরোধী বাহিনীতে কাজ করার জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু দ্রুতই সামরিক বাহিনী তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের পোষা গুন্ডা পাচা খানের পক্ষাবলম্বন করে। ফলস্বরূপ ওমারি ও তার লোকজনকে বাগরাম বিমানঘাঁটির কারাগারে আটক এবং নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাবেক মুজাহিদিন স্বাধীনতাকামী বীরদের মধ্যে থেকে হক্কানির মতো একজনকে মারাত্মক শত্রুতে রূপান্তরিত করতে সফল হয়!

বর্তমানে জালালুদ্দিন হক্কানির ছেলে সিরাজউদ্দিন হক্কানি এই নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হক্কানির সঙ্গে মিত্রতার এসব সুযোগ বরবাদ করার পর থেকে এ পর্যন্ত মার্কিনবিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের অংশ হিসেবে হক্কানি নেটওয়ার্ক কমপক্ষে কয়েক শ বেসামরিক নাগরিক এবং পশ্চিমা ও আফগান সেনাদের হক্কানি হত্যা করেছে। ২০০৯ সালে হক্কানির হয়ে কাজ করা একজন জর্ডানিয়ান ডাবল এজেন্ট সাতজন সিআইই কর্মকর্তাকে হত্যা করে। সেই ঘটনায় ছয়জন সিআইএ কর্মকর্তা এবং ঠিকাদার আহত হয়। এই ঘটনাটি পরবর্তী বছরগুলোতে তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধ আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে।[১০]

আফগান গুন্ডা সরদার গুল আঘা শিরজাই যুদ্ধের শুরুতে বাগরাম বিমানঘাঁটি দখল করেছিল। সে-ই এটিকে মার্কিনদের ব্যবহারের উপযোগী করে। এরপর আঘা সিরিজাই তার নিজস্ব 'ব্ল্যাকওয়াটার' ধরনের ভাড়াটে বাহিনী এবং আফিমশিল্পের দখল নিয়ে সেই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মাস্তানে পরিণত হয়।

২০০২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই সিংহভাগ মার্কিন সেনা বাগরামে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু তত দিনে আল-কায়েদা পলায়ন করেছিল এবং তালেবানরাও রণক্ষেত্র ত্যাগ করেছিল। তাই বাস্তবে যুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত কোনো প্রতিপক্ষ ছিল না। অথচ মার্কিন বাহিনীর নিকট সুস্পষ্ট রাজনৈতিক নির্দেশনা ছিল 'জঙ্গিবাদ নির্মূলকরণ'। তাই টিকে থাকতে এবং সমৃদ্ধ হতে শিরজাই এবং তাঁর গুন্ডা সরদাররা মার্কিন উপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে শুরু করে। কোনো যৌক্তিক প্রতিপক্ষ না থাকা সত্ত্বেও তারা নতুন নতুন শত্রু তৈরি শুরু করে। মার্কিনদের গৃহীত ভুল পদক্ষেপগুলো থেকেও তারা নিজেদের ফায়দা হাসিল করতে থাকে। মার্কিনরা আজও সেগুলো উপলব্ধি করতে পারেনি। শিরজাইয়ের শত্রুরা আমেরিকার শত্রুতে পরিণত হয় এবং তার লড়াই আমেরিকার লড়াইয়ে পরিণত হয়। তার ব্যবসায়িক স্বার্থ ওয়াশিংটনের ব্যবসায়িক স্বার্থে পরিণত হয়। তার ব্যক্তিগত কলহ এবং স্বার্থ সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের অংশ হয়ে যায়। এমনই একটি ঘটনায় শিরজাই হাজি বুর্গেট খান নামক স্থানীয় একজন গোত্রনেতার ওপর আল-কায়েদা সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনে। স্বভাবতই বুর্গেট খানের গ্রামে একটি ব্যাপক এবং সহিংস অভিযান চালানো হয়। সেই অভিযানে খানসহ আরও কয়েকজন লোক নিহত হয় এবং ফলাফল হিসেবে সেই এলাকায় দখলদার মার্কিনদের বিরুদ্ধে একটি তীব্র ও স্থায়ী জনরোষের সৃষ্টি হয়। অথচ মার্কিনরা মনে করছিল যে, তারা 'জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই' করছে এবং আমেরিকাকে নিরাপদ রাখছে। আনন্দ গোপাল মন্তব্য করেন, 'সামনের বছরগুলোতে উভয় পক্ষেরই হাজার হাজার মানুষ নিহত হবে। কিন্তু হাজি বুর্গেট খান হত্যার স্মৃতিকে সেই গ্রামবাসী কখনোই ভুলবে না।... হাজি বুর্গেট খানের হত্যার ঘটনাটিকে মাইওয়ান্দ জেলা এবং অন্যান্য ইসহাকজাই (উপজাতীয়) অঞ্চলে অস্থিতিশীলতার পেছনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই অঞ্চলের তিনজন তালেবান কমান্ডার তালেবানে যোগ দেওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে এই ঘটনাকে উল্লেখ করেছেন। আফগান সরকারি কর্মকর্তারাও স্বীকার করেছেন যে, এই ঘটনার ফলে সমগ্র অঞ্চলেই একটি বিপর্যয়কর প্রভাব পড়ে।

গুল আঘা শিরজাইয়ের মতো উরুজগানের আরেক গুন্ডা, খুনি, মাদক ব্যবসায়ী, শিশু-ধর্ষক ছিল জান মুহাম্মদ খান। সে প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহগোত্রীয় ছিল। তার নির্যাতনে স্থানীয়রা অতিষ্ঠ ছিল। তারা একই সঙ্গে তাকে ঘৃণা এবং ভয় করত। কিন্তু কারজাই তাকে উরুজগান প্রদেশের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। উরুজগানে পোপালজাই গোত্র এবং গিলজাই

গোত্রের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলছিল। পোপালজাই গোত্রের জান মুহাম্মদ খান সুযোগ পেয়ে মার্কিন সেনাদের মাধ্যমে সাবেক প্রাদেশিক প্রশাসনে থাকা তার শত্রুদের বধ করেছিল। অথচ তার সেই প্রতিপক্ষদের সবাই তালেবানবিরোধী ছিল এবং নতুন মার্কিন পৃষ্ঠপোষিত সরকারকে সমর্থন জানিয়েছিল। জান মুহাম্মদ খান মার্কিন সেনাদের মাধ্যমে 'মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই'য়ের নামে ঝিলজাই কালোবাজারে ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষকে হত্যা অথবা নিষ্ক্রিয় করে দিত। কৃত্রিমভাবে হিরোইনের উচ্চমূল্য বজায় রাখতে সে এই কৌশলের আশ্রয় নেয়।

আফগানিস্তানে কার পরিচয় কী অথবা কাকে সমর্থন এবং কাকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে হবে, এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রকার স্বাধীন ধারণা রাখা অসম্ভব। গুল আঘা শিরজাই এবং জান মুহাম্মদ খানদের সঙ্গে মার্কিনদের বিপর্যয়কর সম্পর্কই এর প্রমাণ। তালেবানবিরোধী এবং মার্কিনপন্থি বহু গোত্রনেতা, রাজনীতিবিদ এবং কর্মকর্তাকে হত্যা, আটক করে নির্যাতন এবং গুয়ানতানামো বে কারাগারে জীবনাবসানের অসংখ্য ঘটনা আনন্দ গোপালের লেখায় উঠে এসেছে। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলেও একই রকম অগণিত গুন্ডাবাহিনী রয়েছে। কিন্তু সেখানে কমসংখ্যক মার্কিন সেনা থাকায় তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। দিনশেষে শিরজাই এবং খানদের মতো গুন্ডাদের হাতের পুতুল হয়ে মার্কিনদের চালানো নিরীহ আফগানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন এই প্রতিরোধ যুদ্ধকে বহুগুণে বিস্তৃত করেছে।

তথ্যসূত্র

১. Margolis, American Raj, 218.

২. Chris Sands, "Chaos Central," in The Case for Withdrawal from Afghanistan, ed. Nick Turse, (New York: Verso, 2010), 64-70.

৩. Gareth Porter, Perils of Dominance: Imbalance of Power and the Road to War in Vietnam (Oakland: University of California Press, 2006), 229-258.

৪. "The Strategic Hamlet Program, 1961-1963," Pentagon Papers, Gravel Edition, Volume 2, (Boston: Beacon, 1971), 128-159. ৫. Edward G. Lansdale, "Vietnam: Do We Understand Revolution?," Foreign Affairs, October 1964; Samuel P.

Huntington, "The Bases of Accommodation," Foreign Affairs, July 1968.

৬. Gareth Porter, Vietnam: The Politics of Bureaucratic Socialism, (Ithica, NY: Cornell University Press, 1993) 17-18.

৭. Van Linschoten and Kuehn, An Enemy We Created, 262-263.

৮. Rory Fanning, "Talking to the Young in a World That Will Never Truly Be 'Postwar,'" TomDispatch, April 7, 2016.

৯. Rory Fanning, "Talking to the Young in a World That Will Never Truly Be 'Postwar,'" TomDispatch, April 7, 2016.

১০. Anand Gopal, "How the US Created the Afghan War — and Then Lost It," TomDispatch, April 29, 2014.

নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতিরাষ্ট্র নির্মাণ

আমেরিকার সামরিক দখলদারি সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দায়িত্বের (?) পরিমাণও বেড়ে যায়। জঙ্গিবাদ মোকাবিলার পরিবর্তে গণতন্ত্র ও সংসদ প্রতিষ্ঠা, নিপীড়িত নারী ও মেয়েশিশুদের মুক্তি এবং শিক্ষার ব্যবস্থা, পপি চাষ বন্ধ করা, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়িসহ সম্পূর্ণ নতুন কাঠামো তৈরি তথা জাতিরাষ্ট্র নির্মাণ করা আমেরিকা ও ন্যাটো জোটের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। স্বরাষ্ট্র বিভাগ, বেসরকারি সংস্থা (NGO) এবং সব ধরনের ঠিকাদারেরা কাবুলে জায়গা তৈরি করে নিতে থাকে। আফগান সমাজকে সাহসী ও আধুনিক করে তুলতে তারা নিজেদের অপরিহার্য মনে করে। এভাবে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ আসা শুরু করলে পুরো আফগানিস্তান দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়। রাজনীতিবিদ ও দালালরা কাবুলে সুবিশাল প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করে। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র রাষ্ট্রটিতে এভাবেই একটি অভিজাত পাড়া গড়ে ওঠে। এই অভিজাত পাড়া মাদক[১], পতিতাবৃত্তি (এমনকি শিশুদেরও)[২] এবং ঘুষের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। এর পর থেকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় নিয়মিত আফগানিস্তান জায়গা করে নিতে থাকে।[৩]

আফগানিস্তানে আগ্রাসনের শুরু থেকেই মার্কিন জনগণকে বোঝানো হচ্ছিল যে, তারা সেখানে আফগানদের সহায়তার জন্যই অবস্থান করছে। ফার্স্ট লেডি লরা বুশ ২০০১ সালের ১৮ নভেম্বরের বেতার ভাষণে আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদে একটি জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের বিবরণ তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মতে, আফগানিস্তানে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটি নারীর সম্মান ও অধিকারের লড়াইও বটে। তিনি শপথ করেন, আমেরিকা ও তার মিত্ররা নারীদের তালেবান শোষণের পাশাপাশি সেখানকার বৈষম্যমূলক রীতিনীতি থেকেও মুক্ত করবেন। তার দাবি জোরালো করতে তিনি কাবুলে নারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে ছবি

তোলেন।[৪] এই পদক্ষেপকে আপাত নির্দোষ ও সদিচ্ছা মনে হলেও বাস্তবে এর অর্থ ছিল কোনো রাখঢাক না রেখেই এমন একটা বৃহৎ লক্ষ্য নির্ধারণ করা, যাতে এই যুদ্ধে কখনো জয়লাভ সম্ভব না হয় এবং এই যুদ্ধ কখনো শেষও না হয়। অথচ মার্কিনদের মিত্র উত্তরাঞ্চলীয় জোট ভয়ংকর নারী নিপীড়ক ছিল। এ ছাড়া প্রাচীন পশতুন নীতি এবং গোত্রীয় রীতিনীতির চেয়ে তালেবানের ইসলামিক আইন যথেষ্ট আধুনিক ছিল, বিশেষ করে সম্পত্তির ওপর নারীর মালিকানার প্রশ্নে।[৫] মধ্য এশিয়াবিষয়ক অভিজ্ঞ প্রতিবেদক এরিক মারগোলিস প্রশ্ন রাখেন, 'আফগানিস্তানে নারীমুক্তি যদি মার্কিন মিশনের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে তারা কেন তাজিকিস্তান, ভারত, সৌদি আরবের নারী নিপীড়ন নিয়ে কিছুই বলে না? অথচ যেখানকার পরিস্থিতিও তো প্রায় একই রকম।' তার মতে, দখলদারির জন্য নারী অধিকারকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো বেকুবদের প্রতি প্রচারণার একটি উপকরণ মাত্র।[৬]

যাহোক, বৃহত্তর সামরিক অভিযান শেষে বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলেও আফগানিস্তানে ক্ষমতার অপব্যবহারে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আফগানিস্তানের জিডিপি ২০ বিলিয়ন ডলারের কম। অথচ প্রতিবছর আফগান ন্যাশনাল আর্মির পেছনে আমেরিকা ৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করে। স্পেশাল ইন্সপেক্টর জেনারেল ফর আফগানিস্তান রিকনস্ট্রাকশন (SIGAR)-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ওবামা আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য ২০১৭ অর্থবছরে ৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি আবেদন করেন। কিন্তু আফগান সরকার ২০১৬ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পুলিশ বাহিনীসহ) এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের (সেনাবাহিনীসহ) ব্যয় বাবদ মাত্র ৩৩৬ মিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয়। আর এটা তাদের বাৎসরিক জিডিপির প্রায় ১৭%। স্পষ্টতই আমেরিকার সামনে দুটি বিকল্প রয়েছে। হয়তো এই পরজীবী সরকারকে টিকিয়ে রাখতে অনন্তকাল ধরে আফগানিস্তানে থেকে যাওয়া কিংবা এর পতনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

পরিহাসের ব্যাপার হলো, আফগানিস্তানে জোট সেনারা পপি উৎপাদন বন্ধের ওপর জোর দিলেও অপরাধী, গুন্ডা এমনকি হেরোইন কারবারিদের গভর্নর ও পুলিশ হিসেবে নিয়োগ দেয়। দুর্বৃত্তদের এই ক্ষমতায়ন দুর্নীতি ও সহিংসতার মাত্রাকে আরও বৃদ্ধি করেছে।[৭] আবার পশ্চিমারা যেহেতু ন্যাশনাল আর্মি ও পুলিশের ব্যয়সহ পুরো অর্থের জোগান দিচ্ছে, সে জন্য তারা জনগণের পরিবর্তে এই বিদেশি প্রভুদের কাছে দায়বদ্ধ।

ইতিহাস বলে, দক্ষতা কিংবা সদিচ্ছা থাকলেও বাইর থেকে আফগানদের ওপর কোনো ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার ফলাফল কখনোই ভালো হয়নি। আর যত

দিন আফগান সরকার বাইরে থেকে পাওয়া সাহায্যের ওপর নির্ভর করবে, তত দিন তারা উৎপাদনের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরিতে কাজ করবে না।[৮] সাংবাদিক আতি সুকের ভাষায়, 'আমেরিকা একটি আধুনিক ভাড়াটে রাষ্ট্র তৈরি করছে।' আফগানিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর বদলে আফগান সরকারি কর্মকর্তা ও এনজিওগুলো তাদের দেশে আসা পশ্চিমা নাগরিকদের ট্যাক্সের টাকায় সম্পদ গড়ছে। পাশাপাশি আমেরিকা ও তার মিত্ররা রাজধানী কাবুলে এমন একটি অত্যাধুনিক শহর গড়ে তুলছে, যা অচিরেই ভৌতিক শহরে পরিণত হবে। পৃথিবীর অন্যতম এই দরিদ্র রাষ্ট্রটিতে ন্যাটো জোটভুক্ত দেশ ও এনজিওসমূহ অসংখ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়। পশ্চিমাদের এই ডলারের স্রোত ব্যতীত কখনোই এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না। এসবের মধ্যে রয়েছে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে আদালত নির্মাণ, সরকারি কৃষি ও খনন কার্যক্রম, মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বেসামরিক বিমান শিল্প, ড্যাম, খামার, ব্যয়বহুল হাসপাতাল, অফিস, পার্ক, বহুতল ভবন, প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য প্রজেক্ট।

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে এক প্রতিবেদনে স্পেশাল ইন্সপেক্টর জেনারেল ফর আফগানিস্তান রিকনস্ট্রাকশন (SIGAR) জানায়, 'আফগানিস্তান পুনর্গঠন প্রকল্পে আমেরিকার প্রতিশ্রুত ১৯৫ বিলিয়ন ডলারের অধিকাংশই ভুল পথে ব্যয় হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। কেননা, দাতা দেশের নিয়মিত এবং ব্যাপক সহায়তা ছাড়া আফগানরা কার্যত এই বিনিয়োগ সামলাতে পারবে না। ২০১৪ সালে আফগানিস্তানের ৬.৫ বিলিয়ন ডলারের বাজেটের ৬৯ শতাংশই দাতাদেশগুলোকে জোগান দিতে হয়েছিল।' পররাষ্ট্র বিভাগের পরিদর্শকগণ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এক রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'আফগানিস্তানকে ২০৩০ সালের পরও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হবে।'[৯]

আমেরিকা এবং এর মিত্রদের সহায়তা সত্ত্বেও আফগান অর্থনীতির কোনো দীর্ঘস্থায়ী টেকসই উন্নয়ন ঘটেনি। কারণ স্থানীয় অর্থনীতিতে যুক্ত হওয়ার বদলে সিংহভাগ অর্থই চলে যায় বিদেশি ঠিকাদারদের পকেটে। তাই আফগান অর্থনীতিতে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ হলেও এসব সাধারণ জনগণের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে।

ইনডিপেনডেন্টের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক প্রতিনিধি প্যাট্রিক ককবার্ন ২০১০ সালে জানান, 'সামরিক ও বেসামরিক দখলদারির কেন্দ্র রাজধানী কাবুলে সিংহভাগ অর্থ ব্যয়ের পরও ব্যাপক খাদ্যসংকট একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।... প্রচুর

অর্থ সহায়তা এলেও তা বিভিন্ন সংগঠনের মাঝে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায় এবং প্রত্যেকে নিজেদের অংশ কাঁটায় কাঁটায় নিয়ে যায়। এই অর্থ আফগান জনগণকে কোনো প্রকার সহায়তা করছে না বললেই চলে।'[১০]

স্পেশাল ইন্সপেক্টর জেনারেল ফর আফগানিস্তান রিকনস্ট্রাকশন (SIGAR)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, আফগানিস্তান পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ঠিকাদারি একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। দুর্গম এলাকা, চলমান সহিংসতা, ব্যাপক দুর্নীতি, সীমিত প্রশাসনিক ক্ষমতা, তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ে অসুবিধা এবং অন্যান্য কারণে ঠিকাদারি চুক্তি তদারকি অসম্ভব কঠিন। সংস্থাটি আরও জানায়, ভুল করে বিদ্রোহী দলগুলোর কাছেই বিভিন্ন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার অনেক নজির রয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষা ও প্রমাণাদি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আফগান জনগণকে সরকারের সকল পর্যায়ের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ভুক্তভোগী হতে হয়। মার্কিন ফান্ডের সিংহভাগ প্রতিপক্ষের হাতে চলে যাওয়ার অন্যতম কারণ এই দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে আন্তর্জাতিক জোট পুনর্গঠন প্রচেষ্টাও ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আফগান জনতা সার্বক্ষণিক পুনর্গঠন প্রজেক্টগুলোতে মার্কিন সেনাবাহিনী ও ত্রাণকর্মীদের তদারকিতে গাফিলতি প্রত্যক্ষ করে আসছে। ঘুষ, জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, স্বজনপ্রীতি ছাড়াও নিপীড়ক গুন্ডাবাহিনী ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা সবকিছু থেকেই ফায়দা ওঠায়।[১১] সুর্ক বলেন, 'জাতিসংঘ ও ন্যাটোতে মার্কিন এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিকেরা নিজস্ব স্বার্থের জন্যই প্রমাণ করতে চায়, তারা আমেরিকার পরিকল্পনা মোতাবেক আফগানিস্তানের পুনর্নির্মাণ সম্পন্ন করতে পারবে। অথচ দুই প্রজন্ম আগেও এই কৌশল ভিয়েতনামে অকেজো প্রমাণিত হয়েছিল।'

পররাষ্ট্র বিভাগ, পেন্টাগন এবং ত্রাণ সরবরাহের এনজিওগুলোর জন্য আফগানিস্তান বিরাট একটি গবেষণাগার। কূটনীতি থেকে ঠিকাদারি পর্যন্ত সব বিভাগে আর্থিক প্রণোদনায় স্বেচ্ছাচারিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আফগানিস্তান নামক গবেষণাগারের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থের সঙ্গে অপ্রতুল জবাবদিহি প্রাধান্য পায়। এর সঙ্গে বাহ্যিক প্রভাব তো রয়েছেই। যুদ্ধে কিছু অর্জন সম্ভব নয় জেনেও পুরোনো প্রকল্পগুলোতে আরও 'বিনিয়োগকে সমাধান ভাবা হচ্ছে। তারা আশা করছে, অলৌকিকভাবে হলেও একদিন হয়তো এসবে সফলতা আসবে। দিনের আলোর মতো স্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও যারা এখনো ভাবছে যে, সফলতা খুব নিকটে, তাদের জন্য দেউলিয়াত্বই সর্বশেষ পরিণতি।'[১২]

বর্তমান আফগানিস্তানে দুর্নীতি সকল রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে। এই দুর্নীতি শুধু গ্যাস স্টেশনের পেছনে বাৎসরিক ৪৩ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে সীমাবদ্ধ নয়।[১৩]

আফগানিস্তানের পুনর্গঠনের পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে। ২০১৭ সালের শুরুতে স্পেশাল ইন্সপেক্টর জেনারেল ফর আফগানিস্তান রিকনস্ট্রাকশন (SIGAR) প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় আফগানিস্তান পুনর্গঠনের জন্য ব্যয় হওয়া অর্থের পরিমাণ ১১৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠতে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের ১৬টি দেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত সহায়তা কার্যক্রম 'মার্শাল প্ল্যান'কেও এই অঙ্ক ছাড়িয়ে গেছে। তবু বলা হচ্ছে, আফগানিস্তানের পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম 'দুর্বল ও অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে'।[১৪]

স্পেশাল ইন্সপেক্টর জেনারেল ফর আফগানিস্তান রিকনস্ট্রাকশন (SIGAR) মোতাবেক, অধিকাংশ পুনর্নির্মাণ অভিযানই ঝুঁকিপূর্ণ। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসের একটি প্রতিবেদনে তারা জানায়, 'শিক্ষা খাতে বিগত দেড় যুগে ব্যয় হওয়া ৭৫৯ মিলিয়ন ডলার আদৌ কোনো পরিবর্তন নিশ্চিত করতে পারেনি। দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ ও পয়ঃনিষ্কাশনের কোনো প্রকার ব্যবস্থা ছাড়া অসংখ্য বিদ্যালয় ভবন তৈরি করা হয়েছে।[১৫] এসব অকার্যকর প্রকল্পের জন্য পররাষ্ট্র বিভাগ, ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (UAID) এবং পেন্টাগনের ঠিকাদারদের কোটি কোটি ডলার বিল করার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এসব বিদ্যালয়ের খাতায় কেবল ভৌতিক শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি রয়েছে। কোথাও কোথাও এসব বিদ্যালয়ে যেতে শিক্ষার্থীদের বহু দূর পাড়ি দিতে হতো।[১৬] এত কিছুর পরও ডলারের স্রোত বন্ধ হয়নি। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আফগানিস্তানও নিয়মিতভাবে শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় জায়গা করে নিতে থাকে।

আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আসা অর্থ আফগানিস্তানের তহবিল থেকে উপসাগরীয় দেশগুলোতে আস্তানা গেড়ে বসা দুর্নীতিবাজ আফগান কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে জমা হয়। আফগান জনতার কল্যাণের দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন সংস্থা এখন দুর্নীতি ও অদক্ষতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনগণের জন্য কাজ করার বদলে তারা প্রকল্পের ব্যক্তিদের মাঝে অর্থ বিলিয়ে দেয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কিংবা অর্থ আত্মসাৎ ও অপব্যবহার রুখে দেওয়ার মতো দায়িত্বশীল আচরণ তাদের থেকে আশা করাও অবান্তর।[১৭]

২০১১ সালে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের তদন্তে মার্কিন সহায়তায় নির্মিত কাবুলের দাউদ ন্যাশনাল মিলিটারি হাসপাতালে আহত সেনা ও পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে

ঘটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্ব্যবহার ও অবহেলার খবর প্রকাশিত হয়। ডাক্তার ও নার্সদের ঘুষ দিতে না পারলে ক্ষত থেকে সংক্রমণ কিংবা অনাহারে মৃত্যুর জন্য রোগীদের ফেলে রাখা হতো এই হাসপাতালে। ২০০৬ সালে মার্কিন সেনাবাহিনী সর্বপ্রথম এসব তথ্য জানতে পেরেছিল। কিন্তু তারপরও বহু বছর যাবৎ এই পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। সেখানে দায়িত্বরত আফগান ন্যাশনাল আর্মির জেনারেলই ছিল আসল চোর। সে ১০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থমূল্যের ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী চুরি করেছিল। সামান্যতম সেবার বিনিময়েও এই জেনারেল রোগীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করত।[১৮] এই ঘটনার দুজন প্রত্যক্ষদর্শী পরবর্তীকালে আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ মিশনের দায়িত্বে থাকা লেফটেন্যান্ট জেনারেল উইলিয়াম বি কডওয়েলের বিরুদ্ধে তদন্ত কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনে। ২০১০ সালে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের আগে এই দুর্নীতির তথ্য ফাঁস হয়েছিল। কিন্তু 'ডেমোক্র্যাটদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে' বিবেচনায় উইলিয়াম বি কডওয়েলের প্রতিরক্ষা বিভাগের তদন্তে বাধা দিয়েছিল।[১৯]

যুক্তরাষ্ট্র ও আফগান সরকার যৌথভাবে কাবুলের কাছে একটি বৃহৎ ও অত্যধিক ব্যয়বহুল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করেছে। কিন্তু কাবুলের উপকণ্ঠে এমন একটি প্রকল্প পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় এবং প্রায় অকার্যকর। কান্দাহারে ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্যও তারা শত শত কোটি ডলার ব্যয় করেছে। অথচ দীর্ঘ মেয়াদে এই প্রকল্প চালানোর সক্ষমতা নেই স্থানীয় সরকারের। তখন আমাদের সেনাবাহিনী জানাল, 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই। পার্শ্ববর্তী হেলমান্দ প্রদেশের কাজাক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হওয়া অবধি বিদ্যুৎ ঘাটতির অস্থায়ী সমাধান হিসেবে এসব জেনারেটর বসানো হয়েছে!'[২০] আসল কথা হলো, এই প্রকল্পগুলো অর্থনৈতিক প্রয়োজনের বদলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্মিত। এসবের ব্যর্থতার মূল কারণ এটিই।[২১]

২০১৬ সালের অক্টোবরে স্পেশাল ইন্সপেক্টর জেনারেল ফর আফগানিস্তান রিকনস্ট্রাকশন (SIGAR) আফগানিস্তানের সড়ক ব্যবস্থাপনা খাতে মার্কিন সেনাবাহিনী ও ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (USAID)-এর বাজেটের তথ্য প্রকাশ করে। তাদের তথ্যানুসারে, ২০০২ সাল থেকে আফগানিস্তানে সড়ক নির্মাণ, মেরামত এবং প্রশস্তকরণে প্রায় ২.৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে। পরিহাসের বিষয় হলো, আফগান কর্মকর্তাদের বরাতে জানা যায় যে, স্বয়ং মার্কিনরা 'নিরাপত্তা শঙ্কায়' এসব প্রকল্পস্থলে যেতে পারে না। উপরন্তু, আমেরিকার তৈরি রাস্তার ২০ শতাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে

আর বাকি ৮০ শতাংশও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মেরামত ব্যতীত আফগানিস্তানের সড়কব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে ৮.৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে। আফগানিস্তানের ৫৪ শতাংশ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে কোনো ব্যবস্থা নেই। এই সড়কগুলো চলাচলের উপযুক্ত করতে হলে সাধারণ মেরামত কোনো কাজে দেবে না।[২২]

স্পেশাল ইন্সপেক্টর জেনারেল ফর আফগানিস্তান রিকনস্ট্রাকশন আফগানিস্তানে অপচয় হওয়া অর্থের সামান্য অংশের পর্যালোচনা করার সক্ষমতা ও অধিকার রাখে। তথাপি সংস্থাটির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন আফগানিস্তানে মার্কিন ব্যর্থতার একটি ঐতিহাসিক নথি হিসেবে সাড়া ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে এনজিক, সেনাবাহিনী, পররাষ্ট্র বিভাগের কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের অপরিবর্তনীয় মতামত হলো, 'আমেরিকা ও তার মিত্রদের দ্রুততম সময়ে আরও অর্থ ব্যয় ও কাজ করা উচিত ছিল। বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এটাই একমাত্র বিকল্প।' এই দখলদারদের মতে তালেবানের পুনরুত্থানের কারণ হলো আফগান পুনর্গঠনের জন্য যথেষ্ট কাজ করতে না পারা। আফগানিস্তানে বিদেশি শত্রুসেনার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক জোটের হস্তক্ষেপের কারণে তালেবানের পুনর্জাগরণ হয়নি। তাহলে এখন এর সমাধান? তারা বলে, 'এর সবচেয়ে সহজ সমাধান হলো আরও সৈন্য মোতায়েন এবং রাষ্ট্র নির্মাণ কার্যক্রম জোরদার।'[২৩]

তথ্যসূত্র

১. Matthieu Aikins, "Afghanistan: The Making of a Narco State," Rolling Stone, December 4, 2014.

২. John Nova Lomax, "WikiLeaks: Texas Company Helped Pimp Little Boys to Stoned Afghan Cops," Houston Press, December 7, 2010.

৩. "Corruption Perceptions Index, National Integrity System's Assessment, Afghanistan, 2015," Transparency International; Rod Nordland and Jawad Sukhanyar, "US-Backed Effort to Fight Afghan Corruption Is a Near-Total Failure, Audit Finds," New York Times, September 27, 2016.

৪. James Gerstenzang and Lisa Getter, "Laura Bush Addresses State of Afghan Women," Los Angeles Times, November 18, 2001.

৫. Gopal, No Good Men, 173.

৬. Margolis, War at the Top of the World, 67-68.

৭. Scott Baldauf, "Afghanistan's New Jihad Targets Poppy Production," Christian Science Monitor, May 16, 2005; Gareth Porter, "Afghanistan: US, NATO Forces Rely on Warlords for Security," Inter Press Service, October 29, 2009; Abagail Hall, "America Risks Losing the War on Terror in Afghanistan Unless it Legalizes the Opium Trade," Quartz, December 9, 2016.

৮. Suhrke, When More is Less, 15-17.

৯. "Navigating Risk and Uncertainty in Afghanistan," World Bank, Brussels Conference on Afghanistan, October 4–5, 2016, cited in "High-Risk List," Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, January 2017.

১০. Patrick Cockburn, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, December 20, 2010.

১১. "Corruption in Conflict: Lessons Learned from the US Experience with Corruption in Afghanistan," Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, September 2016.

১২. Suhrke, When More is Less, 1-8.

১৩. Cassandra Vinograd, "US Spent $43 Million on Afghanistan Gas Station," NBC News, November 2, 2015.

১৪. "High-Risk List," SIGAR.

১৫. "Primary and Secondary Education in Afghanistan: Comprehensive Assessments Needed to Determine the Progress and Effectiveness of over $759 Million in DOD, State, and USAID Programs," Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, April 2016.

১৬. Steve Rennie, "Afghan Enrollment Claims Fail to Make Grade; School Numbers Don't Add Up," Winnipeg Free Press, February 10, 2011.

১৭. Cheryl Benard, "Expensive and Useless: America's Botched Afghanistan Aid," National Interest, June 7, 2016.

১৮. Maria Abi-Habib, "At Afghan Military Hospital, Graft and Deadly Neglect," Wall Street Journal, September 3, 2011.

১৯. Gareth Porter, “General’s Defense on Afghan Scandal Ducks Key Evidence,” Inter Press Service, September 13, 2012.

২০. Rajiv Chandrasekaran, “US Construction Projects in Afghanistan Challenged by Inspector General’s Report,” Washington Post, July 30, 2012.

২১. Pratap Chatergee, “Paying Off the Warlords,” in The Case for Withdrawal from Afghanistan, edited by Nick Turse, (New York: Verso, 2010), 82-86.

২২. “Afghanistan’s Road Infrastructure: Sustainment Challenges and Lack of Repairs Put US Investment at Risk,” Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, October 29, 2016; Megan McCloskey et al., “We Blew $17 Billion in Afghanistan. How Would You Have Spent It?,” ProPublica, December 17, 2015.

২৩. Suhrke, When More is Less, 12-13.

আদিবাসীদের দেশ?

সমরবিদ রবার্ট কাপলানের মতে, প্রাচীন আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের 'আদিবাসীদের দেশ' এবং মুসলিমবিশ্বের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।[১] প্রাচীন আমেরিকায় আমাদের বাহিনীর এবং আমাদের সভ্যতার কাছে রেড ইন্ডিয়ানদের হারতে অথবা মরতে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়ে 'আদিবাসী'দের জায়গায় এসেছে আমাদের নকল কাউবয়দের (মার্কিন সামরিক বাহিনী) কল্পনা করা যেতে পারে। ভিনদেশে তাদেরকে এখন আধুনিক এবং ক্রমশ শক্তিশালী তালেবানকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

২০০৪ সাল নাগাদ কেন্দ্রীয় তালেবানের কয়েকজন নেতা দক্ষিণাঞ্চলের হেলমান্দ প্রদেশে প্রত্যাবর্তন করে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সে সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড আল-কায়েদা এবং তালেবানকে মিলিয়ে মিশিয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছিলেন। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, এই 'দীর্ঘ এবং নির্মম যুদ্ধে' সেনাবাহিনী লড়াই কিংবা অগ্রগতি সম্পর্কে তার বিভাগ সম্পূর্ণ অজ্ঞ![২] অতঃপর, ২০০৪ সালের বসন্তে রামসফেল্ড আফগানিস্তানে সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণ করে ২০ হাজারে উন্নীত করেন।[৩] মার্কিন জোটের ক্রমবর্ধমান দখলদারির বিরুদ্ধে স্থানীয় অসন্তোষকে কেন্দ্র করে ২০০৫ সালের শুরুতে পরিস্থিতি আবারও অস্থিতিশীল হতে শুরু করে। চলমান দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধের লাদেনপন্থি যোদ্ধাদের কাছ থেকে তালেবান এই সময়ের মধ্যে আত্মঘাতী হামলার কৌশল রপ্ত করে নিয়েছিল। প্যাট্রিক ককবার্ন বলেন, 'প্রতিরোধ যুদ্ধকে দমন করতে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও অন্যরা আফগানিস্তানের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং নিপীড়ক আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য নিজেদের সেনা মোতায়েন করে। কিন্তু এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা উল্টো প্রতিরোধ যুদ্ধকে আরও ব্যাপকভাবে উসকে দিচ্ছিল।' পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন সাবেক পশতুন জেনারেল ককবার্নকে জানান, 'পশতুন সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রীয়

বিষয় হচ্ছে বিদেশিদের প্রতি বৈরী মনোভাব।[৪] তাই দখলদারির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কখনোই শেষ হওয়ার নয়।' নতুন সরকারকে টক্কর দিতে পশতুন প্রভাবিত এলাকাগুলোতে তালেবান ছায়া আদালত গঠন করেছে। একই সময়ে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কারণে বুশ প্রশাসন পূর্বপরিকল্পিত সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বাতিল করে। ম্যাকক্লাচি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন মোতাবেক, 'আফগানিস্তান ধীরগতিতে ইরাকে রূপান্তরিত হচ্ছে। ক্ষমতা থেকে উৎখাতের পাঁচ বছর পর নতুন প্রজন্মের জানবাজ যোদ্ধাদের নিয়ে তালেবান নতুন উদ্যমে ফিরে এসেছে। ২০০১ সালে মার্কিন নেতৃত্বে আগ্রাসনের পর থেকে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে সহিংসতা, আফিম পাচার, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অরাজকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।'[৫]

মার্কিন সংবাদমাধ্যম আফগান আগ্রাসনে বিশেষত পশতুন প্রভাবশালী দক্ষিণাঞ্চলে সামরিক ও বেসামরিক রাষ্ট্রগঠন প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের ঘাটতি রয়েছে বলে অভিযোগ করে। কিন্তু এই বাড়তি হস্তক্ষেপ পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল করার বদলে সর্বদা আরও অস্থিতিশীল করেছে। পাঁচ বছরের অধিক সময় ধরে আফগানিস্তানে থাকা সাংবাদিক জিন ম্যাককেনজি জানান, 'সাধারণ আফগানরা আশির দশকের সোভিয়েত আগ্রাসনের সঙ্গে মার্কিন আগ্রাসনের পার্থক্য আছে বলে মনে করে না। তারা দেখতে পায়, মার্কিন সৈন্যরা তাদের সম্মান করে না এবং মার্কিন তাদের সাহায্য করতেও আসেনি। তাই প্রতিবার সৈন্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আফগান বিদ্রোহও শক্তিশালী হতে থাকে।'[৬]

২০০৪ সাল নাগাদ মার্কিন জেনারেল এবং সমরবিদেরা আফগানিস্তানের যুদ্ধকে 'দীর্ঘ লড়াই' এবং মধ্য এশিয়াকে 'সংকট চত্বর' ডাকা শুরু করে। এই 'দ্য লং ওয়ার' বা 'দীর্ঘ লড়াই' শুধু ভাষাগত পরিবর্তন ছিল না। এই শব্দচয়ন ৯/১১-র পর থেকে আমেরিকার কৌশলগত ভাবনার পরিবর্তনও নির্দেশ করে। মার্কিন কমান্ডাররা ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্র পেরিয়ে অনন্ত সময় ও বিস্তৃত জায়গাজুড়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামি মৌলবাদের মুখোমুখি হতে শুরু করে। পেন্টাগনের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'এই লড়াই বহু দেশব্যাপী বহু বছর ধরে লড়তে হতে পারে।'

২০০৩ সালের ইরাক আক্রমণের মতো বৃহৎ পরিসরে গতানুগতিক সামরিক অভিযানের পরিবর্তে এখন দ্রুতগামী ও গোপন সন্ত্রাসবিরোধী বাহিনী নিয়োজিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ হচ্ছে বিশেষ বাহিনীর সংখ্যা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি, মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াদি ও সিভিল

অ্যাফেয়ার ইউনিটে অতিরিক্ত ৩ হাজার ৭০০ জন অর্থাৎ ৩৩ শতাংশ সদস্য বৃদ্ধি, দ্বিগুণ চালকবিহীন ড্রোন মোতায়েন, নিয়মিত হামলার ক্ষেত্রে সাবমেরিন থেকে ছোড়া আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার, উপকূলে নৌ-সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিশ্বের যেকোনো স্থানে আণবিক বোমা শনাক্তকরণ ও সেটিকে নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করার জন্য চৌকস দল মোতায়েন এবং দূরপাল্লার বোমারু বাহিনী মোতায়েন ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ অভিযানে কোনো নির্দিষ্ট দেশকে সরাসরি হামলার লক্ষ্যবস্তু না বানালেও পেন্টাগন মধ্যপ্রাচ্য থেকে হর্ন অব আফ্রিকা, উত্তর আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর ককেশাসে প্রভাব বিস্তার করতেও দ্বিধা করবে না। ১৯৪৬ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত স্নায়ুযুদ্ধ যেভাবে পৃথিবীকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল, তেমনিভাবে এই 'দীর্ঘ যুদ্ধ'ও পরবর্তী বহু দশকের জন্য বিশ্বের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করবে।[৭] এ জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ২৫ বছর পর এসে হাতে বানানো স্থলমাইন এবং একে-ফোরটি সেভেন অপেশাদার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়তে এত নিউক্লিয়ার সাবমেরিন প্রয়োজন হচ্ছে।

২০০৬ সালে কথিত 'ধাপ-৩'-এর অধীনে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করা হলে অনেক আফগান গোষ্ঠী তালেবানের পক্ষে চলে আসে। *অ্যান এনিমি উই ক্রিয়েটেড* বইয়ের লেখকদ্বয় জানান, 'অনেকের মতে, অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধের হিসাব মেটাতে আফগানিস্তানের বহু জায়গায় এবং বিশেষভাবে ব্রিটিশ সেনাদের দখলে থাকা হেলমান্দ প্রদেশে জনসাধারণ প্রতিরোধ যুদ্ধে যুক্ত হতে শুরু করে। এই সাধারণ জনগণের হতাশা ও অধিকার হারানোর অনুভূতিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে তালেবানও কোনো প্রকার কার্পণ্য করেনি।'[৮]

২০০৭ সালে বুশ প্রশাসন স্বীকার করে যে ২০০৬ সালে আফগানিস্তানে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন বিফল হয়েছে। তাই তারা আরেকবার পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়! আফগানিস্তানে ন্যাটো মিত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কারজাই সরকারে সহায়তা বাড়ানোর জন্য চাপ দিতে পররাষ্ট্রসচিব কন্ডোলিৎসা রাইস ব্রাসেলসে যান। আফগানিস্তানে ন্যাটোর সঙ্গে কাজ করা পররাষ্ট্র বিভাগের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা কার্ট ডি ভলকার ওয়াশিংটন পোস্টকে জানান, 'এই বসন্তে সবাই তালেবানের সামরিক সফলতা নিয়ে কথা বলছে। অথচ আগ্রাসী কিছু করার থাকলে তা আমাদের করা উচিত, এটা নিয়েই এখন আলোচনা করা প্রয়োজন। এটা এখন শুধু সামরিক কোনো বিষয় নয়। এটা উন্নয়ন, মাদক নির্মূল, পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম এবং সামরিক ক্ষেত্র মিলিয়ে একটি বিস্তৃত বিষয়।' ওয়াশিংটন পোস্টকে আরেকজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেছিলেন, 'দক্ষিণাঞ্চলে

মার্কিন সেনাদের খুব খারাপ একটি বছর কাটবে। দুর্নীতি, আফিম উৎপাদন, রাস্তা ও অন্যান্য অবকাঠামোর ঘাটতি ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তাদের।' তারা যেন বলতে চাইছিল, আরও কয়েক শ কোটি ডলার এবং কিছু সামরিক মিশন হয়তো এসব সমস্যা থেকে আমাদের মুক্তি দেবে!

২০০২-০৩ মেয়াদে আফগানিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট পি ফিন বলেন, 'আমি একদম শুরুতেই বলেছিলাম, আফগানিস্তানে আমাদের পর্যাপ্ত অর্থ এবং সৈন্য নেই এবং আজ ছয় বছর পরও আমি তা-ই বলব।' পরবর্তী রাষ্ট্রদূত এবং বর্তমানে জাতিসংঘে মার্কিন বিশেষ প্রতিনিধি জালমে খলিলজাদ জানান, 'আমি মনে করি, দেশ পুনর্গঠন ও জাতিরাষ্ট্র নির্মাণে আমরা অনিচ্ছাপূর্বক জড়িয়ে পড়েছি। অনেক পূর্বেই এসব সমস্যার সমাধান করা যেত।' অন্যদিকে, কাবুলে খলিলজাদের স্থলাভিষিক্ত রোনাল্ড ই নিউম্যানের মতামত হলো, 'জঙ্গিদের নির্মূল করে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে পারা এবং জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের কাজ শেষ না করার ধারণা একটি বড় ভুল।' অর্থাৎ আরও টাকা, আরও সেনা, আরও সহায়তা, আরও সময়। এগুলো যতই ব্যয় করা হোক, তাদের চোখে কখনোই পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে না।

২০০৭-০৮ নাগাদই আফগানিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মার্কিন জোট এবং তাদের মদদপুষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে এই অন্যায় যুদ্ধের ভুক্তভোগী পশতুনরা ছাড়াও হাজারা, শিখ ও উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মার্কিন সেনাদের নিত্যকার রুটিন হয়ে দাঁড়ায় অ্যাম্বুশের শিকার কিংবা গুলিবিদ্ধ হওয়া।[৯] পশ্চিমাঞ্চলে আটকে পড়া সৈন্যদের কাছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছাতে নিরাপত্তা বাবদ তালেবানকে বিপুল অর্থ প্রদান করতে হয়। নিরাপত্তার জন্য তালেবানসহ অন্যান্য বিদ্রোহী দল ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে গিয়ে সেনাবাহিনী লাখ লাখ ডলার খরচ করছিল।[১০] এই ডলার তারা পুনরায় মার্কিনদের ওপরই প্রয়োগ করত। সব মিলিয়ে যুদ্ধটি একটি প্রহসনে পরিণত হয়। মার্কিন সেনাবাহিনী এমনকি নিজেদের পণ্য সরবরাহকারী ট্রাককে সামনে-পেছনে সুরক্ষা দিতে তালেবানদের গাড়ি ভাড়া করত। তৎকালীন আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পুত্র হামিদ ওয়ারদাকের কোম্পানি মার্কিন সরবরাহকারী গাড়িগুলোর সুরক্ষার জন্য তালেবান যোদ্ধাদের ভাড়া করে দিত। এমনকি নিজের লভ্যাংশ ও যুদ্ধকে আরও দীর্ঘায়িত করার জন্য তদবির করতে সে ওয়াশিংটনে প্রতিষ্ঠান খুলে বসে।[১১] সর্বোপরি, আফগান অভিযানের পেছনে যুক্তি খুঁজতে চাইলে সব যৌক্তিকতা ত্যাগ করলেই হয়তো সেটা পাওয়া সম্ভব।

তথ্যসূত্র

১. Robert Kaplan, Imperial Grunts: On the Ground with the American Military, from Mongolia to the Philippines to Iraq and Beyond (New York: Random House, 2005), 4; Andrew J. Bacevich, "Robert Kaplan: Empire Without Apologies," Nation, September 8, 2005.

২. "Rumsfeld's War on Terror Memo," USA Today, October 16, 2003.

৩. Associated Press, "A Timeline of US Troop Levels in Afghanistan Since 2001," Military Times, July 6, 2016; "Bush Announces New Steps to Aid Afghanistan," Voice of America News, June 19, 2004.

৪. Patrick Cockburn, The Age of Jihad: Islamic State and the Great War for the Middle East (New York: Verso, 2016), 183-184.

৫. Jonathan Landay, "4 US Troops Killed in Afghanistan as Insurgents Step Up Attacks," McClatchy, August 21, 2005.

৬. Jean McKenzie, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, September 9, 2009.

৭. Simon Tisdall and Ewen MacAskill, "America's Long War," Guardian, February 15, 2006.

৮. Van Linschoten and Kuehn, An Enemy We Created, 272-279.

৯. Sands, The Case for Withdrawal from Afghanistan.

১০. Gopal, No Good Men, 275.

১১. Aram Roston, "Afghan Lobby Scam: Has a Major Military Contractor in Afghanistan Created an Astroturf Organization to Promote Long-term US Engagement?," Nation, December 22, 2009.

পাকিস্তান ও ক্ষমতাচ্যুত তালেবান

৯/১১-পরবর্তী কয়েক বছর পাকিস্তানি ন্যাশনাল পুলিশ এই হামলার কয়েকজন পরিকল্পনাকারীসহ ডজনখানেক আল-কায়েদা কুশলীকে গ্রেপ্তার করতে এফবিআই এবং সিআইএকে সাহায্য করে। এদের মধ্যে প্রধান হাইজ্যাকার মুহাম্মদ আত্তার বন্ধু এবং এই হামলার একজন সমন্বয়ক রমজি বিন আস-সিবহ, ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলাকারী রমজি ইউসুফের চাচা খালিদ শেখ মুহাম্মদ অন্যতম। আল-জাজিরার জুসরি ফুদার কাছে উভয় ব্যক্তিই হামলার পেছনে নিজেদের ভূমিকা নিয়ে গর্ব করেছিলেন।[১]

কিন্তু পলাতক তালেবান নেতাদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (ISI)-এর অনেক কর্মকর্তার ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে যায়। অনুসন্ধানী সাংবাদিক সিমর হার্শ বলেন, ‘তালেবান নেতাদের সঙ্গে অনেক পাকিস্তানি সেনা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। যুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তান তাদের বিমানবাহিনীর সহায়তায় অনেক তালেবান নেতাকে আফগানিস্তান থেকে সরিয়ে নেয়। আমেরিকাও এর বিরোধিতা করেনি। তবে এটা ছিল দীর্ঘদিনের মিত্র পাকিস্তানের সঙ্গে এক জটিল সম্পর্কের সূচনা। কারণ পাকিস্তান নিজ দেশে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করছিল। আবার একই সঙ্গে আফগানিস্তানে আমেরিকার শত্রু আফগান তালেবান, হিজব-ই-ইসলামি ও হাক্কানি নেটওয়ার্ককে সীমান্ত দিয়ে অবাধ অনুপ্রবেশ ছাড়াও আরও অনেকভাবে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল।’[২]

ভিয়েতনাম যুদ্ধে লাওস ও কম্বোডিয়ার অভয়ারণ্যে থাকা দক্ষিণ ভিয়েতনামী ভিয়েতকংকে হারাতে গিয়ে আমেরিকা ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। আফগানিস্তানের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি সেদিকেই মোড় নিতে থাকে। আমেরিকার মিত্র হওয়া সত্ত্বেও এসব দেশ ভিয়েতকংকে থামাতে অসমর্থ

ছিল। এই অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ হিসেবে সেসব দেশে ভিয়েতকংয়ের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে গোপন অভিযান ও বিমান হামলা করতে হয়েছিল।[৩]

পাকিস্তানি ভূখণ্ডে আমাদের শত্রুদের আশ্রয় এবং সহযোগিতার কারণেই আমরা সেসব শত্রুদের অবরুদ্ধ করে নির্মূল করতে পারিনি। কিন্তু আমাদের মিত্র পাকিস্তানের এই ধোঁকাবাজির কারণ কী? উত্তরটা খুবই সহজ: পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আফগানিস্তানকে নিজেদের আঙিনা মনে করে। পূর্বদিকের শত্রু ভারতের বিরুদ্ধে সামগ্রিক কিংবা আণবিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে আফগানিস্তানকে তারা একটি কৌশলগত নিরাপদ ভূমি হিসেবে দেখে।[৪] জন্মলগ্ন থেকেই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটি চিরবৈরী সম্পর্ক বিরাজমান। এখন পর্যন্ত তারা চারবার যুদ্ধে জড়িয়েছে। বর্তমানে উভয় দেশই পারমাণবিক শক্তিধর। ভারত অধিকৃত কাশ্মীর এই দুই দেশের মধ্যকার উত্তেজনা ও সম্ভাব্য সংঘাতের অন্যতম কারণ। এ জন্যই দশকের পর দশক ধরে আফগানিস্তানে নিজেদের মিত্রদের ক্ষমতায় রাখা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি অন্যতম মিশন।[৫]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে ভারতীয় মিত্র উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সঙ্গে শুরুতেই হাত মিলিয়েছিল। এরপর তারা হাজার হাজার আফগান সেনাকে ভারতে প্রশিক্ষণের চুক্তি করে।[৬] পাশাপাশি আফগান ন্যাশনাল আর্মির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের মাধ্যমে রাশিয়ান অ্যাটাক হেলিকপ্টার এবং অন্যান্য অস্ত্র সরবরাহ করছে।[৭] আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিবেশী চীনকে চাপে রাখার বৃহত্তর কৌশলগত স্বার্থে ভারত সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র বিবেচনা করে এবং তাদেরকে খুশি রাখতে চায়। কিন্তু একই সঙ্গে আফগানিস্তানে ভারতের আধিপত্য পাকিস্তান সরকারের কাছে অসহনীয় হয়ে দেখা দেয়। ভারতকে প্রতিহত করতে পাকিস্তানও তাদের মিত্র এবং আদর্শিক ভাই আফগান তালেবানকে ও বৃহত্তর পশতুন বিপ্লবকে সমর্থন করাকে জরুরি মনে করে। মূলত, এই কারণেই ১৯৯০-র দশকে তালেবানের উত্থানকে পাকিস্তান সমর্থন দিয়েছিল। আবার ২০০০ সালের দিকে আইএসআই ভালেবানকে ব্যাপক সহায়তা শুরু করেছিল। কিন্তু ২০০৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত আমেরিকা এই বিষয়টিতে নজর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি।[৮] আমেরিকা এক মিত্রকে (ভারত) তোষামোদ করছিল অন্য মিত্রকে (আফগান সরকার) সহায়তা করার জন্য, যা তৃতীয় মিত্রকে (পাকিস্তান) বাধ্য করেছে আমাদের এবং প্রথম মিত্রের শত্রুকে (তালেবান) সহায়তা করতে। এতে করে আমেরিকা তৃতীয় মিত্রকে (পাকিস্তান) প্রথম মিত্রের শত্রুর (তালেবান) মুখাপেক্ষী করে তুলেছে। এই চক্রটি এভাবেই

দেড় যুগ ধরে চলমান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা এর চেয়েও অনেক জটিল। এ ছাড়া, আমাদের আরেক মিত্র সৌদি শাসকগোষ্ঠীও শুরু থেকেই তালেবান বিদ্রোহকে আর্থিকভাবে সহায়তা করছে। কারণ তালেবানই একমাত্র সৌদি আরবের শত্রু ইরানের সঙ্গে জোটবদ্ধ আফগানিস্তানের শিয়া উপজাতি হাজারাদের লাগাম টেনে ধরতে পারে।[৯]

আফগান যুদ্ধের গতিবিধি বুঝতে বুশ প্রশাসন মন্থর হলেও ওবামা প্রশাসন দ্রুতই উপলব্ধি করতে পারে যে তালেবান সমস্যার শিকড় রয়েছে খোদ পাকিস্তানে। তখন ওবামা প্রশাসন এই সংঘাতটিকে আফ-পাক যুদ্ধ হিসেবে পুনঃনামকরণ করেন। ওবামা ও তার প্রশাসনের কাছে এটাও স্পষ্ট ছিল যে, আফগান তালেবান ও হক্কানি নেটওয়ার্ককে পাকিস্তান কর্তৃক সহায়তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, আফগান ন্যাশনাল আর্মির সঙ্গে ভারতের মিত্রতা।[১০] তারপরও ওবামা প্রশাসন ভারতকে আফগান সরকারের মিত্র হিসেবে উপস্থাপন করার নীতিতে অটল থাকে। অন্যদিকে সিআইএ পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ড্রোন হামলার সম্প্রসারণ ঘটায়। এই হামলার প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল আল-কায়েদা ও পাকিস্তানি তালেবান বা তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (TTP)। উল্লেখ্য, টিটিপি তথা তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান আফগান তালেবান থেকে ভিন্ন একটি গোষ্ঠী। পাকিস্তানের ভূখণ্ডে আত্মগোপন থাকা আল-কায়েদার অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় সদস্যদের নির্মূলে সহায়তার জন্য পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করাও এই যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তবে আফগান তালেবান নেতারা মার্কিন ড্রোন থেকে অনেক দূরে পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমের কোয়েটা অঞ্চলে নিরাপদেই অবস্থান করছিল। শপথ গ্রহণের পরপরই নতুন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান মাইক ম্যাককোলেল জানিয়েছিলেন, জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের কারণে কোয়েটায় ড্রোন হামলা সম্ভব হচ্ছে না।[১১] তাই সিআইএ গোপনে 'কাউন্টার টেরোরিজম পারাস্যুট টিম' গঠন করে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা পাকিস্তানি তালেবান ও হাক্কানি নেটওয়ার্কের সাধারণ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সীমিত সফলতা পেয়েছিল। কিন্তু, আফগান তালেবান ও হাক্কানি নেটওয়ার্কের নেতারা নাগালের বাইরেই থেকে যায়।[১২]

যাহোক না কেন, যুক্তরাষ্ট্র আফগান তালেবানকে সহায়তার নীতি থেকে সরে আসার জন্য পাকিস্তানকে চাপও দিতে পারছিল না। কারণ আফগানিস্তানে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর রসদ জোগান দিতে হলে তাদেরকে পাকিস্তানের করাচি বন্দর থেকে খাইবারপাস হয়েই যেতে হয়। মার্কিন দখলদারি বজায়

রাখার জন্য ২০১১ সাল নাগাদ ৮০ শতাংশ রসদ এই পথে পরিবহন করা হয়েছে।[১৩] ইতোমধ্যে একটি কথিত দুর্ঘটনামূলক হামলায় মার্কিন হেলিকপ্টার পাকিস্তানের দুটি সীমান্তচৌকিতে ২৮ জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করে। পাকিস্তান এর পাল্টা জবাবে ন্যাটো জোটের বহরে জঙ্গি হামলার সুযোগ করে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ ২০১২ সালে প্রায় পুরো সময়ের জন্য এই সরবরাহ লাইন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[১৪] যুক্তরাষ্ট্রকে তখন রসদ সরবরাহের জন্য রাশিয়ার মধ্য দিয়ে উত্তরাঞ্চল দিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে হয়েছে।[১৫] এর পর থেকে ওবামা প্রশাসনকে এই অঞ্চলে তাদের সীমাবদ্ধতা বোঝাতে পাকিস্তানকে আর কিছু করতে হয়নি।

আফগান তালেবান ও হাক্কানি নেটওয়ার্ককে সহায়তার পরও পাকিস্তান সরকারের প্রতি আমেরিকা কঠোর না হওয়ার অন্য কারণও ছিল। যেমন: ড্রোন হামলা চালাতে ওবামা প্রশাসনের পাকিস্তানের সহায়তার প্রয়োজন। এ ছাড়া হরেক রকমের চরমপন্থি গোষ্ঠীতে পরিপূর্ণ পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তান সরকারকে আরও অস্থিতিশীল করার ফলাফলও ভবিষ্যতের জন্য ভয়ানক হতে পারে। এ জন্য প্যাট্রিক ককবার্ন বলেছিলেন, তালেবানের পুনরুত্থানকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পুরোপুরি সমর্থন করলে আফগানিস্তানে আমেরিকার শোচনীয় পরাজয় ঘটবে। সর্বোপরি আমেরিকা আফগান অভিযানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মতো একই ধরনের কৌশলগত দুর্বলতার সম্মুখীন। সোভিয়েতবিরোধী মুজাহিদিনদের মতো মার্কিনবিরোধী তালেবানও কোনো প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হলেই বিশ্রাম, পুনর্গঠন ও পুনর্সজ্জার জন্য পাকিস্তানের ১ হাজার ৬০০ মাইল সীমান্ত পেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারে।

দায়িত্ব গ্রহণের শুরুর দিকেই প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে জানানো হয়েছিল যে, আমেরিকা আফগানিস্তানে সামরিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার মূল কারণ পাকিস্তানে হলেও ওয়াশিংটনের পক্ষে এর কার্যকরী সমাধান বের করা সম্ভব হয়নি।[১৬] ১৯৯০ সালের শেষ দিকে স্বিগনিফ ব্রজেন্সকি বলেছিলেন, ভারত, রাশিয়া ও ইরানকে আটকে রাখতে আফগানিস্তানে চীন-পাকিস্তান-তালেবান জোটকে সমর্থন করাতেই আমেরিকার স্বার্থ নিহিত ছিল।[১৭] কিন্তু ২০০১ থেকে আমেরিকা ঠিক এর বিপরীতটাই করছে। প্রশ্ন হলো, ১৯৯৭ সালে ব্রজেন্সকি আমেরিকার স্বার্থ উপলব্ধি করতে ভুল করেছিল নাকি তখন থেকেই প্রশাসন ভুল পক্ষের জন্য লড়ছে? উভয় ক্ষেত্রেই আমেরিকা নিজের আগের অবস্থান অগ্রাহ্য করে কাবুল সরকারকে টিকিয়ে রাখতে স্বল্প মেয়াদে ভারতের সাহায্য

নেওয়াকে জরুরি মনে করেছে। কিন্তু এসবের বিনিময়ে দীর্ঘ মেয়াদে পাকিস্তান ও পশতুনদের পক্ষ থেকে কঠিন প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১. Yosri Fouda, "Top Secret - The Road to September 11," al Jazeera, September 11, 2002, YouTube video, 41:08; Giles Tremlett, "Al-Qaeda Leaders Say Nuclear Power Stations Were Original Targets," Guardian, September 8, 2002.

২. "Pakistan Continues to Be Safe Haven for Terrorists: Pentagon Report Says Haqqani Network Biggest Threat," First Post, December 17, 2016.

৩. George Wright, "Declassified Files Portray Lon Nol as 'Shaken' Man," Cambodia Daily, January 20, 2017.

৪. Barbara Elias, ed., "Pakistan: 'The Taliban's Godfather'?," National Security Archive at George Washington University; Khalid Masood Khan, "The Strategic Depth Concept," Nation (Pakistan), October 16, 2015.

৫. Margolis, American Raj, 198.

৬. Tom Wright and Margherita Stancati, "Karzai Sets Closer Ties with India on Visit," Wall Street Journal, October 5, 2011.

৭. Franz-Stefan Gady, "US General Asks India for More Military Assistance in Afghanistan," Diplomat, August 14, 2016; Franz-Stefan Gady, "India Delivers 4th Combat Helicopter to Afghanistan," Diplomat, December 1, 2016.

৮. Patrick Cockburn, Chaos and Caliphate: Jihadis and the West in the Struggle for the Middle East (New York: OR, 2016), 182-183.

৯. Carlotta Gall, "Saudis Bankroll Taliban, Even as King Officially Supports Afghan Government," New York Times, December 6, 2016.

১০. Woodward, Obama's Wars, 216.

১১. Ibid., 7-8.

১২. Gareth Porter, "Pakistan Drone Story Ignored Military Opposition to Strikes," Inter Press Service, October 25, 2013.

১৩. Ahmed Rashid, Pakistan on the Brink: The Future of America, Pakistan and Afghanistan, (New York: Penguin, 2012), 167-168.
১৪. Christian Parenti, “With Friends Like These: On Pakistan,” Nation, April 30, 2013.
১৫. Richard Norton-Taylor et al., “Convoy Attacks Trigger Race to Open New Afghan Supply Lines,” Guardian, December 9, 2008.
১৬. Cockburn, Chaos and Caliphate, 203.
১৭. Brzezinski, The Grand Chessboard, 139, 149, 187.

মৃত্যু উপত্যকা

ভিয়েতনামে বিধ্বংসী আগ্রাসন যেমন কোরিয়ান যুদ্ধের কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল, ঠিক তেমনি ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে নানাবিধ ঘটনা মার্কিন জনগণকে আফগানিস্তান যুদ্ধকে ভুলিয়ে দিয়েছে। ৯/১১-র প্রতিশোধের উত্তেজনা স্তিমিত হলে মার্কিন টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের গ্রাহকেরা এই যুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। গণমাধ্যমগুলো ছুটির দিনগুলোতে কিছু লোকদেখানো কারসাজির বাইরে যুদ্ধের সঠিক খবর অনুৎসাহী হয়ে পড়ে।

আফগানিস্তানের দুর্গম পূর্বাঞ্চলে 'কোরেঙ্গাল ভ্যালি' বা 'মৃত্যু উপত্যকায়' নিযুক্ত মার্কিন সেনাসদস্যদের নিয়ে সাংবাদিক সেবাস্টিয়ান জাঙ্গার জনপ্রিয় দুটি ডকুমেন্টারি প্রযোজনা করেন। সেগুলো হলো— রেস্ট্রেপো (Restrepo, 2010) ও কোরেঙ্গাল (Korengal, 2014)। এই ডকুমেন্টারি দুটিতে আফগান যুদ্ধে অর্থ এবং জীবনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা তুলে ধরা হয়।[১] একজন আফগান কাঠ ব্যবসায়ীর কুপরামর্শে ২০০২ সালে কোরেঙ্গাল উপত্যকায় সংঘাত শুরু হয়। এই সংঘাত সৃষ্টির পেছনে তার আসল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় গোত্রপতি ও কয়েকজন প্রতিপক্ষ ব্যবসায়ীকে নিজের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া। তাই স্থানীয় জনগণকে 'তালেবান সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়ে মার্কিন সেনাদের ভুল তথ্য দেওয়া হয়। আমাদের সেনারা এমনকি একজন মার্কিন সমর্থক গোত্রনেতাকে ধোঁকা দিয়ে গুয়ানতানামোতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারা বোমা মেরে ওই কাঠ ব্যবসায়ীর প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করতে থাকে। অতঃপর 'দ্রুতই একের পর এক গ্রাম প্রতিরোধযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।'[২]

কোরেঙ্গালের জনসাধারণ আফগানিস্তান সম্পর্কে আমেরিকার চেয়ে কম জানত। জন্মভূমির উপত্যকা আর গ্রামগুলোই ছিল তাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী। জন্মলগ্ন থেকে তারা সেখানে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটিয়ে আসছিল। কিন্তু তাদের সেই নির্বিবাদী জগতে ভারী অস্ত্রসজ্জিত মার্কিনদের আগমন ঘটে। আমেরিকার

কোনো ঘটনার সঙ্গে কোরেঙ্গালের বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতা ছিল না। শুধু তা-ই নয়, তারা মার্কিনদের দেখে প্রথমে রুশ সৈন্য ভেবেছিল! তার মানে, এক যুগেরও আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনা প্রত্যাহার ও পতনের বিষয়ে তারা কিছু জানত না। সাম্প্রতিক মার্কিন আগ্রাসন সম্পর্কেও তাদের কোনো ধারণা ছিল না![৩] কিন্তু সেনারা এই নির্দোষ গ্রামবাসীর মোকাবিলা করতে সেখানে যায়নি। বরং তাদেরকে সেখানে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য বলা হয়েছিল! তাই স্থানীয়দের রক্ষার্থে যে কাউকে হত্যা, বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড এবং মৃত্যু তাদের কাছে যুক্তিযুক্ত ছিল।

যাহোক, কোরেঙ্গালের একজন মার্কিন যোদ্ধা কাইল স্ট্যাইনারের বক্তব্য আমাদের আফগানিস্তানে আমেরিকার পুনর্গঠন প্রকল্পের ব্যর্থতার কারণ বুঝতে সাহায্য করে। তিনি জানান, 'উপত্যকার লোকজনের মন জয় করতে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত একদল বিদেশি তরুণ যোদ্ধাকে সেই উপত্যকায় পাঠানো হয়। অবান্তর কাজের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল এই পদক্ষেপ। সেখানে যাও আর তাদের বন্ধুর মতো আচরণ করো— এই নির্দেশনা সব সময় মানা যায় না। বিশেষ করে রাস্তার পাশে বোমা পুঁতে রাখার সময় হাতেনাতে ধরার পর তো তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা যায় না। মুখের ওপর থুতু নিক্ষেপ কিংবা 'কাফের' ও অন্যান্য গালাগালির সময় সব সময় আবেগ ও যুক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তারা আমাদের ওপর গুলি চালানোর পর স্ত্রী-সন্তানদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করত। আবার অনেকে তার পরিবারের জন্য ১০ বস্তা চাল, স্কুলের জিনিসপত্র, কোট ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে পরক্ষণেই পাহাড়ে উঠে আমাদের লক্ষ্য করে রকেট গ্রেনেড নিক্ষেপ করত। পরদিনই হয়তো ছাগল চরানোর সময় আমাদের দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসত। আমি সেসব আবেগ এবং যুক্তির থোড়াই পরোয়া করি।'

২০১০ সালে সেনাবাহিনী হার মেনে কোরেঙ্গাল উপত্যকা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়। ৪০ জন মার্কিন সেনার প্রাণহানি, শতাধিক আহত এবং অসংখ্য আফগান বেসামরিক জনতার হতাহত হওয়া ব্যতীত এই অভিযানে ভিন্ন কিছু অর্জিত হয়নি। কোরেঙ্গালে লড়াই করা মার্কিন সেনাসদস্য রবার্ট সোতো সেই মৃত্যু উপত্যকা থেকে চলে আসার পর নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আমরা সেখানে তিন ইউনিটের ছিলাম। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ দিয়ে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। আমরা নিয়মিত সহযোদ্ধাদের নিহত দেখেছি। মাত্র ১৮ বছর বয়সে আমি সেখানে যাই। এত অল্প বয়সে যে জিনিসগুলো আমাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে,

সেগুলো আমি মোটেই আশা করিনি। অগ্রগতি সাধনে আমাদের অপারগতা বুঝতে কর্তৃপক্ষের কেন এর দেরি হলো, এটাই আমাকে আশ্চর্যান্বিত করে।' বাস্তবে এটাই পুরো আফগানিস্তান যুদ্ধের আসল চিত্র।[৪]

মার্কিন সরকার এই সৈন্যদের একটি অবান্তর মিশনে দুর্গম এবং বিশ্বাসঘাতক এক পাহাড়ি উপত্যকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে মরতে ও মারতে ছেড়ে দিয়েছিল। সেখানে অদৃশ্য শত্রুরা দূর থেকে গুলি করত এবং চারপাশে বিস্ফোরক মাইন পুঁতে রাখত। এসব অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল এমন এক জায়গায় রাষ্ট্রনির্মাণ, যেখানে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ছিল না।

তথ্যসূত্র

১. Sebastian Junger and Tim Hetherington, Restrepo, (New York: Virgil Films and Entertainment, 2010), DVD; Sebastian Junger, Korengal, (New York: Virgil Films and Entertainment, 2014), DVD.

২. Gopal, No Good Men, 141-143.

৩. Sebastian Junger, War (New York: Twelve, 2010), 47.

৪. Alissa J. Rubin, “US Forces Close Post in Afghan ‘Valley of Death,’” New York Times, April 14, 2010.

সরাসরি হস্তক্ষেপের ভূত

মার্কিন সার্জেন্ট অ্যান্টনি ওয়াকার তিনবার আফগানিস্তানে মোতায়েন ছিলেন। তার মতে, 'রাত্রিকালীন অভিযানে নির্দোষ ব্যক্তিদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ছিল সাধারণ একটি ব্যাপার।' তিনি একসময় শীর্ষস্থানীয় বিশেষ বাহিনী 'জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশনস কমান্ড' (JSOC)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অ্যান্টনি ওয়াকার জানান, 'শতাধিক অভিযানের মধ্যে একটি হয়তো গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো। বাকি অভিযানগুলো হতো লিংকের ভিত্তিতে। এই পদ্ধতিতে দৈবক্রমে ফেঁসে গিয়ে জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আক্রমণের শিকার হওয়াও ছিল একটি নিত্যকার ঘটনা।... অনেক সময় সেসব লোকজন গুলিবিদ্ধ হতো, যারা কিনা গভীর রাতে গোলমাল শুনতে পেয়ে প্রতিবেশীর সাহায্যার্থে ঘরের বাইরে বের হয়েছিল। অভিযান পরিচালনাকারী সেনাদের সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত স্নাইপারদের গুলি তাদের হতাহত করত।' ওয়াকার আরও জানান, 'টার্গেটেড ব্যক্তির দূরসম্পর্কের আত্মীয় অথবা আশ্রয় প্রার্থীদের নিরাপত্তা দেওয়ার মতো ঐতিহ্যবাহী পশতুন নিয়ম পালন করা লোকজনের বাড়িতেও অভিযান চালানো হচ্ছিল। অথচ তালেবান আন্দোলনের সঙ্গে তাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা থাকত না।'[১]

ওয়াকার ২০০৮ সালে পূর্ব আফগানিস্তানের খোস্ত শহরের উপকণ্ঠে ৭৫তম রেজিমেন্টের এক তরুণ সেনা কর্মকর্তার দুটি যুদ্ধাপরাধের সচিত্র প্রমাণ এবং বর্ণনা দেন। তিনি প্রমাণ হিসেবে দুটি ছবি উপস্থাপন করেন। একটি ছবিতে এমন একজন মহিলার লাশ ছিল, যার ঘাড় থেকে একটি বড় চতুর্ভুজাকৃতির টুকরো কেটে নেওয়া হয়েছিল। ওয়াকার জানান, এটি তারই এক সহকর্মীর কাজ। তার সেই সহকর্মী ট্রফি হিসেবে লাশ থেকে মাংস কেটে নিয়েছিল। সেটাকে সে বিজয়োল্লাসে বাতাসেও ছুড়ে মেরেছিল। অপর ছবিটি ছিল মৃত একটি কিশোরী বালিকার মুখমণ্ডল রক্তে ভেসে যাওয়ার। লাশটি একটি AK-47 রাইফেলের

পাশে রাখা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছিলেন যে, নিরস্ত্র বেসামরিক লোককে হত্যা করে পাশে অস্ত্র রেখে ছবি তুলে সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমাণ করার একটি কৌশল ছিল এটি। ওয়াকার আরও জানান, তিনি চেষ্টা করেও এই ঘটনা থামাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ফলে ছবির সেই মহিলা ও কিশোরী মেয়েটি মারা গিয়েছিল। সেই ঘটনায় একটি বাড়িতে নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির খোঁজে অভিযান চালানো হচ্ছিল। অভিযানের সময় আক্রমণকারী দলের ঢাল হিসেবে পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ির ছাদে কয়েকজন স্নাইপার মোতায়েন করেছিল। তবে সেই বাড়িতে 'মিলিটারি এজড মেল' (MAM) অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের নিকট একটি AK-47 ছিল। সে তার বাড়ির ছাদে থাকা ব্যক্তিদের ভয় দেখানোর জন্য ঘরের আস্তরকৃত সিলিংয়ে সতর্কতামূলক গুলি ছোড়ে। ওয়াকার জানান, ছাদের ওপর কোনো ডাকাত মনে করেই হয়তো লোকটি গুলি চালিয়েছিল। কারণ সেই অভিযানে হেলিকপ্টারের শব্দ বা অন্য কোনো স্পষ্ট সংকেত ছিল না। তাই মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতি বোঝার কোনো কারণ নেই। লোকটির পক্ষে ধারণা করার কোনো কারণ ছিল না যে, তার ছাদে থাকা লোকগুলো মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্য। ওয়াকার বলেন, কিন্তু এক রাউন্ড গুলির শব্দেই 'নৃশংসতা শুরু হয়ে যায়।' সিলিংয়ে গুলি চালানোর জবাবে একজন সেনাসদস্য সেই পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে হত্যা করে। অবশেষে দেখা যায়, পরিবারটি কেবল নির্দোষই নয়; বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ও অর্থায়নে পরিচালিত আফগান ন্যাশনাল আর্মির কর্নেল আউয়াল খানের পরিবার। আফগান ন্যাশনাল আর্মিতে তাঁর পদমর্যাদার কারণে এই নৃশংস ঘটনার কিছু সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। এটি ওয়াকারের বর্ণিত কাহিনির সত্যতা নিশ্চিত করেছে। তারা ধারণাও করেনি যে, সেখানে মার্কিন সেনারা থাকতে পারে। তাদের পিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করায় তারা সম্ভবত ভেবেছিল যে তালেবানই বরং প্রতিশোধ নিতে এসেছে। পরবর্তীতে আরও জানা যায়, ওয়াকারের বর্ণনার চেয়ে বেশি মানুষ সেদিন নিহত হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ছিল কর্নেল আউয়াল খানের স্ত্রী, একজন স্কুলশিক্ষিকা, তাদের ১৭ বছরের মেয়ে, ১৫ বছর বয়সী ছেলে (সম্ভবত সেই সতর্ক করার জন্য গুলি ছুড়েছিল), তার ৭ দিন বয়সী ভাই এবং আউয়াল খানের চাচাতো বোনের অনাগত শিশু। আউয়াল খানের চাচাতো বোন পাঁচটি গুলিবিদ্ধ হয়ে তার সন্তানকে হারানোর পরও বেঁচে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আউয়াল খানের আরেক মেয়ে আহত হলেও বেঁচে গিয়েছিল।[২]

যেমনটা বলা হয়েছে, নিরীহ লোকজনের হত্যার পর সন্ত্রাসী প্রমাণের জন্য পাশে রাইফেল রেখে আসা একটি গতানুগতিক ব্যাপার ছিল। তারা এই

পরিবারের ক্ষেত্রেও এমনটা করেছিল। এই বাহিনীর ২ নম্বর ব্যাটালিয়নের কাছে এটি ছিল একটি দৈনন্দিন কাজ। তিনি বলেন, বাস্তবে পুরো রেজিমেন্টই একই কাজ করেছে। দুই তারকাবিশিষ্ট জেনারেল এবং তৎকালীন 'জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশনস কমান্ড' কমান্ডার অ্যাডমিরাল ম্যাক্র্যাভেনের ডেপুটি এই ঘটনার তদন্ত করেছিলেন। তদন্ত শেষ হলে তিনি সৈন্যদের একত্র করেছিলেন। এই বিষয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে কী গল্প বলতে হবে, সেই মিটিংয়ে তিনি তাদের সবকিছু শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তার বানোয়াট গল্প হলো, 'বাড়ির চারজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক একই সঙ্গে AK-47-এর দিকে ছুটে গিয়েছিল বলে তাদের গুলি করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।' সেই চারজনের মধ্যে কিশোরী মেয়েটি এবং তার ১৫ বছর বয়সী ভাইও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আফগানিস্তানে থাকাকালীন ওয়াকার এ রকম আরও অসংখ্য নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়েছিলেন। খোস্ত শহরের নিকটে অন্য একটি মিশনে সেই একই ব্যাটালিয়নের এবং সম্ভবত একই প্লাটুন আরেকটি বাড়িতে অভিযানের সময় একজন নির্দোষ মহিলা এবং তার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করেছিল। সেই মহিলার কাছে একটি বন্দুক থাকার সন্দেহে গুলি চালানো হয়েছিল। খোস্তেই আরেকটি অভিযানে তারা যখন একটি বাড়ির দেওয়াল ভাঙার জন্য বিস্ফোরক স্থাপন করেছিল, তখন আরেকটি বাড়ির থেকে একজন নিরস্ত্র বেসামরিক লোক উঁকি দেয়। ওয়াকার বলেন, 'আমি বলেছিলাম, সে একজন বেসামরিক ব্যক্তি। কারণ আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে সে নিরস্ত্র ছিল।' নিয়মানুসারে ওয়াকার লোকটিকে ভেতরে ফিরে যেতে সতর্ক করার জন্য মেগাফোন ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। আরেকজন সেনা গুলি চালিয়ে লোকটিকে হত্যা করে ফেলে।[৩]

২০০৮ বা ২০০৯ সালে ওয়াকারের সঙ্গে এ রকম আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে ওয়াকারকে একটি স্থানীয় স্কুলে 'কল আউট' করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কল আউট-এর অর্থ হলো, কোনো ভবনের ভেতরে থাকা ব্যক্তিদের দুই হাত উঁচু করে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া। সেই নির্দেশ মোতাবেক ১১-১৩ বছরের একদল বালক একে একে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছিল। তবে আট নম্বর ছেলেটি খুব আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটি ভয় পেয়ে ইতস্তত করছিল। কেউ একজন ছেলেটির পকেটে একটি উঁচু কিছু দেখতে পেয়ে সেটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। ওয়াকার বলেন, 'কেউ আপনাকে আপনার পকেটে কী আছে জিজ্ঞেস করলে আপনি যেটা করতেন, ঠিক সেভাবেই ছেলেটি তার পকেটে হাত দিতে গিয়েছিল। তখনই একজন সৈন্য ছেলেটিকে গুলি করে

হত্যা করে। এটা সেই একই সৈন্য ছিল, যে খোস্তে একটি পুরো পরিবারকে হত্যা করেছিল।'

সার্জেন্ট ওয়াকার জানান, তিনি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন যে তার সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। 'আমরা অনেক মা-বাবাকে হত্যা করার পর তাদের বাচ্চাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম এবং তাদের কাছে মিথ্যা বলেছিলাম।' ওয়াকার সর্বশেষ মন্তব্য করেন, 'আমি নিশ্চিত, সেসব শিশুদের অনেকেই বর্তমানে তালেবানে যোগ দিয়েছে।'

কেউ কেউ এই তর্ক করতে পারে যে, এসব দাবির কোনো শক্তিশালী দালিলিক প্রমাণ নেই অথবা এগুলো কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ধরে নিলাম, এগুলো অতিরঞ্জিত বর্ণনা। কিন্তু কোনো বিদেশি দখলদার সেনাবাহিনী আমাদের জনগণের সঙ্গে এমন একটিমাত্র ঘটনা ঘটালেও মার্কিনদের প্রতিক্রিয়া কেমন হতো, সেটা কল্পনা করা নিশ্চয়ই কঠিন কিছু নয়।

বাস্তবে নিরপরাধ মানুষ হত্যা এবং অঙ্গহানি করার মতো যুদ্ধাপরাধ আফগান যুদ্ধের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং নিত্যকার ব্যাপার। ওয়াকার এসব ঘটনার ফলাফলকে 'সরাসরি হস্তক্ষেপের ভূত' বলে উল্লেখ করেন। কারণ, প্রতিটি হামলা এবং জিজ্ঞাসাবাদের পরবর্তী ফলাফল ছিল নতুন নতুন তালেবান যোদ্ধার আবির্ভাব।[৪] বছরের পর বছর ধরে আফগান গ্রামগুলো আমাদের বাহিনীর নৃশংসতার শিকার। তাদের অভিযানগুলো সমগ্র সমাজের ওপর দিয়ে একটি ঝড় বয়ে দিত। আফগানরা তাদের পরিবারের সামনে হত্যা, নির্যাতন এবং অবমাননার শিকার এবং এসবের কোনো কিছুই তারা ভোলে না।

এই 'সরাসরি হস্তক্ষেপের ভূত' আফগানিস্তানে জাতিরাষ্ট্র নির্মাণ কার্যক্রমকে অসম্ভব করে দিয়েছে। গ্রাম্য আফগানরা আফগান ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্স (ANSF) এবং মার্কিন সেনাদের একই চোখে দেখে। তারা আফগান ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্সে কোনো প্রকার ভরসা রাখে না। তাদের অধিকাংশের মতামত, তালেবানই তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে অধিক মর্যাদা দেয়। তাদের বাসগৃহে রাত্রিকালীন অভিযান আফগান ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্সের প্রতিও তাদের অসন্তোষ এবং অবিশ্বাসকে আরও প্রকট করেছে। এটা মনে করারও কোনো কারণ নেই যে, আমেরিকা চিরতরে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গেলেই আফগান সেনাবাহিনীর ওপর জনগণের আস্থা ফিরে আসবে।

আফগানিস্তানের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের গ্রাম্য পশতুনরা আফগান সরকার বলে কোনো কিছু রয়েছে বলে মনেই করে না। আমেরিকা সরাসরি অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আফগান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বকীয়তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ওয়াকার জানান, 'আমি আফগানিস্তান থাকাকালে দেখেছি, কোনো ভীতিকর ও নৃশংস ঘটনা ঘটলে আমাদের বাহিনীর কার্যক্রম দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হতো। তারপরে পুনরায় এরূপ কোনো নৃশংসতা সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সবকিছু আবার আগের মতোই শুরু হয়ে যেত। তাই নিজেদের সরকারের প্রতি আফগানদের কোনো আস্থাই অবশিষ্ট ছিল না।'[৫]

২০১০ সালে উইকিলিকস 'আফগান ওয়ার লগস' প্রকাশ কর।[৬] ব্র্যাডলি (বর্তমানে চেলসি) ম্যানিং নামে একজন তরুণ সেনা অফিসার সেসব হাজার হাজার গোপনীয় এবং অতিগোপনীয় সামরিক নথি তাদের সরবরাহ করেছিল। কিন্তু মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো এসব নথিপত্র নিয়ে পর্যাপ্ত সংবাদ প্রচার করেনি। ডেভিড লে গার্ডিয়ানে লিখেছিলেন, 'ওয়ার লগস যেন বেসামরিক ট্র্যাজেডির বিবরণ দিয়েই পরিপূর্ণ। নিরীহ ব্যক্তিদের ওপর গুলি চালানো থেকে শুরু করে বিমান হামলার মাধ্যমে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইও বলতে বাধ্য হন যে, আমেরিকা আফগানদের জীবনকে 'সস্তা' মনে করে। আফগানিস্তানে কোনো বেসামরিক ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে তাদের আত্মীয়রা ন্যায্যতার সঙ্গে শিম এবং হার্সি বারের বোতলের চেয়ে বেশি অঙ্কের ক্ষতিপূরণ পান! লগ-এর হিসাব মোতাবেক, মৃতদেহ প্রতি এক লাখ আফগানি মুদ্রা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, যা প্রায় ১ হাজার ৫০০ ইউরোর (প্রায় ১ হাজার ৯০০ ডলার)-এর সমতুল্য।'

মার্কিন গণমাধ্যমগুলোর কলাকুশলীরা এই ফাঁস হওয়া নথিগুলোর গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য নানাবিধ তদবির করে। তারা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে, নথির তথ্যগুলো আসলে 'অস্পষ্ট' এবং 'অনির্ভরযোগ্য'। তাই এই দাবিগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করা উচিত। বেশ, এটারও প্রয়োজন রয়েছে। এবার তাহলে কিছু উদাহরণ হাজির করা যাক। 'ওয়ার লগস' প্রকাশিত হওয়ার পর কয়েকজন সাংবাদিক পূর্ববর্তী কয়েকটি ঘটনার প্রতিবেদনের সঙ্গে এই দলিলগুলোর মিল খুঁজে পান। যেমন, গার্ডিয়ানের একজন প্রতিবেদক ২০০৭ সালের মার্চ মাসে একটি বেসামরিক গণহত্যার ঘটনার পর মার্কিন নেভির বর্ণিত কাহিনির ওপর অনুসন্ধান চালান। সেই ঘটনায় স্বয়ংক্রিয় মাইন বিস্ফোরণে টহলকারী দলের একজন সদস্য আহত হয়েছিল। এই ঘটনার জবাবে চারজন সেনা তাদের ঘাঁটিতে ফেরার পথে প্রতিটি যানবাহন, শিশু-কিশোর-বৃদ্ধনির্বিশেষে

সবার ওপর গুলি চালিয়েছিল। তাদের এই নির্বিচার গুলিবর্ষণে ১৯ জন নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষ নিহত হয় এবং আরও প্রায় ৫০ জন আহত হয়। মিডিয়া এবং সেনাবাহিনীর তদন্তের বিপরীতে সেই সেনারা দাবি করেছিল যে তাদের ওপর বোমা হামলা করা হয়েছিল এবং তিন দিক থেকে আক্রমণ করা হয়েছিল। বিবৃতিতে তারা ঘাঁটিতে ফেরার পথে সবার ওপর নির্বিচারে গুলি চালানোকে সযত্নে এড়িয়ে যায়।[৭] ওয়ার লগসে প্রকাশিত এই ঘটনার সত্যতা গার্ডিয়ানের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়।

আফগানিস্তানে যুদ্ধ থেকে বহুদূরে সাধারণ জীবনযাপনের চেষ্টা করা নিরীহ মানুষেরও শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা নেই। অধিকাংশ মার্কিন খুব সম্ভবত বিশ্বাস করতে চাইবে না যে তাদের গর্বিত সেনাবাহিনী বিয়ের অনুষ্ঠানেও তরুণ দম্পতি ও তাদের পরিবারের ওপর বোমা ফেলতে পারে। কিন্তু আমেরিকা-আফগান যুদ্ধে এখন পর্যন্ত অন্তত ছয়বার এই ঘটনা ঘটেছে। টম এঞ্জেলহার্ড এবং এরিকা আইসেলবার্গারের তালিকা অনুযায়ী:[৮]

২৯ ডিসেম্বর ২০০১, পখিয়ালি প্রদেশ: বি-৫২ এবং বি-১বি বিমান হামলায় পূর্ব-আফগানিস্তানের একটি গ্রামে উৎসবরত ১০০-এর বেশি মানুষ মারা যায়।

১ মে ২০০২, খোস্ত প্রদেশ: একটি গ্রামে বিবাহ অনুষ্ঠান চলাকালীন মার্কিন হেলিকপ্টার এবং বিমান হামলায় কমপক্ষে ১০ জন আফগান মারা যায়।

১ জুলাই ২০০২, উরুজগান প্রদেশ: বি-৫২ বিমান এবং একটি এসি-১৩০ গানশিপ হামলায় কমপক্ষে ৩০-৪৯ জন উদ্‌যাপনকারী মারা যায়।

৬ জুলাই ২০০৮, নাঙ্গাহার প্রদেশ: যুদ্ধবিমান থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে কমপক্ষে ৪৭ জন মারা যায়। যাদের মধ্যে ৩৯ জনই ছিল মহিলা ও শিশু। তাদের মধ্যে নববধূও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই নববধূকে তার স্বামীর বাড়িতে দিয়ে আসা হচ্ছিল।

আগস্ট ২০০৮, লগমন প্রদেশ: বিমান হামলায় বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজক পরিবারের ১২ সদস্যসহ সর্বমোট ১৬ জন নিহত হয়েছিল।

৮ জুন ২০১২, লোগার প্রদেশ: তালেবান যোদ্ধারা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আশ্রয় নিলে মার্কিন হামলায় ১৮ জন নিহত হয়।

২০০৮ সালের ৬ জুলাইয়ের হামলার ঘটনায় প্রথম বোমার আঘাতে মূলত শিশুরা হতাহত হয়েছিল। তারা মূল অনুষ্ঠান থেকে কিছুটা দূরে খেলাধুলা করছিল। দ্বিতীয় বোমাটি অনুষ্ঠানের মাঝে এসে পড়ে। নববধূ এবং অন্য অতিথিরা বাঁচার জন্য একটি পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নেয়। কিন্তু, তৃতীয়

আরেকটি বোমা তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। গার্ডিয়ান তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, ‘কনেপক্ষের নেতৃত্বস্থানীয় চারজন প্রবীণ ব্যক্তির একজন ছিলেন হাজি খান। তিনি জানান, ‘আমি আমার নাতির হাত ধরে ছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে যায়। চোখ খুলে দেখতে পাই সবাই চিৎকার করছে। আমি উড়ে গিয়ে কয়েক মিটার দূরে ছিটকে পড়ি। তখনও আমার নাতির হাত আঁকড়ে ধরে ছিলাম। কিন্তু তার শরীরের বাকি অংশ বোমার আঘাতে উড়ে গিয়েছিল। আমি চারদিকে তাকালে সর্বত্র কেবল লাশের টুকরো টুকরো অংশ দেখতে পাই। কোন টুকরো শরীরের কোন অংশ, সেটাও বোঝা যাচ্ছিল না।’[৯]

এ রকমই আরেকটি ঘটনায় ২০০৭ সালের জুন মাসে মার্কিন বোমা হামলায় সাতটি শিশু মারা যায়। আমাদের সেনারা মনে করেছিল যে বিদ্রোহী যোদ্ধারা সেই বিল্ডিংয়ে লুকিয়ে আছে। তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি উড এই ঘটনা অস্বীকার করেন। আবার তিনিই নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছিলেন যে, এই বিষয়গুলোকে ‘পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব নয়।’ অর্থাৎ তার মতে, এমন ঘটনা টুকটাক হবেই। ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্বাঞ্চলীয় কুনার প্রদেশের গাজী খান গ্রামে আরও কিছু স্কুলছাত্র নিহতের ঘটনা ঘটে। তখন সিআইএ’র আধা সামরিক বাহিনী এবং নেভি সদস্যরা একটি স্কুলে ১০ জন নিরীহ বালককে হত্যা করেছিল। পরবর্তীতে জানা যায়, মিথ্যা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তারা সেসব বালককে রাত্রিকালীন অভিযানের সময় বিছানা থেকে তুলে এনে হত্যা করেছিল! ন্যাটো দাবি করে, গ্রামে প্রবেশের পরই তাদের বাহিনী তালেবানদের গুলির কবলে পড়ে এবং সেসব বালক সে গোলাগুলিতেই মারা গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই যুদ্ধাপরাধ শিকার না করলেও তারা লক্ষ্যবস্তু নির্ণয়ে ভুলের কথা স্বীকার করে নিয়েছিল।[১০]

ফারাহ প্রদেশে, ২০০৯ সালের ৪ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলায় প্রায় ১২০ জন নিরীহ বেসামরিক আফগান মারা যায়। এই ঘটনাকে কয়েক মাইল দূরে চলমান একটি লড়াইয়ের এয়ার সাপোর্ট বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। পাশাপাশি তালেবানদের হামলা হিসেবেও চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু স্থিরচিত্রের আলামত থেকে কোনো স্থলযুদ্ধের প্রমাণ পাওয়া না গেলেও বিমান হামলার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।[১১]

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক রবার্ট এ পেপ পেন্টাগনের সহায়তায় আত্মঘাতী হামলা নিয়ে একটি বিস্তর গবেষণা চালিয়েছেন। তিনি ও তার সহকর্মীরা ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৩ সাল অবধি পৃথিবীতে ঘটা প্রতিটি

আত্মঘাতী হামলার ডেটাবেইস তৈরি করেন। এই গবেষণার ভিত্তিতে পেপ আত্মঘাতী হামলা নিয়ে দুটি বই রচনা করেন। প্রথমটি হলো, 'ডাইং টু উইন: স্ট্র্যাটেজিক লজিক অব সুইসাইড টেরোরিজম'। দ্বিতীয়টি হলো 'ফিউজ কাটিং: দ্য এক্সপ্লোশন অব গ্লোবাল সুইসাইড টেরোরিজম অ্যান্ড হাউ টু স্টপ ইট'।[১২] তিনি আফগানিস্তান যুদ্ধের মাত্রা বৃদ্ধির অনিবার্য ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন—

> আমাদের নীতিনির্ধারকেরা আরও ১০ হাজার কিংবা ২০ হাজার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের কথা বলছে। কিন্তু এই পদক্ষেপ দেশটির অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ কিংবা শত্রু দমনে কোনো কাজে দেবে না। বরং বর্তমান আফগান নীতিগুলো নিয়েই আমি সবচেয়ে ভীত। পরিস্থিতি এখন যেদিকে যাচ্ছে, সেটা উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। আমরা মূলত পরিপাটিভাবে আত্মঘাতী অভিযানের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার জন্য আফগানিস্তানে পর্যাপ্ত স্থলবাহিনী মোতায়েন করছি। আমার ধারণা, আফগানিস্তানের সহিংসতা হ্রাসে আমরা সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছি না।... তাত্ত্বিকভাবে বিদ্রোহ দমন অভিযান, সহিংসতা দমন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য লাখ লাখ অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করতে হবে। এটি স্পষ্টতই ব্যয়বহুল এবং রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু, বাস্তবে আফগানিস্তানে এত বিপুল সেনা প্রেরণের পরও আমেরিকার সমস্যাগুলো সমাধানের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত।[১৩]

তথ্যসূত্র

১. সহিংস প্রকৃতির হওয়ায় লেখক বইতে কোনো ছবি সংযুক্ত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে অনলাইনে ছবিগুলো দেখতে ভিজিট করুন এই লিংকে: http://foolserrand.us/walker.

২. Ali Daya, "Family of Afghan Army Colonel Killed in US Raid," Taipei Times, April 9, 2009; Douglas A. Wissing, In Writing: Uncovering the Unexpected Hoosier State (Bloomington, IN: Quarry, 2016), 131-132; Alie Daya, "Afghan Father Says His Baby Dies in Coalition Raid," Reuters, April 10, 2009.

৩. Saboor Mangal, "Coalition Forces Kill Three of an Afghan Family in Khost," RAWA News, December 17, 2008.

৪. Anthony Walker, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, July 27, 2016; Anthony Walker, email

message to the author, July 25, 2016; Anthony Walker, interviewed by the author, August 6, 2016; Aaron Glantz and Anthony Swofford, eds., Winter Soldier: Iraq and Afghanistan (Chicago: Haymarket, 2008).

৫. Anthony Walker, “The Ghosts of Direct Action,” Antiwar, July 27, 2016.

৬. C. J. Chivers et al., “View Is Bleaker Than Official Portrayal of War in Afghanistan,” New York Times, July 25, 2010.

৭. Declan Walsh, “Afghanistan War Logs: How US Marines Sanitized Record of Bloodbath,” Guardian, July 26, 2010; “(Explosive Hazard) IED Ambush RPT (SVBIED) CJTF-82: 1 CF WIA,” Afghan War Diary, March 4, 2007.

৮. Tom Engelhardt, “Washington’s Wedding Album from Hell,” TomDispatch, December 20, 2013.

৯. Clancy Chassay, “‘I Was Still Holding My Grandson’s Hand - the Rest Was Gone,’” Guardian, December 15, 2008.

১০. Jerome Starkey, “Western Troops Accused of Executing 10 Afghan Civilians, Including Children,” London Times, December 31, 2009.

Mark Mazzetti et al., “SEAL Team 6: A Secret History of Quiet Killings and Blurred Lines.”

New York Times, June 6, 2015.

১১. Cockburn, Chaos and Caliphate, 188-189.

১২. Robert A. Pape, Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. New York: (Random House, 2005); Robert A. Pape and James K. Feldman, Cutting the Fuse: The Explosion of Global Suicide Terrorism and How to Stop It, (Chicago University Press, 2010).

১৩. Robert A. Pape, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, October 1, 2008.

চতুর্থ অধ্যায়

সর্বশক্তি প্রয়োগ

আমরা এত এত জটিল সমস্যায় পতিত যে, সবার উচিত এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে এখনই কাজে নেমে পড়া।

— স্টেট সেক্রেটারি হিলারি ক্লিনটন, জুন ৭, ২০০৯

উপযুক্ত সময়ের আগে আমরা আফগানিস্তান ত্যাগ করছি না। এমনকি আমরা হয়তো কখনোই আফগানিস্তান ছেড়ে যাব না।

— ডিফেন্স সেক্রেটারি রবার্ট গেইটস, মে ১০, ২০১০

আমি যে মানুষ খুনে এত পটু, এটা আগে জানতামই না।

— প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১১

দেশ যখন নীতিনির্ধারকদের হাতে জিম্মি

২০০৮ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী বারাক ওবামা ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু 'জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তিনি যথেষ্ট কঠোর নন'— এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করতে তিনি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের জন্য একদল যুদ্ধপ্রিয় ব্যক্তিকে নিজের উপদেষ্টা ও ক্যাবিনেট সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাদের প্ররোচনায় প্রেসিডেন্ট ওবামা এত বেশি সৈন্য মোতায়েন করেন যে, পরবর্তীতে তিনিই এই পদক্ষেপকে মাত্রাতিরিক্ত বলেছিলেন। ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে উড্রো উইলসন সেন্টারে দেওয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে বারাক ওবামা বলেছিলেন—

> আমাদের সৈন্যরা আফগানিস্তানে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেও ইরাক যুদ্ধের কারণে তারা পর্যাপ্ত সহায়তা পায়নি। এ জন্যই আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল তালেবানের দখলে চলে যাচ্ছে। পুরো দেশটা এখন সন্ত্রাস, মাদক আর দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠতে পারে। আমি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে আফগানিস্তানে জঙ্গিবাদ ও তালেবানবিরোধী অভিযানে ন্যাটোকে সহায়তা করতে ন্যূনতম দুই ব্রিগেড অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাব। ... পাকিস্তানে অবস্থানরত শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিদের ব্যাপারে গোয়েন্দারা পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়ার পরও যদি প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ কোনো পদক্ষেপ না নেন, তাহলে আমরাই মাঠে নামব।[১]

নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার তৃতীয় দিনে বারাক ওবামা পাকিস্তানে সিআইএ'র মাধ্যমে ড্রোন হামলা চালান। এই হামলায় ৯ জন নিরপরাধ ব্যক্তি জীবন হারান। বেঁচে থাকা আহত ব্যক্তিদের জীবন নরকে পরিণত হয়।[২] এভাবেই প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন।

ইতিপূর্বে বুশ প্রশাসন ইয়েমেন, ইরাক ও আফগানিস্তানে ড্রোন ব্যবহার করলেও বারাক ওবামা এবং তার 'দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রধারী উদার' মিত্ররা একটি ভিন্নমাত্রার যান্ত্রিক যুদ্ধের সূচনা ঘটায়।[৩] পাকিস্তানে লুকিয়ে থাকা আল-কায়েদার অবশিষ্ট 'ঝানু' সদস্যদের হত্যার জন্য ড্রোন হামলাগুলোকে যথার্থ মনে হতে পারে। কিন্তু সেসব এলাকায় বসবাসরত লোকজনের জন্য এই হামলা ছিল ভয়াবহ। স্বভাবতই এই হামলাগুলোর প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয়দের মার্কিন 'বিদ্বেষ ও সন্দেহ' বৃদ্ধি পায়। ২০০৯ থেকে ২০১২ সালে 'অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন'সহ বারাক ওবামার আফগান নীতিসমূহ পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণীত ছিল। ডেমোক্র্যাটরা এই যুদ্ধকে 'আফ-পাক যুদ্ধ' নাম দিয়েছিল।[৪] ডুরান্ড লাইনের উভয় পাশে এই যুদ্ধ আছড়ে পড়ছিল।[৫] বুশ প্রশাসনের সমালোচকদের মতে, মার্কিন সেনাদের আফগানিস্তানের পাহাড় থেকে ইরাকের মরুভূমিতে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি যুক্তরাষ্ট্রের আফগানবিষয়ক নীতিমালার একটি মারাত্মক ভুল ছিল। বারাক ওবামাও একই ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু এই ধারণাকে সঠিক মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রতিবার আফগানিস্তানে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের পর আরও বেশি সাধারণ জনগণ তালেবান শিবিরে যোগ দিয়েছে। আফগানিস্তানে বারাক ওবামার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে।

সে সময় আফগানিস্তান থেকে আল-কায়েদা প্রায় নিশ্চিহ্নই হয়ে গিয়েছিল। শুধু চরম স্বার্থবাদী ও বোকারাই ২০০৯ সালেও ধারণা করত যে মধ্য এশিয়ার বুকে ন্যাটো জোট একটি গণতান্ত্রিক ও পশ্চিমা মডেলের জাতিরাষ্ট্র নির্মাণ করতে পারবে। এই রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের জনক ছিল প্রেসিডেন্ট বুশ। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'অসম্পূর্ণ কাজ'। কিন্তু, তত দিনে তাদের সকল ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

যাহোক, মুসলমানের মতো নামের কৃষ্ণাঙ্গ ও তরুণ লিবারেল ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইরাক থেকে সব মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করতে চাইলেও নিজেকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর প্রমাণ করার জন্য আফগানিস্তানে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেন। ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পর, ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওবামা তার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন প্রকল্প শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট বুশের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে পাঠানো ৬ হাজার সেনার সঙ্গে তিনি আরও ১৭ হাজার অতিরিক্ত সেনা যোগ করেন।[৬] মার্চ নাগাদ এ সংখ্যা ১৭ হাজার থেকে ২১ হাজারে উন্নীত হয়[৭] এবং অক্টোবরে তিনি আরও ১৩ হাজার সেনা প্রেরণ করেন।[৮] কঠোরতা প্রদর্শনের এই নীতির

বদৌলতে প্রেসিডেন্ট ওবামা বুশের দ্বিতীয় ও সর্বশেষ ডিফেন্স সেক্রেটারি রবার্ট গেইটস এবং 'সফল' ইরাক আগ্রাসনের প্রবক্তা, তৎকালীন সেন্ট্রাল কমান্ডের অধিনায়ক মার্কিন সেনাপ্রধান ডেভিড এইচ পেট্রেয়াসহ পূর্ববর্তী রিপাবলিকানদের পাশে পাচ্ছিলেন। এমনকি তিনি ডেমোক্রেটিক দলের মনোনয়ন লড়াইয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আগ্রাসী মনোভাবের হিলারি ক্লিনটনকে পররাষ্ট্রসচিব হিসেবে নিয়োগ দেন। এই চতুর সিদ্ধান্ত তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী ও রিপাবলিকান নেতা জন ম্যাককেইনের সঙ্গে হিলারিকে জোট বাধা থেকে বিরত রেখেছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে শত্রুকে নজরে রাখতে গিয়ে তাকে বেশিই নিকটে নিয়ে এসেছিলেন ওবামা। ক্লিনটন, গেইটস ও পেট্রেয়াস একজোট হয়ে নতুন বছরে আফগানিস্তানে ন্যূনতম ৪০ হাজার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন ও জঙ্গিবাদ দমন কার্যক্রম সম্প্রসারণের দাবি জানাতে থাকে। মেয়াদের শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ তার 'যুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা' লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডগলাস লুটকে আফগান যুদ্ধের চলমান পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন পেশ করতে বলেছিলেন। লুটের মতে, 'যুদ্ধের অবস্থা এতই বাজে ছিল যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না।' তিনি আরও জানান, 'আফগানিস্তানে সিআইএ, ন্যাটো, ট্রেইনিং অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ফোর্স, জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশনস কমান্ড (প্রথম সারির বিশেষায়িত বাহিনী), ইউএস স্পেশাল অপারেশনস কমান্ড (দ্বিতীয় সারির বিশেষায়িত বাহিনী), আফগান ন্যাশনাল আর্মি, আফগান ন্যাশনাল পুলিশ এবং আফগান ন্যাশনাল ডিরেক্টরেট ফর সিকিউরিটি (তাদের গোয়েন্দা সংস্থা) একই সঙ্গে আটটি ভিন্ন যুদ্ধ পরিচালনা করছিল। কোনো নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা ছাড়াই সমন্বয়হীনভাবে প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল।'[৯]

২০০৯ সালের শুরুতে বারাক ওবামার ক্ষমতা গ্রহণের পর জেনারেল পেট্রেয়াস তার বন্ধু এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা ডেরেক হার্ভিকে ব্যক্তিগতভাবে আফগানিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর বিশেষ প্রতিবেদন তৈরির কথা বলেছিলেন। পেট্রেয়াসকে দেওয়া প্রতিবেদনে হার্ভি জানান, 'এই যুদ্ধে আসল শত্রু কে? তাদের ডেরা কোথায়? তাদের উদ্দেশ্য কী? এই সাধারণ প্রশ্নগুলোই করা হয়নি। জয়ের পরিকল্পনা করার মতো (শত্রুর ব্যাপারে) পর্যাপ্ত তথ্যই আমাদের কাছে নেই।'[১০]

তবে অদূরভবিষ্যতে বাড়তি সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্তকে যথাযথ দেখাতেই সম্ভবত সেই প্রতিবেদনগুলো তৈরি করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে তাদের খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। অতীতের রক্তাক্ত অভিযানগুলোর কথা ভুলে

এবং বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে শত্রুদের উত্থানের গল্প শোনানোই যথেষ্ট ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, তাদের সবাই রায় দেয়, 'বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য বুশ প্রশাসন যথেষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল না।' পরবর্তী প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব পান সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা ব্রুস রাইডেল। তার পরামর্শ মোতাবেক ওই গ্রীষ্মে দ্বিতীয়বারের মতো ৪ হাজার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করা হয়।[১১] তিনি জানিয়েছিলেন, 'তালেবানকে পাকিস্তানের সহায়তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নিলে এই যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব।... এ জন্য অবশ্য আমাদের হাতে তেমন কোনো বিকল্প নেই। পাকিস্তানকে ঘুষ দিয়েও কিছু হবে না। কারণ ঘুষ নিয়েই এত দিন ধরে তারা কাজ করছে। পারমাণবিক অস্ত্র থাকার কারণে তাদের ভয়ও দেখানো যায় না।'

যাহোক, মোটের ওপর রাইডেলের বক্তব্য সত্য হলেও তার পরামর্শগুলো যৌক্তিক ছিল না। 'আফগানিস্তানে আমরা কিছু একটা জয় করতে গিয়েছি'— এই মূলনীতির ভিত্তিতে তার প্রতিবেদনটি সাজানো হয়েছিল। বিজয় অর্জনের জন্য অসংখ্য মানদণ্ড চলে আসে। কিন্তু আফগানিস্তানে যাওয়ার উদ্দেশ্য আসলে কী ছিল? প্রকৃত শত্রুই-বা কে? বাড়তি সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্তকে যথাযথ প্রমাণ করার জন্য আল-কায়েদার সঙ্গে পাকিস্তানি তালেবান, আফগান তালেবান, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অমীমাংসিত কাশ্মীরের ভারতবিরোধী সশস্ত্র সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বাকে একজোট দেখিয়ে সম্ভাব্য ঝুঁকির গল্প সাজাতে হয় রাইডেলকে।[১২]

এরপর ম্যাকক্ল্যাচি নিউজের হাতে বাতিলের খাতায় চলে যাওয়া 'সেইফ হেভেন' আষাঢ়ে গল্পের পুনরুত্থান ঘটে। 'তালেবান আফগানিস্তানের অংশবিশেষ দখলে নিতে পারলে আল-কায়েদাকেও সেখানে ডেকে আনবে' উল্লেখ করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো হোয়াইট হাউসকে সতর্ক করেছিল। ফাঁস হওয়া তথ্যে হোয়াইট হাউসের বিরুদ্ধে এই সতর্কবার্তাকে 'অবহেলা করার' অভিযোগও করা হয়। অথচ ওই মুহূর্তে গোয়েন্দা সংস্থার কাছে নতুন কোনো তথ্য ছিল না।

অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের পক্ষের লোকজন বারবার এসব কথা বলে পুরো বিষয়টাকে এমনভাবে সাজায় যে তাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে প্রেসিডেন্টকে বিশ্বাসঘাতক মনে হবে। ওসামা বিন লাদেন সে সময় জীবিত থাকায় আফগানিস্তানে 'মূল' আল-কায়েদার পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। অবশ্য ২০০২ সালের পর থেকেই এই বিপদের আশঙ্কা একই রকম

ছিল। পেট্রেয়াসের মিত্র ও অবসরপ্রাপ্ত যুদ্ধপ্রিয় জেনারেল জ্যাক কিনের পরামর্শে প্রেসিডেন্টের শুভাকাঙ্ক্ষী জেনারেল ডেভিড ম্যাককিয়েরনানকে অনানুষ্ঠানিকভাবে তার অধিনায়কত্ব থেকে সরানো হয়েছিল। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, নতুনভাবে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের আবেদন করতে প্রতিবন্ধকতা না রাখা।[১৩] ম্যাককিয়েরনান ২০০৯ সালের শুরুতে প্রথমবারের মতো ২১ হাজার সৈন্য পাঠাতে ভালোই কাঠখড় পুড়িয়েছিলেন। পেন্টাগন আরও ৪৫ হাজার সৈন্য পাঠাতে চাইছিল। নতুন কমান্ডার পেলে বাড়তি সেনা পাঠানোর জন্য দেনদরবার করার সুযোগ তৈরি হবে। এ জন্য সেক্রেটারি গেইটস ম্যাককিয়েরনানের বিরুদ্ধে অদক্ষতার অভিযোগ এনে তাকে পদচ্যুত করার জন্য ওবামাকে রাজি করান। তার স্থলে নিযুক্ত হয়েই জেনারেল স্ট্যানলি ম্যাকক্রিস্টাল আবারও সেনা মোতায়েনের জন্য কংগ্রেসে বক্তব্য দেন। তিনি দাবি করেন, সম্প্রতি পাঠানো ২২ হাজার সেনা এই যুদ্ধ জয়ের জন্য পর্যাপ্ত নয়। ওবামার ভাষ্যে, এই পর্যায়ে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের ওপর মার্কিন সেনাবাহিনীর 'ছড়ি ঘোরানো' শুরু হয়।[১৪]

বিশেষ অভিযানের অধিনায়ক হিসেবে ইরাকে বিদ্রোহী দমন কার্যক্রমে সফলতা পাওয়ায় সেন্ট্রাল কমান্ডের অধিনায়ক পেট্রেয়াসের বন্ধুবর ম্যাকক্রিস্টালকে আফগান যুদ্ধে নিযুক্ত করা হয়। ২০০৭ সালে ইরাকে সুন্নি ও শিয়া বিদ্রোহীদের দমনে তিনি বেশ সফলতা পেয়েছিলেন। ফ্রেন্ডলি ফায়ারে মার্কিন ফুটবল তারকা ও আর্মি রেঞ্জার প্যাট টিলম্যানের মৃত্যুকে তালেবানের ওপর চাপিয়ে মূল ঘটনা লুকিয়ে ফেলার ঘটনায় সরাসরি জড়িত থাকা[১৫] ও ইরাকে নামা (ন্যাস্টি এস মিলিটারি এরিয়া)-সহ অসংখ্য সামরিক কারাগারের পরিচালক হিসেবে ম্যাকক্রিস্টাল কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। এসব কারাগারে তার নজরদারিতেই বন্দিদের নির্যাতন করা হতো।[১৬] এত কিছু সত্ত্বেও, তার অনুগত কর্মকর্তা ও ওয়াশিংটনের পক্ষপাতদুষ্ট মিডিয়ার কাছে ম্যাকক্রিস্টাল শুধু একজন দক্ষ স্পেশাল অপারেশন কমান্ডার ছিলেন না, তাদের কাছে তিনি ছিলেন নায়ক, পাদরি এবং একজন রকস্টার।

হোয়াইট হাউস ও বেসামরিক নেতৃবৃন্দের প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পর (যদিও ম্যাকক্রিস্টাল এগুলোরই থোড়াই পরোয়া করত) মারদাঙ্গা এই মার্কিন হিরোকে সবকিছু রক্ষার জন্য ডাকা হয়। ম্যাকক্রিস্টাল ও পেট্রেয়াসকে সমগ্র ২০০৯ সালজুড়ে মিডিয়াতে তোষামোদি করে যোগ্যতম, তীক্ষ্ণতম, অতিমানবিক সামরিক দক্ষতাসম্পন্ন ও সফল যোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছিল। অবসরপ্রাপ্ত আর্মি কর্নেল ও পররাষ্ট্রনীতি সমালোচক এন্ড্রু বেসেভিচের মতে,

'মিডিয়ার এই আচরণ সকল সীমা অতিক্রম করে। এটি যেকোনো সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের জন্য বেমানান।' এসব ঘটনা প্রেসিডেন্টের অধীন লোকজনের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করেছিল। ম্যাকক্রিস্টালের রিপোর্টে আফগানিস্তানে নতুন করে ৮৫ হাজার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের সুপারিশ করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়, 'ন্যূনতম ১০ বছর আফগানিস্তানে অবস্থান করে পেট্রেয়াসের কাউন্টার ইনসার্জেন্সি (COIN) ডকট্রিন বাস্তবায়ন করতে হবে।' কিন্তু ওয়াশিংটন পোস্টে ম্যাকক্রিস্টালের এই রিপোর্ট ফাঁস হয়ে যায়।[১৭] দ্য নিউইয়র্ক টাইমস তার এই রিপোর্টকে 'প্রেসিডেন্টকে করায়ত্ত করতে হোয়াইট হাউসে ষড়যন্ত্র' হিসেবে উপস্থাপন করে। উল্লেখ্য, পূর্বে প্রেরণ করা ১০ হাজারের বাইরে অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর ব্যাপারে প্রেসিডেন্টও সন্দিহান ছিলেন। বেসামরিক নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তের ওপর সামরিক বাহিনীর নজিরবিহীন হস্তক্ষেপের ঘটনা প্রকাশিত হলে ছোটখাটো উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল।[১৮]

ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি না করে জঙ্গিবাদ দমনের জন্য কম আগ্রাসী পরিকল্পনার প্রস্তাব করেন। এই পরিকল্পনায় পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধ ও রাষ্ট্র নির্মাণের পরিবর্তে আল-কায়েদার ওপর হামলা ও আফগান ন্যাশনাল আর্মির প্রশিক্ষণ বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু বাইডেনের এই পরিকল্পনাও যৌক্তিক ছিল না। কেননা, আফগানিস্তানে হয়তো '১০০-এরও কম' আল-কায়েদা সদস্য টিকে ছিল। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল জিম জোনস হোয়াইট হাউসের আলোচনা সভায় এ সংখ্যা উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান, এই যুদ্ধ আল-কায়েদা নয়, বরং স্থানীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে লড়া হচ্ছে। আর এই জনসাধারণ কেবল 'আফগানিস্তান থেকে দখলদার বহিঃশক্তিকে হটাতে' লড়াই করছে।[১৯]

আফগান যুদ্ধ নিয়ে প্রয়াত বিজ্ঞ অনুসন্ধানী সাংবাদিক মাইকেল হ্যাস্টিংস লিখেছিলেন, 'ম্যাকক্রিস্টালের পরিকল্পনায় আল-কায়েদা পুরোপুরি উপেক্ষিত ছিল। সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম তাকে ও পেট্রিয়াসকে মনে করিয়ে দেন যে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইলে তাদের আল-কায়েদাকে বেশি করে উল্লেখ করতে হবে।' এর পর থেকেই আল-কায়েদা নিয়মিত বার্তার অংশে পরিণত হয়।[২০]

অথচ আফগানিস্তানের আল-কায়েদার সদস্যদের উপস্থিতির সুস্পষ্ট প্রমাণ কারও কাছেই ছিল না। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার মতে, ওই মুহূর্তে আফগানিস্তানে ২০ থেকে ১০০-র মতো আল-কায়েদা সদস্য টিকে ছিল। এই অস্তিত্বও ছিল রূপকথার মতো।[২১]

২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা এবং সাবেক নৌ ক্যাপ্টেন ম্যাথিউ হো পদত্যাগ করেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দেওয়া পদত্যাগপত্রে তিনি অভিযোগ করেন, 'আফগানিস্তানে সামরিক ও বেসামরিক কোনো ক্ষেত্রেই জয়লাভের কোনো আশা নেই।'[২২] মিডিয়ায় প্রকাশিত সেই পদত্যাগপত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র মূলত জাতিগত পশতুন বিদ্রোহ মোকাবিলা করছে। তালেবানের সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা নেই। এই যুদ্ধ মূলত শত শত বছরের পশতুন ভূখণ্ড, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধর্মের ওপর দেশি ও বিদেশি শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে গোত্রীয় প্রতিরোধের অংশ। পশতুন গ্রাম ও উপত্যকাগুলোতে উপস্থিত মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনী, এমনকি অপশতুদের সমন্বয়ে গঠিত আফগান সেনাবাহিনী এবং পুলিশও তাদের নিকট দখলদার শক্তি। তাই আফগান দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করাও তাদের পক্ষে থেকে যৌক্তিক।' স্থানীয় আফগানদের বিভিন্ন গোত্রের তীব্র পারস্পরিক বিদ্বেষ, প্রেসিডেন্ট কারজাইকে পুনর্নির্বাচিত করতে আগস্টের নির্বাচনের কারচুপি,[২৩] সরকার ও ঠিকাদারদের মহাকাব্যিক দুর্নীতিসহ নানা দিক উল্লেখ করে হো এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান, সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে সফলতা পাওয়া যাবে না। তাই প্রেসিডেন্ট ওবামা শেষবারের মতো অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে জনগণের কাছে সঠিক পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্যই হো চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। পদত্যাগপত্রের উপসংহারে হো বলেন, 'স্বজনদের কাছে মৃতরা শুধুই লাশ হিসেবে ফিরে আসে। স্বজনদের তখন আশ্বস্ত করতে হয়, মৃত ব্যক্তি মহান উদ্দেশ্যে তার জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা জীবন উৎসর্গ করেছে, যাতে কারও অনাগত জীবন নষ্ট না হয়, ভালোবাসা যাতে শেষ হয়ে না যায় এবং স্বপ্নগুলো যাতে অপূর্ণ থেকে না যায়। কিন্তু এই ধরনের আশ্বাস দেওয়ার সাহস আমার মাঝে অবশিষ্ট নেই।'[২৪]

বছরখানেক পরে হো জানান, '২০০৪ কিংবা ২০০৫ সাল থেকেই আফগানিস্তানে কাউন্টার-ইনসার্জেন্সিকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রতিবার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের ফলাফল ছিল আরও বেশি লোকজনকে বিপক্ষ শিবিরে যোগ দিতে বাধ্য করা এবং বিদ্রোহীদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করা! নতুন করে ওবামার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি। তবে এবার সেটা আরও বড় আকারে হবে।' দিনশেষে হোর কথাই যথাযথ প্রমাণিত হয়েছে।[২৫]

এমনকি মার্কিন সামরিক ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রেসিডেন্ট কারজাইকে নিয়ে এতটাই ক্ষুব্ধ ছিল যে, তারা কারজাইয়ের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে তাকে শুধু আনুষ্ঠানিক পদে রাখতে চেয়েছিল। পাশাপাশি সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

জালমে খলিলজাদকে আফগানিস্তানের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে নিয়োগ দিতে চেষ্টা করেছিল।[২৬]

আফগান যুদ্ধে ন্যাটোর সাবেক কমান্ডার এবং পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) কার্ল ডব্লিউ একেনবেরি নভেম্বরে হোর সঙ্গে সম্মতি প্রকাশ করেন। নিউইয়র্ক টাইমসে একেন বেরির বার্তা থেকে জানা যায়, তিনি হোয়াইট হাউসকে দুর্নীতিগ্রস্ত কারজাই সরকার ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিপুল কারচুপির ঘটনা নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। অযথা লাখ লাখ ডলার খরচ করার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিলেন। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মূল কমিটির বৈঠকে নিজের সহকর্মীদের কাছে তিনি এসবের ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন। সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হওয়া এই তথ্য রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সেনাবাহিনীর বিভাজনকে জনসমক্ষে নিয়ে এলেও ওপরমহলে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে এটি ব্যর্থ হয়। যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় ও পরিকল্পনার অকার্যকারিতা সম্পর্কে একেন বেরির মূল্যায়ন যথার্থ হলেও কোনো ফায়দা হয়নি।[২৭]

যুদ্ধকে ‘আফগানিকরণ’ এবং অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত চলমান সংকট নিরসনে আফগান কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও বেশি মার্কিন সামরিক বাহিনীর ওপর নির্ভর করে তুলবে বলে রাষ্ট্রদূত এইকেনবেরি যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছিলেন। সংকট নিরসনের দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে কারজাই প্রশাসনের অনীহার কথাও তিনি জানিয়েছিলেন। ‘মার্কিনরাই সবকিছুর দেখভাল করবে’ এই নীতিতে কারজাই প্রশাসন নিরাপত্তা, উন্নয়ন কিংবা অন্য কোনো কিছুরই দায়িত্ব নিতে চাইত না। তিনি আরও বলেন, ‘তারা মনে করত, অনন্তকাল ধরে ওয়ার অন টেরর চালানো ও প্রতিবেশী পরাশক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সামরিক ঘাঁটিগুলো ব্যবহার করার জন্য তাদের ভূখণ্ড ছাড়া আমরা অচল।’ এইকেনবেরি আরও সতর্ক করেন, ‘দেশটির জনগণের মাঝে রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের ধারণা নেই বললেই চলে। নিজেদের গোষ্ঠী ও গোত্রের বাইরে কোনো নেতার অস্তিত্বও তারা মানে না। সীমাহীন মার্কিন সহায়তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার মতো সম্পদ উৎপানের সক্ষমতা তাদের নেই।’ দুই বছর প্রশিক্ষণের পরও মার্কিন ও জোট সেনাদের কাছ থেকে দায়িত্ব নেওয়ার মতো যোগ্যতা আফগান ন্যাশনাল আর্মি বা আফগান ন্যাশনাল পুলিশ অর্জন করেনি বলেও তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেন। ব্যর্থতার এই রাস্তায় যুক্তরাষ্ট্র আগেও হেঁটেছিল।[২৮]

কিন্তু রিপাবলিকান ও সামরিক কর্মকর্তারা বারাক ওবামার বিরুদ্ধে যথাসময়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়ার অভিযোগ তুলে দায় সেরেছিলেন। বল বৃদ্ধির পরিকল্পনায়

সায় না দিলে তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের প্রতি নমনীয়তার অভিযোগ আনা হতো। তাই ২০০৯ সালে নভেম্বর মাসের শেষ দিকে বারাক ওবামা নিজের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে জেনারেলদের কাছে নতি স্বীকার করেন। তিনি অতিরিক্ত ৩০ হাজার সেনা ও নৌ আফগানিস্তানে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, ২০০৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরাজিত রিপাবলিকান দলের প্রার্থী সিনেটর জন ম্যাককেইনের অন্যতম মিত্র সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম প্রেসিডেন্ট ওবামার যুগ্ম বাহিনী প্রধান রেম ইমানুয়েলের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, রিপাবলিকানদের সমর্থন পেতে চাইলে ন্যূনতম ৩ দিয়ে শুরু হয় এমন সংখ্যক (যেমন: ৩০ হাজার) সৈন্য পাঠাতে হবে। গ্রাহাম তাকে জানান, 'যতক্ষণ পর্যন্ত জেনারেলরা সন্তুষ্ট আছেন এবং সংখ্যাটা বেশ বড় হবে, ততক্ষণ সব ঠিক থাকবে।'

মধ্য এশিয়াকে চিরদিনের জন্য কবজা করতে যুদ্ধবাজ নেতাদের উদ্দেশ্য একদম স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সিনেটর গ্রাহামের ভাষায়, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ৭০ বছরের বেশি সময় ধরে ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়াকে কবজা করে রেখেছে। কোনো মার্কিন নাগরিক হতাহতের ঘটনা না ঘটলে এই বিষয়টি কারও স্মরণেই আসে না।'[২৯]

উইকলি স্ট্যান্ডার্ড সাময়িকীর তৎকালীন নিও-কনজারভেটিভ সম্পাদক উইলিয়াম ক্রিস্টলের মতে, অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন প্রেসিডেন্ট ওবামার মারমুখী সমালোচকদেরও সন্তুষ্ট করেছিলেন। তিনিও 'ওবামার জয় হোক' বলে উল্লাস করেন।[৩০]

অন্যদিকে, ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, জেনারেল ডগলাস লুট এবং প্রশাসনের অন্যান্য 'অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন' বিরোধীরা হো এবং একেন বেরির দেওয়া তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে ওবামার এই বাতিল ও সেনাসংখ্যা হ্রাসের পক্ষে ছিলেন। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও যে তুলনামূলক কম আগ্রাসী পরিকল্পনা পছন্দ করতেন, তা সহজেই বোধগম্য। আত্মজীবনীতে প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট গেইটস উল্লেখ করেন, 'প্রেসিডেন্ট তার প্রধান সেনাপতিকে (পেট্রেয়াস) ভরসা করতেন না। কারজাইকে ওবামা পছন্দ করেন না, তার পরিকল্পনায় আস্থা রাখেন না এবং এই যুদ্ধকেও নিজের লড়াই ভাবেন না। তার কাছে এই যুদ্ধ শেষ করাই ছিল মুখ্য বিষয়।'

আফগান আগ্রাসন শক্তিশালীকরণ, ইরাক যুদ্ধে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের পুনরাবৃত্তি ঘটানো এবং একই সঙ্গে উভয় যুদ্ধ থেকে প্রত্যাহার ঠেকাতে

ওবামার ওপর প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছিল। আগ্রাসন বৃদ্ধিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য মতে পরিণত হয় এবং আগ্রাসন বৃদ্ধির বিরোধিতাকারীরা আক্রমণের শিকার হতে থাকে। কিছু 'অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন' না করাকে যখন বিজয়ের পথে একমাত্র প্রতিবন্ধকতা মনে করা হচ্ছিল, তখন বারাক ওবামা কি নিশ্চিত জয়ের কথা জেনেও কি হার মেনে নেবেন? অবশ্যই না। প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেই তিনি পরাজয় বরণ করবেন।

আফগান ন্যাশনাল আর্মি ও পুলিশের শক্তি বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ১০ হাজার থেকে ১১ হাজার সেনা মোতায়েনের 'নিরুদ্যম' এবং জোরালো জঙ্গিবাদবিরোধী অভিযান পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত ৮৫ হাজার সৈন্য মোতায়েনের 'অতি উদ্যমী' একটি পরিকল্পনা প্রেসিডেন্টের সামনে উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া কাউন্টার ইনসার্জেন্সি ডকট্রাইন (COIN) বাস্তবায়ন ও যথা শিগগিরই আফগান ন্যাশনাল আর্মির কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে এই দুয়ের মাঝামাঝি ৪০ হাজার সেনা মোতায়েনের 'পরিমিত' পরিকল্পনাও উপস্থাপন করা হয়। জয়েন্ট চিফের ভাইস চেয়ারম্যান এবং মেরিন কোর জেনারেল জেমস কার্টরাইট প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে পেট্রেয়াস-ম্যাকক্রিস্টালের রাষ্ট্র নির্মাণের বিস্তৃত পরিকল্পনার বদলে মাত্র ২০ হাজার অতিরিক্ত সেনা প্রেরণের একটি 'মিশ্র' পরিকল্পনা হাজির করেন। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী, এদের অর্ধেক জঙ্গিবাদবিরোধী অভিযান এবং অবশিষ্ট অর্ধেক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই পর্যায়ে মাইক মুলেন প্রকাশ্যে অবাধ্য আচরণ শুরু করেন এবং প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের পছন্দনীয় পরিকল্পনা উপস্থাপনে জেনারেল কার্টরাইটকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন।[৩১] কার্টরাইটের অনড় অবস্থানের জন্য প্রতিরক্ষাসচিব গেইটস ও চেয়ারম্যান মুলেন তাকে কখনোই ক্ষমা করেননি।[৩২]

সামরিক বাহিনীর নানাবিধ আকাশচুম্বী দাবিদাওয়ায় একপর্যায়ে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শুধু আফগান ন্যাশনাল আর্মির প্রশিক্ষণের জন্য ১০ হাজার সেনা প্রেরণের সবচেয়ে কম আগ্রাসী পরিকল্পনা বেছে নিতে যাচ্ছিলেন।

এই পরিকল্পনাও হয়তো সফলতা পেত না। কিন্তু এতে আফগান ন্যাশনাল আর্মির সামর্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল। তারা নিজেরা এখন যতটুকু অর্জন করতে পারবে, ভবিষ্যতে ততটুকু রক্ষা করাই হবে তাদের কাজ। কিন্তু ওবামা শেষ পর্যন্ত জেনারেল পেট্রেয়াস, ম্যাকক্রিস্টালের[৩৩] পাশাপাশি

প্রতিরক্ষাসচিব গেইটসের পদত্যাগের ভয় করছিলেন।[৩৪] বুশের লোকজনের স্বপদে বহাল রাখার এই সিদ্ধান্ত মারাত্মক ভুল ছিল। নতি স্বীকার করা ভুল হবে জেনেও অন্তর্নিহিত ভীরুতার কারণে ওবামা তাদের বিরুদ্ধে যেতে পারেননি।

অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়ার পর ব্যর্থতার দায় এড়াতে মিডিয়ায় বারাক ওবামা নিজেকে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারকদের দ্বারা 'বাধাপ্রাপ্ত' এবং নিজের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে এই নির্দেশ দিতে বাধ্য হওয়ার অভিযোগ করেন।[৩৫] অবিশ্বাস্য হলেও এই অভিযোগ সত্য। কংগ্রেসে যুদ্ধবাজ নেতারা, বিশেষত সিনেটর ম্যাককেইন ও গ্রাহাম সে সময় কঠোর চাপ প্রয়োগ করছিলেন। অন্যদিকে, জেনারেল পেট্রিয়াস, ম্যাক ক্রিস্টাল এবং যুগ্ম বাহিনী প্রধানের চেয়ারম্যান অ্যাডমিরাল মাইক মুলেনসহ পেন্টাগন স্পষ্টতই বিশৃঙ্খল আচরণ করছিল। ওয়াশিংটন পোস্টে তারা 'অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের' পক্ষে বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করছিল। মিডিয়ায় তাদের মতটাই বারবার প্রতিধ্বনিত হওয়ার জন্য নিউজউইক,[৩৬] ওয়াশিংটন পোস্ট,[৩৭] সিবিএস নিউজের সিক্সটি মিনিটস[৩৮]-এর মতো প্রধান গণমাধ্যমগুলোতে তারা বক্তব্য, বিবৃতি এবং ইন্টারভিউ দিচ্ছিল।[৩৯]

এতৎসত্ত্বেও, ওবামার দায় এড়ানোর প্রচেষ্টা পুরোপুরি অযৌক্তিক। ন্যূনতম সৎসাহস থাকলে তিনি আগ্রাসন বৃদ্ধির প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানাতেন। সবার সামনে বুক ফুলিয়ে বলতে পারতেন যে বছরখানেক আগেই তিনি জন ম্যাককেইনকে নির্বাচনে হারিয়েছিলেন এবং আফগান যুদ্ধের প্রশ্নে জর্জ ডব্লিউ বুশের মতো আরেক যুদ্ধবাজ সিনেটর ম্যাককেইনের পরিবর্তে মার্কিন জনগণ তাকেই পছন্দ করেছিল। তিনি জয় লাভ করেছেন এবং তিনি তার মতো করেই নেতৃত্ব দেবেন। যেসব জেনারেল ও কর্মকর্তার কাছে তা অপছন্দনীয়, তারা চাইলে পদত্যাগ করতে পারে। বীরত্বের প্রমাণ দিতে অন্যদের পুত্র-কন্যাদের আফগানিস্তানে মৃত্যুমুখে পাঠানোর চাইতে এই কথাগুলো বলতে পারাই হতো প্রকৃত সাহসী পদক্ষেপ।[৪০]

সত্যি বলতে, ওবামা হয়তো মার্কিন রাজনীতির প্রেক্ষাপটেই আফগানিস্তানে আগ্রাসন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। লিবারেল ও প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটরা ওবামা প্রশাসনের তথাকথিত 'প্রত্যাশা' ও 'পরিবর্তন'-এর বয়ানে এতটাই বিশ্বাসী ছিল যে ওবামা আফগান নারী ও শিশুদের নিজহাতে হত্যা করলেও তারা চোখ বন্ধ করে থাকত। উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা থাকলেও মোটের ওপর এটাই সত্য। মাইকেল টি হিনি এবং ফাবিও রোহাস তাদের বই 'পার্টি ইন দ্য

স্ট্রিট: দ্য এন্টিওয়ার মুভমেন্ট অ্যান্ড দ্য ডেমোক্রেটিক পার্টি আফটার নাইন ইলেভেন'-এ দেখিয়েছেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা বুশের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নেয়। অথচ এই যুদ্ধ কখনোই শেষ হয়ে যায়নি।[৪১]

ডেমোক্র্যাট ভক্তকুলের সমর্থনকে কোনো ঝুঁকিতে না ফেলে ওবামা সফলভাবে রিপাবলিকানদের রাজনৈতিক আক্রমণ থেকে গা বাঁচান। মূলধারার কিছু নারীবাদী গ্রুপও ওবামার আফগানিস্তানে আগ্রাসন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছিল।[৪২] কংগ্রেসে ইরাক যুদ্ধের সমালোচনাকারী ডেমোক্র্যাট ও ইউরোপীয় মিত্ররাও[৪৩] জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি নিজেদের দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করতে দীর্ঘদিন যাবৎ বলির পাঁঠা হিসেবে আফগানিস্তানকে ব্যবহার করছিল। তাই নিশ্চিত পরাজয় জেনেও প্রেসিডেন্ট অন্যদের কথায় অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন এবং এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রেসিডেন্ট ওবামা মূলত তালেবানের সঙ্গে মীমাংসায় পৌঁছানোর ক্ষীণ সম্ভাবনা নিয়ে জুয়া খেলছিলেন। অনেক মার্কিন নাগরিকই জেনে অবাক হবে যে তালেবানকে পরাজিত করা কিংবা তাদেরকে পাকিস্তানের গোপন ঘাঁটিগুলোতে ফেরত পাঠিয়ে দেশকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ২০০৯-২০১২ মেয়াদে আফগানিস্তানে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করা হয়নি। পুরো কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি ডকট্রিন দেশের বিভিন্ন অংশে কিছু সাময়িক ফায়দা ব্যতীত কোনো কিছুই অর্জনের কথা বলেনি। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগান সমাজের সহজাত শক্তি ও রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ তালেবানকে পরাজিত করার সামর্থ্য রাখে কি না'— এ বিষয়ে গেইটস ও অন্যদের মন্তব্যসহ প্রশাসনে ঘটমান বিভিন্ন আলোচনার কথা নিউইয়র্ক টাইমস প্রকাশ করছিল। প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তার পাশাপাশি সিআইএ ডিরেক্টর লিওন ই প্যানেটা গেইটসের মতোই বিশ্বাস করতেন যে 'তালেবানকে পরাজিত করা অসম্ভব। এ জন্য আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত আফগান সরকারের সঙ্গে মীমাংসায় ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুকদের আলাদা করা।'

জনৈক কর্মকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতিরক্ষাসচিবের অফিস থেকে আগত এক বার্তায় জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ ঐকমত্যে পৌঁছায়। বার্তায় বলা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্রের উচিত তালেবানকে নিশ্চিহ্ন করার পরিবর্তে দুর্বল করা, অত্যাবশ্যক মন্ত্রণালয়গুলো গঠন ও আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার ওপর জোড় প্রদান করা।' গেইটস, পেট্রেয়াস এবং অন্যান্য সামরিক নেতৃবৃন্দ ১৮ মাসের মধ্যেই অর্থাৎ ২০১১ সালের জুলাই নাগাদ তালেবানকে আলোচনার টেবিলে আনা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করার

ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারা আশ্বস্ত করেছিলেন, তত দিনে আফগান ন্যাশনাল আর্মি প্রশিক্ষিত ও পুরো দেশের নিরাপত্তার দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত হয়ে উঠলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের সেনাদের প্রত্যাহারের সুযোগ পাবে।[৪৪]

কিন্তু আট বছর পর হাজার দশেক ব্রিটিশ, কানাডিয়ান, ডাচ, জার্মান ও ন্যাটো জোটের অন্যান্য সেনা ছাড়াও মার্কিন সেনা ও নৌ-সেনা সংখ্যা বাড়িয়ে ৬০ হাজারে উন্নীত করার পরও আশানুরূপ কোনো উন্নতি ছাড়াই বহু বছর ধরে আফগান বাহিনীর প্রশিক্ষণ চলছে। এই প্রশিক্ষণের প্রতিশ্রুতি ছিল দেড় বছরের মধ্যেই তালেবানকে 'দুর্বল' ও 'পরাজিত' করা।

কিন্তু জেনারেল পেট্রেয়াস তার আকাঙ্ক্ষিত 'অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন' শুরু করার আগেই নিজের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যেতে থাকেন। তিনি দাবি করেন, 'আমার মনে হয়, জয়ের জন্য নয় বরং লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্যই এই যুদ্ধ।' আফগান আগ্রাসনকে ইরাকে চলমান সহিংসতার সঙ্গে তুলনা করে পেট্রেয়াস বলেন, 'আমাদের পুরো জীবন এমনকি আমাদের সন্তানদের হয়তো জীবনব্যাপী এই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'[৪৫]

২০০৯ সালের গ্রীষ্মে মূল কমিটির বৈঠকে জেনারেল ম্যাকক্রিস্টাল মন্তব্য করেন, 'আফগান প্রকল্পে এই পর্যায়ের সফলতা নির্ভর করছে ৪ লাখ সদস্যের আফগান ন্যাশনাল আর্মি এবং নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসেবে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় আফগান সরকার গঠনের ওপর।' জানা যায়, রাষ্ট্রদূত একেন বেরি আফগানিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব না থাকা ও ভবিষ্যতে তা গঠনের সম্ভাবনা নেই জানিয়ে কর্তৃপক্ষকে বাধা দিচ্ছিলেন ও সতর্ক করছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, 'আফগানিস্তানে দুর্নীতি এতই লাগামছাড়া যে পরিবর্তনের যেকোনো প্রস্তাবকেই হাস্যকর মনে হবে। কাবুলের বিলাসী ভবনের সংখ্যা গুনলে এই সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।'

ওবামার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই' ও 'পরাজয়ের' সংজ্ঞা নির্ধারণে অপ্রয়োজনীয় শোরগোল করেই সময় ব্যয় করত। তারা কাবুল সরকারের পেছনে কোটি কোটি ডলার অপচয়ের উপায় খুঁজতে দিনের পরদিন কুতর্কে কাটিয়ে দিত। এ ছাড়া তালেবানকে পরাজিত করা এবং আলোচনার টেবিলে আনার উপায় খোঁজ করার নামে কোনো সমাধান বের না করেই দ্রুত আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করে ফেলত। বব উডওয়ার্ড এসব তথ্য বিশদাকারে প্রকাশ করেছিলেন। কয়েক মাস ধরে প্রশাসনের ভেতরে

ও বাইরে এসব আলোচনা চলত। আকাঙ্ক্ষিত সেই ঘোষণা আসার মাত্র তিন সপ্তাহ আগে ২০০৯ সালের নভেম্বরের শুরুতে অনুষ্ঠিত অষ্টম পরিকল্পনা পর্যালোচনা বৈঠকে হোয়াইট হাউস সামরিক বাহিনীর কাছে জানতে চেয়েছিল, 'আমাদের মিশন আসলে কী? আমরা কী করতে চাইছি? আমাদের লক্ষ্য কী? কীসের জন্য এসব করছি?' কিন্তু কোনো প্রশ্নেরই সদুত্তর পাওয়া যায়নি।[৪৬]

এককথায়, অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের একমাত্র ভবিষ্যতে ছিল বন্দুকযুদ্ধ এবং বোমা হামলার প্রেক্ষিতে অগণিত নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু। বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুতে জনগণের মনে জন্ম নেওয়া ক্ষোভের প্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনীর জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের কোনো পরিবর্তন হবে কি না, দীর্ঘদিনব্যাপী চলা আলোচনায় এই প্রশ্ন কখনোই করা হয়নি। যদিও সেটা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিরক্ষাসচিব গেইটস সম্ভবত এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়াকেই উত্তম মনে করেছিলেন। পরবর্তীতে নিজের আত্মজীবনীতে গেইটস লিখেছেন, 'আমার মনে হয়েছে, রাজনীতিবিদেরা খুব সহজেই এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মার্কিন নাগরিকদের মতকে উপেক্ষা করতে পারবে।' ভাইস প্রেসিডেন্ট বাইডেন পুরো প্রক্রিয়া জুড়েই সতর্ক করছিলেন যে, এই যুদ্ধ অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা তৈরি করবে। কিন্তু গেইটস মনে করছিলেন, বাইডেন ভুল করছে এবং প্রেসিডেন্ট মনোবল দৃঢ় রেখে সবকিছু পরিকল্পনা মাফিক করতে পারলে জনমত বিরুদ্ধে গেলেও এই যুদ্ধ তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারবে না। জনগণের তুমুল বিরোধিতা এবং কংগ্রেসের উভয় কক্ষে ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ইরাক যুদ্ধে বুশ একই কাজ করে দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেন:

> সামরিকভাবে আমাদের জয়ী হওয়ার কথা জনগণকে বোঝানো এবং কিছু সেনা প্রত্যাহার করে যুদ্ধের সমাপ্তি সন্নিকটে— এমন বার্তা দেওয়াই ছিল সফলতার রহস্য।[৪৭]
>
> জনমতের প্রশ্নে পররাষ্ট্রসচিব হিলারি ক্লিনটনের একমাত্র চিন্তা ছিল ওয়াশিংটন ডিসি তাকে ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট হওয়ার মতো যথেষ্ট দৃঢ়চেতা ভাবছে কি না। কিন্তু ২০১৬ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের মাধ্যমে তার এই চিন্তার সলিল সমাধি ঘটে।[৪৮]

প্রধান উপদেষ্টা হিলারি সামরিক বাহিনীর পক্ষ নেওয়ায় এই বিষয়ে প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক গণ্ডি সীমিত হয়ে যায়। এটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কাছে তত দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাদের মতে, হিলারির কারণে ওবামার

জন্য 'কম আগ্রাসী' পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ কমে যায়। হিলারির ব্যর্থ রাজনৈতিক পরিকল্পনার দায় শুধু প্রেসিডেন্টের ওপরই নয়, বরং হাজারো ব্যক্তির ওপর গিয়েছে।[৪৯]

তার ই-মেইল থেকে পরবর্তী সময়ে জানা যায় যে, তার স্বামী বিল ক্লিনটনের প্রশাসনের জেনারেল ওয়েস্লি ক্লার্ক ও সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক স্যান্ডি বার্গ তাকে বলেছিলেন: 'যুক্তরাষ্ট্রের মূল কাজ হচ্ছে পাকিস্তানে লুকিয়ে থাকা আল-কায়েদা সদস্যদের দেওয়া সহায়তা করা বন্ধ করতে পাকিস্তানকে রাজি করানো।' আফগানিস্তানে অভিযানের ধীরগতির ব্যাপারেও জেনারেল ক্লার্ক তাকে সতর্ক করেছিলেন। যাহোক, ২০০৮ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের মনোনয়নের জন্য ব্যর্থ লড়াইয়ে হিলারির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা মার্ক পেন্স দ্ব্যর্থহীনভাবে তাকে বলেছিলেন, 'আগ্রাসন বৃদ্ধির প্রস্তাবে সমর্থন না জানানো একটি চরম রাজনৈতিক ভুল হতে পারে।' নির্বাচনী প্রচারণার পুরো সময় এবং ক্ষমতা গ্রহণের শুরুতেই ওবামা মেনে নিয়েছিলেন যে আফগানিস্তানের লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তিনি ও তার প্রশাসন সমর্থন হারাবেন এবং নিজেকে দুর্বল ও সিদ্ধান্তহীন প্রমাণ করবেন। হিলারিও এই পরামর্শকে আত্মস্থ করে নেন এবং প্রশাসনিক বিতর্কগুলোতে সব সময় জেনারেলদের পক্ষ নিতে থাকেন।[৫০]

এটি শেষ পর্যন্ত ওবামাকে জিম্মি করে ফেলে। এমনকি ওয়েস্ট পয়েন্টে এক ভাষণে ওবামা অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দেওয়ার এক সপ্তাহ আগে প্রতিরক্ষাসচিব গেইটস ও পররাষ্ট্রসচিব হিলারি উভয়েই জনসাধারণের সামনে বলেন যে 'পূর্বঘোষিত ২০১১ সালের জুলাই মাসের মধ্যে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টি শিথিলযোগ্য।' সেনা প্রত্যাহার বিষয়ে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আপস করার সম্ভাবনা তখনই শেষ হয়ে যায়।[৫১] জেনারেল পেট্রেয়াসও সেনা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জনসম্মুখে পিছু হটার ঘোষণা দেন।[৫২]

তথ্যসূত্র

১. Barack Obama, "Obama's Speech at Woodrow Wilson Center," delivered August 1, 2007.

২. Spencer Ackerman, "Victim of Obama's First Drone Strike: 'I Am the Living Example of What Drones Are,'" Guardian, January 23, 2016.

৩. The Other Scott Horton (no relation to the author), Lords of Secrecy: The National Security Elite and America's Stealth Warfare (New York: Nation, 2015) 109-128; Andrew Cockburn, Kill Chain: The Rise of the High-Tech Assassins (New York: Henry Holt, 2015); Chris Woods, Sudden Justice: America's Secret Drone Wars (Oxford: Oxford University Press, 2015); Jeremy Scahill et al., The Assassination Complex: Inside the Government's Secret Drone Warfare Program (New York: Simon & Schuster, 2016).

৪. Malik Jalal, "I'm On the Kill List. This is What it Feels Like to be Hunted by Drones," Independent, April 12, 2016; Malik Jalal, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, April 13, 2016.

৫. David Rhode, "The Obama Doctrine: How the President's Drone War is Backfiring," Foreign Policy, February 27, 2012; Doyle McManus, "US Drone Attacks in Pakistan 'Backfiring,'? Congress Told," Los Angeles Times, May 3, 2009.

৬. Helene Cooper, "Putting Stamp on Afghan War, Obama Will Send 17,000 Troops," New York Times, February 17, 2009.

৭. Karen DeYoung, "More Troops Headed to Afghanistan," Washington Post, February 18, 2009.

৮. Michael Hastings, The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan (New York: Blue Rider, 2012), 22.

৯. Woodward, Obama's Wars, 41-43.

১০. Ibid., 77.

১১. Woodward, Obama's Wars, 115.

১২. Gareth Porter, "Gates Conceals Real Story of Gaming Obama on the Afghan War," Inter Press Service, January 10, 2014.

১৩. Hastings, The Operators, 39.

১৪. Woodward, Obama's Wars, 82-85, 123-125.

১৫. Hastings, The Operators, 184.

১৬. John H. Richardson, "Acts of Conscience," Esquire, September 21, 2009; Ian Cobain, "Camp Nama: British Personnel Reveal

Horrors of Secret US Base in Baghdad," Guardian, April 1, 2013.

১৭. Bob Woodward, "McChrystal: More Forces or 'Mission Failure,'" Washington Post, September 21, 2009; Stanley McChrystal, "COMISAF Initial Assessment (Unclassified)," Washington Post, September 21, 2009.

১৮. Peter Baker, "How Obama Came to Plan for 'Surge' in Afghanistan," New York Times, December 5, 2009.

১৯. Woodward, Obama's Wars, 155-156, 162.

২০. Hastings, The Operators, 134-135.

২১. McKenzie, Scott Horton Show, September 9, 2009.

২২. Karen DeYoung, "US Official Resigns over Afghan War," Washington Post, October 27, 2009.

২৩. Sonia Verma, "Rival Accuses Karzai of 'Rigging' Vote," Globe and Mail, August 23, 2009.

২৪. Matthew Hoh, "Resignation Letter," Washington Post, September 10, 2009.

২৫. Matthew Hoh, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, September 25, 2010.

২৬. Helene Cooper, "Ex-US Envoy May Take Key Role in Afghan Government," New York Times, May 18, 2009.

২৭. Woodward, Obama's Wars, 261.

২৮. Greg Jaffe et al., "US Envoy Resists Troop Increase, Cites Karzai as Problem," Washington Post, November 12, 2009; "Ambassador Eikenberry's Cables on US Strategy in Afghanistan," New York Times, accessed May 25, 2007.

২৯. Woodward, Obama's Wars, 206.

৩০. Michael Goldfarb, "Kristol: All Hail Obama!" Weekly Standard, March 27, 2009.

৩১. Woodward, Obama's Wars, 235-238.

৩২. Josh Rogin, "General Cartwright is Paying the Price for Hillary Clinton's Sins," Washington Post, October 18, 2016.

৩৩. Hastings, The Operators, 135.

৩৪. Woodward, Obama's Wars, 304.

৩৫. Jeffrey Goldberg, "The Obama Doctrine," Atlantic, April 2016.

৩৬. Alex Spillius, "White House Angry at General Stanley McChrystal Speech on Afghanistan," Daily Telegraph, October 5, 2009.

৩৭. Evan Thomas, "General McChrystal's Plan for Afghanistan," Newsweek, September 25, 2009.

৩৮. Ann Scott Tyson, "US Commander in Afghanistan Calls Situation 'Serious,'" Washington Post, September 1, 2009; Michael Gerson, "US Has Reasons to Hope for Afghanistan," Washington Post, September 4, 2009; Woodward, "McChrystal: More Forces or 'Mission Failure.'"

৩৯. David Martin, "McChrystal's Frank Talk on Afghanistan," 60 Minutes, CBS News, September 24, 2009.

৪০. Woodward, Obama's Wars, 194-197.

৪১. Michael T. Heaney and Fabio Rojas, Party in the Street: The Antiwar Movement and the Democratic Party after 9/11 (Cambridge, Cambridge University Press, 2015).

৪২. Feminist Majority Foundation, Campaign for Afghan Women and Girls; Sonali Kolhatkar and Mariam Rawi, "Why Is a Leading Feminist Organization Lending Its Name to Support Escalation in Afghanistan?," Alternet, July 7, 2009.

৪৩. "CIA Report into Shoring Up Afghan War Support in Western Europe," WikiLeaks, March 26, 2010.

৪৪. Woodward, Obama's Wars, 113; Jonathan Alter, The Promise: President Obama, Year One, excerpted in Newsweek, May 14, 2010.

৪৫. Woodward, Obama's Wars, 332.

৪৬. Woodward, Obama's Wars, 269.

৪৭. Robert M. Gates, Duty, 342.

৪৮. John Hudson, "Exclusive: Prominent GOP Neoconservative to Fundraise for Hillary Clinton," Foreign Policy, June 23, 2016.

৪৯. Woodward, Obama's Wars, 254.

৫০. Jason Leopold and Alya Iftikhar, "Hillary Clinton Sought Advice on Afghanistan from Former Bill Clinton Advisers," Vice, July 1, 2015.

৫১. Mary Katharine Ham, "Gates, Clinton Talk Afghanistan Deadlines That Aren't Really Deadlines on Sunday Shows," Weekly Standard, December 7, 2009; Baker, "How Obama Came to Plan for 'Surge' in Afghanistan."

৫২. Woodward, Obama's Wars, 213-219, 224, 254.

কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির কুশীলববৃন্দ

বারাক ওবামার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরপরই সেন্টার ফর অ্যা নিউ আমেরিকান সোসাইটি (Center for a New American Security, CNAS) নামক একটি শক্তিশালী নতুন থিংক ট্যাংক চালু হয়। মূলত জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের দক্ষ করার লক্ষ্যে এই থিংক ট্যাংক চালু হয়েছিল। সেই কর্মকর্তারা ছিল অধুনা হিলারি ক্লিনটন প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। বিশাল বিশাল প্রতিরক্ষা ঠিকাদার, বিনিয়োগ ব্যাংক, রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন বিদেশি সরকার অর্থায়িত সেন্টার ফর অ্যা নিউ আমেরিকান সোসাইটি আফগান যুদ্ধকে আরও তীব্র করার জন্য কঠোর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।[১] এটি নতুন ডেমোক্রেটিক প্রশাসন ও এর সদস্যবৃন্দের ওপর প্রভাব এবং অবস্থান তৈরি করে নেওয়ার লক্ষ্যেও কাজ করতে থাকে। এই সেন্টার ফর অ্যা নিউ আমেরিকান সোসাইটির কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির প্রবক্তা ও সমমনা ব্যক্তিরা আফগানিস্তানে সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি তত্ত্ব প্রয়োগের জন্য ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করেছিল। এই ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রাক্তন সেনা রেঞ্জার অ্যান্ড্রু এক্সামু, অধুনা রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবী ফ্রেডরিক কাগান ও তার স্ত্রী কিম্বারলি,[২] অস্ট্রেলিয়ান কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি তাত্ত্বিক এবং পেট্রিয়াসের উপদেষ্টা ডেভিড কিলকুলেন, কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির জনি আপেলসিড এবং পল ওলফউইটজের প্রাক্তন সামরিক উপদেষ্টা জন নাগল, ইরাকে 'সুন্নি টার্ন'-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক[৩] এবং বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক পরিষদের স্টিফেন বিডল, সেন্টার ফর অ্যা নিউ আমেরিকান সোসাইটির জার্নালিস্ট, ফরেন পলিসি পত্রিকার টমাস রিক্স[৪] এবং মিলিটারি পরিচালিত আটলান্টিকের রবার্ট কাপলান,[৫] প্রতিরক্ষা নীতির নতুন ডেপুটি সেক্রেটারি, সেন্টার ফর অ্যা নিউ আমেরিকান সোসাইটির সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিশেল ফ্লোরনয় প্রমুখ।

সেন্টার ফর অ্যা নিউ আমেরিকান সোসাইটির পক্ষে থেকে দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধের সবচেয়ে খারাপ সময়ে জেনারেল ম্যাটিস ও পেট্রিয়াস রচিত কাউন্টার-

ইনসার্জেন্সি ডকট্রিনকে আফগানিস্তানেও মার্কিন সাফল্যের কার্যকরী হাতিয়ার বলা হচ্ছিল।[৬]

যুদ্ধে জয়লাভের বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানের অধিকারী না হলেও জনগণকে ফুসলাতে তারা বিশেষ পারঙ্গম ছিল। তারা জনসমক্ষে বলত: 'সামরিক বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় পুরোদমে কাজ চালাচ্ছে', 'বুশ শাসনামলের অক্ষম এবং বেকুবদের ভুলে যান', 'প্রকৃত সমরবিদেরা এখন দায়িত্বে রয়েছেন এবং তারা কী করতে হবে সে সম্পর্কে অবগত রয়েছেন', 'নতুন সমরকৌশলটি দখলদারির পুরোনো অর্বাচীন চিন্তাভাবনার অবসানের লক্ষ্যেই গড়া হয়েছে' এবং 'এই সমরকৌশল প্রায় এক দশক আগে (কথিত) স্বাধীন হওয়া অঞ্চলটি পরিষ্কার করে হাতের মুঠোয় রেখেই নির্মাণ কার্যক্রমে দিকে মনোনিবেশ করবে'। তাদের এই উজ্জ্বল নতুন পরিকল্পনার সর্বাত্মক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে: 'সেনাবাহিনী আফগানিস্তানের নির্মাণ এবং পরিবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করবে।'[৭]

তারা সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে শ্রোতাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল, 'তারা যেকোনো সমাজকে পরিবর্তনের সক্ষমতা রাখে, এমনকি আফগানিস্তানেরও। এ জন্য আফগানিস্তানের প্রতিটি শহর, জেলা ও গ্রামে গ্রামে একটি তৈরি সরকার স্থাপন করতে হবে। এই রেডিমেইড বা তৈরি সরকারগুলোর দক্ষ, নিবেদিতপ্রাণ এবং অভিজ্ঞ আফগানি টেকনোক্র্যাটরা তখন নিঃস্বার্থভাবে দেশকে পরিচালনা করবে।[৮] দিনশেষে তারাই আমাদের দুর্দান্ত, পশ্চিমঘেঁষা এবং একবিংশ শতাব্দীর একটি আধুনিক আফগানিস্তান উপহার দেবে।' ব্যাপারটা অনেকটা এমন যেন, কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি সুপার হিরোরা 'চাকু দিয়েও স্যুপ খেতে পারে।'[৯] এখন তাদের আর কিছুই আমাদের থামাতে পারবে না।

কিন্তু আসল ব্যাপারটি হলো, এই কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি এবং অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন ছিল ওয়াশিংটনের একটি পরিকল্পিত প্রহসন। আমাদের প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিয়োজিত আমলারা এটিকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ হিসেবে নিয়েছিল। মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এটা ছিল জীবনের শ্রেষ্ঠতম সুযোগ। এ ছাড়া নতুন প্রকল্পে পদোন্নতিও একটি মুখ্য বিষয় ছিল। তারা সবাই বিভিন্ন সভা ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করছিল এবং প্রচুর ভারী ভারী কথা বলছিল। সামগ্রিকভাবে এটি উত্তেজনাপূর্ণ এবং মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতোই একটি বিষয় ছিল। যদিও এসবের পুরোটাই ছিল একটি আবর্জনা।

কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি ইতোমধ্যেই একটি স্বীকৃত ব্যর্থতা ছিল। এই নীতিমালার সফলতা তুলে ধরতে যেসব ঐতিহাসিক উদাহরণ দেওয়া হয়, সেগুলো

বর্তমান প্রেক্ষাপটে অতিমাত্রায় সন্দেহজনক। যেমন, ব্রিটিশরা একটি প্রান্তিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়াই করে মালয়েশিয়া জয় করেছিল। এই বিদ্রোহে তারা সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে গতানুগতিক যুদ্ধ এবং জাতিগত নির্মূল অভিযানের মাধ্যমে সহজে প্রতিপক্ষকে পরাজিত ও নির্বাসিত করেছিল। অথচ একই নীতিমালা অনুসরণ করেও আলজেরিয়া এবং ভিয়েতনামে ফরাসিরা পরাজিত এবং অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিনদের পরিণতি হয় ফরাসিদের মতোই।[১০]

যদিও রূপকথার গল্প অনুসারে, কংগ্রেস কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি ডকট্রিন বাস্তবায়নের মতো পর্যাপ্ত সময় পেলে আমেরিকা ভিয়েতনামে জয়লাভ করত! অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই ১৯৬২ সাল থেকেই ভিয়েতনামে 'বিদ্রোহ নির্মূল করে নির্মাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন' কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা করছিল। সেখানে আমেরিকার প্রয়োগকৃত কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি নীতিমালা দেখিয়েছিল যে সফলভাবে জাতিরাষ্ট্র নির্মাণ এবং রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বৈধতা প্রতিষ্ঠা না করা গেলে সাময়িক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা অর্থহীন। আমেরিকার এই নীতি ভিয়েতনামের মতো আফগানিস্তানেও অকার্যকর।[১১]

দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধও আফগানিস্তানের জন্য কোনো উদাহরণ হতে পারে না। অথচ ২০১০ সালের আফগান পরিকল্পনার একটি প্রধান ভিত্তিই ছিল ২০০৭ সালে ইরাকে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের মাধ্যমে অর্জিত জেনারেল পেট্রিয়াসের কথিত সাফল্যের গল্প। রাজনীতিবিদগণ এবং গণমাধ্যমগুলো যেভাবে এর চিত্রায়ণ করে, বাস্তবে সেটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের ফলে ইরাকে অস্থায়ী এবং তুলনামূলকভাবে সহিংসতা হ্রাস পায়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র সেখানে দুর্বল সংখ্যালঘু সুন্নি আরবদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়া আরবদের পক্ষ নিয়ে শিয়া-সুন্নি গৃহযুদ্ধের লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল। রাজধানী বাগদাদ হাতছাড়া হয়ে যাওয়া এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর সুন্নি বিদ্রোহীদের যুদ্ধে ফিরে আসার জন্য পুনরায় সংগঠিত হতে সময়ের প্রয়োজন ছিল। ইরাকি বিদ্রোহে নেতৃত্বে থাকা সুন্নি যোদ্ধারা ইতোমধ্যেই তাদের সবচেয়ে দুষ্ট মিত্র ইরাকি আল-কায়েদার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল এবং তাদেরকে কোণঠাসা করা শুরু করেছিল। এটা হয়েছিল পেট্রিয়াসের দায়িত্ব নেওয়ার অনেক পূর্বেই।[১২] তদুপরি ইরাকি আল-কায়েদার জঙ্গি সমরকৌশলের প্রতিক্রিয়া হিসেবে শিয়া মিলিশিয়ারা একটি ধ্বংসাত্মক অভিযান পরিচালনায় প্ররোচিত হয়েছিল। সুন্নি বিদ্রোহী নেতারা সে সময় মার্কিন দখলদারির বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে লড়াই বন্ধ করে দেয়। তারা মার্কিন অর্থ এবং গোলা-বারুদ

গ্রহণ করার বিনিময়ে ইরাকি আল-কায়েদাকে কোণঠাসা করে ফেলতে রাজি হয়েছিল। এটাই ছিল তথাকথিত 'সুন্নি জাগরণ আন্দোলন'। এটা এমন এক আন্দোলন যেখানে বিদ্রোহী যোদ্ধারা আমেরিকান বেতনভুক্ত কর্মচারীতে পরিণত হয়েছিল। তাদেরকে আবার 'সচেতন স্থানীয় নাগরিক' বা 'ইরাকের পুত্র' নামেও ভূষিত করা হয়েছিল। তাদেরকে মূলত নিজ বাড়ির আশপাশে টহল এবং আল-কায়েদাকে বিতাড়িত করার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল। কিন্তু অপরদিকে ইরাকে অতিরিক্ত মার্কিন সেনা মোতায়েনের সুযোগে শিয়া মিলিশিয়ারা বাগদাদ থেকে সুন্নিদের নির্মূল করতে নৃশংস অভিযান চালিয়েছিল।[১৩] মার্কিনরা সেখানে অবস্থান করলেও জনবলের অভাবে যুদ্ধ থেকে বিরত দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সমাধান ও সংহতকরণের লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অথচ রাজনৈতিক সমাধানই ছিল এই সামগ্রিক প্রকল্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য। বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়ারা পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সমঝোতা করার সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছিল।[১৪] অতঃপর সেখানে একটি স্থায়ী ঘাঁটির অনুমতি না দিয়ে এবং কোনো প্রকার ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়াই শিয়ারা দ্রুতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেখান থেকে বের করে দেয়। এটাই ছিল আফগানিস্তানের জন্য ওবামার ইরাক প্রেসক্রিপশনের বাস্তবতা।

কর্নেল জেন্টিল উল্লেখ করেন, মালেশিয়া ও ভিয়েতনামে ব্রিটিশ ও ফরাসি বাহিনী এই একই মতবাদকে 'কাউন্টার-রেভল্যুশনারি ওয়ারফেয়ার' নাম দিয়েছিল। এ জন্যই সম্ভবত নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করে মার্কিন জনগণকে বোঝাতে হয়েছিল যে, আফগানিস্তানে দখলদারি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর ব্রিটিশ ধাঁচের কোনো ঔপনিবেশিক দমন-নিপীড়ন নয়। এটি হলো আফগানদের প্রতি সর্বজনবিদিত মার্কিন সহায়তা। এ রকম সহায়তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মার্কিনরা ফ্রান্সকে নাৎসিদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। পেন্টাগনের কর্মকর্তারা শান্তিকামী নাগরিকদের সন্ত্রাসীদের কবল থেকে রক্ষার একটি বীরত্বপূর্ণ লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করা জন্য এই সামরিক মতবাদ 'কাউন্টার-রেভল্যুশনারি'কে 'কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি' নামে চালিয়ে দেন, যাতে করে এই যুদ্ধকে দখলদারি ও আধিপত্যের আগ্রাসন হিসেবে দেখা না হয়। একই সঙ্গে আফগানরা যেন ভুলে না যায় যে, মার্কিনদের সরবরাহকৃত 'প্রগতিশীলতা' এবং 'স্বাধীনতা'কে ব্যাহত করার চেষ্টায় থাকা লোকজনের বিরুদ্ধেই এই যুদ্ধ!

এই বানোয়াট কাহিনি সফলভাবে আসল প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রশ্নটি কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি কুশীলবদের কাছ থেকেও কখনো জানতে

চাওয়া হয়নি। সেটি হলো— 'আমেরিকা কি বিভিন্ন দেশে আধিপত্য বিস্তার করা একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ নয়?' এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ামাত্রই আমাদের যুদ্ধবাজের সেইফ হেভেন বা 'নিরাপদ দুর্গ' কল্পকাহিনির অবতারণা করে। যুদ্ধবাজদের মতে: 'এই যুদ্ধ থেকে আমাদের পুরোপুরি চলে আসর সময় হয়নি। কারণ যে কোনো সময় যেকোনো কিছু ঘটতে পারে।' অথচ ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে প্রধান নিপীড়কের আসনটা ইংরেজদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। একই সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীও বর্তমানে আমেরিকার প্রায় সব যুদ্ধেই সহযোগী হিসেবে অংশ নিচ্ছে।[১৫]

জেনেটেল উল্লেখ করেন, 'আমেরিকা আফগান দখলদারির শুরু থেকেই কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি নীতিমালা মোতাবেক জাতিরাষ্ট্র গঠনের অনুশীলন করে আসছে। তারা এখানে প্রশাসন ও গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত সময় এবং অর্থ ব্যয় করেছে। মানুষকে অধিক নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য স্থানীয় পুলিশ গঠনে কঠোর পরিশ্রম করছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের মতোই আফগানিস্তানে বিদ্রোহ প্রতিরোধ বা কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি মতবাদ প্রথম থেকেই কার্যকর করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। তবে কেবল ব্যর্থতা ব্যতীত ভিন্ন কিছু অর্জন করা সম্ভব হয়নি।'[১৬]

একপর্যায়ে কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির নকশা প্রণয়নকারীরা আফগানিস্তানে অতিরিক্ত সেনাবল নিয়োগে আসন্ন সাফল্যের বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত ছিল। তারা এমনকি এই নীতিমালা অনুসারে 'গ্লোবাল কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি' নীতিমালা প্রণয়নের পরামর্শও দেয়। তারা বলে যে 'সোমালিয়া থেকে ফিলিপাইন কিংবা কোথাও কোনো মার্কিন মিত্র জঙ্গিগোষ্ঠীর হুমকির শিকার হলেই এই কর্মপন্থা অনুসরণ করা আবশ্যক।' অর্থাৎ, দুনিয়ার সব হুমকি বা হামলাকে কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির নকশার আলোকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। আইকেনবেরি পরবর্তী সময়ে কৌতুক করে বলেছিলেন যে, 'কাউন্টার ইনসার্জেন্সি বিশেষ্য থেকে বিশেষণে বিবর্তিত হয়েছে।'[১৭]

লেখক টম এঞ্জেলহার্ট ২০০৯ সালের শেষ দিকে সতর্ক করে বলেছিলেন, আফগানিস্তানে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন একটি বিশাল প্রকল্প হতে যাচ্ছে। এই প্রকল্প অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের বিশেষ অপারেশন বাহিনীসহ কয়েক হাজার মার্কিন ও জোটসেনা মোতায়েন করা হতে পারে। সমগ্র অঞ্চলজুড়ে বিপুলসংখ্যক নতুন ঘাঁটি নির্মাণের প্রয়োজন হতে পারে। সেসব ঘাঁটির মধ্যে কয়েকটি আক্ষরিক অর্থেই কোনো ছোট শহরের সমান হবে। সেগুলোতে

বার্গার কিংস, বাসকিন রবিনস, টাকো বেলস, সিনেমা প্রেক্ষাগৃহ এবং এমন সকল কিছুই থাকবে। এটি একটি মারাত্মক ব্যয়বহুল প্রকল্প হতে হতে যাচ্ছে। বেসামরিক ঠিকাদার, পররাষ্ট্র বিভাগের কর্মকর্তা এবং এনজিও, মার্সেনারিজ, সিআইএ কর্মকর্তা এবং স্পাই, বিভিন্ন গোত্রীয় মিলিশিয়া গঠন, আফগান ন্যাশনাল আর্মি এবং আফগান ন্যাশনাল পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ, পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানে ড্রোন যুদ্ধের সম্প্রসারণ এবং আর্থিক ও প্রাণহানিসহ সব দিক থেকেই এর ব্যয় সবকিছু ছাড়িয়ে যাবে। এগুলোর প্রতিটি কাঁটায় কাঁটায় এঙ্গেলহার্টের ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করেছে।

বাস্তবতা হলো, সমগ্র প্রকল্পটি প্রত্যেকের কাছে পূর্বজ্ঞাত এবং সংশয়াতীত ছিল। আগে থেকেই সেন্টার ফর অ্যা নিউ আমেরিকান সোসাইটি এবং যুদ্ধপ্রিয় কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি কুশীলবদের মাহাত্ম্যের ছলচাতুরীকে বিশ্বাস করায় নিজস্ব কোনো স্বার্থ না থাকলেই কেবল প্রকল্পটি সম্পর্কে জানা না থাকার কথা। ২০০৯ সালের বসন্তে প্রেসিডেন্ট ওবামা অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের প্রথম দফা সম্পন্নের আদেশ দেওয়ার পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। প্যাট্রিক ককবার্নের বিশ্লেষণে সেগুলো সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। প্রথমটি ছিল পাকিস্তান সমস্যা। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী বিশাল সীমানার কারণে আমাদের শত্রুরা উপর্যুপরি আশ্রয় এবং উপযুক্ত সময়ে আঘাত হানার অন্তহীন সুযোগ পেয়ে থাকে। স্থানীয়রা সেখানে দুই দেশের পশতুনদের আলাদা করে রাখা তথাকথিত ডুরান্ড লাইনকে স্বীকৃতি দেয় না। আফগান সরকার ইতোমধ্যেই সতর্ক করে দিয়েছিল যে তালেবানদের পরাস্ত করার জন্য লড়াইকে আরও তীব্র করা একটি ভুল। বিশেষত বিমানবাহিনীকে কাজে লাগানো হবে মারাত্মক ভুল। কারণ বিমান হামলায় বেসামরিক হতাহতের ঘটনার হার বেশি। এমনটা হলে আরও বেশি সাধারণ জনগণ তালেবানে যোগদানে প্ররোচিত হবে। ককবার্ন নিজেও পাকিস্তানে ওবামার সদ্য চালু হওয়া সিআইএ'র ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে জোরালো সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই কৌশলে সফল হতে হলে সেই দেশের অভ্যন্তরে একটি বৃহত্তর গোয়েন্দা কার্যক্রম স্থাপন করতে হবে। পাশাপাশি এর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বড় ধরনের রাজনৈতিক মূল্য দিতে হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি বিবিসির একটি প্রতিবেদনের প্রমাণসহ দেখান, 'মার্কিন সেনাদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির সমানুপাতে আফগানিস্তানে তাদের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে একই সময়ে স্থানীয়দের মাঝে মার্কিনদের বিরুদ্ধে তালেবান বিদ্রোহের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।'[১৮]

তথ্যসূত্র

১. "CNAS Supporters," Center for a New American Security, accessed May 24, 2017.

২. Frederick W. Kagan and Kimberly Kagan, "Afghan Surge Would Give US Leverage to Succeed," November 27, 2009.

৩. Stephen Biddle, "Seeing Baghdad, Thinking Saigon," Foreign Affairs, March/April 2006. Andrew Gray, "US Afghan Commander May Ask for More Troops," Reuters, July 30, 2009.

৪. Thomas E. Ricks, "The COINdinistas," Foreign Policy, November 30, 2009.

৫. Hastings, The Operators, 91.

৬. Counterinsurgency FM 3-24, Department of the Army, December 2006; John A. Nagl, "A Better War in Afghanistan," Joint Force Quarterly, January 2010.

৭. Anthony H. Cordesman, "Obama's New Strategy in Afghanistan," Center for Strategic and International Studies, December 2, 2009.

৮. David Sanger, "A Test for the Meaning of Victory in Afghanistan," New York Times, February 13, 2010.

৯. John A. Nagl, Learning to Eat Soup with a Knife: Counterinsurgency Lessons from Malaya and Vietnam (Chicago: University of Chicago Press, 2005).

১০. Gian, Wrong Turn, 35-58, 59-84.

১১. "The Strategic Hamlet Program, 1961-1963," Pentagon Papers.

১২. Sabrina Tavernise and Dexter Filkins, "Local Insurgents Tell of Clashes with Al Qaeda's Forces in Iraq," New York Times, January 12, 2006; John Ward Anderson, "Iraqi Tribes Strike Back at Insurgents," Washington Post, March 7, 2006.

১৩. Maggie Fox, "Satellite Images Show Ethnic Cleanout in Iraq," Reuters, September 19, 2008; "Baghdad's New Owners," Newsweek, September 9, 2007; Joel Wing, "Columbia University Charts Sectarian Cleansing of Baghdad," Musings on Iraq, November 19, 2009.

১৪. Lionel Beehner and Greg Bruno, "Backgrounder: What are Iraq's Benchmarks?," Council on Foreign Relations, March 11, 2008.
১৫. Gian, Wrong Turn, 6.
১৬. Ibid., 113-129, 135.
১৭. Karl Eikenberry, "The Limits of Counterinsurgency Doctrine in Afghanistan," Foreign Affairs, September/October 2013.
১৮. Patrick Cockburn, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, April 29, 2009.

কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ

মাইকেল হেস্টিংস ২০০৯ সালের শুরুর দিকে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় পাকিস্তান সীমান্তবর্তী অঞ্চলে লড়াইরত সেনাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আফগান মিশনকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। ক্যাপ্টেন টেরি হিল্টের অধীন মার্কিন সেনাদের ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে হেস্টিংস লিখেছিলেন, 'হিল্ট এবং তার অধীন সেনাদের বিশাল এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল যে এই বিশাল এলাকায় কোনো টেকসই ভূমিকা রাখা অসম্ভব। তাই তাদের সাধ্যের মধ্যে থাকা কাজগুলোই তারা ঘুরেফিরে করত। যেমন, মিলিয়ন-ডলারের সুরক্ষিত সাঁজোয়া যান নিয়ে টহল। সেই সাঁজোয়া যানগুলো কাদায় আটকে গেলে রেকার এসে গাড়ি সমেত তাদেরকে উদ্ধার করতে হতো। তারা আফগান পুলিশকে নিজেদের সুরক্ষার বিষয়ে তালিম দিত। আবার, কখনো তারা হয়তো জটিল উপজাতীয় বিরোধ নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা করত। কদাচিৎ তার ইউনিট শত্রুকে তাড়া করে তাদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে জড়াত।'[১]

হেস্টিংস আরও বর্ণনা করেন, 'তার ইউনিটের সর্বমোট সদস্য ছিল ২৫ জন। অথচ তাদের দায়িত্বে ছিল আফগান-পাকিস্তান সীমান্তসংলগ্ন প্রায় ৩৫০ বর্গমাইল এলাকা। তারা তাদের দায়িত্বের বেশির ভাগ এলাকায় এমনকি পদচিহ্নও রাখেনি। তাদের কাজ ছিল আশপাশে ঘোরাঘুরি করা এবং সর্বদা অ্যাম্বুশের প্রহর গোনা। এই দুই বিষয়ে অসংখ্য মুখরোচক গল্প রয়েছে।'

হেস্টিংস এবং তার সঙ্গে থাকা সৈন্যদের কাছে স্পষ্ট ছিল যে, যুদ্ধের আসন্ন তীব্রতা বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ কোনো কিছু অর্জনে ব্যর্থ হবে। কারণ কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি মতবাদের সঙ্গে জড়িত সিনিয়র কর্মকর্তা এবং সমরবিদেরা যুদ্ধের মাত্রা বাড়ানো নিয়ে চূড়ান্তভাবে সন্দেহগ্রস্ত ছিল। তাদের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য বিরাজ করছিল। অনেক কর্মকর্তাই দখলদারিকে সম্প্রসারণের চেয়ে পাকিস্তানে টিকে থাকা সর্বশেষ আল-কায়েদা যোদ্ধাদের

ধ্বংস করার দিকে মনোনিবেশ করাকে পছন্দ করেছিলেন। সেনাবাহিনীতে আমলাতান্ত্রিক পদোন্নতির ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় যুদ্ধের পরিস্থিতি অনেক খারাপ হলেও কারোর মাঝেই ছাড় দেওয়ার কোনো মানসিকতা ছিল না। হেস্টিংস জানান, 'অভিযানের সার্বিক পরিস্থিতির সাপেক্ষে ত্বরিত পদক্ষেপের অভাবে একসময় আফগান অভিযানকে হামাগুড়ি এবং অন্তহীন অভিযান বলে মনে হতে থাকে। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারাও স্বীকার করেছিলেন যে তালেবান সমস্যার কোনো সামরিক সমাধান নেই।'

কিন্তু সমাধানের বিষয়ে কারা বলে এবং তারাই-বা কী পরামর্শ দেয়? জেনারেল পেট্রিয়াসের কাউন্টার-ইনসার্জেন্সিবিষয়ক অস্ট্রেলিয়ান উপদেষ্টা ডেভিড কিলকুলেন হেস্টিংসকে বলেছিলেন যে, 'তিনি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে পূর্ণ ২৫ বছরের একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব রেখেছিলেন।' হয়তো ২০০৯ সালের অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন কার্যক্রম থেকে এর সূচনা হতো।[২]

২০০৯ সালের শুরুর দিকে অতিরিক্ত সেনা প্রেরণের প্রথম ধাপে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার প্রদেশের পরিবর্তে এর পার্শ্ববর্তী জনবিরল হেলমান্দ প্রদেশে সেই সেনাদের প্রেরণ করা হয়েছিল। ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদক এবং 'লিটল আমেরিকা: দ্য ওয়ার উইথিন দ্য ওয়ার ফর আফগানিস্তান' বইয়ের লেখক রাজীব চন্দ্রশেকারণ এর পেছনের কারণ তুলে ধরেছেন। তার মতে, হেলমান্দ প্রদেশে সেনা পাঠানোর কারণ হলো— 'গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা কার্যক্রমের জন্য অল্পসংখ্যক কর্মী সমন্বিত ন্যাটো অংশীদারদের ওপর নির্ভরতা, আফগানিস্তানের নিরাপত্তা ইস্যুতে হেলমান্দকে ভুলভাবে উপস্থাপন এবং পেন্টাগনের অভ্যন্তরীণ বিবদমান রাজনীতি।' কেবল এই সিদ্ধান্তটি সমগ্র অভিযানের ওপর একটি মারাত্মক আঘাত বলে দৃশ্যমান হয়। এই পদক্ষেপটি ছিল পুরোদস্তুর একটি অপচয়। সেনারা নিজেদের মরুভূমি আচ্ছাদিত অগুরুত্বপূর্ণ একটি ভূখণ্ডে আবিষ্কার করেছিল। নেভি সদস্যরা ছাড়াও জেনারেল ম্যাকক্রিস্টাল এবং মার্কিন কমান্ডের অনেকেই এই অহেতুক নিয়োগের ব্যাপারে একমত ছিলেন।[৩] কিন্তু পরবর্তী সময়ে জেনারেল ম্যাকক্রিস্টাল হেলমান্দে শক্ত অবস্থানের জন্য আরও কয়েক হাজার সেনা মোতায়েন করেন। অথচ ইতিপূর্বে মোতায়েনকৃত সেনারা সেখানে অযথা নতুন নতুন শত্রু তৈরি করছিল।[৪]

ইনভেস্টমেন্টস ইন ব্লাড: দ্য ট্রু কস্ট অব ব্রিটেনস আফগান ওয়ার[৫] বইয়ের লেখক ফ্রাঙ্ক লেদউইজ হেলমান্দ প্রদেশে কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি অভিযানে

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন। মার্কিন সেনাবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকারীদের কেউই তাদের দখলকৃত দেশটির লোকজনের পরিচয় বা সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানত না এ ছাড়া আফগানিস্তানে ঐতিহাসিক ব্রিটিশ আগ্রাসন এবং এরপর যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সেনাদের উপস্থিতি খোদ মার্কিনদের জন্যই সমস্যা সৃষ্টি করেছিল।[৬]

২০০১ সালের নভেম্বর মাসে ব্রিটিশরা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কাউকে না জানিয়ে বাগরাম বিমানবন্দরে উপস্থিত হলে আবদুল্লাহ এবং অন্যরা মারাত্মক ক্রুদ্ধ হয়েছিল। অথচ আহমাদ শাহ মাসুদের সাম্প্রতিক মৃত্যুর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে জোটবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। এমনকি সেই ঘটনা একটি নতুন সরকার গঠনে মার্কিন প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে প্রায় বিনষ্ট করে দিচ্ছিল।[৭]

সর্বোপরি, পশতুন জনগোষ্ঠীর জন্য দখলদার মার্কিন ও ইংরেজ বাহিনীকে নিজেদের জীবন ও জীবনযাত্রার প্রধান হুমকি হিসেবে দেখাটাই ছিল স্বাভাবিক।[৮]

২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ হেলমান্দ প্রদেশের মারজাহ অঞ্চলে চালানো 'অপারেশন মোশতর্ক'কে জেনারেল পেট্রিয়াসের কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির প্রথম 'পরীক্ষামূলক প্রয়োগ' বলা হয়। 'মোশতর্ক' আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের দারি ভাষার শব্দ।[৯] অথচ দক্ষিণাঞ্চলীয় হেলমান্দের বাসিন্দারা মূলত পশতু ভাষায় কথা। দারি ভাষাকে তারা আপন মনে করে না। যাহোক, প্রধান গণমাধ্যমে মারজাহকে ৮০ হাজার জনসংখ্যার 'শহর' হিসেবে অভিহিত করা হলেও সেটি মূলত বিস্তীর্ণ কৃষিপ্রধান হেলমান্দ প্রদেশের একটি ছোট এবং গেঁয়ো এলাকা ছিল।[১০] মার্কিন জনগণের কাছে এই অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনকে বৈধতা দেওয়ার জন্যই জনসংখ্যা বাড়িয়ে বলা হয়। কারণ একটি বিশাল জনসংখ্যার শহরকে উল্লেখযোগ্য টার্গেট হিসেবে প্রচার করে সেখানে বিদ্রোহ প্রতিরোধে সফলতা খুবই চমকপ্রদ বিষয় হতো।[১১] অথচ এই পল্লি এবং প্রায় জনবসতিশূন্য এলাকায় সাফল্য অর্জন বাস্তবে কোনো গুরুত্ব রাখে না। অন্যদিকে সমরবিদেরা সবাই পার্শ্ববর্তী কান্দাহারে অতিরিক্ত সেনাদের উপস্থিতির বিষয়ে একমত ছিল। অবশ্য, কান্দাহার প্রদেশেও যে তারা ভালো কিছু করত তা নয়। তথাপি সুশৃঙ্খল সেনাবলকে ম্যাকক্রিস্টাল মারজাহ মিশনে সামগ্রিকভাবে ব্যবহার করতে থাকেন। তিনি প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন যে কান্দাহারে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির প্রথম সফল উদাহরণ হবে মারজাহ।

ম্যাকক্রিস্টাল অবশেষে আবদুল জহির আর্যানকে মারজাহ জেলার শাসকের আসনে সযত্নে বসিয়ে দেন। আর্যান বিগত ১৫ বছর জার্মানিতে কাটিয়েছিলেন। সেখানে স্ত্রীকে মারধরের সময় সৎছেলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে আর্যান তাকে ছুরিকাঘাত করেন। এই অপরাধে তাকে চার বছর জার্মানির কারাগারে থাকতে হয়েছিল। মারজাহতে তিনি সার্বক্ষণিকভাবে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতেই থাকতেন। বহু বছর আগে ছেড়ে যাওয়া দেশের সঙ্গে তার কোনো সংস্পর্শই ছিল না। তাই স্থানীয় বাসিন্দারাও তাকে তুচ্ছজ্ঞান করত। তাকে নীরবে অপসারণের আগে তিনি সেই চাকরিতে ছয় মাস স্থায়ী ছিলেন। পরবর্তীতে রহস্যজনকভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

২০১১ সালে HBO-এর *দ্য ব্যাটল ফর মারজাহ*[১২] নামক ডকুমেন্টারিতে অপারেশন মোশতর্ক চলাকালীন অল্প বয়সী মেয়েসহ অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যার বিবরণ তুলে ধরা হয়। সেনারা এ জন্য ভুক্তভোগী বাবাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং উন্নত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিহত বেসামরিক লোকদের জনপ্রতি ২ হাজার ৫০০ ডলার 'সমবেদনামূলক অনুদান' প্রদান করেছিল। নিশ্চিতভাবেই এতে কারও মন গলেনি।

আফগান ন্যাশনাল আর্মি প্রায় পুরোপুরি আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের তাজিকদের নিয়ে গঠিত।[১৩] পুলিশ বাহিনীতেও স্থানীয়দের নিয়োগ দেওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরপর আমাদের সেনাবাহিনী পুলিশে অন্তর্ভুক্ত করতে স্থানীয় মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে থাকে। এটিকে বলা হয় তালেবান দমন করার একটি কৌশল। মিলিশিয়াদের দিকে ইঙ্গিত করে একজন ক্যাপ্টেন এক তরুণ সেনাকে কোনোরকম ইতস্তত না করেই মন্তব্য করেছিলেন, 'মিলিশিয়ারা কেবল আমাদের প্রস্থান কৌশল। আমরা তাদের পুলিশ বানাব। তারপর পাশের গ্রামে গিয়ে তারা সেই গ্রামবাসীকে পুলিশ বানাবে। তারপর আমরা বাড়ি চলে যাব।' অর্থাৎ আফগানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে আমরা চলে আসব! সেই ক্যাপ্টেন আরেকটি বিষয় সম্পর্কেও পুরোপুরি অবগত আছেন। সেটা হলো: 'পুলিশ গঠনের এই কৌশল কখনোই সফল হবে না। এই নীতি শিগগিরই অন্যদের জন্য সমস্যা তৈরি করবে (কিন্তু এ জন্য আমাদের ভুগতে হবে না)।' মূলত এসব পুলিশকে অসম্ভব কাজ সম্পাদনের জন্য তৈরি করা হচ্ছিল। প্রতিরোধ যুদ্ধ করার কোনো সক্ষমতাই এসব পুলিশের ছিল না। এসব পুলিশ সর্বোচ্চ গাড়ি তল্লাশির জন্য উপযোগী ছিল।

ডকুমেন্টারির আরেক তরুণ অফিসার স্থানীয়দের দাবিকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিল। সে একবার স্থানীয় লোকজনের ‘সহায়তা’ করছে বলে জানালে তারা তাকে সাফ জানিয়ে দেয়, ‘আমরা কেবল আমাদের চিরাচরিত জীবনযাপন করতে চাই।’ আরেকজন সেনা জানান, ‘স্থানীয় লোকজন মার্কিনদের নয়, বরং তালেবানকেই পছন্দ করে। তালেবানরা তো তাদের স্বামী, পুত্র এবং প্রতিবেশী। অন্যদিকে মার্কিনরা হাজার মাইল দূর থেকে আগত ভিনদেশি।’ ডকুমেন্টারিতে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়, মার্কিন সেনাদের মারজাহর একদল স্থানীয়দের আরেক দল স্থানীয় লোকজনের থেকে সুরক্ষা দেওয়ার মতো একটি অযৌক্তিক মিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাই তারাও সুন্দরভাবে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত একে অপরকে বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

অবশেষে ম্যাকক্রিস্টাল নিজেই মারযাহ নিয়ে মোটামুটি দ্রুতই হাল ছেড়ে দিয়ে জনসমক্ষে স্বীকার করেন যে ‘এটি একটি “রক্তক্ষরণকারী ক্ষত”, সেখানে খুবই কম অগ্রগতি হয়েছে।’ কিন্তু কিলকুলেন স্টারস এবং স্ট্রাইপসকে বলেছিলেন, ‘কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির সেনা বৃদ্ধি আরও ১০-১৫ বছর স্থায়ী হলে আমরা সত্যিকারের অগ্রগতি দেখতে পেতাম। কিন্তু আমরা সেখানে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করিনি।’[১৪]

অথচ মারজাহকে পরিপূর্ণ দখলে রাখার সময়েও বিদ্রোহীরা কেবল দিনের বেলা ঘরে লুকিয়ে থাকত এবং রাতের বেলা নিজেদের কার্যক্রম শুরু করত। যেসব আফগান মার্কিন দখলদারির সহযোগী ছিল, তালেবান তাদের সমুচিত শাস্তিবিধান করত। মার্কিন এবং মূলত তাজিক সংখ্যাগরিষ্ঠ আফগান ন্যাশনাল আর্মির অগ্রগতি থামাতে তারা প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিশ্চিত করত। অর্থাৎ মার্কিন সেনারা পুরো শহরটি দখল করে রাখার সময়ও সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। সেনাবাহিনী সেখানে অবস্থান করেও বিদ্রোহ দমন, নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কিংবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেনি। অথচ ওবামা প্রশাসনের কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি নীতিমালার চূড়ান্ত পর্ব ছিল মার্কিনদের কাছ থেকে কাবুলের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। এটা কখনোই সম্ভব হবে না। বর্তমানে মারজাহ এবং বাস্তবে সমগ্র হেলমান্দ প্রদেশটিই তালেবান নিয়ন্ত্রিত এবং এতে বিস্মিত হওয়ারও কিছু নেই।[১৫]

ইরাকের কথিত সফলতার বিপরীতে আফগানিস্তানে সেনা বৃদ্ধির পরও এর ব্যর্থতার কারণগুলো পেট্রিয়াস নিজেই ব্যক্ত করেছেন: ‘আফগানিস্তানে ইরাকের বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। পুরোদস্তুর পরাজয় তো নয়, বরং তারা

জয়ের পথে হাঁটছে। প্রতিবেশী দেশ তাদের অভয়ারণ্য এবং তারা জানে যে যুক্তরাষ্ট্রকে আজ কিংবা কাল অবশ্যই বিদায় নিতে হবে। কিন্তু তালেবানরা সেখানে চিরকাল থাকবে।... তালেবান দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। তারা লড়াই পরিত্যাগ করার মতো কোনো বাস্তবিক কোনো চাপ বা কারণের মুখোমুখি হয়নি। দেশটির রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বাগদাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইরাকে সংখ্যাগুরু শিয়া আরব এবং কুর্দি মিত্ররা মার্কিনদের পক্ষে ছিল। কিন্তু তালেবান যোদ্ধারা সেখানকারই 'দায়িত্বশীল স্থানীয় নাগরিক'। আফগানিস্তানে 'ইরাকি আল-কায়েদা' ঘরানার কোনো ভিন্নমতাবলম্বী জঙ্গি সংগঠনও নেই যে, আমেরিকা ঘুষ দিয়ে সেই দুই দলের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করবে।... তালেবান আদালতে মার্কিনদের তুলনায় উন্নত নিরাপত্তা বিচারব্যবস্থা বিদ্যমান। তারা ন্যায্যভাবে সব বিরোধ নিষ্পত্তি করে।'[১৬]

তথ্যসূত্র

১. Michael Hastings, “Obama’s War,” GQ, March 31, 2009.

২. Michael Hastings, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, April 21, 2009.

৩. Hastings, The Operators, 79-80.

৪. “‘Little America’ book excerpt: Obama’s Troop Increase for Afghan War Was Misdirected,” excerpted from Little America: The War Within the War for Afghanistan, by Rajiv Chandrasekaran, Washington Post, June 22, 2012.

৫. Frank Ledwidge, Investment in Blood: The True Cost of Britain’s Afghan War (New Haven, CT: Yale University Press, 2013).

৬. Frank Ledwidge, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, January 2, 2015.

৭. Berntsen and Pezzullo, Jawbreaker, 209-210.

৮. David Collins et al., “Rogue SAS Unit Accused of Executing Civilians in Afghanistan,” Sunday Times, July 2, 2017.

৯. Sue Pleming and Philip Barbara, eds., “Analysts Assess Marjah Offensive,” Reuters, March 1, 2010.

১০. “Marjah, Afghanistan,” Google Maps, Earth View.

১১. Gareth Porter, “Fiction of Marjah as City Was US Misinformation,” Inter Press Service, March 9, 2010.

১২. Ben Anderson, The Battle for Marjah, directed by Anthony Wonke, (New York: HBO Films, 2011), DVD.

১৩. Porter, “Tajik Grip on Afghan Army Signals New Ethnic War.”

১৪. Heath Druzin, “A Look at How the US-Led Coalition Lost Afghanistan’s Marjah District to the Taliban: Misunderstanding Afghan Ideology Key to Coalition’s Failure to Maintain Control,” Stars and Stripes, January 16, 2016.

১৫. Taimoor Shah and Rod Nordland, “Taliban Take an Afghan District, Sangin, That Many Marines Died to Keep,” New York Times, March 23, 2017.

১৬. Woodward, Obama’s Wars, 243.

মাদকযুদ্ধ

১৯৮০-র দশকে সোভিয়েত যুদ্ধে ধ্বংস হওয়া চিরায়ত কৃষিশিল্পকে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের সমর্থনে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার ও মুজাহিদ মিত্ররা আফিমশিল্প দ্বারা প্রতিস্থাপন করেছিল। নব্বইয়ের দশকের গৃহযুদ্ধ আফিম চাষকে গুরুতর পর্যায়ে নিয়ে যায়।[১]

ইতিহাসবিদ আলফ্রেড ম্যাককয় বলেন, 'আপাত অন্তহীন এই গৃহযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলো যুদ্ধের খরচ জোগাতে ব্যাপকভাবে আফিম চাষের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১১৯৯ সালের মধ্যে আফিম উৎপাদন দ্বিগুণেরও বৃদ্ধি পেয়ে বার্ষিক ৮ হাজার ৬০০ টনে পৌঁছায়। পশুসম্পদ, ফলের বাগান এবং ৬০টির বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী একটি বৈচিত্র্যময় কৃষির দেশ ছিল আফগানিস্তান। কিন্তু দুই দশকের যুদ্ধ এবং মাদক উৎপাদনে ২০ ধাপ অগ্রগতির মাধ্যমে দেশটি ধীরে ধীরে 'বিশ্বের একমাত্র অবৈধ মাদক উৎপাদন-নির্ভরশীল অর্থনীতি' হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছায়।

এই দুই দশকব্যাপী যুদ্ধে আধুনিক গোলাবারুদ পশুপালকে ধ্বংস করেছে, সেচব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং অগণিত বাগান ধ্বংস করেছে। সোভিয়েতরা গোলাবারুদের মাধ্যমে আফগান ভূখণ্ডকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। পরবর্তী গৃহযুদ্ধে অলিখিত আফগান যুদ্ধবিধি লঙ্ঘন করে কাবুলের উত্তরে শোমালি সমভূমির বাগানগুলো কেটে সাফ করা হয়। এই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের ফলে আফগান জনগণের জন্য আফিম চাষই একমাত্র বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়। আলেকজান্ডারের কিংবদন্তি তলোয়ারের মতো আফিম চাষই ছিল এই জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহজতম উপায়। কয়েক মিলিয়ন শরণার্থীসহ আফগান কৃষকেরা আফিম চাষেই ভরসা খুঁজে পায়। উল্লেখ্য, ক্ষুদ্র আকারে হলেও আফিম চাষ একসময় ঐতিহাসিকভাবে তাদের কৃষিরই অংশ ছিল। যাহোক, বহির্বিশ্বের সাহায্য ব্যতিরেকে পশুসম্পদ, কৃষিজমি কিংবা বাগানগুলোকে

আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার কোনো সুযোগ ছিল না। বর্তমানে এটা আরও স্পষ্ট যে আফগানিস্তানের পক্ষে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।[২] অর্থনীতির সূত্রই এমন একটি দেশে আফিমকে নির্মূল করার অনুমতি দেয় না, যেখানে পপি কেবল বৃহত্তম অর্থকরী ফসলই নয় বরং বৃহত্তম অর্থনীতিও বটে।[৩]

SIGAR জানায়, বর্তমানে কৃষকেরা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক আফিম উৎপাদন করছে। আফগানিস্তানে আমাদের শত্রুরা (বলা হয়, পপিচাষি এবং আফিম উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে তালেবানও এমনকি প্রতিবছর শুল্ক বাবদ কয়েক মিলিয়ন ডলার রাজস্ব আয় করে।) উল্লেখযোগ্য তহবিল পায় অবৈধ মাদক ব্যবসা এবং এর থেকে আহরিত শুল্কের মাধ্যমে। আমাদের জন্য একটি বড় প্রশ্ন হলো, আফগান সরকার মাদক সমস্যা মোকাবিলা না করে কখনো বিজয়ী হতে পারবে কি না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পপি চাষ বন্ধ করতে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু পপি চাষ থেমে নেই। আবার এই কৃষকদের থেকে আফগান কর্মকর্তারা জোরপূর্বক ঘুষ আদায় করে। এটিও পশতুন হালচাষি কৃষকদের তালেবান বিদ্রোহীদের অস্ত্রে পরিণত করছে। সব মিলিয়ে অন্যান্য সমস্যার মতোই আফিম সমস্যাটির ‘মোকাবিলা’ করাও কার্যত অসম্ভব প্রমাণিত হচ্ছে।

SIGAR আরও জানায়, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুনর্নির্মাণ প্রকল্পসমূহ আফিম সমস্যাটিকে আরও গুরুতর অবস্থায় নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। উন্নত সেচব্যবস্থা, উন্নত রাস্তাঘাট এবং কৃষি সহায়তার মতো কয়েকটি পুনর্নির্মাণ প্রকল্প আফিম চাষে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। SIGAR-এর গবেষণা মোতাবেক, সাশ্রয়ী মূল্যের গভীর নলকূপ গত দশকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় আফগানিস্তানের ২ লাখ হেক্টর মরুভূমিকে আবাদযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত করেছে। তুলনামূলকভাবে আফিমের উচ্চ বাজারদর এবং সস্তা, দক্ষ এবং সুলভ শ্রমশক্তির বদৌলতে এসব নতুন আবাদযোগ্য জমিগুলোর অধিকাংশই এখন আফিম চাষে নিয়োজিত হচ্ছে। যে প্রদেশগুলোকে একসময় পপিমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল, সেগুলোতেও এখন পপি চাষের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

২০০১ সাল থেকে পপি চাষ নির্মূলের জন্য মার্কিন সরকার আফগানিস্তানে কমপক্ষে ৮.৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। ২০১৫ সালে NBC নিউজের প্রতিবেদনে জানা যায়, সে সময়টিতে বিশ্বব্যাপী কালোবাজারে আফগানিস্তানের আফিম সরবরাহ ৭০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। এটি বর্তমানে বাৎসরিক ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের শিল্প।

তথাপি DEA প্রশাসক মিচেল লিওনহার্ট ‘ফক্স নিউজ’কে বলেছিলেন, ‘DEA এই লড়াইয়ে জয়লাভের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আমাদের রক্ত ঝরছে। মাদকের সঙ্গে জড়িত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের আটক করা কেবল আফগান জনগণের জন্যই উপকারী নয়, বরং এটি এখানকার মার্কিন সেনা এবং মার্কিন জনগণের জন্যও হিতকর।’ রোনাল্ড রিগ্যানের শাসনামলের এক NSC কর্মকর্তা অলিভার নর্থ ফক্স নিউজে লেখেন, ‘আমেরিকার ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির (DEA) জন্য পপিগাছ নির্মূল এবং ঘুষ দিয়ে স্থানীয় কৃষকদের পপিখেত ধ্বংস করার উদ্যোগ একটি অগ্নিপরীক্ষা ছাড়া কিছু নয়।[৪]

তারপরও কুখ্যাত দুর্নীতিবাজ সিআইএ এজেন্ট,[৫] আফগান প্রেসিডেন্টের সৎভাই এবং কান্দাহারের প্রাদেশিক কাউন্সিল প্রধান আহমেদ ওয়ালি কারজাইয়ের বিরুদ্ধে ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি পদক্ষেপ নিয়েছিল। ওয়ালি কারজাই তখন আফগানিস্তানের অন্যতম হেরোইন কারবারি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।[৬] ৯/১১-র আগে থেকেই সিআইএ’র সঙ্গে ওয়ালি কারজাইয়ের যোগাযোগ ছিল। পরবর্তী মার্কিন অভিযানেও সে সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে। ম্যাকক্রিস্টালের তৎকালীন সহকারী কর্নেল মাইকেল ফ্লিন ওয়ালি কারজাইকে ‘ব্যাধি’র এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন, ‘কান্দাহারে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওয়ালি কারজাইকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা আবশ্যক।’[৭] কিন্তু দ্রুতই জেনারেলরা এই মত পরিবর্তন করে। তারা কথিত উচ্চপদস্থ তালেবান টার্গেটবিষয়ক গোয়েন্দা তথ্যের জন্য ওয়ালি কারজাইয়ের নেটওয়ার্কের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল। পাশাপাশি সিআইএ’র হয়ে কাজ করা আধা সামরিক বাহিনীগুলোর জন্যও কান্দাহার ও এর নিকটস্থ জায়গাগুলোতে তার সহায়তা আবশ্যক ছিল।[৮]

ওয়ালি কারজাই অবশেষে ২০১১ সালের গ্রীষ্মে খুন হয়। কথিত আছে, তারই বন্ধু এবং বিশ্বস্ত সিআইএ এজেন্ট তালেবানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এটা করেছিল।[৯] এ রকম বিভিন্ন চড়াই-উতরাই ছাড়াও পুরোটা সময় আফিম কালোবাজারে আফগানিস্তান এক নম্বরেই ছিল। ২০১৫ সালেও আফগানিস্তান বিশ্বের ৯০ শতাংশ হেরোইন সরবরাহ করে।[১০] অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মার্কিন সেনারা স্থানীয় আফগান গুন্ডাদের পপি বাগান পাহারা দিয়েই সময় কাটাত।[১১] কারণ সেই গুন্ডারাই ছিল মার্কিনদের প্রকৃত সহযোগী।

অতীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন যুদ্ধে গোপন অভিযানসমূহের ব্যয়ভার বহনের জন্য সিআইএ’র বিরুদ্ধে গোপনে মাদক

কারবারির অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু আফগানিস্তানে এই বিষয়ে কোনো লুকোচুরি নেই। এখানে মাদক কারবারিদের অনেকেই উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা।[১২] একবার একটি আফগান বিবাহ অনুষ্ঠানে রিপোর্টার মাইকেল হেস্টিংসের সঙ্গে এক হেরোইন কারবারির পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। হেস্টিংস বলেছিলেন, 'বাহ, বেশ চমৎকার তো! আপনাকে কি কোনো আইনি ঝামেলায় পড়তে হয় না?' অতিথি জবাব দিয়েছিল, 'একেবারেই না। পুলিশে আমার এক ভাই আছে। তালেবানে আমার আরেক ভাই আছে। কোনো সমস্যা নেই।'[১৩]

২০১৬ সালে নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, হেলমান্দ থেকে কাবুল পর্যন্ত 'সরকারি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালিত একটি মাদক সাম্রাজ্য বিদ্যমান।' বর্তমানে আফগানিস্তানের সরকারি কর্মকর্তারা আফিম ব্যবসায় সরাসরি জড়িত হয়ে রাজনীতির বাইরেও তালেবানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। তারা তালেবানের সঙ্গে মাদকের বাজার ও রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়াচ্ছে। এই লড়াই অনেকটা গ্রাম্য মারামারিতে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় মার্কিন সেনাদের সরকারি দলের আফিম কারবারিদের পক্ষ হয়ে লড়তেও হয়, বিশেষত দক্ষিণ আফগানিস্তানের হেলমান্দে।

১৫ বছরের বেশি সময় ধরে আফগান আফিম নিয়ে মাঠপর্যায়ে গবেষণা করা ডেভিড ম্যানসফিল্ড জানান, 'এই কুকর্মে সরকারি সংশ্লিষ্টতার অনেক পর্যায় রয়েছে। সরকার প্রথমে কৃষকদের অনুমোদন দেয় এবং তাদের সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। সবশেষে সেই কৃষককে গুম করে দিয়ে পুরো ব্যবসা করায়ত্ত করে নেয়।'[১৪]

কার্যত সোভিয়েত যুদ্ধে ধ্বংস হওয়া চিরায়ত কৃষিশিল্প আফিমশিল্প দ্বারা প্রতিস্থাপনের পর আফগানিস্তানে রেকর্ড পরিমাণ পপি চাষ বৃদ্ধি পায়।[১৫] বিশ্বব্যাপী আফিম সরবরাহ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছে। এই আফিমের প্রায় সবটাই অতীব প্রয়োজনীয় ওষুধের কাঁচামালের পরিবর্তে হেরোইন কালোবাজারে চলে যায়। হেরোইনের অপব্যবহার এবং মাদক সম্পর্কিত মৃত্যুর ঘটনা আফগানিস্তান,[১৬] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র[১৭] এবং পুরো বিশ্বে[১৮] একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা। নিষিদ্ধকরণ এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদনে ভর্তুকি দেওয়ার প্রকল্পও আফগানিস্তানকে আফিমশিল্প থেকে মুক্তি দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

২০১৭ সালে ভয়েস অব আমেরিকা জানায়, আফগানিস্তান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে আদিমকাল থেকেই পপি চাষ হলেও বর্তমানে সেটি বালখ, জাওজানসহ বেশ কয়েকটি উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয়

অঞ্চলের উর্বর জমিতে ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তর-পশ্চিম বাঘঝিস এবং ঘোড়-এর মতো সামান্য পরিমাণ আফিম চাষ হওয়া প্রদেশগুলোতে বৃহৎ পরিসরে আফিম চাষ আশা করা হচ্ছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বাঘলান প্রদেশের একজন বাসিন্দা নিরাপত্তার কারণে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ভয়েস অব আমেরিকাকে বলেন, ‘প্রায় অর্ধেক প্রদেশজুড়ে বর্তমানে আফিম চাষ হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোও রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্বত্রই এখন আফিম চাষ দেখা যায়। তাজিকিস্তান ও চীন সীমান্তবর্তী বাদাখশান প্রদেশ উত্তরাঞ্চলে মাদকের কেন্দ্রস্থল।’

আফগান সরকার বলছে, তারা সাহায্যকারী সংস্থাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আফগানদের জন্য টেকসই বিকল্প শস্য সন্ধানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে সেসব প্রচেষ্টাও এখন ব্যর্থ হতে চলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতা এবং নগদ লাভই আফিম চাষ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। অন্যদিকে, মাদক কারবারিরা বেশ কয়েকটি প্রদেশে সরকারি জমির বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেখানে তারা আফিম চাষ করে।[১৯]

কিন্তু আফিম উৎপাদন ও বাণিজ্যের বৈধতা দিয়ে আন্তর্জাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করে কি আফগান কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো যায় না?[২০] এই প্রকল্প ইতোমধ্যে ভারত ও তুরস্কে সফল প্রমাণিত হয়েছে।[২১] কিন্তু মার্কিন সরকার আফিমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বাহানায় কখনোই এর অনুমতি দেবে না। অতএব, এই সমস্যার কোনো সমাধান দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

তথ্যসূত্র

১. James Rupert and Steve Coll, “US Declines to Probe Afghan Drug Trade,” Washington Post, May 13, 1990.

২. Alfred McCoy, “Afghanistan as a Drug War,” TomDispatch, March 30, 2010.

৩. Reid Standish, “NATO Couldn’t Crush Afghanistan’s Opium Economy,” Foreign Policy, November 13, 2014.

৪. Alfred McCoy, “Afghanistan as a Drug War.”

৫. Woodward, Obama’s Wars, 65.

৬. James Risen, “Reports Link Karzai’s Brother to Afghanistan Heroin Trade,” New York Times, October 4, 2008.

৭. Dexter Filkins et al., “Brother of Afghan Leader Said to Be Paid by CIA,” New York Times, October 27, 2009.

৮. Porter, “US, NATO Forces Rely on Warlords for Security.”

৯. Julius Cavendish, “Bodyguard Who Killed Karzai’s Brother Was Trusted CIA Contact,” Independent, July 15, 2011.

১০. “Afghanistan Opium Survey 2014,” United Nations Office on Drugs and Crime, November 2004.

১১. David Axe, “US Kicks Drug-War Habit, Makes Peace with Afghan Poppies,” Wired, May 9, 2015.

১২. Alfred W. McCoy, The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade, revised ed. (Chicago: Lawrence Hill, 1991).

১৩. Gary Webb, Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion (Oakland: Seven Stories, 1998).

১৪. Azam Ahmed, “Tasked with Combating Opium, Afghan Officials Profit from It,” New York Times, February 15, 2016.

১৫. Andrea Germanos, “$7 Billion US Eradication Effort Delivers Record High Poppy Crop in Afghanistan,” Common Dreams, October 21, 2014.

১৬. “UNODC Reports Major, and Growing, Drug Abuse in Afghanistan,” United Nations Office on Drugs and Crime, June 21, 2010.

১৭. Maggie Fox, “Heroin Deaths Quadruple Across US,” NBC News, July 7, 2015.

১৮. “Record 29 Million People Drug-Dependent Worldwide; Heroin Use Up Sharply – UN Report,” United Nations Office on Drugs and Crime, June 23, 2016.

১৯. Noor Zahid and Akmal Dawi, “Afghanistan’s Deadly Poppy Harvest on Rise Again,” Voice of America News, May 16, 2017.

২০. bigail Hall, “Want to Hurt the Taliban? Legalize Opium in Afghanistan,” Defense One, December 10, 2016.

২১. Reza Aslan, “How Opium Can Save Afghanistan,” Daily Beast, December 19, 2008.

কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি বাস্তবায়ন

ওয়ালি কারজাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার সিদ্ধান্তই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, কান্দাহারে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন ঘটতে যাচ্ছে। কারণ সামগ্রিকভাবে সমাজ পরিবর্তন করার লক্ষ্যে তাদের সব প্রচেষ্টা ইতোমধ্যে মাঠে মারা গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের মিত্রদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কতটা গভীর সমস্যার মুখোমুখি হতো তার একটি উদাহরণ হলো, কারজাইয়ের সৎভাই ওয়ালিকে 'হত্যার করা উচিত কি উচিত না'— এই আলোচনা এবং সিদ্ধান্তহীনতা। যদি এটাই হয় পরিস্থিতি, হেস্টিংস প্রশ্ন রাখেন, মার্কিনরা তাহলে কীভাবে তালেবানের সঙ্গে আপস করতে সক্ষম হবে? হেস্টিংস লিখেছেন, 'ধারণা করা হচ্ছিল, কান্দাহার সিটি নিষ্পত্তিমূলকভাবে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। এর মৌলিক কারণ ছিল সেনা বৃদ্ধি, যেটা ম্যাকক্রিস্টাল ওবামার কাছ থেকে খসিয়েছিলেন।'[১]

হেস্টিংস ২০০৭ সালে ইরাকে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে সুন্নি গোত্রীয় নেতাদের ঘুষ দেওয়ার প্রচেষ্টার প্রসঙ্গ এনে বলেছিলেন, 'আফগানিস্তানে কোনো কারণ ছাড়াই আমাদের সেনা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। মার্কিনরা কতসংখ্যক স্থানীয় পুলিশ বাহিনী তৈরি করেছিল, সেটা বিবেচ্য নয়। স্থানীয় পুলিশ তালেবান ও সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মোকাবিলায় এই অঞ্চলে কোনো কার্যকরী শক্তি হতে পারে না।' এই পরিস্থিতির সম্পর্কে হেস্টিংস নিশ্চিত করেন, 'মার্কিন বাহিনী ইতোমধ্যেই 'কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি' এবং কান্দাহার সিটিতে 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠার ভণ্ডামিকে বর্জন করেছে। এর বিপরীতে তারা কথিত মাঝারি স্তরের লক্ষ্যবস্তুতে রাত্রিকালীন অভিযান বৃদ্ধি করবে।'[২]

২০১০ সালে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি নিয়ে মূলধারার গণমাধ্যমের প্রচার যতটা হাস্যকর ছিল, ঠিক ততটা অনুমেয় ছিল। ক্ষুদ্র সাফল্যকে তখন দীর্ঘমেয়াদি অগ্রগতির সুস্পষ্ট লক্ষণ হিসেবে প্রচার করা হচ্ছিল। তারা বলছিল, 'আমরা

তালেবানের ক্ষমতাকে কেড়ে নিয়েছি এবং তাদের অগ্রগতি থামিয়ে দিয়েছি।' অন্তত মুহূর্তের জন্য হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন সব এলাকা দখল করেছে, যেগুলো (তালেবান) বছরের পর বছর ধরে শাসন করেছে। রণক্ষেত্রের জেনারেলরা নিশ্চিতভাবেই এই অস্থায়ী সাফল্যগুলোকে চূড়ান্ত সফলতার প্রথম পদক্ষেপ বিবেচনা করেছিল।[৩] অথচ পিছু হটা অধিকাংশ তালেবান এমনকি পাকিস্তানেও পালিয়ে যায়নি। তারা কান্দাহার এবং আশপাশের এলাকাগুলোতে কিছু সময়ের জন্য আত্মগোপন করে ছিল।[৪]

হেস্টিংস জানান, মার্কিন বাহিনী পৃথিবীর অপর পাশের সুদূর উত্তর আমেরিকা থেকে আফগানিস্তানে গিয়েছে এবং একদিন না একদিন তাদের ঘরে ফিরতেই হবে। তালেবানরা এটি ভালোভাবেই জানে। তারা আরও জানে, গেরিলাযুদ্ধে বিদ্রোহীদের একমাত্র কাজ হলো পরাজিত না হওয়া। অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের মাধ্যমে সেনাদের এ রকম আরও এলাকায় পাঠানো হয়েছে, যেখানে তাদের কেউ কামনা করে না। ফলস্বরূপ হতাহতের ঘটনা আরও বৃদ্ধি পাবে। যাহোক, পরিকল্পনাটি ছিল যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে হতাহতের সংখ্যাও সমানুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে একটি 'সর্বোচ্চ বিন্দুতে' পৌঁছানোর পর থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হবে। এই সর্বোচ্চ বিন্দুর পর হতাহতের সংখ্যা কমতে শুরু করবে। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হলো, এই 'সর্বোচ্চ বিন্দু' কখনোই অর্জিত হয়নি।

অধুনা কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি নীতিমালার অধীনে সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণকে হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া এবং একই সঙ্গে জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০০৯ সালে ম্যাকক্রিস্টালের দায়িত্ব গ্রহণের সময় থেকেই উভয় পক্ষের সামরিক-বেসামরিক হতাহতের ঘটনা কেবলই বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫] সেনা বৃদ্ধির সময় ম্যাকক্রিস্টাল মার্কিন সেনাদের সংঘর্ষে জড়ানোর ব্যাপারে নিয়মকানুন বেঁধে দিলেও হতাহতের সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি। তিনি এর কৈফিয়ত দেন যে 'আফগান জনসাধারণই প্রতিরোধ যোদ্ধা'। কিন্তু মার্কিন সেনারা যদি জনসাধারণকেই হত্যা করে, তবে সেখানে তাদের কাদের সুরক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে? মার্কিন সেনাদের উচিত জনসাধারণের সঙ্গে বীরত্ব দেখানো বাদ দিয়ে আসল কাজে মনোযোগী হওয়া। তখন হয়তো স্থানীয় জনসাধারণ মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে না লড়ে তাদের সাদরে গ্রহণ করবে।

ম্যাকক্রিস্টাল এ সময় ১:১০ অনুপাত তত্ত্ব দিয়েছিলেন। তত্ত্বটি হলো— যদি মার্কিন সেনারা ২ জন প্রতিরোধ যোদ্ধাকে হত্যা করে, তবে ভবিষ্যতে তাদের

আরও ২০ জনের মুখোমুখি হতে হবে। ম্যাকক্রিস্টাল বলেছিলেন, 'যে দুজনকে হত্যা করা হবে, তাদের আত্মীয়রা এটা বুঝবে না যে তারা দুষ্ট ছিল। তারা মনে করবে, বেশ! ভিনদেশি একজন আমার ভাইকে হত্যা করেছে। অতএব আমাকে এখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।'[৬]

মার্কিন সেনারা দিনব্যাপী সশস্ত্র অবস্থাতেই বিভিন্ন সামাজিক সেবা এবং বেসামরিক জনগণের সুরক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে জনসেবার ভান করত। তারাই আবার রাতের বেলায় পেট্রিয়াসের উপদেষ্টা কিলকুলেনের পরামর্শ মোতাবেক তালেবান নেতা এবং কথিত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে হানা দিত।[৭] এই রাত্রিকালীন অভিযানের মূল লক্ষ্যও কিন্তু তালেবানদের প্রতিরোধ যুদ্ধকে পরাভূত করা ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল, ১৮ মাসের মধ্যে তালেবানকে মার্কিন শর্তাবলি মোতাবেক আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসার মতো দুর্বল করে দেওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কল্পনা করছিল, স্থানীয় জনগণও একপর্যায়ে তালেবানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং আফগান সেনাবাহিনীকে নিরাপত্তা প্রদানকারী হিসেবে গ্রহণ করবে। কিন্তু হেস্টিংসের রিপোর্ট অনুসারেই এই কৌশল উল্টো শত্রুপক্ষ এবং তাদের মনোবলকে উন্নীত করেছে।[৮]

২০১০ সালের জুন মাসে হেস্টিংস রোলিং স্টোন ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলে ম্যাকক্রিস্টালকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। হেস্টিংস সেই প্রবন্ধে ম্যাকক্রিস্টাল এবং তার সহকর্মীদের হাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নেতাদের চূড়ান্ত অবমাননার চিত্রকে তুলে ধরেছিলেন। ম্যাকক্রিস্টালের অসংলগ্ন নিয়মনীতির কারণে রণক্ষেত্রে সৈন্যদের নাকাল হওয়ার বিস্তারিত বিবরণও তিনি তুলে ধরেছিলেন।[৯] ইতোমধ্যে অবশ্য ম্যাকক্রিস্টাল মারযাহ বিপর্যয়কে স্বীকার করেছিলেন। তখন তিনি কান্দাহার সিটিতে তার পরিকল্পিত কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি অপারেশন থেকেও সরে এসেছিলেন। এত কিছুর পরও তার অপসারণের অর্থ সম্ভবত এটাই যে ভবিষ্যতে কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি কুশলীদের ব্যর্থতার জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে হবে না। তবে প্রেসিডেন্ট ওবামা কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির গডফাদার, সিংহতুল্য জেনারেল ডেভিড পেট্রিয়াসকে ম্যাকক্রাইস্টালের সূচনা করা প্রকল্পটি সমাপ্ত করার দায়িত্ব দেওয়ার মাধ্যমে যেন অবমাননার প্রতিশোধের চেষ্টা করেন। এমনকি আফগান যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তাকে জেনারেল থেকে পদাবনতি দিয়ে কমান্ডার অব সেন্ট্রাল কমান্ডের দায়িত্ব দেন। শিষ্যের কাজ তার গুরুর চেয়ে ভালোভাবে কি কেউ সমাপন করতে পারে? তবে এই পদক্ষেপের

মাধ্যমে আসন্ন ব্যর্থতার জন্য জেনারেলদের পাশাপাশি প্রেসিডেন্টদেরও চিরকাল স্মরণ করার ব্যবস্থাও করেছেন তিনি![১০]

মজার বিষয় হলো, পেট্রিয়াসের শিষ্য ম্যাকক্রিস্টাল আদতে তার কার্যক্রমে গুরুর অধুনা কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি নীতিমালা প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি সংঘাতে জড়ানোর নিয়মনীতি কিছুটা সংকীর্ণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পেট্রিয়াস স্বয়ং তার নিজস্ব কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি মতবাদ পরিত্যাগ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি সংঘাতের নিয়ম-নীতি শিথিল করে দেন। কথিত তালেবান এবং অন্যান্য বিদ্রোহী লক্ষ্যবস্তুতে রাত্রিকালীন অভিযান এবং বিমান হামলাকে বিস্তৃত করেন। এগুলো মার্কিন এবং পৃষ্ঠপোষিত আফগান সরকারের বিরুদ্ধে তালেবানকে আরও বেশি সক্রিয় করে তোলে। পেট্রিয়াস একইভাবে কান্দাহারেও কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি প্রয়োগের অভিনয় থেকে সরে এসেছিলেন। টার্গেট কিলিংয়ের স্পেশাল অপারেশন বিশেষজ্ঞ ম্যাকক্রিস্টাল পেট্রিয়াসের কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি তত্ত্বটি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। অথচ যখন পেট্রিয়াসকে যুদ্ধ পরিচালনার ভার দেওয়া হয়, তখন তিনি সরাসরি তার নিজস্ব তত্ত্ব বর্জন করেন। এর পরিবর্তে তিনি অ্যান্টি-ইনসার্জেন্সি তত্ত্বে মনোনিবেশ করেন। কর্নেল ফ্লিন একে তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, 'বাছবিচারহীন হত্যাকাণ্ড এবং বিমান হামলার ঘনঘটা।'[১১]

আফগানিস্তানের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি কখনোই বাস্তব অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি। সিংহভাগ সেনা বৃদ্ধির ফলাফল ছিল বেহুদা সহিংসতা বৃদ্ধি। মার্কিন সেনাবাহিনী এবং সিআইএ তাদের অনুগত স্থানীয় মিলিশিয়াদের জন্য 'কাউন্টার টেরোরিজম পারস্যুট টিমস' নামে একটি নতুন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করেছিল। একে কাজে লাগিয়ে পেট্রিয়াসের অনুগ্রহপ্রাপ্ত কান্দাহারের আবদুর রাজ্জাকের মতো হেরোইন পাচারকারী গুন্ডারা আরও শক্তিশালী হয়।[১২] মার্কিন বিশেষ বাহিনীও তালেবান এবং হক্কানি নেটওয়ার্কের কথিত অতিগুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে রাত্রিকালীন অভিযান কর্মসূচি সম্প্রসারণ করছিল। সংঘাতে জড়ানোর শিথিল নিয়নকানুনের ফলে ISAF ফোর্সের হাতে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটতে থাকে। এমনকি স্থানীয় আফগান পুলিশ সদস্যদের ওপর বিমান হামলা চালানোর মতো আপাত দুর্ঘটনাও ঘটেছিল।[১৩]

নতুন সামরিক প্রোগ্রাম 'সামাজিক নিরাপত্তা উদ্যোগ'ও ছিল একটি ব্যর্থতা। 'জননিরাপত্তা উদ্যোগ', 'স্থানীয় প্রতিরক্ষা উদ্যোগ', 'স্থানীয় আফগান পুলিশ' ইত্যাদি উদ্যোগের ক্ষেত্রেও ফলাফল ব্যতিক্রম হয়নি। শিরোনাম যা-ই হোক না

কেন, এ উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে মার্কিন বাহিনী স্থানীয় মিলিশিয়া ও ক্ষমতাবানদের নগদ অর্থ এবং একে-৪৭ বণ্টন ব্যতীত ভিন্ন কিছু করতে পারেনি। সেটাও আবার স্থানীয় গুন্ডাবাহিনী এবং ক্ষমতাবানেরা তালেবানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে—এই আশায়। মার্কিনরা সত্যিকারার্থে কখনোই প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তবে অর্থ এবং সময় অপচয়ে তারা সর্বাগ্রে থাকত। আসল কথা হলো, আফগান প্রকল্পের অধিকাংশ সময়জুড়ে এই অর্থ এবং সময় অপচয়ের বিষয়টিকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।[১৪]

যাহোক, কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি এবং ২০০৯ থেকে ২০১২ অবধি যুদ্ধে তীব্রতা বৃদ্ধির সবচেয়ে কার্যকর অংশ বলা হয়ে থাকে সন্দেহভাজন অতিগুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুগুলোতে রাত্রিকালীন অভিযান। অসংখ্য মার্কিনই হয়তো ডকুমেন্টারি ফুটেজে স্পেশাল অপারেশন ফোর্সের দেখানো সাহসী অভিযান দেখে পুলকিত হয়। কিন্তু এসব অভিযানে অপর পক্ষের কী পরিণতি হয়, সেটা কল্পনা করতে তারা অক্ষম। বাস্তবতা হলো, মার্কিনরা আফগানদের অনুভূতিকে গ্রাহ্যই করে না। বিশেষত যখন এই কথিত শত্রুরা মার্কিন সেনাদের হাতে থাকে। অথচ, বৃহত্তর কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির প্রচারণা ছিল: নির্মূল, অবস্থান, নির্মাণ। ভালো লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এবং জনগণকে তাদের আসল শত্রু তালেবান থেকে রক্ষা করে একটি জাতিরাষ্ট্র নির্মাণ করা! কিন্তু কীভাবে তাদের হৃদয় এবং মনকে জয় করা সম্ভব, যখন কিনা মাঝরাতে তাদের বাড়িতে কালো হেলিকপ্টারে আগত বিশেষ সেনারা অভিযান চালায়, তাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে, তাদের পুরুষদের আটক করে বা হত্যা করে, তাদের স্ত্রী এবং শিশুদের সামনে অস্ত্র তাক করে বিদেশি ভাষায় চিৎকার করে, উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্র দিয়ে চোখ স্ক্যান করে, পরিস্থিতির তদন্ত করতে বা অগ্রিম সুরক্ষার নামে প্রতিবেশীর ওপর গুলি চালায়? এগুলো কি অনেকটা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি থেকে আগত দুঃস্বপ্নের যন্ত্রদানব কিংবা বিংশ শতাব্দীর কোনো সর্বগ্রাসী দুঃশাসনের মতোই নয়? এই রাত্রিকালীন অভিযান নিয়ে সাবেক CNAS পরিচালক এবং কাউন্টার ইনসার্জেন্সির নেতৃত্বস্থানীয় কুশীলব জন নাগল দম্ভভরে বলেছিলেন, 'সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের জন্য এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ।' বাস্তবে এটি একটি হত্যা যন্ত্র। এখানে 'কাউন্টার-টেরোরিজম' বা সন্ত্রাসবিরোধী শব্দটি কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়।[১৫]

২০১২ সালে ইতিহাসবিদ এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদক গ্যারেথ পোর্টারকে সাংবাদিকতার জন্য মার্থা গেলহর্ন পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কার পাওয়ার

পেছনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল রাত্রিকালীন অভিযান নিয়ে তার মূল্যায়ন। তিনি লিখেছিলেন—

> এই অভিযানে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক তালেবান কমান্ডার এবং তালেবান যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে। তবে একই সঙ্গে নিরীহ বেসামরিক মানুষকেও হত্যা ও বন্দির সংখ্যাটি অকল্পনীয়। যোদ্ধা ও বেসামরিক নাগরিকদের আলাদা করার কোনো উদ্যোগ ছিল না। এই বিষয়ে মার্কিন সেনারাও পুরোপুরি অক্ষম ছিল।[১৬]

> রণক্ষেত্রে কার প্রকৃত পরিচয় কী, এটা মার্কিনরা কখনোই জানত না। তারা 'লিঙ্ক অ্যানালাইসিস'-এর ভিত্তিতে অভিযান পরিচালন করত। কে কাকে ফোন করেছে এবং কোন কোন ফোনের অবস্থান একবারের সেখানে ছিল, এগুলোই ছিল অপরাধী শনাক্তকরণে তাদের মাপকাঠি।... দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধের সময় ম্যাকক্রিস্টাল ও ফ্লিন বিদ্রোহী নেতাদের টার্গেট করার জন্য ড্রোন এবং সেলফোন ডেটা ব্যবহার করেছিলেন। জেনারেলেরা মার্কিনদের বোঝাত, এসবের ব্যবহার ইরাকে সহিংসতা হ্রাস করতে ভূমিকা রেখেছিল। অতএব, আফগানিস্তানেও এই কথিত সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। সামরিক বাহিনী শত্রুদের পরিচয় এবং গতিবিধি নির্ণয় করতে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত 'সামাজিক যোগাযোগ বিশ্লেষণ'কে হাতিয়ার বানায়।... মার্কিনরা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে দীর্ঘমেয়াদি নজরদারি চালানো শুরু করে। ম্যাকক্রিস্টালের গোয়েন্দা প্রধান কর্নেল মাইকেল ফ্লিন ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থাকে 'দ্য আনব্লিংকিং আই' বা নিষ্পলক চক্ষু বলতে পছন্দ করতেন। ম্যাকক্রিস্টাল এবং ফ্লিন উদ্ভাবিত এই নব্য গোয়েন্দা প্রণালির মূলনীতি ছিল— কেউ নজরদারির এলাকায় এসে সেই অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো কিছুর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলেই বিদ্রোহী নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে![১৭]

২০০৯ সালের অক্টোবরে এই রাত্রিকালীন অভিযানের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০টি। উইকিলিকস প্রকাশিত আফগান ওয়ার লগস ডকুমেন্টস অনুসারে, জয়েন্ট প্রায়োরিটাইজড ইফেক্ট লিস্ট (JPEL) নামে রাত্রিকালীন অভিযানের টার্গেট লিস্টে ২ হাজার ৫৮টি নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে তালিকার একটি বড় অংশই কোনো ব্যক্তি ছিল না! বরং সেগুলো ছিল মোবাইল ফোন নম্বর।

২০১০ সালের গ্রীষ্মে স্পেশাল অপারেশন ফোর্স প্রতি রাতে গড়ে প্রায় ২০টি অভিযান পরিচালনা করত। এক বছর পর এই সংখ্যা দাঁড়ায় গড়ে প্রতি রাতে ৪০টি অথবা মাসে ১ হাজারের বেশি। নিম্নবিত্ত পশতুনদের বাড়িগুলো এতটা

প্রশস্ত না যে সামরিক কম্পিউটারগুলো সেখান থেকে কোনো মানুষের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করে হামলা করতে পারবে। তাই কম্পিউটারের মাধ্যমে কোনো মানুষকে বা অবস্থানকে সঠিকভাবে অনুমান করে হত্যাকাণ্ড মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটাই ডানা প্রিস্ট এবং উইলিয়াম আরকিন ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় 'টপ সিক্রেট আমেরিকা' সিরিজে তুলে ধরেছিলেন। তারা জানান: 'দুজন সিনিয়র কমান্ডারের মতে, সঠিক ঘরবাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের টার্গেট করার সফলতা সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশের কাছাকাছি ছিল।' অথচ, তারা এটাকেই একটি ভালো হার হিসেবে বিবেচনা করেছিল।[১৮]

সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন বিবৃতিতেও এই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছিল। তাদের মতে, এসব অভিযানে আটককৃতদের মধ্যে কেবল ১৪ শতাংশেরই প্রতিরোধ যুদ্ধের সঙ্গে সত্যিকারের যোগসূত্র ছিল।[১৯] ম্যাকক্রিস্টালের সহকারী ফ্লিন অতীতে আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নমানের গোয়েন্দা কার্যক্রমের সমালোচনা করে একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন। কিন্তু ফ্লিনের 'গোয়েন্দা বিপ্লব'-এর অধুনা পদ্ধতিগুলোও শত্রুদের বেসামরিকদের থেকে আলাদা করা কিংবা তালেবানের শক্তি হ্রাস করার পক্ষে অধিকতর ভালো বলে প্রমাণিত হয়নি। ২০১১ সালের শুরুর দিকে কিছুদিন এটি আলাপ-আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। পেট্রিয়াসের নেতৃত্বে রাত্রিকালীন অভিযানে মিলিটারি হাজার হাজার তালেবান যোদ্ধাকে আটক করায় মনে হচ্ছিল যে কিছুটা হলেও সফলতা পাওয়া যাচ্ছে। অথচ গ্রেপ্তারকৃতদের প্রায় ৯০ শতাংশকেই দুই সপ্তাহের মধ্যেই মুক্তি দিতে হয়। কারণ, তাদেরকে আটক করা কর্মকর্তারা তালেবানের সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতার বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি।[২০] তাই এটা মনে করারও কোনো কারণ নেই যে সেসব রাত্রিকালীন অভিযানে নিহতরা আটককৃতদের চেয়ে কোনো অংশে বেশি অপরাধী ছিল।

এই প্রেক্ষাপটের একটি ভয়াবহ উদাহরণ ছিল একজন পুলিশ সদস্যের বাড়িতে ডেলটা ফোর্সের অভিযানের পাঁচজনের মৃত্যু। অভিযানে সেই পুলিশ, তার ভাই, দুজন গর্ভবতী মহিলা (তাদের মধ্যে একজন ১১ সন্তানের জননী) এবং একটি কিশোরী মেয়ে মারা গিয়েছিল। সেনা কমান্ডাররা এই হামলা নিয়ে মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়। তারা দাবি করে, সেই পরিবার সম্মান রক্ষার্থে মহিলাদের বেঁধে গুলি চালিয়েছে (Honor Killing)। ডেলটা ফোর্স সদস্যরা তাদের বানোয়াট কাহিনি প্রমাণ করতে মহিলাদের ক্ষতগুলো থেকে

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গুলিগুলো বের করার চেষ্টা করেছিল, যাতে সেই গুলি শনাক্ত করে তাদের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করা না যায়।[২১]

পরবর্তী সময়ে একজন বেনামি হুইসেলব্লোয়ার জেরেমি স্কাইলের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন প্রোগ্রামসংক্রান্ত চূড়ান্ত গোপনীয় (Top Secrat) নথি সরবরাহ করে। জেরেমি স্কাইল সেগুলো 'দ্য ড্রোন পেপারস' নামে দ্য ইন্টারসেপ্ট-এ প্রকাশ করেছিলেন। এগুলোই পরবর্তীকালে 'দ্য অ্যাসাসিনেশন কমপ্লেক্স' বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। স্কাইল, রায়ান দেভেরাক্স এবং অন্যদের এই প্রতিবেদনটিতে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বিস্তৃত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা উঠে এসেছে। আফগানিস্তান অধ্যায়ে বলা হয়েছে, '২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সিআইএ'র সহায়তায় "হেইমেকার" নামে একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানটি ছিল মূলত পাকিস্তান সীমান্তবর্তী উত্তর-আফগানিস্তানের কুনার এবং নুরিস্তান প্রদেশে তালেবান ও হক্কানি নেটওয়ার্কের লক্ষ্যবস্তুতে ধারাবাহিক এবং সুনির্দিষ্ট গণহত্যা অভিযান। এই বিমান হামলায় নিহতদের অধিকাংশই টার্গেটেড ব্যক্তি ছিল না। একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, নিহত ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই ছিল নিরীহ পথচারী। ফাঁস হওয়া স্লাইডগুলোর মতে, 'টাস্কফোর্স গ্রিন' নামে পরিচিত এই 'টাস্কফোর্স 3-10' এক বছরের মধ্যে ২ হাজারের বেশি অভিযান পরিচালনা করে।[২২]

ভাইস প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সীমিত অভিযানের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর যুক্তি ছিল, 'কাউন্টার টেরোরিজম প্লাস' নামক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি পূর্ণমাত্রার কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি অভিযান এবং জনসাধারণের সঙ্গে মার্কিন বাহিনীর মিশ্রণ ব্যতিরেকে কোনো কাজে দেবে না। সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগের পর সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে যথাযথ গোয়েন্দা কার্যক্রম প্রয়োগ করা যেত। কিন্তু সেনাসংখ্যা শীর্ষে থাকার সময়েও সামরিক বাহিনীর কাছে কখনোই যথাযথ মানবভিত্তিক (Human Based) গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল না। পরিবর্তে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোবাইলের সিম কার্ডের তথ্য এবং লোকেশন ট্র্যাকিংয়ের ওপর নির্ভর করে লক্ষ্যবস্তু ঠিক করত।

২০০৯ সালের জুলাই মাসে যখন সেনা বৃদ্ধি নিয়ে প্রশাসনে তীব্র তর্ক-বিতর্ক চলছিল, তখন সিআইএও একটি প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলেছিল, কথিত অতিগুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুগুলোকে ধরে ধরে হামলা বা হত্যা করা কোনো অংশেই কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির চেয়ে ভালো কাজ করবে না। 'অতিগুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু'তে অভিযানের অসংখ্য শক্তিশালী নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যেমন:

প্রতিরোধ যুদ্ধের পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি, শত্রু দমন কৌশলের অন্য দিকগুলোর প্রতি অবহেলা, শত্রুকে কৌশলগত সুবিধা প্রদান, জনগণের মধ্যে সশস্ত্র গোষ্ঠীর সমর্থনকে আরও শক্তিশালী করা, কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠীর অবশিষ্ট নেতাদের আরও চরমপন্থি করে তোলা এবং অধিক চরমপন্থিদের অনুপ্রবেশ করতে পারার মতো জায়গা তৈরি করে দেওয়া। 'অতিগুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু'তে অভিযান সরকার এবং প্রতিপক্ষের মধ্যকার সংঘর্ষে সহিংসতার মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই বিষয়টি সরকারের স্বার্থের অনুকূল হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে।

সিআইএ আফগানিস্তানে এই কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক করেছিল। তাদের মতে, 'মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট ২০০১ সাল থেকে তালেবান নেতাদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর ক্ষেত্রে একটি টেকসই অভিযান পরিচালনা করছিল। কিন্তু, কাবুলের বাইরে সরকারের সীমিত প্রভাবের কারণে অতিগুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ এবং বিদ্রোহ প্রতিরোধে অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক পদক্ষেপের মধ্যে সমন্বয় সাধন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আফগান সরকারে সংহতির অভাব, দুর্নীতি, আফগান-ন্যাটো নিরাপত্তা বাহিনীর অপর্যাপ্ত শক্তি এবং দেশটির জাতিগত অরাজকতা প্রভৃতি এর কার্যকারিতাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। প্রবীণ তালেবান নেতাদের পাকিস্তানকে আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহারও অভিযানকে জটিল করে দিয়েছে। অধিকন্তু, হারানো নেতাদের শূন্যস্থান পূরণে তালেবানের ভিন্ন মাত্রার সক্ষমতা রয়েছে। গোপন মার্কিন সামরিক বাহিনীর রিপোর্ট অনুযায়ী, তালেবানের কেন্দ্রীভূত কিন্তু নমনীয় নেতৃত্ব কাঠামো বিদ্যমান। পাশাপাশি তাদের উত্তরাধিকার পরিকল্পনা এবং বিচারিক শক্তিও অসামান্য।[২৩]

কর্নেল ফ্লিন ২০১০ সালে তার বিখ্যাত গবেষণাপত্রে, আফগান যুদ্ধে অধিক মাত্রায় কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি নীতিমালা এবং অধিক পরিশীলিত গোয়েন্দা কার্যক্রম গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি লেখেন—

> অমোঘ সত্য এটাই যে কেবল শত্রুদের হত্যা করে তাদের সংখ্যা হ্রাস করা যায় না। এটি বরং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পক্ষেই কাজ করে। এই উল্টো ফলাফল অতীতেও অসংখ্য গেরিলা সংঘাতের একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল। প্রতিশোধপ্রবণ পশতুন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। সোভিয়েতরা ১৯৮০-র দশকেই এই বাস্তবতা অনুভব করেছিল। তারা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করার পরও যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শুরুর চেয়ে অনেক বেশি প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল।[২৪]

কিন্তু পেট্রেয়াস কেবল দুটো রাস্তাই খোলা রেখেছিলেন, হয়তো পূর্ণমাত্রায় কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি নীতিমালা বাস্তবায়ন, নয়তো আগের মতো বিমান হামলা ও রাত্রিকালীন অভিযান চালিয়ে যাওয়া। ওয়াশিংটনের কাছে দ্বিতীয়টিকেই অধিক নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি মনে হয়েছিল।[২৫] আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত বোমা আর গভীর রাতে দরজায় বুটের আঘাতকে শত্রুরা সরাসরি প্রতিহত করতে পারবে না। তবে কেবল ড্রোন হামলা এবং হেলিকপ্টারের মাধ্যমে রাত্রিবেলায় বেসামরিক ঘরবাড়িতে অতর্কিত আক্রমণের মাঝেই এই অভিযান সীমাবদ্ধ ছিল না। বোমারু বিমান আবারও পুরোদমে আফগান আকাশে ফিরে আসে।

এমনি একটি ঘটনায় কান্দাহার প্রদেশে সম্মিলিত যৌথ টাস্কফোর্সের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডেভিড ফ্লিন[২৬] (কর্নেল ফ্লিন নন) ২০১০ সালের অক্টোবরে খোসরো সোফলা, লোয়ার বাবুর এবং তারোক কোলাচকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়ার আদেশ নিয়ে গর্ব করেছিলেন। লে. কর্নেল ফ্লিনের মতে, সেখানে অসংখ্য উন্নত বিস্ফোরক এবং স্নাইপার ছিল। তাই সেই তিনটি গ্রাম পুরোপুরিভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া ব্যতীত কোনো বিকল্প ছিল না। কেননা, তারা প্রদেশটির অন্যান্য অংশে শান্তি প্রতিষ্ঠার চলমান গতিবেগ হারাতে চাচ্ছিল না। ওয়্যার্ড ম্যাগাজিনের একটি নিবন্ধে লে. কর্নেল ফ্লিন পাঠকদের আশ্বস্ত করেন যে, ‘সকল বেসামরিক ব্যক্তিই অনেক আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। আমাদের হামলায় একমাত্র তালেবান যোদ্ধারাই হতাহতের শিকার হয়েছিল।’ মার্কিনরা কেবল ক্ষুদ্র তারোক কোলাচ গ্রামেই প্রায় ৫০ হাজার পাউন্ড বোমা ফেলেছিল। তাই লে. কর্নেল ফ্লিনের দাবি মোতাবেক সেই গ্রামে আদৌ বেসামরিক লোক ছিল কি না, সেটা যাচাই করতে যাওয়াটা অনর্থক।[২৭] কারণ সেখানে জনমানবের কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট ছিল না। জনসংযোগ বিভাগের ফ্ল্যাক পলা ব্রডওয়েল কর্তৃক ফরেন পলিসি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ছবিগুলোতে দেখা যায়, গ্রামটি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সেখানে কেবল কিছু ভবনের ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট ছিল। এই ফ্ল্যাক পলা ব্রডওয়েল সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা যায়। তিনি জেনারেল পেট্রিয়াসের উপপত্নী ছিলেন এবং পেট্রিয়াস তার কাছে অতি গোপনীয় অনেক দলিলপত্র ফাঁস করেছেন! ব্রডওয়েল জানিয়েছিলেন, ‘তবে এটা কোনো সমস্যাই না। সমগ্র গ্রামটিকে পুনর্নির্মাণের জন্য একজন স্থানীয় অনুমোদিত ঠিকাদারকে ভাড়া করা হয়েছে। তারা কালভার্ট এবং অন্য সব কিছুর নকশা চূড়ান্ত করে রেখেছে।’[২৮]

ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্টে দেখা যায়, তিন বছর পরও তারোক কোলাচ একটি ধ্বংসাবশেষ হিসেবেই রয়ে গেছে। সেখানে গুটিকয়েক কংক্রিটের বিল্ডিংয়ে কিছু মানুষের আনাগোনা ছিল। কয়েকটি পরিবার পরে ফিরে এলেও সেই সমাজটি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাসিন্দাদের অধিকাংশই ভাগ্যের খোঁজে চিরদিনের জন্য অন্য কোথাও গমন করেছে।[২৯]

২০১০ সালের নভেম্বর মাসে ন্যাশন রিপোর্টার জেরেমি স্কাইল তালেবান ভূখণ্ড থেকে তাদের দৃষ্টিকোণে যুদ্ধের হালচাল উপস্থাপন করেছিলেন। স্কাইলের মতে, 'ন্যাটো এবং ওয়াশিংটনের গলাবাজির মতো তালেবানরা বাস্তবে কোনো ঠুনকো সুতোর ওপর দাঁড়িয়ে নেই। তালেবানের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ন্যাটোর সঙ্গে আপসের মাধ্যমে তারা কিছু অর্জন করতে পারবে না। তালেবান জানে যে সময় তাদের সঙ্গেই রয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি তাদের পক্ষেই যাবে। সাম্প্রতিক সম্মেলনের পরও তালেবান জানিয়েছে যে ন্যাটো এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উত্তম হবে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে অবশেষে তাদের যা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হবে (সেনাবাহিনী প্রত্যাহার), সেটা আগেভাগেই বাস্তবায়ন করা। সেনাবাহিনী প্রত্যাহার স্থগিত করা তাদের জন্য কোনো ভালো ফলাফল বয়ে আনতে পারে না।'[৩০]

মাইকেল হেস্টিংসের রিপোর্ট অনুসারে, ২০১১ সালের গ্রীষ্মের দিকেই আফগানিস্তানের মাটিতে নিয়োজিত সৈন্যরা নিশ্চিত ছিল যে, 'তাদের প্রচেষ্টা এবং জীবন কেবল অপচয়ই হচ্ছে।' সেটা ছিল হেস্টিংসের দেখা মনোবলের সর্বনিম্ন স্তর। তিনি বলেন, কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির ব্যর্থতার বিষয়ে সবাই একমত ছিল। সেনা বৃদ্ধির কথিত সাফল্য বাস্তবে একটি মরীচিকা ছিল। মার্কিনরা কেবল শত্রুকে তাড়িয়ে স্বল্প সময়ের জন্য স্থিতিশীলতা আনতে পারত। কিন্তু, এত বেশি অর্থ ও সময় ব্যয় করার পরেও স্পষ্টতই এই কৌশলটি মোটেও টেকসই ছিল না। অন্তহীন এই খেলায় প্রতিপক্ষ কেবল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গা-ঢাকা দিত এবং আমাদের (মার্কিনদের) চলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকত।[৩১]

রবার্ট পেপে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন এবং কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি নীতিমালা আফগানিস্তানজুড়ে আত্মঘাতী হামলার প্রসার ঘটাবে। দ্রুতই তার ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। ২০১০ সালের গ্রীষ্মে সেনা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হারের সময় প্রকাশিত জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে তালেবানের আত্মঘাতী হামলার এই চিত্র উঠে আসে। *নিউইয়র্ক টাইমস* প্রতিবেদনের সারাংশ ছিল—

> জাতিসংঘ জানিয়েছে, প্রতিদিন গড়ে একটি হত্যাকাণ্ড এবং গড়ে প্রতি দুই বা তিন দিনে একটি করে আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে তালেবান আফগানিস্তানে সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি করে চলছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে আত্মঘাতী বোমা হামলায়। এই সংখ্যা ২০০৯ সালের তুলনায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আত্মঘাতী হামলা সপ্তাহে গড়ে তিনবার হচ্ছে। আগে এই সংখ্যা ছিল গড়ে প্রতি সপ্তাহে একটি। উপরন্তু এই আত্মঘাতী হামলাগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ জটিল আত্মঘাতী হামলা, যেখানে আক্রমণকারীরা আত্মঘাতী বোমার পাশাপাশি অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করেছে।[৩২]

তালেবানের সহিংস আক্রমণের পরিসংখ্যানের তুলনায় মার্কিন সেনাবাহিনীর হেলমান্দ ও কান্দাহার প্রদেশের অমুক তমুক জেলায় 'অগ্রগতি'র দাবিসমূহ পুরোপুরি হাস্যকর ছিল। এই ব্যাপারটি মূলধারার গণমাধ্যমগুলোতেও একটি অসুস্থ রসিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৩৩] সর্বোপরি, তালেবানকে পরাস্ত করে আলোচনার টেবিলে আমেরিকার বেঁধে দেওয়া শর্তাবলি মানতে বাধ্য করা না যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, তালেবানই এই যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ।

তথ্যসূত্র

১. Gareth Porter, "McChrystal Strategy Shifts to Raids – and Wali Karzai," IPS News, May 25, 2010; Hastings, The Operators, 338; Hastings, "The Runaway General."

২. Michael Hastings, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, September 30, 2010.

৩. Ron Moreau, "David Rodriguez: The General Who Planned the Afghan Surge," Newsweek, June 26, 2011.

৪. Ben Farmer, "Taliban Quit Rural Areas for City After US Surge," Irish Times, June 20, 2011; C.J. Chivers, "What Marja Tells Us of Battles Yet to Come," New York Times, June 10, 2010.

৫. Gentile, Wrong Turn, 132.

৬. Hastings, The Operators, 141; Hastings, "The Runaway General."

৭. Shorrock, "Making COIN.''

৮. Hastings, "The Runaway General."

৯. Ibid.

১০. “Afghan Shift: McChrystal Out, Petraeus In,” NPR News, June 23, 2010.

১১. Carlotta Gall, “Night Raids Curbing Taliban, but Afghans Cite Civilian Toll,” New York Times, July 8, 2011; Noah Shactman, “Petraeus Launches Afghan Air Assault; Strikes Up 172 Percent,” Wired, October 12, 2010; Jeremy Scahill, “America’s Failed War of Attrition in Afghanistan,” Nation, November 22, 2010.

১২. Michael Hastings, “King David's War,” Rolling Stone, February 2, 2011; Matthieu Aikins, “Our Man in Kandahar,” Atlantic, November 2011; Matthieu Aikins, “The Bidding War,” New Yorker, March 7, 2016.

১৩. “Afghanistan: NATO Air Strike Kills Seven Policemen,” Daily Telegraph, February 18, 2010.

১৪. Dexter Filkins, “Afghan Militias Battle Taliban with Aid of US,” New York Times, November 21, 2009.

১৫. Dan Edge and Stephen Grey, “Kill/Capture,” Frontline, PBS, May 10, 2011; Matthew Cole, “The Crimes of SEAL Team 6,” Intercept, January 10, 2017.

১৬. Gareth Porter, “How McChrystal and Petraeus Built an Indiscriminate ‘Killing Machine,’” Truthout, September 26, 2011.

১৭. Porter, “How McChrystal and Petraeus Built an Indiscriminate ‘Killing Machine.’”

১৮. Dana Priest and William M. Arkin, “‘Top Secret America’: A Look at the Military’s Joint Special Operations Command,” Washington Post, September 2, 2011.

১৯. Porter, “How McChrystal and Petraeus Built an Indiscriminate ‘Killing Machine.’”

২০. Gareth Porter, “Ninety Percent of Petraeus’s Captured ‘Taliban’ Were Civilians,” June 12, 2011, Inter Press Service.

২১. Gareth Porter, “Trump’s National Security Adviser Facilitated the Murder of Civilians in Afghanistan,” Truthout, November 23, 2016; Porter, “How McChrystal and Petraeus Built an Indiscriminate ‘Killing Machine.’”

২২. Scahill, The Assassination Complex; Ryan Devereaux, “Manhunting in the Hindu Kush,” Intercept, October 15, 2015.

২৩. “Best Practices in Counterinsurgency,” CIA, posted by Wikileaks, July 7, 2009.

২৪. Flynn, “Fixing Intel.”

২৫. Anand Gopal, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, June 28, 2010.

২৬. Email message from journalist Mark Perry, April 3, 2017.

২৭. Spencer Ackerman, “25 Tons of Bombs Wipe Afghan Town Off Map,” Wired, January 19, 2011.

২৮. Thomas E. Ricks, “Travels with Paula (I): A Time to Build,” Foreign Policy, January 13, 2011.

২৯. Kevin Sieff, “Years Later, a Flattened Afghan Village Reflects on US Bombardment,” Washington Post, August 25, 2013.

৩০. Scahill, “America’s Failed War of Attrition in Afghanistan.”

৩১. Michael Hastings, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, July 14, 2011; Hastings, The Operators, 334.

৩২. Rod Nordland, “Violence Up Sharply in Afghanistan,” New York Times, June 19, 2010.

৩৩. Spencer Ackerman, “What Surge? Afghanistan’s Most Violent Places Stay Bad, Despite Extra Troops,” Wired, October 23, 2012.

যুদ্ধাপরাধের কিছু নমুনা

২০০৯ সালে গারলোচ নামক একটি গ্রামে দুটি পৃথক ঘটনায় ৩৩ জন নিরপরাধ নাগরিককে হত্যা করা হয়। প্রথম ঘটনায় ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ভুল বাড়িতে বিমান হামলা চালানো হয়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনায় একটি বাড়িতে অভিযান চলাকালে সেনারা একটি কুকুরকে গুলি করে বসে। একজন প্রতিবেশী এই আওয়াজের কারণ অনুসন্ধানে এলে তাকেও গুলি করা হয়। এভাবে একজনের পর আরেকজন আসে এবং গুলিবিদ্ধ হয়। শেষপর্যন্ত এভাবে ১৭ জন নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করা হয়। সরকারের প্রাথমিক দাবি ছিল, এই ঘটনায় নিহতদের 'অধিকাংশই জঙ্গি'। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সরকার অবস্থান পরিবর্তন করে এবং হামলায় বেঁচে যাওয়া প্রত্যেকের জন্য ২ হাজার ডলার 'সমবেদনামূলক ভাতা' প্রদানের আশ্বাস দেয়। মালেক হাজরাত নামের এক আফগান সাংবাদিক আনন্দ গোপালের কাছে ক্ষুব্ধভাবে বলেছিল, 'হে আমেরিকানরা, তোদের কাছে আমাদের জীবনের মূল্য কি এতই সস্তা? ২ হাজার ডলার? তোরা আমাদের হত্যা করবি আর আমাদের টাকা দিয়ে চুপ করিয়ে দিবি?' এক বৃদ্ধ বলেন, 'আমার মেয়ে এখন মাটির নিচে। তোমরা আমাকে পৃথিবীর সমস্ত ডলার এনে দিলেও আমি ছুঁয়েও দেখব না। তোমাদের ডলার আমার মেয়েকে ফিরিয়ে আনবে না।' এই ঘটনার পর বাদবাকি গ্রামবাসী গোরলোচ গ্রাম ছেড়ে পাকিস্তানমুখী একটি রাস্তার পাশে আশ্রয় নেয়। সেখানে তারা বেঁচে থাকার জন্য ময়লা ঘাঁটাঘাঁটি এবং ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে।[১]

২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ড্রোন হামলাকারীরা একটি রাস্তার পাশের কিছু পরিবারের ওপর হামলা চালালে ২৩ জন পুরুষ, মহিলা ও শিশু মারা যায়। আহত হয় এক ডজনের বেশি মানুষ।[২] এই হামলাটি অন্যান্য হামলা থেকে বিশেষ কারণে ভিন্ন ছিল। এই ভিন্নতার কারণ ছিল সেই ড্রোন পাইলটদের মধ্যে হওয়া কথোপকথন এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এর সবটাই অ্যান্ড্রু ককবার্ণের

‘কিলিং চেইন’-এ প্রকাশিত হয়েছিল।[৩] এটি নিয়ে ‘ন্যাশনাল বার্ড’ নামক একটি ডকুমেন্টারিও নির্মিত হয়।[৪] নিরীহদের বধে অমানবিক সামরিক যন্ত্র এবং প্রযুক্তির অবদানের ভয়াবহ দিক এই ডকুমেন্টারিতে তুলে ধরা হয়।[৫] আফগান জনগণ তাদের তথাকথিত ‘মুক্তিদাতা’ এবং ‘রক্ষক’ দাবিদারদের হাতে যেই নির্মমতার শিকার হচ্ছে, এই হামলায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে ডকুমেন্টারি নির্মাতা সোনিয়া কেনেবেকের সাক্ষাৎকারে সেই দুর্দশা এবং ব্যথা কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয়।

ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে কুনার প্রদেশে একটি মার্কিন হামলায় ৬৫ জন নিরপরাধ মানুষ মারা যায়। এই হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল পেট্রিয়াস আফগান সরকারের কারজাই এবং অন্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠকে জঘন্যভাবে দাবি করেন, ‘আমেরিকাকে কলঙ্কিত করতে হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং বসতিতে আগুন দেয়।’[৬]

এই ঘটনার মাত্র কয়েক দিন পর ৯ থেকে ১৫ বছর বয়সী ৯ জন বালককে লাকড়ি সংগ্রহের সময় মার্কিন হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়। হেমাদ নামের একটি বালক যেন এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বর্ণনার জন্যই বেঁচে গিয়েছিল। হেমাদের বর্ণনা মতে—

> লাকড়ি সংগ্রহের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা হঠাৎই হেলিকপ্টারগুলোকে আসতে দেখেছিলাম। সেখানে দুটি হেলিকপ্টার ছিল। সেগুলো আমাদের মাথার ওপর এসে উড়তে থাকে এবং আমাদের নিরীক্ষণ করে। আমরা হেলিকপ্টারগুলোতে একটি সবুজ আলোর ঝলকানি দেখতে পাই। এরপর হেলিকপ্টার আরও ওপরে উঠে যায় এবং দ্বিতীয় দফায় আমাদের ওপর জড়ো হয়ে গুলি করা শুরু করে। তারা একটি রকেটও নিক্ষেপ করেছিল। রকেটটি একটি গাছে আঘাত হানে। সেই গাছটির ডালপালাগুলো আমার ওপরে পড়লে আমার শরীরের ডান পাশ এবং হাত চাপা পড়ে যায়।

উপড়ে যাওয়া গাছটির ডালপালার নিচ থেকে হেমাদ দেখতে থাকে যে হেলিকপ্টারগুলো ‘একজনের পর একজনকে গুলি করে যাচ্ছে।’ জেনারেল পেট্রিয়াস কেবল ছেলেগুলোর পরিবারগুলোর উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘আমরা গভীরভাবে দুঃখিত।’ কী নিষ্ঠুর রসিকতা![৭]

আফগান রণক্ষেত্রে মার্কিন সেনাবাহিনীর পদাতিক বিভাগের ব্রাভো কোম্পানির ‘কিল টিম’[৮] নামের একটি দুর্বৃত্ত দল সূচনালগ্ন থেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন

নৃশংস ঘটনা সংঘটিত করেছে। ১৫ বছর বয়সী একটি রাখাল বালককে ঠান্ডা মাথায় খুন করার মাধ্যমে এই দলটি নৃশংসতার উৎসবের সূচনা করেছিল। ছেলেটিকে হত্যার পর তারা তার মৃতদেহ নিয়ে উল্লাস করে, অপবিত্র করে এবং অঙ্গহানি করে। পরের মাসেই এই একই দল কমপক্ষে তিনজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যার পর অঙ্গহানি করে। পরে তাদের ১১ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।[৯] সাংবাদিক মার্ক বোল উল্লেখ করেন—

> 'রোলিং স্টোন'-এর হাতে আসা সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ রেকর্ডসমূহের পর্যালোচনা এবং অনুসন্ধানী ফাইলগুলোতে ব্রাভো কোম্পানির কয়েক ডজন সদস্যের সাক্ষাৎকারও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলো থেকে জানা যায় যে প্রায় এক ডজন পদাতিক সৈন্যকে গোপন 'কিল টিমের' সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তারা খোলাখুলিভাবেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করত। দলের বাকিদের কাছে এটি একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। পেন্টাগনের মতো লুকোচুরি তো দূরের কথা, বরং ইউনিটের সবাই বেসামরিক নাগরিকদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিল। তাদের সম্পর্কে অভিযোগকারী একজন সেনার মতে, 'পুরো প্লাটুনের একে আইনবিরোধী বলে স্বীকার করতে নারাজ ছিল'। এই বেসামরিক হত্যাকাণ্ড দৈনন্দিন কথোপকথনে একটি খোলামেলা বিষয় ছিল। এ ছাড়া, ৩ হাজার ৮০০ সেনাসংবলিত 'স্ট্রাইকার ব্রিগেডের' প্রতিটি ব্যাটালিয়নে কমপক্ষে একজন সেনা নিরস্ত্র আফগানদের হামলায় অংশ নেয়। প্রফেসর জাস্টিন স্টোন নামক একজন তথ্যদাতা সেনা অপরাধ তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বলেছিল, 'এই কাজের জন্য প্লাটুনটির বেশ নামডাক ছিল। তারা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু এ জন্য তাদের কোনো জবাবদিহি করতে হয়নি।'[১০]

২০১২ সালের ১১ মার্চ নেশাখোর, মাতাল, প্রতিহিংসাপরায়ণ এক মার্কিন সার্জেন্ট রবার্ট বেলস ১৭ জন নিরপরাধ আফগান গ্রামবাসীকে খুন করে। তাদের মধ্যে নজনই ছিল শিশু। এই শিশুদের দুজনের বয়স ছিল যথাক্রমে দুই এবং তিন বছর। হত্যার পর সে অনেক মৃতদেহকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। এই ঘটনায় স্থানীয় জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল।[১১]

সম্প্রতি ২০১৫ সালে এসেও বেলস জোর দিয়ে বলেছিল যে, 'তার এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর আফগানিস্তানে ন্যায়সংগত অভিযানে বাধা দেওয়ার অধিকার কোনো আফগানের নেই!' তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার পর সে কেবল এতটুকুই বলে যে 'সেই শিশুদের জবাই করার জন্য আমি দুঃখিত!'[১২]

একই বছরে ‘আলফা ৩১২৪’ বা ‘এ-টিম’ নামে পরিচিত বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা ওয়ার্দাক প্রদেশে দায়িত্বরত অবস্থায়, তাদের দোভাষীসহ কমপক্ষে ১৮ জন বেসামরিক নাগরিককে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছিল। প্রথম ধাপে তারা ১০ জনকে অপহরণ করে নির্যাতন চালায়। তাদেরকে হত্যার পর অধিকাংশ মৃতদেহ তারা ঘাঁটির দেয়ালের অন্য পাশে বিভিন্ন জায়গায় পুঁতে রেখেছিল। তারা আরও অনেক গ্রামবাসীকে নির্যাতন করেছিল। যদিও সেনারা জোর দিয়ে দাবি করেছিল যে, ‘কেবল দোভাষীর সঙ্গেই এরূপ করা হয়েছে। গ্রামবাসী মিথ্যা গল্প বানিয়েছে।’ কিন্তু সাংবাদিক ম্যাথিউ আইকিনস তার অনুসন্ধানে পুরো নেরখ জেলায় সেই বিশেষ বাহিনীর সেই দুষ্কর্মের অনেক সাক্ষী খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই সাক্ষীদের প্রত্যেকে একইভাবে এই ঘটনা বর্ণনা করেছিল। তিনি রায় দেন, ‘ডজন ডজন নিরক্ষর গ্রাম্য আফগান কয়েক মাসজুড়ে কোনো হেরফের ছাড়াই কোনো বিশাল বানোয়াট কাহিনি বর্ণনা করতে পারে না। এই নিরক্ষর আফগানদের পক্ষে কয়েক মাস ধরে এত মিথ্যা তথ্য মনে রাখা সম্ভব নয়।’ সাংবাদিক আইকিনস সৈন্য এবং দোভাষীর ছবি পুলিশের ‘ফটো অ্যারে’-এর মতো করে গ্রামবাসীদের দেখান। গ্রামবাসীর প্রত্যেকেই সেসব অভিযুক্ত সৈন্য এবং দোভাষীকে চিনতে পেরেছিল। এই ঘটনায় আফগান সরকারের তত্ত্বাবধানে একটি তদন্তও হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে তদন্ত কর্মকর্তা এই দাবিগুলোকে ভুয়া মনে করেছিলেন। সেখানেও পরবর্তী সময়ে এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রস এবং জাতিসংঘের ভিন্ন ভিন্ন তদন্তেও একই ফলাফল উঠে আসে। অবশেষে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মার্কিন তদন্তের পর সেসব অভিযুক্ত সেনাকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়। চতুর্থ আরেকটি তদন্ত এখনো অমীমাংসিত রয়েছে।[১৩]

গার্ডিয়ান পত্রিকায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের জোয়ান্নে ম্যারিনার বলেন, ‘সেসব মার্কিন সেনার যুদ্ধাপরাধের জড়িত থাকার ব্যাপারে জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে।’ ওয়ার্দাক প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদের সাবেক উপপ্রধান হাজরাত মোহাম্মদ যানান গার্ডিয়ানকে বলেছিলেন, ‘নিখোঁজদের লাশ আবিষ্কারের পর বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। শান্তিপূর্ণভাবে সেই প্রতিবাদ নিরসনের লক্ষ্যে আমরা মৃতদেহগুলো হস্তান্তর করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের ব্যর্থ হতে হয়েছে। এসব ঘটনার ফলে সরকারের প্রতি জনগণের ঘৃণা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।... এসবই তালেবানকে দিন দিন শক্তিশালী করে তুলছে।’[১৪]

‘সিল টিম সিক্স’ বা ‘নেভাল স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডেভলপমেন্ট গ্রুপ (DEVGRU)’ মার্কিন বিশেষ বাহিনীগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই বাহিনীর

সদস্যরাই ২০১১ সালে পাকিস্তানে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে। তারাও যুদ্ধের সূচনালগ্ন থেকে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করে আসছিল। জার্নালিস্ট ম্যাথিউ কোল-এর প্রতিবেদনে তাদের বিরুদ্ধে কুঠার ব্যবহার করে হত্যা এবং অঙ্গহানির তথ্য উঠে এসেছে। তা ছাড়া তারা টিমের বিশেষ চিহ্ন হিসেবে মৃতদেহের কপালে গুলি করত। সেই গুলিতে মাথা বিদীর্ণ হয়ে মগজ বের হয়ে যেত। সিল টিম এই বিষয়ে মন্তব্য করে, 'এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। এই ধরনের কার্যকলাপ শত্রুদের ভীত করে। তারা আশা ত্যাগ করে।' কিন্তু বাস্তব এগুলো শত্রুপক্ষের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করেছে। তালেবানরাও মার্কিনদের সঙ্গে এরূপ নৃশংস আচরণ করলে মার্কিনদের প্রতিক্রিয়াও একই হতো। কোল তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, 'নেভি সিলের সবাই হয়তো এ রকম বর্বর দুষ্কর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। কিন্তু কোনো একগুঁয়ে ভাইরাসের মতো এই ধরনের নৃশংসতা সর্বদাই উপস্থিত ছিল। বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কারণ সেখানে তো কোনো প্রকার জবাবদিহি ছিল না।'[১৫]

২০১১ সালে জাতিসংঘ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে আফগান পুলিশ এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের হাতে বন্দিদের ওপর ধারাবাহিক নির্যাতনের চালানোর তথ্য উঠে আসে। আফগান কর্তৃপক্ষের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্দি হস্তান্তর নিয়ে এই ঘটনা একটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু যখন মিডিয়ার আগ্রহ ম্লান হয়ে যায়, তখন আটককৃতদের পুনরায় তাদের দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত কুখ্যাত বাগরাম কারাগার ২০১৩ সালে আফগান কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু সিআইএ সমর্থিত যোদ্ধারা ২০১৫ সালে এসেও এসব যুদ্ধাপরাধ চালিয়ে গেছে এবং আজ অবধি তারা সেসব অপরাধ করেই যাচ্ছে।[১৬]

আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেসামরিকদের ওপর তথাকথিত 'সমান্তরাল ক্ষয়ক্ষতির' তীব্রতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। জেনারেল ম্যাকক্রিস্টাল নিজেই স্বীকার করেন, 'আফগান রাস্তাগুলোর অসংখ্য চেকপোস্টে আমাদের গুলি চালাতে হয়েছে। সেসব ঘটনায় বহুসংখ্যক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। আমার জানামতে, তাদের কেউই মার্কিন সেনাদের জন্য কোনো সত্যিকারের হুমকি ছিল না।' সার্জেন্ট মেজর মাইকেল হল তার সেনাদের একটি বক্তৃতায় মন্তব্য করেছিলেন, 'এসব সাধারণ মানুষ কীভাবে তালেবানে রূপান্তরিত হচ্ছে, তা নিয়ে অনেক গল্প রয়েছে। প্রতিটি ঘটনার পেছনে আমরা কারণ হিসেবে খুঁজে পেয়েছি যে, কোথাও না কোথাও তাদের নিরপরাধ আত্মীয় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে।'[১৭]

তথ্যসূত্র

১. Gopal, No Good Men, 215-222.

২. David S. Cloud, “Anatomy of an Afghan War Tragedy,” Los Angeles Times, April 10, 2011.

৩. Andrew Cockburn, Kill Chain: The Rise of the High-Tech Assassins, 1-16, (Henry Holt, 2015).

৪. National Bird, by Sonia Kennebeck, (New York: FilmRise, 2016).

৫. David Swanson, “How Drone Pilots Talk,” November 4, 2016.

৬. “Afghan Governor: Women and Children Killed in Military Operation,” CNN, February 20, 2011; Joshua Partlow, “Petraeus's Comments on Coalition Attack Reportedly Offend Karzai Government,” Washington Post, February 21, 2011; Hastings, The Operators, 355.

৭. Alissa J. Rubin and Sangar Rahimi, “Nine Afghan Boys Collecting Firewood Killed by NATO Helicopters,” New York Times, March 2, 2011.

৮. Paul Harris, “US Soldier Admits Killing Unarmed Afghans for Sport,” Guardian, March 23, 2011.

৯. Chris McGreal, “‘Kill Team’ US Platoon Commander Guilty of Afghan Murders,” Guardian, November 10, 2011.

১০. Mark Boal, “The Kill Team: How US Soldiers in Afghanistan Murdered Innocent Civilians,” Rolling Stone, March 27, 2011.

১১. “Officials: Bales Sneaked Off Base Twice During Rampage,” CNN, March 26, 2012; Eric M. Johnson, “US Soldier Pleads Guilty to Murdering 16 Afghan Civilians,” Bangor Daily News, June 5, 2013.

১২. Brendan Vaughan, “Robert Bales Speaks: Confessions of America’s Most Notorious War Criminal,” GQ, October 21, 2015.

১৩. Matthieu Aikins, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, November 25, 2013.

১৪. Matthieu Aikins, “The A-Team Killings,” Rolling Stone, November 6, 2013; Matthieu Aikins, “US Special Forces May

Have Gone on a Murder Spree in Afghanistan — Did the Army Cover It Up?" Nation, September 2, 2015.

১৫. Matthew Cole, "The Crimes of SEAL Team 6," Intercept, January 10, 2017.

১৬. Sudarsan Raghavan, "Inside the CIA's Shadow War in Afghanistan: Agency Oversees Militias Implicated in Torture, Civilian Killings," Washington Post, December 3, 2015.

১৭. Richard Oppel Jr., "Tighter Rules Fail to Stem Deaths of Innocent Afghans at Checkpoints," New York Times, March 26, 2010.

সর্বমুখী পরাজয়

জেনারেল পেট্রিয়াস আফগানিস্তানে তার সময়জুড়ে সর্বক্ষণ বলে গিয়েছেন যে 'যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধিতে কাজ হচ্ছে।' বাস্তবতা হলো, এই পদক্ষেপের বিপরীতে কেবল তালেবানের সামগ্রিক হামলা[১] এবং বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতিই[২] বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্পষ্টত প্রতীয়মান এসব বিপত্তি সত্ত্বেও পরিস্থিতির 'উন্নতি' হচ্ছে বলে দাবি করেছেন।

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ড্যানিয়েল ডেভিস কংগ্রেসে একটি বিশেষ প্রতিবেদন ফাঁস করেন। তিনি পরবর্তী সময়ে প্রতিবেদনটি আর্টিকেল আকারে 'আর্মড ফোর্সেস জার্নাল'-[৩]এর মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন।[৪] আফগান যুদ্ধ সম্পর্কে ড্যানিয়েল ডেভিসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেবারে ভিন্ন। ডেভিস প্রথম দুই ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আফগানিস্তানের একটি অভিযানের অভিজ্ঞতাও ছিল তার। তিনি আফগানিস্তানে আর্মি র‍্যাপিড ইকুইপিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। রণক্ষেত্রের সেনাদের প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র কোনো প্রকার বিলম্ব ছাড়াই সরবরাহ করা ছিল তার দায়িত্ব। এই লক্ষ্যে তিনি সমগ্র আফগানিস্তান ভ্রমণ করেছিলেন। এই সুযোগে তিনি ভিন্ন ভিন্ন শাখা, ব্রিগেড, প্লাটুন এবং ব্যাটালিয়নের শত শত সেনার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তাদের মধ্যে যেমন নিয়মিত বাহিনী ছিল, তেমনি বিশেষ বাহিনীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা সবাই ডেভিসকে একই বার্তা দিয়েছিল: 'মার্কিন কৌশল বর্তমানেও কাজ করছে না এবং ভবিষ্যতেও কোনো কাজ করবে না।'

ড্যানিয়েল ডেভিস দেশে ফিরে আসার পর দেখলেন, জেনারেল পেট্রিয়াস তার কল্পিত সাফল্য কংগ্রেস এবং জনগণের কাছে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন 'যথেষ্ট হয়েছে'। ডেভিস লিখেছিলেন, 'জেনারেল কেবল

পরিস্থিতিকে পাশই কাটাচ্ছেন না; বরং তিনি মিথ্যাচার করছেন। তিনি মার্কিন সংসদ এবং জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছেন এই বলে যে, "সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি দৃশ্যমান হচ্ছে" অথবা "সুড়ঙ্গের শেষমুখে আলোর মুখ ফুটবেই"।... কিন্তু আফগান ন্যাশনাল আর্মিকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এবং তালেবান বা অন্য শত্রুপক্ষীয় গোষ্ঠীগুলোকে পরাজিত কিংবা অন্তত দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করে রাখার উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা পুরোপুরি অবাস্তব।'

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ড্যানিয়েল ডেভিসের মতে, এই যুদ্ধে সফল হতে চাইলে তিনটি প্রধান বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

প্রথমত, প্রতিপক্ষের সামরিক সক্ষমতাকে এমন একপর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে, যাতে আফগান নিরাপত্তা বাহিনী একাই তাদের মোকাবিলা করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, একই সময়ে আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকে উঁচুমানের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে তারা সেসব শত্রুর সহজেই সামলাতে পারে।

তৃতীয়ত, ইসলামিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান সরকারকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে এবং শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদেরকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তুলতে হবে; যেন তারা একটি টেকসই অর্থনীতি, নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচার কায়েম করতে সক্ষম হয়।

তবে, ২০০৭ বা ২০০৮-এর শেষে বা এমনকি ১০ বছরের প্রচেষ্টা এবং ৩০ হাজার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করার পরও আমরা এই তিনটি লক্ষ্যের একটির কাছাকাছিও যেতে পারিনি। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ড্যানিয়েল ডেভিসের প্রতিবেদনের শর্তগুলো এই মিশনের অসম্ভাব্যতাকেই উন্মোচন করে।

আফগান ন্যাশনাল আর্মি পুরোপুরি একটি তামাশা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তারা প্রতিনিয়ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি এবং শান্তিচুক্তিতে উপনীত হয় এবং তালেবান আগমনের সামান্যতম গুজবেই অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ড্যানিয়েল ডেভিস এর একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন। কুনার প্রদেশের মারাওয়ারা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নিতে দুটি ভিন্ন লড়াইয়ে কয়েক ডজন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছিল। এরপর মার্কিনরা আফগান ন্যাশনাল আর্মিকে সেই এলাকার কর্তৃত্ব হস্তান্তর করে। কিন্তু কিছুদিন পরই আফগান ন্যাশনাল আর্মি সেখান থেকে ভেগে যায়। অবশেষে ২০১২ সালের মধ্যেই সেই এলাকায় তালেবান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আফগান ন্যাশনাল আর্মি মারাত্মক মাদক সমস্যায় জর্জরিত। কাগজ-কলমে উল্লিখিত সৈন্যদের একটি বড় অংশই 'ভূতুড়ে সৈনিক'। ফ্রি রাইফেল এবং বুটের জন্য কয়েকবার হাজিরা দেওয়ার পর এসব 'ভুতুড়ে সৈনিক'দের আর কখনো দেখা যায় না। হাজিরা দিয়েই তারা বাড়িতে চলে যায়। বেতনের খাতায় লিপিবদ্ধ একটি নাম-ঠিকানা ব্যতীত তাদের আর কোনোই অস্তিত্ব থাকে না। সর্বোপরি, আফগানিস্তানে 'ভূতুড়ে সৈনিক' সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণ ঘাটতি, মনোবলের অভাব, মাদকের অপব্যবহার, মার্কিন সেনা ও আফগান সরকারি সেনাদের ওপর অভ্যন্তরীণ হামলা (Insider Attack) প্রভৃতি সমস্যাও চলমান রয়েছে। আফগানিস্তানে সরকারি শাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আফগান ন্যাশনাল আর্মির ওপর ভরসা করা একটি বিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। এই ব্যাপারটি তখনো যেমন সুস্পষ্ট ছিল, এখনো তেমনি সুস্পষ্টই রয়েছে। রিচার্ড হলব্রুক অনেক আগেও বলেছিলেন, আফগান সেনাদেরকে ধরে রাখতে এই অক্ষমতার পরও নতুন নতুন সেনাকে প্রশিক্ষিত করে অস্ত্রসজ্জিত করা আর কোনো অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত বালতিতে পানি ঢালা একই কথা।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডেভিস ২০১২ সালেই সতর্ক করে বলেছিলেন, 'অপদার্থ এবং ভীরু আফগান ন্যাশনাল আর্মির কারণে মার্কিন সেনারা পর্যদুস্ত হচ্ছে। মার্কিন সেনারাও মনে করে না যে সরকারি বাহিনী কখনো আফগান জনগণের কাছে গৃহীত হবে এবং মার্কিনরা যেসব কথিত সাফল্য লাভ করেছে, তারা সেগুলো ধরে রাখতে পারবে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, '২০১১ সালের আগস্ট মাসে আমি কান্দাহার প্রদেশের পানিওয়াই জেলায় একটি সেনাচৌকিতে ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সম্প্রতি সেই চৌকির বেশ কিছু সেনা অভিযান চলাকালীন নিহত হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল খুবই বিখ্যাত এবং অভিজ্ঞ। ইউনিটের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আমাকে বিদ্রুপাত্মকভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, কীভাবে আমি এদেরকে দিনের পর দিন এই ধরনের মিশনে যেতে বলব? যখন আমি দেশে ফিরব এবং তাদের বিধবা স্ত্রীদের চোখের দিকে তাকাব, তখন এটা কতটা কঠিন হবে? আমি কি তাদের বলতে পারব যে তাদের স্বামীরা অর্থবহ কোনো কিছুর জন্য মৃত্যুবরণ করেছে? সেটা বলার কি কোনো উপায় রয়েছে?'

ডেভিস আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন। ঘটনাটি তালেবানের একজন আঞ্চলিক কমান্ডারকে জেরা করা নিয়ে। সেই তালেবান কমান্ডার তার জিজ্ঞাসাবাদকারীদের ওপর ভীষণ ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন। তিনি

তাদের বলেন, 'দেখুন, আমি কখনোই তালেবানে যোগ দিতে চাইনি। কিন্তু তোমরা এখানে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে অসহনীয় জুলুম-নির্যাতন আমদানি করেছ। আমার পরিবারের অনেককেই তোমরা (মার্কিন সেনাবাহিনী, আফগান ন্যাশনাল আর্মি বা আফগান পুলিশ) হত্যা করেছ।[৫] তাদের প্রতিরক্ষার চেষ্টা করা আমার ওপর আবশ্যক। তোমরাই আমাকে তালেবান বানিয়েছ।'[৬]

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ড্যানিয়েল ডেভিস সর্বদা বলে গিয়েছেন, 'অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন সূচনা থেকেই মারাত্মক ভুল ছিল।... তালেবানের ওপর এত কঠিন আঘাত হানা হবে যে, তারা দেড় বছরের মধ্যেই আলোচনার টেবিলে আসতে বাধ্য হবে— জেনারেল পেট্রিয়াসের এই হম্বিতম্বি তামাশা ভিন্ন কিছু নয়। প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং মার্কিন জনগণের কাছে পেট্রিয়াস এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ হিসাবনিকাশ এটাই বলে যে, তালেবানের সঙ্গে যতই লড়া হবে, তালেবান ততই সম্প্রসারিত হতে। তাদের সঙ্গে কঠিনতরভাবে লড়া হলে তারা দ্রুততমভাবে শক্তিশালী হতে থাকবে।'

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, তালেবানরা হানাদার বাহিনী নয়; বরং আমরাই হচ্ছি হানাদার বাহিনী। তারা কখনো সেনা সংকটে পড়ছে না। এর কারণ হলো, তারা কোনো সেনাবাহিনী নয়। তারা সেই ভূখণ্ডের বাসিন্দা, যেটাকে আমেরিকা দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই গ্রহের সর্বাধিক প্রশিক্ষিত এবং অভিজাত সামরিক বাহিনীকে সেখানে পাঠিয়েছে। কিন্তু ফলাফলের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, এমনকি আজ অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিপক্ষের কিছুই করতে পারছে না। মার্কিন সামরিক এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ ইতোমধ্যেই বলে দিয়েছে যে আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তাদের কিছুই করার নেই। প্রতিবার সেনা বৃদ্ধি সবার জন্য একটি বিপর্যয়কর ঘটনা হলেও প্রতিবার তালেবানই এর সুফল ভোগ করেছে।[৭]

'লিটল আমেরিকা'য় রাজিব চন্দ্রশিখরণ একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, '২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রেসিডেন্ট ওবামা আফগানিস্তান-বিষয়ক সিআইএ রিপোর্ট পড়তেও অস্বীকৃতি জানান। রিপোর্টে আফগানিস্তান পরিস্থিতির অচলাবস্থার জবাবদিহি করা হয়েছিল। এটি সেই সময়ের কথা, যেই সময়সীমার মধ্যে জেনারেল পেট্রিয়াস তালেবানকে প্রেসিডেন্ট ওবামাকে পায়ে হাজির করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরবর্তী হোয়াইট হাউস জানায়, 'প্রতিবেদনটি সেনা প্রত্যাহারের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবিত সময়কালকে ব্যাহত করতে পারে ভেবেই তারা উদ্বিগ্ন ছিল।' এই ব্যাখ্যাকে অপ্রয়োজনীয় ছলচাতুরী বলে

মনে হয়। এটিকে ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা যেত। তারা চাইলেই বলতে পারত যে, এই সম্পূর্ণ বিষয়টিতে (আফগানিস্তানে আগ্রাসন) কখনোই অগ্রসর হওয়া উচিত হয়নি অথবা সেখান থেকে চলে আসার সময় চলে এসেছে।[৮]

তথ্যসূত্র

১. Thomas Joscelyn and Bill Roggio, "Analysis: The Taliban's 'Momentum' Has Not Been Broken," Long War Journal, September 6, 2012.

২. Laura King, "UN: 2010 Deadliest Year for Afghan Civilians," Los Angeles Times, March 10, 2011.

৩. Daniel L. Davis, "Dereliction of Duty II: Senior Military Leaders' Loss of Integrity Wounds Afghan War Effort," United States Army, February 6, 2012.

৪. Daniel L. avis, "Truth, Lies and Afghanistan," Armed Forces Journal, February 1, 2012.

৫. Daniel Davis, email message to author, August 6, 2016.

৬. Daniel Davis, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, February 3, 2016.

৭. Spencer Ackerman, "Military's Own Report Card Gives Afghan Surge an F," Wired, September 27, 2012.

৮. "Biden, In Leaked Memo, Told Obama War Plan Flawed," Daily Caller, June 25, 2012.

পঞ্চম অধ্যায়

অনিবার্য পতনের পূর্বাভাস

আপনাদের কি এই অনুভূতি নেই যে, আফগান যুদ্ধ আমাদের ইতিহাসে সর্বকালের সবচেয়ে দীর্ঘ যুদ্ধ? আমাদের সেনাদের ঘরে ফিরিয়ে আনুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুনর্নির্মাণ করুন এবং আমেরিকাকে পুনরায় দুর্দান্ত করে তুলুন (মেইক আমেরিকা গ্রেইট অ্যাগেইন)।

— ডোনাল্ড ট্রাম্প, ১৪ জানুয়ারি ২০১৩

ইরাকে আমরা ২ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছি। আফগানিস্তানে এই ব্যয় সম্ভবত ১ ট্রিলিয়ন ডলার। আমরাই আমাদের দেশকে ধ্বংস করছি। আমাদের ঋণের পরিমাণ এখন ১৯ ট্রিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা এখন নানাবিধ অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। রাশিয়া আফগানিস্তানে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল, মানে, আমি বলতে চাইছি সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই আফগানিস্তানই সোভিয়েত ইউনিয়নকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিল।

— ডোনাল্ড ট্রাম্প, ৪ অক্টোবর ২০১৫

আমি মনে করি, আফগানিস্তানে আমাদের আরও কিছু সময় থাকতে হবে।

— ডোনাল্ড ট্রাম্প, ৪ মার্চ ২০১৬

মার্কিন মদদপুষ্ট আফগান পুলিশবাহিনী

২০১৩ সালে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ভাইস This is How Winning Looks Like শীর্ষক ডকুমেন্টারি নির্মাণ করে। ডকুমেন্টারিতে আফগান কৃষকদের মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ভিডিও উঠে আসে। সেনা প্রত্যাহার করার পর তালেবানকে মোকাবিলার জন্যই মূলত এই পদক্ষেপ! স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে তালেবান প্রতিরোধ সম্ভব নয় বলেই কৃষকদের প্রশিক্ষণের এই কসরত করা হচ্ছিল। ডকুমেন্টারিতে আরও উঠে আসে, প্রায় সব অঞ্চলে এবং বিশেষত পশতুন এলাকাগুলোতে সব ধরনের কুকর্মে পটু অপরাধীদের নিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাশনাল পুলিশ ফোর্স গঠন করেছে।[১] যেমন, পশতুন ও বৃহত্তর আফগান সংস্কৃতিতে বাচ্চাদের যৌন নিপীড়নের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। গোত্রপ্রধান, পুলিশ, সেনা সদস্যদের মতো অল্প-বিস্তর ক্ষমতাসীনদের মধ্যে এই বদঅভ্যাস প্রকট।[২] এই প্রামাণ্যচিত্রে মার্কিনদের ভয়ানক ভূমিকা উঠে আসে। জনগণের সেবার্থে তারা এই ধরনের সবচেয়ে দাগি অপরাধীদের পুলিশ চিফ হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছিল। মার্কিন মদদপুষ্ট এই পুলিশ বাহিনীর গুন্ডারা পুলিশি ক্ষমতা পেয়ে অতীত অপরাধের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। তারা যত বেশি অপরাধ করছে, পশ্চিমাদের ওপর চাপও ততই বেড়ে চলেছে।

একটি ঘটনায়, শিশু ধর্ষণের একটি ঘটনায় আফগান ন্যাশনাল আর্মির কিছু সদস্যের ব্যাপারে কানাডিয়ান সৈন্যদের রিপোর্টকে ন্যাটো গোপন করেছিল। তাই, এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য তাদেরও সর্বাত্মক দায় রয়েছে।[৩] আরেকটি ঘটনায়, একটি বালককে ধর্ষণের জন্য একজন আফগান মিলিশিয়া কমান্ডারকে মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের একজন সার্জেন্ট ঘুসি মেরেছিল। কিন্তু এ জন্য তাকে এবং তার কমান্ডারকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। মার্কিন জনগণ বিরোধিতা না করলে এবং কংগ্রেস হস্তক্ষেপ না করলে তাকে হয়তো শেষপর্যন্ত সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হতো।[৪] তবে এখনো তার ক্যাপ্টেনকে কমান্ডারের

দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। এই সমস্যাটি আজও আফগান ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্সের মধ্যে সর্বজনীন রোগ হিসেবে বিদ্যমান। মার্কিন ও ন্যাটো রাজনীতিবিদ এবং জেনারেলরা এই অপকর্মে তাদের সহযোগী হিসেবে সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে। তারা এমন একটি আফগান গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন করছে, যারা পরবর্তীতে কোনোভাবেই এই ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে কিশোরী মেয়ে এবং বালকদের অপহরণ ও ধর্ষণকারীদের আটক করে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমেই তালেবান ক্ষমতায় এসেছিল। আফগানিস্তান শাসনের সময়েও তারা এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিল।[৫] আফগানিস্তানে এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটিকে স্বাগত জানানোর কারণ তাই সহজেই অনুমেয়। তালেবান এসব অনাচার বন্ধ করতে সক্ষম ছিল। একই কারণে বর্তমানে দেশটির অনেক অঞ্চলেও তালেবানের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানানো হচ্ছে।

কিন্তু আমেরিকা নিয়মিতভাবে এই শিশু ধর্ষকদের এত ব্যাপকভাবে ক্ষমতায়ন করে যে তালেবানও শেষপর্যন্ত বালকদের 'হানি ট্র্যাপ' হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা বালকদের দিয়ে আফগান পুলিশদের জন্য টোপ ফেলত। এরপর ফাঁদে পা দেওয়ামাত্রই অ্যাম্বুশের মাধ্যমে তাদেরকে হত্যা করা হতো। এমনই একটি ঘটনায় তিনজন মার্কিন সদস্য আফগান ন্যাশনাল পুলিশের একজন কর্মকর্তার বালক যৌনদাসের হাতে নিহত হয়। অবশ্য বালকটি তালেবান বা অন্য কোনো গোষ্ঠীর হয়ে এটা করেছিল কি না, সেটা শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এমনও হতে পারে যে সেই বালকটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মুক্তিলাভের জন্যই এমনটা করেছিল।[৬]

'বাচা বাযি' বা নর্তকী বালক আফগান পুলিশপ্রধানদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। একজন সাবেক কর্মকর্তা ২০১৬ সালের জুন মাসে ফরাসি মিডিয়ায় জানান, মার্কিন সমর্থিত প্রভাবশালীদের মাদক কিংবা বিষপ্রয়োগ এবং গুলি করে মেরে ফেলার জন্য এই বালকদের কাজে লাগানো হচ্ছে।[৭] এসব পুলিশ সদস্য ধর্ষণের জন্য বালকদের সার্বক্ষণিক সরবরাহ না পেলে মার্কিনদের সহযোগিতা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ফলস্বরূপ আফগানিস্তানের সামগ্রিক সামরিক কৌশল একপ্রকার হুমকির সম্মুখীন! এ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কাবুল সরকারের বিরুদ্ধে তালেবানের প্রাণঘাতী 'ইনসাইডার অ্যাটাক' বা অভ্যন্তরীণ হামলা উল্লেখ না করলেই নয়। মার্কিন এবং আফগান সেনাদের টার্গেট করে এই ধরনের অভিযানগুলো পরিচালিত হচ্ছে।[৮]

এই কৌশলকে সমরবিদ উইলিয়াম এস লিন্ড 'অপারেশনাল আর্ট' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মার্কিন সেনাবাহিনী আফগান সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার পর তালেবান একেবারে তাদের পেটের মধ্যেই ঢুকে পড়ে। আফগান সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণের জন্য তালেবান সদস্যরা অনুপ্রবেশ করে। এরপর তারা সুযোগ বুঝে ঘাঁটির অভ্যন্তরে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষক কিংবা শত্রুপক্ষীয় সরকারি সেনাদের হত্যা করতে শুরু করে। ফলস্বরূপ দ্রুতই মার্কিন প্রশিক্ষকদের সঙ্গে আফগান শিক্ষার্থীদের মাঝে দূরত্ব তৈরি হয়। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলাহীনতা দেখা দেয়। অভ্যন্তরীণ হামলাগুলো মার্কিনদের প্রশিক্ষণ পদক্ষেপকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতাও হুমকির মুখে পতিত হয়।[৯]

আরেকটি তিক্ত সত্য হলো, মার্কিনদের প্রশিক্ষিত আফগান ন্যাশনাল পুলিশ অপরাধী অপেক্ষা নারী এবং বালিকাদের তাড়া করতেই বেশি সময় ব্যয় করে। আফগানিস্তানের উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্রই ধর্ষণ সংস্কৃতি বিদ্যমান। আমেরিকা এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে অক্ষম। কিন্তু কমপক্ষে এসবের অংশীদার হওয়া থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে নিতে পারে। নারীদের দমিত রাখার দীর্ঘ ইতিহাসের পরও তালেবান পুনরায় ক্ষমতা লাভে সমর্থ হলে কমপক্ষে তারা এই ইস্যুতে বর্তমান পরিস্থিতিকে পুরোপুরি বদলে দেবে।[১০]

তথ্যসূত্র

১. Ben Anderson, "This Is What Winning Looks Like: My Afghanistan War Diary," Vice, December 23, 2013.

২. Joel Brinkley, "Afghanistan's Dirty Little Secret," San Francisco Chronicle, August 29, 2010.

৩. Ann Jones, "Meet the Afghan Army," in The Case for Withdrawal from Afghanistan, ed. Nick Turse, 75.

৪. Christine Houser, "Green Beret Who Beat Up Afghan Officer for Raping Boy Can Stay in Army," New York Times, April 29, 2016.

৫. Margolis, American Raj, 197; Ahmed, Taliban, 25; Van Linschoten and Kuehn, An Enemy We Created, 114-115.

৬. Kevin Sieff, "Deadly Insider Attack That Left 3 US Marines Dead Was Work of an Afghan Teenager," Washington Post, August 17, 2012.

৭. Agence France-Presse, "Taliban Use 'Honey Trap' Boys to Kill Afghan Police," Inquirer (Philippines), June 16, 2016.

৮. Lamothe, "Navy Analysis Found That Marine's Case Would Draw Attention to Afghan 'Sex Slaves.'"

৯. Shawn Snow and Andrew deGrandpre, "Another Insider Attack in Afghanistan Leaves 7 Americans Wounded," Military Times, June 17, 2017; IANS, "Six Afghanistan Policemen Killed, Nine Injured in 'Insider Attack,'" First Post, June 4, 2017.

১০. Rashid, Taliban, 95-116.

শান্তি প্রতিষ্ঠায় তালেবানের শর্ত

তালেবান কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আগে বেড়ে লড়াইয়ের বিষয়ে মীমাংসার চেষ্টা করেনি। ২০১০ সালে জেরেমি স্কাইলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে একজন তালেবান কামান্ডার জানান,'বহিরাগত সৈন্য প্রত্যাহার করলে আমরা আর লড়াই করব না। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত বহিরাগত সৈন্যরা আমাদের ভূখণ্ডে অবস্থান করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কারজাইয়ের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনায় বসব না।' স্কাইল জানান, 'তালেবান নেতারাও তাদের অনেক কমান্ডারের নিহত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তবে তারা এটাও বলেছেন, এসব টার্গেটেড কিলিং মোল্লা ওমরের অনুসারী গতানুগতিক তালেবান নেতাদের চেয়ে আরও কট্টরপন্থি নেতা তৈরি করছে। এই কট্টরপন্থি নেতারা আপস-মীমাংসায় মোটেও ইচ্ছুক নয়।' সাবেক তালেবান সরকারের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য আবদুস সালাম জায়েফ বলেছিলেন, 'মোল্লা ওমরকে গ্রেপ্তার কিংবা হত্যা করা হলেও এই লড়াই চলমান থাকবে।... যদি বর্তমান তালেবান নেতৃবৃন্দকে আটক করা হয়, তবে এটা সব পক্ষের জন্যই খারাপ হবে।'[১]

২০১০ সালের শুরুর দিকে পাকিস্তান সরকার কোয়েটা প্রদেশে কয়েকজন উচ্চপদস্থ আফগান তালেবান নেতাকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিকভাবে এটিকে তালেবানের ওপর একটি কঠিন আঘাত মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে মার্কিনদের সহায়তার জন্য পাকিস্তান এই উদ্যোগ নেয়নি। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কাবুলের সঙ্গে চুক্তিতে তালেবান যাতে কোনোভাবেই বাদ না যায়, সে জন্য পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এমনটা করেছিল বলে সন্দেহ করা হয়।[২] ফলস্বরূপ ২০১১ সালে কাতারে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈঠকগুলো কোনো সফলতার মুখ দেখেনি। মার্কিন এবং ব্রিটিশদের ধারণা ছিল, তালেবানকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের পাশাপাশি প্রধান পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানিদের ছাঁটাই করতে পারলে এই দুই পক্ষের মধ্যবর্তী আস্থা বিনষ্ট করা যাবে। সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরও লাভজনক চুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হবে। কিন্তু মার্কিনরা একই

সঙ্গে তালেবানকে তুরস্ক কিংবা কাতারে একটি স্থায়ী অফিস স্থাপনের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অথচ সেখান থেকে তালেবান আলোচকেরা পাকিস্তানি প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারত। যাহোক, তালেবান এবং তাদের সঙ্গে পাকিস্তানও নিজের অবস্থানে অটল থাকে। কারণ 'সময়' সব সময় তাদের পক্ষেই থাকে। তালেবানও তাদের শর্তে অটল থাকে। তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্ররা সব সেনা প্রত্যাহারে রাজি না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে না।'[৩]

অন্যদিকে প্রতিরক্ষা উপসচিব মিশেল ফ্লোরনয় ১৫ মার্চ, ২০১১ সালে কংগ্রেসে ঘোষণা করেন, যা-ই ঘটুক না কেন, 'যৌথ ঘাঁটি' থেকে জঙ্গিবাদবিরোধী অভিযানের জন্য মার্কিন সেনারা ২০১৪ সালের পরও আফগানিস্তানে অবস্থান করবে। এই ঘোষণা স্পষ্টতই মীমাংসার সব সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়।

২০১৩, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র এবং তালেবানের মধ্যে আলোচনার সূচনা হলেও সবই ব্যর্থ হয়। ২০১৩ সালে চুক্তি নিয়ে কাবুল সরকারের ক্ষুদ্র আপত্তির কারণে মীমাংসা প্রচেষ্টার ইতি ঘটেছিল। পরবর্তী প্রচেষ্টা দুটি তালেবানের একগুঁয়েমির জন্য ভেস্তে যায়। তাদের শর্ত ছিল, 'সকল বিদেশি সেনা আফগানিস্তানের মাটি ত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা কাবুল সরকারের সঙ্গে কোনো রকম আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করবে না।' তালেবানরা দীর্ঘ বাজি খেলায় বরাবরের মতো এভাবেই জয়লাভ করে।

তথ্যসূত্র

১. Gareth Porter, "Long-Term Afghan Presence Likely to Derail Peace Talks," Antiwar, March 29, 2011; Scahill, "America's Failed War of Attrition in Afghanistan."

২. Anand Gopal, "Half of Afghanistan Taliban leadership arrested in Pakistan," Christian Science Monitor, February 24, 2010; Joshua Partlow and Karen DeYoung, "Afghan Officials Say Pakistan's Arrest of Taliban Leader Threatens Peace Talks," Washington Post, April 10, 2010.

৩. Jonathon Burch, "Taliban Says No Peace Talks with Leader Mullah Omar," Reuters, March 16, 2009; Gareth Porter, "US Uses Peace Talks to Divide Taliban from Pakistan," Inter Press Service, May 31, 2011.

তালেবানের পুনরুত্থানে মার্কিন ভূমিকা

মার্কিন আমলাদের মতে, তালেবানের সঙ্গে আপস-মীমাংসা কোনোকালেই সম্ভব হবে না। নতুন শতাব্দীতে এসে তারা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। তাই একমাত্র সমাধান হলো সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা এবং চিরকালের জন্য সেটা বলবৎ রাখা।[১] অথবা সবকিছুর একমাত্র বিকল্প হলো, 'পুরো বিষয়টি চিরতরে ভুলে যাওয়া।' মার্কিনরা তাদের সেনা, বৈমানিক এবং গোয়েন্দাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিলে তালেবান সন্দেহাতীতভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তান সীমান্তসংলগ্ন অঞ্চল এবং দেশের দক্ষিণ ও পূর্বের পশতুন অঞ্চলগুলোতে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবে। এমনকি একই সঙ্গে রাজধানী কাবুলের পতনও অসম্ভব কিছু নয়।

তালেবানের ছায়া সরকার ইসলামিক এমিরেটস অব আফগানিস্তান[২] ইতোমধ্যেই অধিকাংশ পশতুন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে।[৩] জাতীয় ঐক্য সরকার সংসদে সারা দিন বৈঠক করলেও মার্কিনরা তাদের তহবিল বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই সরকার চোখের পলকে উধাও হয়ে যাবে। কিংবা আফগান গৃহযুদ্ধের পরবর্তী ভবিষ্যৎ হয়তো আরেকটি রক্তাক্ত অধ্যায়। যাহোক না কেন, সবকিছুর জন্য দায়ী থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ক্ষমতার অসম বণ্টন। এ জন্য আমাদের সামনে কেবল একটি বিকল্পই রয়েছে। তা হলো, মার্কিন সরকারকে এখনই নিবৃত্ত হতে হবে। নয়তো বছরকে বছর পরেও আমাদের সব প্রচেষ্টার ফলাফল একই থাকবে।

আফগানিস্তানের জাতীয় সরকার পশতুন জনসংখ্যার ওপর যৎসামান্য প্রভাব বিস্তার করতে চাইলেও পশতুনরা সেটাকে ছুড়ে ফেলবে। তারা হয়তো আরেকটি কোনো রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৯০-এর দশকে ফিরে যাবে। তখন সুদূর উত্তরাঞ্চল ব্যতীত সর্বত্রই তালেবানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর হয়তো তালেবান ভাগ্য পরীক্ষা থেকে বিরত থেকে অপশতুন অঞ্চলে

আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত থাকবে। এই অঞ্চলে তাদের পূর্ববর্তী শাসনের বৈরী অভিজ্ঞতা থেকে এমনটা করাই বেশি যৌক্তিক। ইতোমধ্যে জোট সরকারও পশতুন অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা থেকে একই শিক্ষা পেয়েছে।

তবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তালেবান কাবুলকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে ভারতকেও জড়িত করতে চাওয়ায় এই সম্ভাবনা আরও প্রকট হয়েছে। এমন কিছু ঘটলে সন্দেহাতীতভাবে পাকিস্তানও হস্তক্ষেপ করবে।[৪]

এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান হয়তো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বাস্তবে আফগানিস্তান শুরু থেকেও একীভূত কোনো রাষ্ট্র ছিল না। ৪০ বছর যুদ্ধের পরও এই বিভক্তি আগের মতোই রয়ে গেছে। আফগানিস্তানকে একীভূত রাখার মতো কোনো বাস্তবিক উপাদানও নেই।

পারস্পরিক আস্থার জন্য প্রথমত টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। একইভাবে এর বিপরীতটিও সত্য। এ জন্য বর্তমান প্রেসিডেন্ট ঘানির সরকার টিকে থাকার জন্য পশ্চিমা সেনা এবং বিমানবাহিনীর কোনো বিকল্প নেই।[৫] তাই অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের আশায় যেকোনো হামলার পরপরই প্রেসিডেন্ট ঘানি তালেবান এবং আইএস নিয়ে হইচই শুরু করেন।

২০১৪ সালে তালেবানের একটি ক্ষুদ্র অংশ নিজেদের আইএসের অনুসারী ঘোষণা করে। তারা নিজেদের 'ইসলামিক স্টেট খোরাসান প্রদেশ'[৬] নামকরণ করে আবু বকর আল-বাগদাদির প্রতি আনুগত্য ব্যক্ত করেছিল।[৭] আইএসের এই নতুন শাখাটি পাকিস্তানি তালেবান এবং স্থানীয় পশতুন সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল।[৮] জানা যায়, তারা কিছু সময়ের জন্য আফগান সরকারের সহায়তাও পায়। আফগান সরকার আশা করেছিল, তাদেরকে তালেবানের বিরুদ্ধে এবং তালেবানকে সহায়তার জন্য পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। ডাচ প্রতিবেদক বেটে ড্যাম দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা পুরোটি সময় সংঘাতের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রত্যক্ষ করেছি।'

অতঃপর, এই নতুন হুমকি প্রত্যক্ষ করে মার্কিন সেনাবাহিনী এবং বিমানবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করে। ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইএস নামধারী এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলীয় নাঙ্গাহার প্রদেশে বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা কেবল সেখানকার জনগণের মাঝে অশান্তি, হতাশা এবং ভবিষ্যতের জন্য নতুন শত্রু

তৈরি করছে। ড্যাম ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'এসবের মাধ্যমে দখলদারবিরোধী সহিংসতা ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পাবে।'[৯]

এরই মাঝে তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হয়। তিনি আরও দুই বছর আগে ২০১৩ সালেই মারা গিয়েছিলেন।[১০] নিম্নপদস্থ তালেবান যোদ্ধারা জানত যে, তিনি বেঁচে আছেন এবং তাদের আমির হিসেবেই বহাল রয়েছেন। মজার বিষয় হলো, মোল্লা ওমর পাকিস্তানে আত্মগোপন করে ছিলেন ধারণা করা হলেও তিনি আফগানিস্তানেই অবস্থান করছিলেন। এরপর, তালেবানপ্রধান হিসেবে মোল্লা ওমরের উত্তরসূরি, পূর্বে আলোচিত মোল্লা আখতার মানসুরকে ২০১৬ সালে পাকিস্তানে ড্রোন হামলায় হত্যা করা হয়। এই হামলাটি দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল।

এই ঘটনা আবারও এই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ড্রোন হামলার মাধ্যমে পাকিস্তানি তালেবান সদস্যদের অনুসন্ধান ও হত্যায় পাকিস্তানকে সহায়তা করতে কেন এত সময় এবং প্রচেষ্টা ব্যয় করছিল?' বলে রাখা ভালো, পাকিস্তানি তালেবান হলো পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কেন্দ্রশাসিত উপজাতীয় অঞ্চল, উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান এবং সোয়াত উপত্যকার একটি পৃথক গোষ্ঠী। আফগানি তালেবানরা সেখান থেকে কয়েক শ মাইল দূরে আত্মগোপন থাকে। এই অঞ্চলগুলো আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার এবং হেলমান্দ প্রদেশ সংলগ্ন। হেলমান্দ প্রদেশ অনেক আগে থেকেই পুরোপুরি তালেবান নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে।[১১]

যাহোক, মোল্লা আখতার মানসুরকে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল তালেবানকে নেতৃত্বশূন্য করে সংগঠনটিতে ভাঙন তৈরি করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। দেখা গেল, মোল্লা আখতার মানসুরের উত্তরসূরি মোল্লা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা তালেবান প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা ওমরের একজন উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি তালেবানের মাঠপর্যায়ে মোল্লা আখতার মানসুরের চেয়ে অধিক গৃহীত ছিলেন। দ্রুতই তিনি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ দৃশ্যত তালেবানকে আরও সংহত করতে সহায়তা করেছিল। পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষক মাইকা জেনকো লিখেছেন, 'মোল্লা মানসুরকে হত্যার এক বছর পরেও তাকে হত্যার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হয়নি।'[১২] প্রতিরক্ষা দপ্তরের দ্বিবার্ষিক 'আফগানিস্তান অগ্রগতি প্রতিবেদন' ২০১৬ সালের জুন এবং ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে দেখা যায়, মোল্লা মানসুরের মৃত্যুর পূর্বের ছয় মাসে সর্বমোট ৪ হাজার ৪৮০টি হামলা হয়েছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পরবর্তী ছয় মাসে (১ জুন থেকে ২০ নভেম্বর, ২০১৬) সর্বমোট

৫ হাজার ২৭১টি হামলার ঘটনা ঘটে। এই অতিরিক্ত ৭৯১টি হামলা মোল্লা মানসুরকে হত্যার পাল্টা জবাব হিসেবেই হয়েছে বলে ধরা হয়। অন্যদিকে, ইন্সপেক্টর জেনারেলের পররাষ্ট্র বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী আলোচনার জন্য তাদের একমাত্র শর্তই হলো, আফগানিস্তান থেকে সব বিদেশি সেনা প্রত্যাহার। এটা না হওয়া অবধি তারা কোনো ধরনের আলোচনায় বসবে না। তাই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সহিংসতা বেড়েই চলেছে।

২০১৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলেও তালেবান নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করে। তারা দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে উত্তর আফগানিস্তানে কুন্দুজের প্রাদেশিক রাজধানী দখল করে রেখেছিল। এরপর আফগানিস্তান ন্যাশনাল আর্মি এবং আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সের যৌথ অভিযানের মাধ্যমে ওই এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হয়। চিরাচরিত পশতুন এলাকা থেকে বহুদূরে এবং সংখ্যায় কম হলেও কুন্দুজে পশতুনদের শক্তিশালী জনসংখ্যা বিদ্যমান।[১৩] কুন্দুজ পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে মার্কিন স্পেশাল অপারেশন ফোর্স AC-130 যুদ্ধযান দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দেয়। এই ঘটনায় প্রায় ৪২ জন বেসামরিক আফগান মারা যায় এবং ৩০ জনের বেশি আহত হয়। ডাক্তারদের পাশাপাশি রোগীরা হাসপাতালের বিছানাতেই বোমার আগুনে পুড়ে মারা যায়।[১৪]

ভবনটির নকশা দেখে যে কেউই বুঝতে পারত যে সেটি ছিল একটি হাসপাতাল। কিন্তু মার্কিন কর্মকর্তারা প্রথমত এটা অস্বীকার করে বসে। এরপর তারা দাবি করেছিল যে, মার্কিন সেনাদের কাছে হাসপাতালের আশপাশের অবস্থানগুলোতে তালেবানের উপস্থিতির তথ্য ছিল। আরও দাবি অনুসারে, একজন পাকিস্তানি গুপ্তচর হাসপাতালের অভ্যন্তরে অবস্থান নিয়ে তালেবানদের সহায়তা করছিল। কিন্তু যখন বোঝা গেল যে এসব অজুহাত দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী হাসপাতালে ঠান্ডা মাথায় বেআইনি হামলার অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়, তখন তারা দ্রুতই আগের দাবিগুলো থেকে সরে আসে। এরপর তারা স্থানীয় আফগান ন্যাশনাল আর্মি ইউনিটের ভুল তথ্য প্রদান এবং বৈমানিকদের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে দায়ী করে।[১৫]

এত কিছুর পরও এক বছর পরই তালেবান পুনরায় কুন্দুজে অভিযান শুরু করে। তারা শহরটিকে প্রায় কবজা করে নিয়েছিল। ঘটনার অনেক পর মার্কিন স্পেশাল ফোর্স পুনরায় তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে।[১৬] বর্তমানে তালেবানরা সরাসরি শহরটি নিয়ন্ত্রণ না করলেও কুন্দুজের আফগান ন্যাশনাল আর্মি নিয়মিত তালেবান হামলার শিকার হয়।

জার্মান দৈনিক ডের স্পিগেল জানায়, ‘গত বছরের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে ইসলামপন্থিরা ১৫ দিনের জন্য কুন্দুজ দখলে রেখেছিল। সেখানে এক দশক ধরে গড়ে তোলা জার্মানদের প্রায় সব অবকাঠামো তালেবান চাইলেই লুণ্ঠন ও পুড়িয়ে ফেলতে পারত।’ তারা আরও উল্লেখ করে, ভাইস প্রেসিডেন্ট দোস্তমের ভাড়াটে গুন্ডাদের সহিংসতা জনসাধারণকে সুরক্ষার তাগিদে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে তালেবানে যোগদানে প্ররোচিত করছে। জেনারেল দোস্তম ২০১৩ সালের মে মাসে আফগানিস্তান ছেড়ে তুরস্কে চলে গিয়েছিল। এর আগের বছরের ডিসেম্বর মাসে তার দেহরক্ষীরা উত্তর জোউজান প্রদেশের সাবেক গভর্নরকে অপহরণ করেছিল। দোস্তম নিজে AK-47-এর ব্যারেল দিয়ে তাকে প্রহার করেছিল। আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি তখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দোস্তমকে বিচারের মুখোমুখি করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু, ঘানিই গোপনে দোস্তমকে সাময়িকভাবে দেশত্যাগ করতে বলেন। পদত্যাগ না করায় দোস্তম ঘানির ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকেন।[১৭]

২০১৭ সালের মে মাসে তালেবানরা পুনরায় কুন্দুজকে ঘিরে নেয়। শেষ মুহূর্তে আফগান ন্যাশনাল আর্মির বিশেষ বাহিনী মোতায়েন করে শহরটি পতনের হাত থেকে রক্ষা করা হয়। এর মাসখানেক আগেই আফগান ন্যাশনাল আর্মির ইউনিফর্মে তালেবানের আত্মঘাতী হামলাকারী এবং বন্দুকধারীরা ২০১৭ সালে যুদ্ধের চিত্রকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এ রকম একটি ঘটনায় তারা আফগানিস্তানের উত্তরে বালখ প্রদেশের মাজার-ই-শরিফ শহরের কাছে একটি ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ করে ১৩৫ জনের বেশি সৈন্যকে হত্যা করেছিল।[১৮]

অপরদিকে ২০১৬ সালের আগস্ট মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে প্রণোদনাস্বরূপ ৩০০ মিলিয়ন ডলার সামরিক সহায়তা আটকে দেয়। আফগানিস্তানে রসদ সরবরাহের জন্য পাকিস্তানের বন্দর, রাস্তা এবং অন্যান্য অবকাঠামো ব্যবহার বাবদ এই সহায়তা দেওয়া হতো। সহায়তা স্থগিত করার কারণ হিসেবে বলা হয়, আফগান তালেবান ও হক্কানি নেটওয়ার্ককে পাকিস্তান দীর্ঘকাল যাবৎ সমর্থন দিয়ে আসছে! একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগান ন্যাশনাল আর্মির জন্য ভারত থেকে আরও MI-25 অ্যাটাক হেলিকপ্টার ক্রয়ের সুপারিশ করে।[১৯] তারা মূলত রাশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা কার্যকরে সহায়তা করতে ভারতকে সরাসরি যুক্ত করতে চাইছিল।

আফগান ন্যাশনাল আর্মিকে আফগান তালেবান এবং হক্কানি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র সরবরাহে ভারতের এই অব্যাহত ইচ্ছা আফগানিস্তানে

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রক্সি ওয়ার তথা ছায়াযুদ্ধের সম্ভাবনা আরও প্রকট হয়। রিপোর্টার চার্লস টিফারের মতে, এই ছায়াযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় পক্ষ অবলম্বন করছে। এটা নিশ্চিত যে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের এসব উদ্যোগের জবাবে পাকিস্তান ভবিষ্যতে তালেবানের আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পথেই হাঁটবে।[২০]

তথ্যসূত্র

১. Bill Roggio, "US Officials Give Up on Prospects for Peace Deal with Taliban," Long War Journal, October 2, 2012; Thomas Joscelyn and Bill Roggio, "Are We Losing Afghanistan Again?" Long War Journal, October 21, 2015.

২. C. J. Chivers, "In Eastern Afghanistan, at War with the Taliban's Shadowy Rule," New York Times, February 6, 2011.

৩. Van Linschoten and Kuehn, An Enemy We Created, 272.

৪. Anand Gopal, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, January 14, 2011.

৫. Matthew Rosenberg and Michael D. Shear, "In Reversal, Obama Says US Soldiers Will Stay in Afghanistan to 2017," New York Times, October 15, 2015.

৬. Khorasan is a province in northeastern Iran, but the term is sometimes used to denote a much larger territory, including parts of Central Asia and northern Afghanistan.

৭. Priyanka Boghani, "ISIS is in Afghanistan, but Who Are They Really?," Frontline, PBS, November 17, 2015; Euan McKirdy and Ehsan Popalzai, "ISIS Kidnaps, Kills 30 in Afghanistan," CNN, October 26, 2016.

৮. Tim Craig and Haq Nawaz Khan, "Pakistani Taliban Leaders Pledge Allegiance to Islamic State," Washington Post, October 14, 2014; "Top ISIS Commander Killed in US Airstrike in Afghanistan," BNO News, August 12, 2016.

৯. Dam, Scott Horton Show; August 24, 2016; Mujib Mashal, "Afghan Police Chief Is Killed as He Tries to Turn Tide Against Taliban," New York Times, September 11, 2016.

১০. Dam, Scott Horton Show; August 24, 2016; Bette Dam, email message to the author, August 29, 2016.

১১. Kathy Gannon and Amir Shah, “Taliban Take Key Afghan District in Helmand Province,” Military, March 23, 2017.

১২. Lead Inspector General for Overseas Contingency Operations, “Operation Freedom’s Sentinel,” Report to the US Congress, October 1, 2016 - December 31, 2016.

১৩. Christian Bleuer, “State-building, Migration and Economic Development on the Frontiers of Northern Afghanistan and Southern Tajikistan,” Science Direct, October 8, 2011.

১৪. Hannah Parry, “Doctor from MSF Hospital Bombed by US Forces Says Staff Died ‘Screaming Out for Help That Never Came,’” Daily Mail, April 7, 2016.

১৫. Glenn Greenwald, “The Radically Changing Story of the US Airstrike on Afghan Hospital: From Mistake to Justification,” Intercept, October 5, 2015.

১৬. Najim Rahim and Fahim Abed, “Afghan Troops Hold Off the Taliban in Kunduz,” New York Times, August 20, 2016.

১৭. Susanne Koelbl, “The Taliban Erases Western Gains in Afghanistan,” Der Spiegal, October 12, 2016.

১৮. Aref Musawi, “Survivors Say Insurgents Had Help from Inside Base,” Tolo News, April 22, 2017.

১৯. Idrees Ali, “Pentagon Not to Pay Pakistan $300 Million in Military Reimbursements,” Reuters, August 4, 2016.

২০. “Pakistan ‘Harboring Terrorists’ in Afghanistan to Counter Indian Influence, Says Top US Official,” India Times, May 24, 2017; “Pentagon Praises India in Afghanistan,” American Interest, June 22, 2017.

গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার: ট্রয়ের ঘোড়া

২০১৬ সালের শরতে 'কাবুলের কসাই' নামে পরিচিত সোভিয়েত যুদ্ধে সিআইএ সমর্থিত পশতুন সেনাপতি, আফগানিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিদ্রোহী নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার কাবুল সরকারের সঙ্গে বিদেশি সেনাদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের শর্ত ছাড়াই একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। 'মার্কিন দখলদারি এখন শেষ পর্যায়ে'— এমন বাজি ধরেই হেকমতিয়ার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হেকমতিয়ারের ভাবনা ছিল, তালেবান কাবুল দখলের আগেই নিজেদের অবস্থানকে সেখানে সুদৃঢ় করতে হবে। নিউইয়র্ক টাইমস-এর মতে, 'হেকমতিয়ার একটি ভালো বাজি ধরেছেন।' চুক্তি অনুসারে, হেকমতিয়ার এবং তার পুরো গোষ্ঠীকে নিরাপত্তা, অর্থকড়ি, ঘরবাড়ি, অফিস দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তার দলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তালিকা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তার অনুগত বন্দি সেনাদের আফগান কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। হেকমতিয়ার প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি সরকারের একজন উচ্চপদস্থ উপদেষ্টার পদ লাভ করেন।

হেকমতিয়ারের সঙ্গে চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল একটি অপেক্ষাকৃত ছোট বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে আসার পাশাপাশি তালেবানের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনের জন্য একটি নজির স্থাপন করা। হেকমতিয়ার এবং তার ২০ হাজার অনুসারীর হঠাৎ করে কাবুলে প্রত্যাবর্তনের অর্থ ছিল: হয় তাকে রাজধানীর নতুন বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে হবে, নয়তো রাজধানীর নতুন বাস্তবতাকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, হিজব-ই-ইসলামিকে হয়তো সমাজে নারীদের ভূমিকাকে মেনে নেওয়া শিখতে হবে, নয়তো নারীদের পুনরায় অ্যাসিড হামলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।[১] আবার এই সমগ্র বিষয়টি ট্রয়ের ঘোড়াও হতে পারে (Trozan Horse)। ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে শহর দখলের পরিকল্পনা থেকেও হেকমতিয়ার

তার লোকজনের রাজধানীতে স্থানান্তর করতে পারে।[২] কাবুলে প্রত্যাবর্তনের পরদিনই হেকমতিয়ার হাজার হাজার সমর্থকের একটি সমাবেশে বক্তব্য দেন। এই বক্তব্যে তিনি জাতীয় ঐক্য সরকার এবং প্রেসিডেন্ট ঘানি ও ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহর তীব্র সমালোচনা করেন।[৩]

কাবুলের রাজনীতিবিদেরা তখন থেকেই হেকমতিয়ারের আগমন নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করতে শুরু করে। তারা বলে, হেকমতিয়ার তার অনুগত সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে অস্বীকার করছে। এমনকি, ইতোমধ্যেই সে শিয়া হাজারাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার শুরু করেছে এবং অভিযোগ করেছে যে শিয়া হাজারাদের অসংখ্য অন্যায্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। হেকমতিয়ারের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়াশিংটন পোস্টকে জানায়, 'আমরা শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। কিন্তু হেকমতিয়ারের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, সরকারের কাছে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে সরকারই যেন তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।'[৪]

তার প্রত্যাবর্তনের স্বল্প সময় পরই একটি আফগান প্রতিনিধিদল জাতিসংঘকে এই নিরাপত্তা চুক্তিকে বাতিল এবং হেকমতিয়ারকে যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি করার আবেদন জানায়। কোনো সন্দেহ নেই যে, হেকমতিয়ারের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন ন্যায়বিচার লাভের অধিকার রাখে। ১৯৯০-এর দশকে তার বাহিনীর হাতে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ নিহত হয়।[৫] যাহোক, আফগানিস্তানের যেসব সমস্যার সমাধান অসম্ভব, এটাও তার একটি। কিন্তু এই চুক্তিকে বাতিল করে হেকমতিয়ারকে কারাগারে বন্দি করা হলে পরবর্তী সময়ে অন্য কোনো সশস্ত্র দলকে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় নিয়ে আসা পুরোপুরি অসম্ভব হয়ে যাবে। আবার, তাকে এখনই জবাবদিহি দিতে বাধ্য করাতে না পারলে অন্য রকম আরেকটি বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে।

যাহোক, হেকমতিয়ার এবং তার হিজব-ই-ইসলামি গোষ্ঠীর অংশবিশেষ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার পরও আফগান সরকারের শত্রুরা ক্রমশ বৃদ্ধিই পাচ্ছে। পশতুন উপজাতি যোদ্ধাদের বিভিন্ন দল, তালেবান, হক্কানি নেটওয়ার্ক, ইসলামিক মুভমেন্ট অব উজবেকিস্তান এবং আইএসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী যোদ্ধারা এখনো আগের মতোই সক্রিয়। এমনকি, তালেবান ও ইসলামিক স্টেট ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব-আফগানিস্তানে আফগান ন্যাশনাল আর্মি ও এর মিত্র মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি সাময়িক জোটের ঘোষণা দিয়েছিল।[৬] তবে দ্রুতই তাদের মাঝে অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টি হয় এবং জোটও ভেঙে যায়।[৭]

তথ্যসূত্র

১. Fariba Nawa, “Kabul’s Women Seek Refuge Indoors After a Series of Acid Attacks,” New York Times, August 10, 2016.

২. Mujib Mashal and Jawad Sukhanyarmay, “Gulbuddin Hekmatyar, Exiled Afghan Insurgent, Nears a Comeback,” New York Times, May 11, 2016.

৩. Hamid Shalizi, “Afghan Former Warlord Hekmatyar Rallies Supporters in Kabul,” Yahoo! News, May 5, 2017.

৪. Pamela Constable, “Return of Warlord Hekmatyar Adds to Afghan Political Tensions,” Washington Post, May 21, 2017.

৫. Dexter Filkins, “Afghans Round Up Hundreds in Plot Against Leaders,” New York Times, April 4, 2002.

৬. Jessica Donati and Habib Khan Totakhil, “Taliban, Islamic State Forge Alliance of Convenience in Eastern Afghanistan,” Wall Street Journal, August 7, 2016.

৭. “Tora Bora Falls to Daesh After Heavy Clashes With Taliban,” Tolo News, June 5, 2017.

আফগানিস্তানে মার্কিন অবস্থান কি চিরস্থায়ী হচ্ছে?

২০১৪ সালের ১২ মার্চ আফগান অভিযানের মার্কিন কমান্ডার জোসেফ ডানফোর্ড ‘সিনেট আর্মড সার্ভিস কমিটি’র কাছে স্বীকার করেন যে ‘আফগান ন্যাশনাল আর্মির পেছনে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়েছে। অথচ, মার্কিন বাহিনী কোনো এলাকার দখল করে সেটা তাদের কাছে হস্তান্তর করলে, তারা সেই এলাকার নিয়ন্ত্রণটাও ধরে রাখতে পারে না।’ ডানফোর্ড প্রেসিডেন্টের পরিকল্পিত সেনা হ্রাস প্রক্রিয়াকে সতর্ক করে বলেন, ‘যদি আমরা ২০১৪ সালের শেষ দিকে আফগানিস্তান থেকে চলে আসি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আফগান নিরাপত্তা বাহিনী ধসে পড়বে। নিরাপত্তাব্যবস্থারও ত্বরিত অবনতি ঘটবে। সর্বোপরি আফগান সরকারের পতন ঘটবে।’[১]

এ রকম অসংখ্য স্বীকারোক্তির পরও ডানফোর্ড ও জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সাবেক কর্মী পল ডি মিলারের মতো মার্কিন আধিপত্যবাদের কট্টর সমর্থকেরা বাস্তবতা স্বীকার করতে ইচ্ছুক না। তারা স্বীকার করেন না যে, আফগান যুদ্ধকে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করতে তাদের সমর্থনটি ছিল মারাত্মক একটি ভুল। বরং মিলার দৃঢ়তা সহকারে বলেছিলেন, ‘না, আরও অর্থ ব্যয় করা উচিত এবং দীর্ঘ অঙ্গীকার করা উচিত।’ তিনি পেট্রিয়াসের মতোই বলেন যে, এই অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন কাজ করছে। মিলার দৃঢ়ভাবে বলেন, ‘এই অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন চমৎকার কাজে দিয়েছে। এই উদ্যোগ আরও সফল হতো, যদি প্রেসিডেন্ট ওবামা মাত্র ৩০ হাজার সেনার বদলে ম্যাকক্রিস্টালের আবেদন মোতাবেক আরও ৮০ থেকে ৮৫ হাজার সেনা প্রেরণ করতেন। মার্কিন সেনারা আরও দীর্ঘ সময় অবস্থান করে আফগান সরকারকে আরও সহায়তা প্রদান করলে একসময় সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে।’ কিন্তু মিলার এবং অন্য আমলারা হয়তো বুঝতেই অক্ষম যে মার্কিন সরকার দেড় দশকের বেশি সময়

ধরে আফগানিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিরুদ্ধে একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর হয়ে লড়াই করছে। তাদের সামান্যতম ধারণাও নেই যে কীভাবে তারা তাদের অভীষ্ট ফলাফলসমূহ অর্জন করবে। সবচেয়ে ভালো হতো, যদি আফগানদের 'বাক্সভর্তি করে একটি সরকার' উপহার দেওয়া যায়। কিন্তু, নিতান্ত অসম্ভব হওয়ায় তারা এমনটা করতে পারছে না। পেট্রিয়াস ও ম্যাকক্রিস্টাল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা মার্কিন শর্তাবলির প্রতি তালেবানকে পরিপূর্ণ বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করবেন। এমনকি তালেবানের বিরুদ্ধে তাদের কল্পিত সাফল্যসমূহকে বজায় রাখার জন্য আফগান ন্যাশনাল আর্মিকে সক্ষম করে তুলবেন। কিন্তু, তারা ভুল বলেছিলেন।

শত ব্যর্থতার পরও আমরা আফগানিস্তানে থেকে যাওয়ার আরেকটি সুযোগ দেখতে পাচ্ছি। সেটা হলো, আইএস![২] বলা হচ্ছে, এরূপ পরিস্থিতিতে কীভাবে একজন প্রেসিডেন্ট সেনা প্রত্যাহারের আদেশ দিতে পারেন?[৩]

২০১৭ সালের মে মাসে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিষদের পত্রিকা *ফরেন অ্যাফেয়ার্স* একটি আর্টিকেল প্রকাশ করে। সেখানে আফগানিস্তানে চারটি বিকল্পের যেকোনো একটিকে বেছে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল—

১. কাবুলে একটি সরকার স্থাপনের জন্য আরও ২৫ বছর অবস্থান করা
২. সামরিক-বেসামরিক অভিযান আরও ত্বরান্বিত করে তালেবানের সঙ্গে সন্ধির বন্দোবস্ত করা
৩. দমন-পীড়ন এবং সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানসমূহ অনন্তকাল চালিয়ে যাওয়া
৪. স্থায়ী ঘাঁটি নির্মাণের দিকে মনোযোগী হওয়া।

কিন্তু একই আর্টিকেলে স্বীকার করা হয় যে, এই পন্থাগুলো ইতোমধ্যেই অবলম্বন করা হয়েছে এবং সবই ব্যর্থও হয়েছে। তাই এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, ভবিষ্যতে এগুলো ভালো কোনো ফলাফল বয়ে আনবে। আর্টিকেলে সরকার পরিকল্পিত 'আধা-স্থায়ী অবস্থান পরিকল্পনার নিষ্ফলতাকেও স্বীকার করা হয়। কারণ, এই পরিকল্পনা অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যম্ভাবীরূপে আফগানিস্তানের দীর্ঘকালীন অচলাবস্থা মেনে নিতে হবে। অন্যদিকে, আফগানিস্তানে স্থায়ী মার্কিন অবস্থান সেখানকার আঞ্চলিক পরাশক্তিগুলোকে প্রক্সি ওয়ার বা ছায়াযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে। আঞ্চলিক পরাশক্তিগুলো তখন নতুন নতুন জঙ্গিগোষ্ঠীকে সহায়তা করার মাধ্যমে চলমান দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮০-র দশকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে

এই কৌশলই অবলম্বন করেছিল। অধিকন্তু, একটি স্থায়ী বিদেশি দখলদারদের প্রতি আফগান সরকারের মৌন সম্মতি আফগান জনগণের চোখে সরকারের বৈধতাকে পুরোপুরিভাবেই ধ্বংস করে দেবে। এ ছাড়া বিকল্প যোগাযোগব্যবস্থা ব্যতীত মার্কিনদের স্থায়ী উপস্থিতি পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন নির্ভরতাকেই কেবল বাড়িয়ে তুলবে। ফলস্বরূপ চীনকে মোকাবিলায় ভারতের সঙ্গে মার্কিন বোঝাপড়া নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে।[৪]

যা-ই হোক না কেন, সরকারি নীতিনির্ধারণের প্রবক্তারা কখনোই স্বীকার করেন না যে, শুরুতেই অন্যান্য বিকল্প উপায় অবলম্বন না করে সরাসরি আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করাই ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। এসব পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি সর্বদা একই ফর্মুলা দিয়ে থাকে। তারা বলে, সরকারের উচিত 'আরও কিছু' করা। কিন্তু, 'আরও কিছু' করার পরও কোনো ফলাফল না এলে তারা তখন প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, এই 'আরও কিছু' অনেক আগেই করা উচিত ছিল। এই 'আরও কিছু' এখনো করতে হবে এবং ভবিষ্যতেও এই 'আরও কিছু'কে বজায় রাখতে হবে।[৫]

কর্নেল ব্যাচেভিচ আফগান যুদ্ধ সম্পর্কে এবং আরও ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ নিয়ে গবেষণার পর মন্তব্য করেন, 'আমরা বিদ্রোহ দমন করেছি, আমরা সন্ত্রাস দমন করেছি, আমরা উপদেশ এবং সহায়তা দিয়ে গেছি, আমরা টার্গেটেড গুপ্তহত্যা চালিয়েছি, আমরা জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়েছি… বর্তমানে আমাদের নীতিনির্ধারণ এবং কৌশলের ভান্ডার শূন্য। অথচ, এসবের প্রবক্তাদের দেখানো কোনো আশাই সফলতার মুখ দেখেনি। তাই আপনারা এই মূল কথায় ফিরে আসুন যে, আফগানিস্তানে এই সামগ্রিক উদ্যোগটিই হয়তো ভুল পথে চালিত হয়েছে।'[৬]

বাস্তবে কেউ কি মনে করে যে, কেবল মার্কিনরা সেখানে আরও বেশ কিছু বছর অবস্থান করলে লস্করগাহ কিংবা হেলমান্দকে আমেরিকার ক্লিভল্যান্ড কিংবা ওহিও-তে রূপান্তরিত করে ফেলতে পারবে?[৭] জেনারেল ম্যাকক্রিস্টাল তার প্রারম্ভিক অসার পরিকল্পনা এমনকি প্রেসিডেন্ট ওবামার নিকট উত্থাপন করেননি। সেই পরিকল্পনায় অতিরিক্ত আরও এক লাখ সেনা মোতায়েন এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য অনির্দিষ্টকালব্যাপী অবস্থানের অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮]

জেনারেল গিয়ান গেনটিল-এর গণনা মতে, 'টেকসই এবং সফলভাবে এই প্রতিরোধ যুদ্ধ দমনের জন্য কমপক্ষে ৩ লাখ মার্কিন সেনা মোতায়েন করা আবশ্যক। তারপরও, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়তো কয়েক দশক লাগতে পারে।'[৯] কিছু কিছু হিসাব থেকে দেখায় যে তালেবানের বিরুদ্ধে জয়লাভ

করতে হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ৫ লক্ষাধিক সেনা মোতায়েন করতে হবে।[১০] কিন্তু এই সংখ্যা কিনা মার্কিন সেনাবাহিনীতে কর্মরত সেনা সংখ্যার চেয়েও বেশি।[১১] এমনকি ৫ লাখ সেনা মোতায়েনের পরও আফগান, বিশেষত পশতুনদের চিরকালের জন্য কবজা করা সম্ভব হবে— এমনটা ভাবার সুযোগ নেই। এলিজাবেথ গোউল্ড এবং পল ফিটজেরাল্ড মারজাহতে মার্কিনদের সফলতা বিশ্লেষণ করে (সেখানে একজন বেসামরিক নাগরিকের জন্য গড়ে দুজন করে সেনা মোতায়েন ছিল) রায় প্রদান করেন: 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র সামরিক বাহিনী আফগানিস্তানে মোতায়েন করলেও কোনো কাজে আসবে না। সেখানে ভয়াবহ সহিংসতা এবং বেসামরিক মৃত্যু অব্যাহত থাকবে এবং এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হবে।'[১২]

'আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের যুদ্ধই মার্কিন দখলদারত্বের বিরুদ্ধে আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিরোধ যুদ্ধকে উসকে দেবে'— এই রায় অস্বীকার করার একটিমাত্র উপলক্ষ্যও নেই। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে আরও ১০০ বছর অবস্থান করলেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। আফগান যুদ্ধ পরিচালনা করা, ধাপে ধাপে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি করা এবং এসব ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী মার্কিন কর্মকর্তাদের অনেকেই ২০১৬ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট ওবামার উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। চিঠিতে তাকে সেনাসংখ্যা হ্রাস বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। সেই চিঠিতে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত রায়ান ক্রুকার, জালমেই খলিলজাদ প্রমুখ যেমন স্বাক্ষর করেছিলেন, তেমনি সামরিক কমান্ডার জেনারেল জন অ্যালেন, স্ট্যানলি ম্যাকক্রিস্টাল এবং ডেভিড পেট্রিয়াসও স্বাক্ষর করেছিলেন। ন্যায়সংগত কারণ ব্যতীত তাদের তত্ত্বাবধানে নিহতদের জন্য তারা চিঠিতে ন্যূনতম দায় স্বীকারের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেনি। তারা উল্টো নিজেদের সব ব্যর্থতা এড়ানোর চেষ্টা করে। এই যুদ্ধপ্রিয় মার্কিন কর্মকর্তারা বরং 'জঙ্গিবাদের স্বর্গরাজ্য' কাহিনি জপতে থাকে। চিঠিতে তারা সেনা প্রত্যাহারের পর আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনারও উল্লেখ করেন। পেট্রিয়াস এবং তার সঙ্গীরা জোর দিয়ে বলেন, 'আফগানিস্তানের অপরিপক্ক অগ্রগতিগুলো দৃঢ় এবং টেকসই করে দীর্ঘস্থায়ী সম্পদে পরিণত করতে আমাদের সর্বপ্রথম দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করতে হবে।'[১৩]

এই যুদ্ধবাজ গোষ্ঠীর অবশ্য দুশ্চিন্তা করার কিছু ছিল না। এর চার দিন পর ২০১৬ সালের ৭ জুন প্রেসিডেন্ট ওবামা ঘোষণা করেন, '২০১৭ সালের শুরুতে তার ক্ষমতা শেষ হওয়া পর্যন্ত আফগানিস্তানে ৮ হাজার ৪০০ সেনা

মোতায়েন রাখা হবে।’[১৪] এই মাধ্যমে তিনি তার পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসেন। ইতিপূর্বে তার প্রতিশ্রুতি ছিল, ‘প্রেসিডেন্সির দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ দিকেই সব সেনাকে আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।’ এর আগে ২০১২ সালের মে মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। চুক্তিতে তারা কয়েকটি বিষয়ে সম্মত হয়েছিলেন। যেমন: আফগান সেনা ও পুলিশ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ এবং কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটকে সহায়তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আফগানিস্তানে ২০২৪-এর শেষ পর্যন্ত এবং প্রয়োজনে আরও বেশি সময় মার্কিন সেনা মোতায়েন রাখা, আফগানিস্তানে স্থায়ী বিমানঘাঁটি নির্মাণ করা ইত্যাদি।[১৫]

এভাবে ২০১৪ সালের শেষ দিকে মার্কিন সেনাদের চূড়ান্ত প্রত্যাহার করার বা আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুত সময় এলো এবং চলেও গেল। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও সেনা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। হোয়াইট হাউস ত্যাগ করার আগে শেষবারের মতো বিশিষ্ট মার্কিন যুদ্ধবাজ জেনারেল ডেভিড পেট্রিয়াসের সম্মুখে ওবামার নত হওয়া দেখে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আশ্চর্যান্বিত হননি। এভাবেই বারবার আফগানিস্তানে মার্কিন উপস্থিতি তালেবানের সঙ্গে আপস-মীমাংসাকে ব্যাহত করেছে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে বেড়ায়, ‘যেকোনো কাবুল প্রশাসনের উচিত তালেবানের সঙ্গে আপস-মীমাংসাকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করা।’

ওয়াশিংটন ডিসিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত এটাই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই আফগানিস্তান ত্যাগ করতে পারবে না। কারণ সেখানকার সব অর্জনই, জেনারেল পেট্রিয়াসের ভাষ্য অনুযায়ী, ‘ঠুনকো এবং পরিবর্তনযোগ্য (Fragile & Reversible)’। অর্থাৎ এই দীর্ঘ সময় পরও সেনাবাহিনী এবং পররাষ্ট্র বিভাগ সেখানে এমন কিছু নির্মাণ করতে পারেনি, যেটা নিজ শক্তিতে বলবৎ থাকতে সক্ষম।[১৬]

এয়ার ফোর্স টাইমস জানায়, যুদ্ধ ‘সমাপ্তির’ ঠিক এক বছর পরই জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট ওবামা মার্কিন বিমানবাহিনীকে আইএস লক্ষ্যবস্তুতে হামলার নির্দেশ দেন। মে মাসে আফগান যুদ্ধের নতুন কমান্ডার এবং ন্যাটো জোটের সর্বোচ্চ সেনাপতি জেনারেল জন নিকলসনের সঙ্গে আলোচনার পর একটি সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন জেনারেল কার্টিস স্কাপোরোত্তি সেই একই প্রাচীন ‘জঙ্গিবাদের স্বর্গরাজ্য’ কাহিনি টেনে আনেন। তিনি ঘোষণা করেন, ‘স্থিতিশীল

এবং নিরাপদ আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা দূর না হওয়া পর্যন্ত ন্যাটো জোট আফগানিস্তানে অবস্থান করবে।'[১৭]

২০১৬ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট ওবামা কোনো লক্ষ্যবস্তুতে হামলার ক্ষেত্রে আইনকানুন শিথিল করতে আদেশ দেন। পাশাপাশি আকাশযুদ্ধে সহায়তা বৃদ্ধির কথা বলা হয়। একটি বিশাল অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হওয়ায় B-52 বোমারু বিমান পুনরায় আফগানিস্তানের আকাশে ডানা মেলে। ফলস্বরূপ ব্যাপক বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটতে থাকে। কিন্তু এর আগেই এপ্রিল মাসের মধ্যে তালেবান দেশটির প্রায় অর্ধেক অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিল।[১৮]

তাই ২০১৬ সালের জুন মাসে তালেবানের বিরুদ্ধে মার্কিন পদাতিক সৈন্যদের লড়াইয়ের নিষেধাজ্ঞাকেও তুলে নিতে হয়। 'নিউইয়র্ক টাইম' প্রতিবেদন অনুযায়ী, নতুন নিয়মের আওতায় মার্কিন সেনাদের প্রতিরক্ষার জন্য বিমান হামলাগুলোকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করতে হতো না। পেন্টাগন এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমান্ডাররা উপযুক্ত মনে করলেই তালেবানের বিরুদ্ধে বিমানবাহিনীকে ব্যবহারের অনুমতি পাবে। পাশাপাশি মার্কিন সেনাদেরও তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়মিত আফগান সেনাদের সঙ্গে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে। নীতিমালার এই পরিবর্তনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়, 'দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দুর্বল নেতৃত্বের কারণে আফগান ন্যাশনাল আর্মি তালেবানের হাতে নাজেহাল হচ্ছে।' অর্থাৎ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মার্কিন সহায়তার পরও আফগান সরকার দুর্বল এবং অস্থিতিশীলই রয়ে গেছে। কিন্তু তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্মুখ সারিতে মার্কিন সেনাদের ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে আফগান ন্যাশনাল আর্মিতে ছদ্মবেশে থাকা তালেবানদের অভ্যন্তরীণ হামলায় নতুন দ্বার উন্মোচন করা হলো। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি একটি ভয়াবহ মোড় নেয়।

২০১৬ সালের ১ আগস্ট কাবুলের একটি হোটেলে শক্তিশালী গাড়িবোমা হামলার পর CNN-এর প্রতিবেদনে উঠে আসে, তালেবানের অপহরণ এবং বোমা হামলার মাত্রা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজধানী কাবুলেই ব্যাপকভাবে নিরাপত্তাভীতি ছড়িয়ে পরেছে। শহরের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কূটনীতিক কার্যালয়ের মাঝের স্বল্প রাস্তাটুকু গাড়ি দিয়ে অতিক্রম করার ব্যাপারে মার্কিন এবং অন্যান্য কূটনীতিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এর পরিবর্তে তাদের হেলিকপ্টারে যাতায়াত করার নির্দেশনা দেওয়া

হয়েছে।[১৯] অর্থাৎ মার্কিন এবং তাদের সহযোগীদের জন্য এখন শহরের রাস্তা নিরাপদ নয়। আর গ্রামাঞ্চলের কথা তো চিন্তাই করা যায় না। ২০০১ সালের দীর্ঘ সময় পরে এসেও কাবুলের নিরাপত্তা সবচেয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে।[২০]

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 'পাকিস্তান এবং দক্ষিণ আফগানিস্তানে তালেবান বিদ্রোহীদের প্রায় ২৫ হাজার সেনা রিজার্ভ রয়েছে। তাদের তাড়াহুড়ো করার কোনো কারণ নেই। প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা এবং সামান্য ভাগ্যের সহায়তায় তারা এমনকি রাজধানী কাবুলকে হুমকিতে ফেলে দিতে সক্ষম।'[২১]

SIGAR ২০১৭ সালের শুরুতেই সতর্ক করে বলে, 'এত দিন পরও আফগান জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর এর জন্য সমগ্র আফগানিস্তান আয়ত্তে আনার সক্ষমতা তো হয়ইনি; বরং তারা তালেবানের কাছে দখলকৃত অঞ্চলগুলোর নিয়ন্ত্রণও হারাচ্ছে।' ২০১৬ সালের ২৮ আগস্টের USFOR-A প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশটির কেবল ৬৩.৪ শতাংশ এলাকায় আফগান সরকারের নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রভাব রয়েছে।[২২]

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৭ সালের গ্রীষ্মের শুরুতে এসেও তালেবান প্রায় ৮.৪ মিলিয়ন আফগানের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। এটি মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। মাত্র এক বছর আগেও ২০১৬ সালের শেষ দিকে এই সংখ্যাটি ছিল ৫ মিলিয়ন। একই সময়ে তালেবানের নিয়ন্ত্রণ প্রায় ৩০ শতাংশ অঞ্চল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪০ শতাংশ অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে।[২৩]

২০১৭ সালের জুলাই মাসে SIGAR-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, '১২ হাজারের বেশি আফগান ন্যাশনাল আর্মি সদস্য বর্তমানে পলাতক বা অস্তিত্বহীন। যারা এখনো লড়াই করে যাচ্ছে, তাদের মধ্য থেকে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৫ হাজার জন নিহত হচ্ছে।[২৪] প্রাদেশিক রাজধানীগুলোর ওপর সরকারের সামান্য হলেও কর্তৃত্ব আছে দাবি করা হলেও বর্তমানে রাজধানী কাবুলেই অস্থিতিশীলতা দেখা দিচ্ছে।' ২০১৭ সালের ৩১ মে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসের নিকটে ভয়াবহ গাড়িবোমা হামলায় প্রায় ১৫০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়।[২৫] অথচ এই এলাকাকে আগে অভেদ্য বলেই গণ্য করা হতো। হামলার দুই দিন পর নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভকারীদের ওপর নিরাপত্তা বাহিনীই গুলি চালায়। এই ঘটনায় আরও ৭ জন মারা যায়।[২৬] অন্যদিকে এসব বোমা হামলাও অব্যাহত থাকে।[২৭] জুলাই মাসেই SIGAR অভিযোগ উত্থাপন করেছিল যে, 'মার্কিন কর্মকর্তারা আফগানিস্তান পুনর্গঠনের জন্য সব খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিলিয়ন

বিলিয়ন ডলার কীভাবে ব্যয় করল যে, তারা এখন মার্কিন দূতাবাস কম্পাউন্ডের বাইরেই বের হতে পারে না?'[২৮]

এখন পর্যন্ত তালেবান যোদ্ধা এবং মার্কিন ডলারের তীব্র স্রোত তাজিক, উজবেক, হাজারা, কাবুল ও উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য গোত্র এবং উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর সমন্বয়ে জাতীয় ঐক্য সরকারকে সংগঠিত রেখেছে। কিন্তু, দেশটির নাম 'আফগানিস্তান'! আনুগত্য এখানে অসম্ভব, ঘৃণা এখানে অতিশয় তিক্ত এবং ক্ষমতার বণ্টন এখানে তীব্রভাবে অসম। তাই যেকোনো সময়ে এই জোটেই পরিবর্তন আসতে পারে। পাশাপাশি, পুনরায় বহুপক্ষীয় গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া যায় না। বস্তুত, ডলারের স্রোত বন্ধ হলে এটি সুনিশ্চিতই।[২৯]

২০১২ সালে সাংবাদিক ডেক্সটার ফিলকিন্সকে খানাবাদের জেলা প্রধান নিজামুদ্দিন নাশহির বলেছিল, 'আমার কথাকে ভালো করে লিপিবদ্ধ করে রাখুন। ঠিক যেই মুহূর্তে মার্কিনরা এখান থেকে চলে যাবে, সেই মুহূর্তেই এখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আফগানিস্তান তখন নিজস্ব সরকারব্যবস্থা সমন্বিত ২৫টি কিংবা ৩০টি জায়গিরে বিভক্ত হয়ে যাবে। মীর আলম কুন্দুজ প্রদেশ নিয়ে নেবে, আত্তা মাজার-ই-শরিফ, দোস্তম শেবারঘান, কারজাইরা কান্দাহার এবং হক্কানিরা পাকতিয়া প্রদেশকে দখল করে নেবে। যদি এসব না ঘটে, তবে আপনি আমার লাশকে আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েন।'[৩০]

তথ্যসূত্র

১. Ernesto Londoño, "US Commander in Afghanistan Warns That Full Withdrawal Will Allow Al Qaeda to Regroup," Washington Post, March 12, 2014.

২. Ahmed Mengli, "Kabul Hospital Attack: ISIS Claims Responsibility After 30 Killed by Gunmen Disguised as Doctors," NBC News, March 8, 2017.

৩. Paul D. Miller, "Obama's Failed Legacy in Afghanistan," National Interest, February 15, 2016.

৪. Sameer Lalwani, "Four Ways Forward in Afghanistan," Foreign Affairs, May 25, 2017.

৫. Ludwig Von Mises, Two Essays by Ludwig von Mises: Liberty and Property; Middle-of-the-Road Policy Leads to

Socialism (Auburn, AL: Ludwig Von Mises, 1991); Ludwig von Mises, Planned Chaos (Atlanta: Foundation for Economic Education, 1947); Murray N. Rothbard, “The Myth of Efficient Government Service,” in Man, Economy, and State, with Power and Market (Auburn, AL: Ludwig Von Mises, 2009), 1260–1272.

৬. Andrew Bacevich, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, April 2, 2017.

৭. Mohammad Stanekzai, “Dozens Killed in Afghanistan Car Bombing,” Herald Sun, June 22, 2017.

৮. Spencer Ackerman, “Michael Hastings: McChrystal Was ‘Complex,’ Obama Was Naive, Afghanistan Is Hopeless,” Wired, January 5, 2012.

৯. Gentile, Wrong Turn, 133-134.

১০. Fred Kaplan, “Obama’s Middle Course,” Slate, October 13, 2009.

১১. “2016 Index of Military Strength,” Heritage Foundation.

১২. Gould and Fitzgerald, Crossing Zero, 166.

১৩. Ryan Crocker et al., “Keep Troop Levels Steady in Afghanistan: An Open Letter,” National Interest, June 3, 2016.

১৪. Landler, “Obama Says He Will Keep More Troops in Afghanistan Than Planned.”

১৫. “Security and Defense Cooperation Agreement Between the Islamic Republic of Afghanistan and the United States of America,” Ministry of Foreign Affairs for the Islamic Republic of Afghanistan, May 2, 2012; Ben Farmer, “US Troops May Stay in Afghanistan until 2024,” Telegraph, August 19, 2011.

১৬. Greg Jaffe and Missy Ryan, “The US Was Supposed to Leave Afghanistan, 2017. Now It Might Take Decades,” Washington Post, January 26, 2016.

১৭. Dan Lamothe, “Top NATO Commanders Signal Support for Keeping Troops in Afghanistan,” Washington Post, May 18, 2016.

১৮. Sarah Almuktar and Karen Yourish, “More Than 14 Years After US Invasion, the Taliban Control Large Parts of Afghanistan,” New York Times, April 19, 2016.

১৯. Steve Visser and Masoud Popalzai, "Kabul's Northgate Hotel Bombed, Attacked," CNN, August 1, 2016.
২০. Laura Cesaretti, "Afghanistan's Militias: The Enemy Within?," Diplomat, January 4, 2017.
২১. Ioannis Koskinas, "Afghanistan on the Brink, Part 1," Foreign Policy, February 18, 2016.
২২. "High-Risk List," SIGAR.
২৩. Jessica Donati and Habib Khan Totakhil, "Taliban Broaden Their Reach in Villages Across Afghanistan," Wall Street Journal, May 8, 2017.
২৪. Quarterly Report, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, July 30, 2017.
২৫. Josh Smith, "Kabul Truck-bomb Toll Rises to More Than 150 Killed: Afghan President," Reuters, June 6, 2017.
২৬. "Afghanistan: 7 Demonstrators Killed as Clashes Erupt at Kabul Anti-government Protest," Almasdar News, June 2, 2017.
২৭. Hamid Shalizi and James Mackenzie, "Taliban Suicide Car Bomber Kills Dozens in Afghan Capital," Reuters, July 23, 2017.
২৮. SIGAR, Quarterly Report, July 30, 2017.
২৯. Brahma Chellaney, "Afghanistan's Partition Might Be Unpreventable," Japan Times, February 27, 2013.
৩০. Dexter Filkins, "After America," New Yorker, July 9, 2012.

যুদ্ধের ব্যয় এবং ফলাফল

আফগানিস্তানে আগ্রাসন এবং তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াই ইতোমধ্যেই আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘতম যুদ্ধের স্থান দখল করে নিয়েছে। ২০১১ সালের বসন্তে 'নেভি সিল' ওসামা বিন লাদেনকে পাকিস্তানে হত্যা করতে সমর্থ হয়।[১] তিনি নিশ্চিতভাবেই একটি পরিতৃপ্তি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তত দিনে তার কোনো আফসোস বা অসমাপ্ত কাজ ছিল না। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি রক্তক্ষয়ী, দীর্ঘ, ব্যয়বহুল এবং অজেয় যুদ্ধের মাধ্যমে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার পরিকল্পনার সফলতা একেবারে তুঙ্গে ছিল সে সময়। এই যুদ্ধটির আর্থিক ব্যয় যেমন অকল্পনীয়, এর ব্যর্থতাও তেমনি অগণিত। আফগান যুদ্ধের ব্যয় ইতোমধ্যেই ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। এ ছাড়া স্পেশাল ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং আরও অনেকেই জানান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী পশ্চিম ইউরোপকে সহায়তায় ব্যয় করা 'মার্শাল প্ল্যান'-এর চেয়ে বেশি অর্থ আফগানিস্তানের পুনর্গঠনের জন্য ব্যয় করা হয়েছে।[২]

আফগান যুদ্ধে ইতোমধ্যেই প্রায় ২ হাজার ৪০০ মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। তাদের অধিকাংশই নিহত হয়েছে ওবামা এবং পেট্রিয়াসের বেহুদা সেনা বৃদ্ধির সময়ে। এর সঙ্গে আরও প্রায় ১০০ ব্রিটিশ এবং ন্যাটো জোটভুক্ত দেশের সেনা নিহত হয়।[৩] আহত মার্কিন সেনার সংখ্যা ১৭ হাজারের বেশি।[৪] শত-হাজার আফগান এই যুদ্ধের সহিংসতায় নিহত হয়েছে। নিহত বেসামরিক নাগরিকের প্রকৃত সংখ্যা কেউই জানে না।

লরা বুশ এবং জন নাগল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারা আফগান সমাজের এমন রূপান্তর করবেন যে, মিনিস্কার্ট পরেও আফগান তরুণীরা নিরাপদে নতুন সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে গিয়ে ভোট দিতে পারবে। কিন্তু আফগানিস্তানে কখনো স্বাভাবিক স্থিতিশীলতাই অর্জিত হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেদিন আফগানিস্তান ত্যাগ করবে, সেটা ২০২৪, ২০৩৪ বা ২০৪৪ সালই হোক না কেন, সম্ভবত তাদের ছাড়াই সেখানে গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকবে।[৫]

চলমান আফগান যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে আধুনিক বিস্ফোরক যন্ত্র এবং হাতে বানানো ল্যান্ডমাইন। এগুলো সাধারণত পুরোনো আর্টিলারি শেল অথবা ঘরোয়া বিস্ফোরক থেকে তৈরি করা হয়।[৬] এই বিস্ফোরক এবং ল্যান্ডমাইনে মার্কিন সেনাদের একটি বড় অংশ পা এবং জননাঙ্গ হারাচ্ছে।[৭] অতীতে এ রকম কোনো আঘাতের ফলাফল ছিল নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির বদৌলতে বর্তমানে আমাদের সেনাদের প্রাণ রক্ষা পেলেও হাজার হাজার মার্কিন সেনা ভয়ংকর এবং স্থায়ী পঙ্গুত্বের শিকার হচ্ছে। কিছু কিছু পঙ্গুত্ব জীবনকে স্থবির করে দেয়। তাদেরকে বাকি জীবন সরকারি ত্রাণ এবং সামরিক ওষুধের ওপর নির্ভর করেই চলতে হয়।[৮] অপরাধবোধ, নৈতিক আঘাত ইত্যাদির কারণে অসংখ্য মার্কিন নারী ও পুরুষ সেনা পরবর্তী সময়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হচ্ছে। একসময় আত্মহত্যাকেই মুক্তির পথ হিসেবে বেছে নিচ্ছে তারা। তাদের এই পরিণতি স্বজনদের মাঝে হতাশার জন্ম দিচ্ছে।

অসংখ্য পরিবার ভেঙে যাচ্ছে।[৯] ছেলেমেয়েরা পরিবারহীন বেড়ে উঠছে। মা-বাবারা তাদের পুত্র ও কন্যাদের হারাচ্ছে। তরুণ যুবক ও যুবতি ঘরে ফিরে আসছে শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ, কর্মহীন[১০] এবং ঋণে জর্জরিত হয়ে[১১]। অথচ তারা একসময় পরিবারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, মিলিটারি সার্ভিস তাদের ক্যারিয়ারে সফলতার চূড়ায় নিয়ে যাবে। 'বার্ন পিট' মার্কিন সেনাদের জন্য একটি ভয়াবহ আতঙ্ক হিসেবে দেখা দিয়েছে। এর বিষাক্ত ধোঁয়া 'কারসিনোজেনিক' (ক্যানসার সৃষ্টির জন্য দায়ী) বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এই ধোঁয়া নিশ্বাসের সঙ্গে নেওয়ার কারণে তারা বিষক্রিয়ারও শিকার হয়। এটা মনে করার পেছনে শক্তিশালী কারণ রয়েছে যে, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে বিউ বাইডেনের মৃত্যুর জন্য বার্ন পিটের ভূমিকা থাকতে পারে। সে সম্ভবত ইরাকে দায়িত্বরত অবস্থায় সেনাঘাঁটিসংলগ্ন বার্ন পিটের ধোঁয়ার শিকার হয়েছিল। পরিচিত অনেক সেনার মৃত্যুর মধ্যে তার মৃত্যুও একটি। তবে বার্ন পিটের কারণে মারা যাওয়া সৈন্যদের প্রকৃত সংখ্যা এখনো জানা যায়নি।

যুদ্ধ মানেই নরক। তাহলে পেন্টাগনের এখন কি করা উচিত? বাস্তবে পরিবেশগত বিপর্যয়ই এসব যুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য একটি যৌক্তিক কারণ হতে পারত। আমেরিকা যতটা গুরুতরভাবে এসব বিষক্রিয়ার ভয়ানক প্রভাব উপলব্ধি করছে, আফগানিস্তান এবং ইরাকের জনগণ তার চেয়ে বহুগুণে এই সমস্যার শিকার হচ্ছে।

জাতিসংঘের মতে, যুদ্ধ শুরুর পর সর্বোচ্চ বেসামরিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ২০১৫ সালে। এই সংখ্যাটি ছিল ৩ হাজার ৫০০-রও অধিক। উল্লেখ্য, নিহতদের প্রায় এক-চতুর্থাংশই ছিল শিশু। একই বছর আহত হয় প্রায় ৭ হাজার ৫০০ জন আফগান। সর্বমোট হতাহতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হয়েছে আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে।[১২] ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের মতে, গত ৭ বছরের মধ্যে ২০১৫ সালে বিমান হামলায় সর্বাধিক বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।[১৩] ২০১৬ সালে এই সংখ্যা ছিল আরও ভয়াবহ। নিদারুণ দরিদ্র দেশটির জনগণ এখনো সহিংস সংঘাতে নিমজ্জিত। এর কোনো সমাপ্তিও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। কেবল ২০১৬ সালেই অর্ধ মিলিয়ন আফগান সহিংসতার কারণে দেশের মধ্যেই শরণার্থী জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে।[১৪] কিন্তু এই সহিংসতা দিনদিন বেড়েই চলছে। ২০১৭ সালের প্রথমার্ধেই ৫ হাজার ২৪৩ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়।[১৫] একই সালে ২ হাজার ৫৩১ জন আফগান সেনা ও পুলিশ নিহত হয় এবং ৪ হাজার ২৩৮ জন আহত হয়।[১৬] 'অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম' এবং বর্তমানে 'অপারেশন ফ্রিডম সেন্টিনেল' নামে চলমান অর্থহীন একটি যুদ্ধে এভাবেই মানুষের মৃত্যু ঘটছে। এর সবটাই নিরর্থক এবং সবটুকুই ব্যর্থ। এই যুদ্ধ একটি বেহুদা বিসর্জন ছাড়া কিছুই নয়।

তথ্যসূত্র

১. Jeff Huber, "Osama bin Laden, Dead and Lovin' It," Pen and Sword, May 24, 2011.

২. "High-Risk List," SIGAR; Geoff Dyer and Chloe Sorvino, "$1 Trillion Cost of Longest US War Hastens Retreat from Military Intervention," Financial Times, December 14, 2014.

৩. "Operation Enduring Freedom, Coalition Military Fatalities By Year," iCasualties, accessed July 31, 2017.

৪. "Operation Enduring Freedom: U.S. Wounded Totals," iCasualties, accessed July 31, 2017.

৫. Mujib Mashal, "Afghanistan's IED Complex," Time, January 2, 2013.

৬. Mary Kekatos, "'Unprecedented' Rate of Genital Injuries Among US Soldiers: Devastating Study Reveals More Than 1,300 Iraq and Afghanistan Vets Left with Life-Changing Wounds to Sexual Organs," Daily Mail, January 16, 2017.

৭. Ann Jones, They Were Soldiers: How the Wounded Return from America's Wars: The Untold Story (Chicago: Haymarket, 2014).

৮. Asked about mental health support for U.S. vets, Matthew Hoh writes: "First is Veterans Crisis Line," 1-800-273-8255.

৯. James Hosek, "Lengthy Military Deployments Increase Divorce Risk for U.S. Enlisted Service Members," RAND Corporation, September 3, 2013.

১০. Dianna Cahn, "Survey: Demands on Troops, Families 'Unsustainable,' Stars and Stripes, December 7, 2016.

১১. Herb Weisbaum, "Survey: Military Families Carry More Debt, Have Fewer Assets Than Civilians," NBC News, July13, 2015.

১২. "Afghan Casualties Hit Record High 11,000 in 2015 – UN Report," UN News Centre, February 2016.

১৩. Jack Serle et al., "US Airstrikes in Afghanistan Killing Civilians at Greatest Rate for Seven Years, New Figures Show," Bureau of Investigative Journalism, February 18, 2016.

১৪. Jelena Bjelica, "Over Half a Million Afghans Flee Conflict in 2016," Afghan Analysts, December 28, 2016.

১৫. "2017 MidYear Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Afghanistan," the Human Rights Unit of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), July 30, 2017.

১৬. Quarterly Report, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, July 30, 2017.

ব্যাকড্রাফট

মার্কিন জনগণ জানে, এই সমগ্র অভিযান অতি উত্তমরূপে কাজ সম্পাদন করছে। কিন্তু বাস্তবে তারা সাম্প্রতিক আফগানিস্তান সম্পর্কে কিছুই শুনতে পায় না। আর শুনতে পেলেও সেটা হয়তো ২০১৬ সালের পপকর্ন ফ্লিক্স ‘হুইস্কি ট্যাঙ্গো ফক্সট্রট’ থেকে জেনে থাকবে। সেখান থেকে তারা জেনেছে, আফগানিস্তানের নারীরাও এখন নারী স্বাধীনতা উপভোগ করছে। অর্থাৎ তারাও মদ খেয়ে মাতাল হতে পারে, পার্টিতে যেতে পারে এবং তারা বেশ ভালোভাবেই তাদের সময় কাটাচ্ছে। মাচুপিচুতে হাইকিং কিংবা সিক্স ফ্ল্যাগসের ভীতিকর রোলার কোস্টার রাইডের মতো আফগান যুদ্ধও উত্তর মার্কিন শ্বেতাঙ্গদের জন্য মজার কোনো রাইডের মতোই। তাদের কাছে যুদ্ধটি বর্বর এবং অর্থহীন নয়; বরং খুবই রোমাঞ্চকর!

২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট ওবামার আরও সেনা মোতায়নের ঘোষণার পর সাংবাদিক প্যাট্রিক কুকবর্ন-এর বিশ্লেষণ এটাই বলে যে, ‘আফগানিস্তানে দখলদারি অব্যাহত রাখলে জঙ্গি হামলাসমূহ প্রতিহত করার বদলে পশ্চিমা দেশগুলোতে উল্টো এই ধরনের হামলার আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি করবে।’[১] কুকবর্নের এই রায়ের এক মাস আগে থেকেই এই বিষয়টি স্পষ্ট ছিল। এই ঘটনার সূত্রপাত হয় নিদাল হাসান নামক একজন মার্কিন আর্মি মেজরের আফগানিস্তানে যাওয়ার আদেশের মাধ্যমে। আফগানিস্তানের বেসামরিকদের ওপর চালানো বিভিন্ন যুদ্ধাপরাধ নিয়ে নিদাল হাসান খুবই মর্মাহত ছিল। এরপর সে দেখতে পায়, তাকেও হয়তো মুসলমান ভাইদের হত্যা করতে হবে।[২] নিদাল হাসান তখন গুলি চালিয়ে সেন্ট্রাল টেক্সাসের একটি সেনা ঘাঁটিতে ১৩ জন মার্কিন সেনাকে হত্যা করে। এই ঘটনায় আরও প্রায় ৩০ জন আহত করে।[৩] পরবর্তী সময়ে জানা যায়, হাসানের সঙ্গে বিশিষ্ট মার্কিন আল-কায়েদা মতাদর্শ প্রচারক আনোয়ার আল-আওলাকির যোগাযোগ ছিল।[৪] কিন্তু এই পাল্টা

আঘাতকে অস্বীকার করে সেনাবাহিনী এটাকে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী হামলা বলে চালিয়ে দেয়। ওবামা প্রশাসন এই হামলাকে 'কর্মক্ষেত্রের সহিংসতা' আখ্যায়িত করে সম্পূর্ণ ঘটনাকেই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চেয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, কর্মক্ষেত্রে প্রচণ্ড চাপের কারণে নিদাল হাসান মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে এই সহিংস ঘটনা ঘটিয়েছে।[৫]

বাস্তবে এসব ঘটনাকে কেবল পাল্টা আঘাত বললে যথার্থ হবে না। সামগ্রিকভাবে সংজ্ঞায়িত করলে বলা যায়, এগুলো হলো নীতিভ্রষ্ট বৈদেশিক নীতি গ্রহণের দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি। এসব পরিণতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ধেয়ে আসছে। এসব পরিণতি মার্কিন জনগণকে হতভম্ব করে দিচ্ছে। অথচ, জনসাধারণ এই হামলার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ভুল তত্ত্বের শিকার।[৬] এই প্রেক্ষাপটকে আরও নিখুঁতভাবে সংজ্ঞায়িত করলে এটাকে বলা যেতে পারে 'ব্যাকড্রাফট'। এই শব্দটি মূলত দমকলকর্মীরা ব্যবহার করে। কোনো উত্তপ্ত বা জ্বালানি পরিপূর্ণ রুমের দরজায় অসাবধানতাবশত ধাক্কাধাক্কি বা কুঠার দিয়ে ভাঙা হলে সেখানে অক্সিজেন সরবরাহের মাধ্যমে শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘটনাকে 'ব্যাকড্রাফট' বলা হয়। আমাদের সরকারের অকপটে ঘোষিত বৈদেশিক নীতিগুলো এখন আমাদের সবার মুখে ব্যাকড্রাফট হিসেবে আঘাত হানছে। একে অস্বীকার করার কোনো যৌক্তিকতা না থাকলেও আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যুদ্ধবাজেরা তা-ই করে চলছে।

নিদাদ হাসানের অভ্যন্তরীণ হামলার মোটামুটি এক মাস পূর্বে নাজিবুল্লাহ জাজি নামক একজন মার্কিন-আফগানকে দুই সহযোগীসহ আটক করা হয়েছিল। নাজিবুল্লাহ জাজি ২০০৮ সালে পাকিস্তান ভ্রমণ করেছিল। সেখানে সে সম্ভবত আল-কায়েদার সদস্যদের কাছ থেকে বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। সেই প্রশিক্ষণের আলোকে জাজি নিউইয়র্ক সাবওয়ে সিস্টেমে হামলার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে। সৌভাগ্যক্রমে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই তাকে আটক করা হয়। পরবর্তীকালে জাজি আদালতে তাঁর এই আত্মঘাতী হামলার পেছনের উদ্দেশ্য হিসেবে কোনো ধর্মীয় কারণ উল্লেখ করেনি। আদালতে স্বীকারোক্তি সময় জাজি এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করে: 'মার্কিন সামরিক বাহিনীর আফগানিস্তান এবং ইরাকের বেসামরিকদের সঙ্গে যা করছে, সেই বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এবং তাদের রক্ষার্থে আমি নিজের জীবনকে বলিদান দিতে চেয়েছিলাম।' অর্থাৎ, জাজি আমেরিকার বিরুদ্ধে উগ্রপন্থার দিকে ধাবিত হয়েছিল কোনো ধর্মীয় কারণে নয়; বরং রাজনৈতিক

কারণে। এই হামলার প্রেক্ষাপট ছিল তার পৈতৃক দেশে আমাদের সরকারের চলমান দখলদারি।[৭]

এর মাত্র কয়েক মাস পর ফয়সাল শাহজাদ নামক এক পাকিস্তানি মার্কিন তরুণ নিউইয়র্ক সিটির জনবহুল টাইমস স্কয়ারে একটি ট্রাকবোমা বিস্ফোরণ করার চেষ্টা করেছিল। সৌভাগ্যক্রমে, এই হামলাটিও ব্যর্থ হয়। শাহজাদ তার জীবনকালের কোনো সময়েই কোনো ধর্মীয় মৌলবাদী হিসেবে পরিচিত ছিল না; বরং সে পুরোপুরি আমেরিকান স্বপ্নিল জীবনে অভ্যস্ত ছিল। তার ছিল উন্নত ডিগ্রি, একটি পেশাদার জীবন এবং একটি পরিবার। জানা যায় যে, সে তার স্বদেশ পাকিস্তান গিয়ে স্বচক্ষে একটি মার্কিন ড্রোন হামলার ফলাফল প্রত্যক্ষ করেছিল। এরপর শাহজাদ পাকিস্তানি তালেবানের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ নিতে নিজেকে তাদের কাছে সোপর্দ করে।[৮] অথচ, এই গোষ্ঠীটি ইতিপূর্বে কখনো আমেরিকার অভ্যন্তরে হামলা চালায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতে সাজা শুনানির সময় শাহজাদ জানায়, ওবামা প্রশাসনের সম্মিলিত 'আফগান-পাক' যুদ্ধে পাকিস্তানে মার্কিন ড্রোন হামলায় নিরীহ নিহতদের প্রতিশোধ নিতেই সে ওই পদক্ষেপ নিয়েছিল। বিচারক যখন নিরীহ বাচ্চাদের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলার জন্য শাহজাদের তীব্র সমালোচনা করে, তখন সে এর জবাব দিয়েছিল: 'বেশ, মার্কিন ড্রোন যখন আফগানিস্তান এবং ইরাকে হামলা চালায়, তখন তো তারা বাচ্চাদের কথা মাথায় রাখে না। বাস্তবে তারা কারও কথাই চিন্তা করে না। তারা নারী, শিশু-নির্বিচারে সবাইকে হত্যা করে। এই যুদ্ধে তারা মানুষ হত্যা করছে। তারা সব ধরনের, সব বয়সের মুসলমানদের হত্যা করছে।'

বিচারক এবং তার এই কথোপকথন চলতে থাকে—

বিচারক: এখন আমরা তাদের সম্পর্কে কথা বলছি না; আমরা আপনার কথা বলছি।

শাহজাদ: বেশ, আমি তাদেরই একটি অংশ। আমি মুসলমান দেশ এবং মুসলমান জনগণের ওপর চালানো মার্কিন নিপীড়নের জবাবেরই একটি অংশ। তাদের পক্ষ হয়ে আমি আক্রমণটি চালিয়েছি। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মার্কিনরা কেবল তাদের নিজের লোকজনেরই গ্রাহ্য করে। বিশ্বের অন্য কোথাও কেউ মারা গেলে তারা সেগুলো নিয়ে মোটেও মাথা ঘামায় না। একইভাবে, গাজা উপত্যকাতেও একই ঘটনা ঘটছে। কারও উচিত সেখানে গিয়ে এমন কোনো পরিবারের সঙ্গে বাস করা, যার বাড়ি ইসরায়েলি বুলডোজার গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সেখানেও এরূপ প্রচুর আগ্রাসন চলছে...

বিচারক: আফগানিস্তানে?

শাহজাদ: গাজা উপত্যকায়।

বিচারক: ও, আচ্ছা।

শাহজাদ: আমরা মুসলমানরা একটি সম্প্রদায়। আমরা বিভক্ত নই।

বোস্টন ম্যারাথনে ভাই তেমরালানের সঙ্গে প্রাণঘাতী হামলার সহ-ষড়যন্ত্রকারী জোখর তামায়েভ[৯] তদন্তকারীদের জানায়, তারা ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়েছে।[১০] ২০১৬ সালের জুন মাসের অরল্যান্ডো পালসের নাইট ক্লাবে গণহত্যা চালানো মার্কিন বংশোদ্ভূত ওমর মতিন প্রত্যক্ষদর্শীদের বলেছিল, সে তার আদি বাসস্থান আফগানিস্তানে চলমান মার্কিন যুদ্ধের প্রতিশোধ নিচ্ছে। প্যাটেনস কার্টার নামের এক যুবতি (তার পায়ে মতিন গুলি করেছিল এবং সে ক্লাবের বাথরুমে তিন ঘণ্টা জিম্মি ছিল) জানায়, 'রক্তে গড়াগড়ি খাওয়া আহত এবং গুলিবিদ্ধ সবার নিকট এই হামলার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাথরুমে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা তাকে ৯১১-এর সঙ্গে কথা বলতে শুনতে পায়। সে ৯১১-এ কল করে এই হামলার কারণ ব্যাখ্যা করেছিল। সে মোবাইলে বলেছিল, সে চায় আমেরিকা তার দেশে বোমাবর্ষণ বন্ধ করুক।[১১]

৪৯ জনকে হত্যা এবং ৫৩ জনকে আহত করার সেই নৃশংসতার মাঝেও মতিন ফেসবুকে পোস্ট করেছিল। সে পোস্ট করেছিল: 'তোমরা আমাদের ওপর বিমান হামলা চালিয়ে নিরীহ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করো... এখন আইএস-এর প্রতিশোধের স্বাদ গ্রহণ করো।'[১২] ঘটনার সবটুকু রেশ কেটে যাওয়ার পর তার ৯১১ কল রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রমাণ ছিল আরও স্পষ্ট। আইএস নেতাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মতিন তার দাবিসমূহ উত্থাপন করে: 'তোমাদেরকেই মার্কিন সরকারকে সিরিয়া ও ইরাকে বোমা ফেলা বন্ধ করার জন্য বলতে হবে। তারা অগণিত নিরীহ মানুষ হত্যা করছে। আমার ভাইয়েরা সেখানে মারা যাচ্ছে। তাই আমি এখানে বসে এটা বাদে অন্য কীই-বা করতে পারি? আমি যা বলছি তা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ?... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিমান হামলা বন্ধ করতে হবে। তাদের বিমান হামলা বন্ধ করা দরকার, বুঝেছ?... তোমাদের উচিত মার্কিন সরকারকে বোমা ফেলা বন্ধ করার জন্য বলা। তারা অগণিত শিশুকে হত্যা করছে, তারা অগণিত নারীকে হত্যা করছে, বুঝেছ? আমি সিরিয়ায়, ইরাকে এবং সমস্ত মুসলিম বিশ্বজুড়ে নিহত হওয়া মানুষের বেদনা অনুভব করি। সিরিয়ায়, ইরাক ও আফগানিস্তানে অগণিত নিরীহ মহিলা ও শিশু মারা যাচ্ছে, বুঝেছ?'[১৩]

অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে যে ওমর মতিন কোনো বউ পেটানো মানসিক বিকারগ্রস্ত কিংবা গুন্ডা ছিল না। যৌনতা কিংবা আক্রমণ করা সেই বিশেষ নাইটক্লাব[১৪] নিয়েও তার কোনো সমস্যা ছিল না; বরং প্রসঙ্গটি ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। মতিন মাতলামি করে তার ছোট্ট জীবনকে কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু, এর পরিবর্তে সে সিরিয়ার আল-কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেটের অ্যাজেন্ডার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে প্রতিবাদ হিসেবে একটি জনাকীর্ণ নাইটক্লাবে আক্রমণ করাকে বেছে নিয়েছে। মতিন কয়েক ডজন নিরীহ মার্কিনকে হত্যা করার সময় আফগানিস্তানে চলমান দখলদারি ও বোমা হামলার কথা উল্লেখ করে। প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, এই ধরনের ঘটনা এবং হামলা ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। আমাদের সরকার বলেছিল যে, মার্কিন বাহিনী 'সেখানে তাদের সঙ্গে লড়াই করছে, যাতে করে আমাদের এখানে তাদের সঙ্গে লড়তে না হয়।' কিন্তু পরিবর্তে সেখানকার যুদ্ধ আমাদের এখানের পরিস্থিতিকে আরও মারাত্মক করে তুলেছে।[১৫]

অরল্যান্ডো হামলার এক মাস পর আফগান যুদ্ধের অন্যতম অংশীদার জার্মানিতেও আঘাত হানা হয়। রিয়াজ খান আহমদজাই ওরফে মোহাম্মদ রিয়াদ নামক এক পাকিস্তানি তরুণ একটি ছোট কুড়াল নিয়ে নর্থ-বাভারিয়ার একটি ট্রেন স্টেশনে মানুষের ওপর হামলা শুরু করে। অথচ বিগত সব রেকর্ড অনুযায়ী, সে জার্মানিতে নতুন জীবনের সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই সামঞ্জস্য করে চলছিল। পালানোর চেষ্টার সময়েও সে এক নিরীহ মহিলাকে আক্রমণ করে। এই ঘটনায় সর্বমোট ছয়জন গুরুতর আহত হয়। পুলিশ জানায়, আফগানিস্তানে বিমান হামলায় সম্প্রতি নিহত হওয়া এক বন্ধুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই সে এরূপ করেছিল। হামলার পরপরই আইএস প্রকাশিত একটি ভিডিও বার্তায় আহমদজাই বলে, 'আমি ইসলামি খেলাফতের অন্যতম সৈনিক। আমি জার্মানিতে একটি আক্রমণ করতে যাচ্ছি। আমাদের ভূমিতে এসে আমাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করাকে প্রতিহত করার সময় এসেছে। আমাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করাকে প্রতিহত করার সময় এসেছে। আমাদের মুরতাদ রাজনীতিবিদেরা কখনোই তোমাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেনি। মুসলমানরাও তোমাদের সঙ্গে লড়াই বা এমনকি তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু, এই সময় এখন গত হয়েছে।'[১৬]

২০১০ সালে উইকিলিকস প্রকাশিত সিআইএ নথিতে ন্যাটো সদস্য ফ্রান্স ও জার্মানির সরকার ও জনগণের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ প্রয়োগ এবং

গুজব রটানোর তথ্য উঠে আসে। আমেরিকা আশঙ্কা করছিল, অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান লোকসানের কারণে এই দুই দেশ যুদ্ধ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে পারে। সেই নথিতে প্রেসিডেন্ট ওবামার অনুরোধ, নারী অধিকারের হুমকি এবং বেসামরিক হতাহতের ঝুঁকি সম্পর্কে বলা হয়। দখলদারির পক্ষে সমর্থন নিশ্চিত করতে এই বিষয়গুলো উদারপন্থি ফরাসিদের জন্য সেরা টোপ ছিল। পাশাপাশি জার্মানরাও জঙ্গি হামলার হুমকি, হেরোইন চোরাচালান এবং আফগানিস্তান থেকে আসা শরণার্থী সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ছিল।[১৭] অতএব, তারা আমাদের সহযোগী হিসেবেই রয়ে যায়। যদিও যুদ্ধ এখন পরাজয়ের দিকেই এগিয়ে চলছে।

২০১৭ সালের ২১ জুন মিসরীয় বিমানবন্দরে আমোর এম ফতুহি নামক এক কানাডিয়ান মুসলমান ছুরি দিয়ে এক পুলিশকে আক্রমণ করে আহত করে। পুলিশের বন্দুক কেড়ে নিয়ে আরও কিছু করার আগেই অন্য পুলিশ এবং রক্ষীরা তাকে আটক করতে সক্ষম হয়। পুলিশ জানায়, ছুরিকাঘাতের সময় হামলাকারী চিৎকার করে বলেছিল, 'তোমরা সিরিয়া, ইরাক ও আফগানিস্তানে মানুষকে হত্যা করছ। তাই তোমাদেরও মরতে হবে।' যখন তাকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সে 'আল্লাহু আকবর' বলে স্লোগান দেয় (এটিই মূলত সব মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল)[১৮]। এরূপ কোনো ঘটনা ঘটলেই বৈদেশিক নীতিনির্ধারক এবং সামাজিক গণমাধ্যমের হর্তাকর্তারা ঘোষণা করে, তাদের বিশেষজ্ঞসুলভ মতামত আবারও প্রমাণিত হয়েছে। এই বিশেষজ্ঞসুলভ মতামতটি হলো: 'ইসলাম মানুষকে উন্মাদ হত্যাকারী বানায়! তাদের ধর্মীয় নিষ্ঠা যত গভীর হয়, তারা ততই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে!'

এফবিআই লস অ্যাঞ্জেলেস অফিসের ২০১১ সালের একটি প্রতিবেদনে ক্রমবর্ধমান মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে হামলার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়: 'ভিন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃত সামরিক উপস্থিতি এবং ইসলামপন্থিদের প্রচারণা।' এই প্রচারণের মধ্যে আল-কায়েদা মতাদর্শ প্রচারক আনোয়ার আওলাকির বক্তব্যও রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আগ্রাসন মোকাবিলায় প্রতিরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে এসব বক্তারা 'জঙ্গিবাদ'কে প্রচার করে।[১৯]

নাইন-ইলেভেনের পর থেকে মার্কিন প্রশাসনের আট শতাধিক জঙ্গিবাদবিরোধী অভিযানে আটক কেউই মার্কিন জনগণের 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' কিংবা 'তাদের উদারপন্থা'র প্রতি ঘৃণার কথা ব্যক্ত করেনি। প্রত্যেকেই কেবল মার্কিন প্রশাসনের জুলুম ও সহিংসতার কথাই উল্লেখ করেছে।

দেশের মাটিতে এসব হামলার পর আমাদের সুরক্ষার নামে মার্কিন প্রশাসন তাদের নজরদারির ক্ষমতাকে ব্যাপক সম্প্রসারণ করে। ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধটি যুক্তরাষ্ট্রেও চলে এসেছে। পুলিশকে সামরিকায়নের মাধ্যমে জঙ্গিবাদবিরোধী লড়াইয়ের অজুহাতে আমাদের অস্ত্রকে আমাদের দিকেই তাক করা হচ্ছে। বিমানবন্দরে অসংখ্য নারী, পুরুষ এবং শিশুদের নিরবচ্ছিন্ন তল্লাশি করা হচ্ছে। বাক্‌স্বাধীনতা ও সভা-সমাবেশে কড়াকড়ির মতো স্বেচ্ছাচার ও জুলুম আমেরিকাতে এখন ডালভাতে পরিণত হয়েছে। মার্কিন জনগণের ওপর সিআইএ[২০] ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির (NSA)[২১] ব্যাপক নজরদারির আইনি বাধা অপসারণ করা হয়েছে। অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে আইনি বাধা দূর করার মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকার সাধারণ নাগরিকদের জীবনে আরও বেশি হস্তক্ষেপ করতে পারছে। প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের মাধ্যমে অযাচিত তল্লাশি ও গ্রেপ্তার থেকে সুরক্ষা দেওয়া ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টকে বাতিল করা হয়েছে।[২২] ন্যাশনাল ডিফেন্স অথোরাইজেশন অ্যাক্ট ২০১২-এ নানা আইনি ফাঁকফোকর রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিল অব রাইটসের অধীনে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মার্কিন নাগরিকসহ সব আমেরিকান জনসাধারণকে সামরিক বাহিনী বিনা অভিযোগে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক করে রাখার অনুমোদন পায়।[২৩]

এমনকি আইনের কোনো তোয়াক্কা না করেই প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মার্কিন নাগরিক আনোয়ার আওলাকিকে ইয়েমেনে ড্রোন হামলার মাধ্যমে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৪] প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স, সম্মিলিত কেন্দ্র, তথ্য আদান-প্রদান ও সামরিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থায় আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে কম স্বাধীনতা বিদ্যমান। আদালতও জরুরি অবস্থার নামে প্রাদেশিক ব্যবস্থার ও বিল অব রাইটস বা অধিকার অধ্যাদেশের এই রোহিতকরণকে বৈধতা দিচ্ছে। এটাকেই ওসামা বিন লাদেন 'দমবন্ধ জীবন' নামে অভিহিত করেছিলেন।[২৫] বিন লাদেন চাইতেন যে, মার্কিন সরকার যেন তাদের জনগণের ওপর এরূপ কিছুই চাপিয়ে দেয় এবং তাদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করাই যথেষ্ট। অথচ, তা না করে নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া কি আমাদের কাম্য? জঙ্গিদের দাবির কাছে মার্কিন সরকারের নত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, এই যুদ্ধে জড়িয়ে সরকার ঠিক তা-ই করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নীতির মাধ্যমে অসংখ্য নতুন শত্রুর জন্ম

দিয়েছে। অধিকন্তু, যে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই লড়াই, তারা সেই গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার চূড়ান্ত বিনাশসাধন করে ছেড়েছে। ভুল কাজগুলো বন্ধ করাই হবে সঠিক সিদ্ধান্ত। সুতরাং, আগ্রাসন বন্ধ করাই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারের ক্ষমতার অযাচিত সম্প্রসারণ ও জঙ্গি হামলা বন্ধ করার সর্বোত্তম উপায়।

তথ্যসূত্র

১. Patrick Cockburn, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, December 8, 2009.

২. "Emails from Nidal Malik Hasan," New York Times, written in 2009, published August 20, 2013.

৩. Robert D. McFadden, "Army Doctor Held in Ft. Hood Rampage," New York Times, November 5, 2009.

৪. David Johnston and Scott Shane, "US Knew of Suspect's Tie to Radical Cleric," New York Times, November 9, 2009; Mariah Blake, "Internal Documents Reveal How the FBI Blew Fort Hood," Mother Jones, August 27, 2013.

৫. Michael Daly, "Nidal Hasan's Murders Termed 'Workplace Violence' by US," Daily Beast, August 6, 2013.

৬. Chalmers Johnson, Blowback: The Costs and Consequences of American Empire (New York: Holt, 2004), 8; Chalmers Johnson, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, January 3, 2008; Risen, "Oh, What a Fine Plot We Hatched."; Wilber, "CIA Clandestine Service History."

৭. "Najibullah Zazi Reveals Chilling Details on Al Qaeda Training and Terrorist Plot to Blow Up Subways," New York Daily News, February 23, 2010.

৮. Howard Chua-Eoan, "Faisal Shahzad: The Broadway Bomber," Time, May 8, 2010.

৯. homas Gibbons-Neff, "I Could Justify Fighting in Afghanistan — Until the Boston Bombing," Washington Post, April 26, 2013.

১০. Kevin Deutsch, "Orlando Shooting Suspect Showed Signs of Violence, Reports Say," New York Newsday, June 13, 2016.

১১. Katie Zezima et al., “Orlando Gunman Said He Carried Out Attack to Get ‘Americans to Stop Bombing His Country,’ Witness Says,” Washington Post, June 14, 2016.

১২. Brian Bennett and Del Quentin Wilber, “Orlando Gunman, During Pause in His Rampage, Searched Social Media for News of It,” Los Angeles Times, June 16, 2016.

১৩. Omar Mateen, “Transcript of 911 Calls,” Public Intelligence, June 12, 2016.

১৪. James Rothwell and Harriet Alexander, “Orlando Shooter Omar Mateen Was ‘Mentally Unstable Wife-Beating Homophobe,’” Daily Telegraph, June 13, 2016.

১৫. James Bradley, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, June 27, 2016.

১৬. Melissa Eddy, “Afghan Teenager Spoke of Friend’s Death Before Ax Attack in Germany,” New York Times, July 19, 2016.

১৭. CIA Report into Shoring Up Afghan War Support in Western Europe, ‘CIA Red Cell: A Red Cell Special Memorandum, Afghanistan: Sustaining West European Support for the NATO-led Mission – Why Counting on Apathy Might Not Be Enough,’” March 11, 2010, WikiLeaks release: March 26, 2010.

১৮. David Komer, “Terror Suspect Who Stabbed Flint Airport Officer ID’d as Canadian Amor Ftouhi,” Fox 2 WJBK News.

১৯. Anwar Nasser Aulaqi CT-Sunni Extremist – Middle East,” Federal Bureau of Investigation, November 26, 2010.

২০. Andrew Griffin, “Wikileaks Publishes Massive Trove of CIA Spying Files in ‘Vault 7’ Release,” Independent, March 7, 2017.

২১. “NSA Primary Sources Catalog of Edward Snowden Documents and Articles,” Electronic Frontier Foundation, accessed May 23, 2017.

২২. Robert A. Levy, “The USA Patriot Act: We Deserve Better,” Liberty, November 1, 2001.

২৩. Yunji De Nies, “With Reservations, Obama Signs Act to Allow Detention of Citizens,” ABC News, December 31, 2011; “President Obama Signs Indefinite Detention Bill into Law,” American Civil Liberties Union, December 31, 2011; Zuri Davis, “Detained Without a Trial: Sen. Rand Paul’s New Legislation Will Combat Unconstitutional Indefinite Detention,” Rare, June 8, 2017.

২৪. “Attorney General Eric Holder Speaks at Northwestern University School of Law,” United States Department of Justice, March 5, 2012; “Memorandum for the Attorney General Re: Applicability of Federal Criminal Laws and the Constitution to Contemplated Lethal Operations Against Shaykh Anwar al Aulaqi,” Office of the Assistant Attorney General, July 16, 2010.

২৫. “Bin Laden’s Sole Post-September 11 TV Interview Aired,” CNN, February 5, 2002; Osama bin Laden, Quotations from Osama Bin Laden, ed. Brad K. Berner (Oracle, AZ: Peacock, 2006), 77.

নতুন বিশ্বে স্বাগত

নাইন-ইলেভেনের কয়েক সপ্তাহ পর আমি টিভিতে অদ্ভুত কিছু লক্ষ করেছিলাম। একজন সাংবাদিক দুই তরুণ ভাইকে প্রশ্ন করে যে, এই নতুন যুদ্ধে তারা ভবিষ্যতে কী করতে চায়। তারা কি আমেরিকার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে চায়? দুই ভাইয়ের মধ্যে বড়জনের বয়স হয়তো ১৬ বছর হবে। ছোটজনের বয়স কোনোভাবেই ১২-র বেশি ছিল না। অর্থাৎ তারা দুজনই ছিল শিশু। আফগানিস্তানে লুকিয়ে থাকা কয়েক শ অপরাধীর বিরুদ্ধে শুরু হতে যাওয়া এই যুদ্ধে দুজন শিশু বড় হয়ে অংশ নেবে কি না, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল, ওই সাংবাদিকের ধারণাই সঠিক ছিল। অর্থাৎ, এই যুদ্ধ আরও বহুদিন চলমান থাকছে।

এটা মূলত অন্তহীন এক যুদ্ধ। বুশ, ওবামা ও ট্রাম্প প্রশাসনের ভাষায় এই 'সংঘাতের সম্মিলন' 'প্রজন্মান্তরে' চলবে। পৃথিবীর আরেক প্রান্তের পাহাড়ে লুকিয়ে থেকে নিজেদের ভূখণ্ডের জন্য যুদ্ধ করা একদল জরাজীর্ণ লোকের বিরুদ্ধে এই 'দীর্ঘ লড়াই' আগামী কয়েক যুগ চলমান থাকবে। অথচ, অতীতে এটাকে অবাস্তব মনে হয়েছিল। মনে আছে কি? বলা হচ্ছিল, '১১ সেপ্টেম্বর সব বদলে গিয়েছে!' দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আবেগ, নিশান আর স্লোগানের কাছে যুক্তির পরাজয় ঘটেছিল। 'হয় তুমি আমাদের সঙ্গে, নইলে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে!'[১] সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল, আমরা 'স্বাধীনতার জন্য লড়ব'[২] এবং 'বিশ্বকে এই শয়তানের কাছ থেকে মুক্ত করব'।[৩] সব গণমাধ্যম সোৎসাহে এই কথা প্রচার করছিল। 'ইউএসএ, আমরাই সেরা!'— সবাই একই স্লোগান দিচ্ছিল। টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির টিভি নিউজগুলো ঢাকঢোল পিটিয়ে, জাঁকজমকপূর্ণ গ্রাফিকসে 'পরবর্তী লড়াইয়ের প্রহর গণনা' করছিল। 'আমাদের সরকারের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, সেটা আফগানিস্তানেই হোক

বা অন্য কোথাও।' কিন্তু অতীতেও তারা এরূপ প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। দেড় যুগের ব্যর্থতার পর বর্তমানে এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

'এই আগ্রাসনের মেয়াদ ১৫ বছর না হয়ে ৩০ বছর হলে চলমান সংকটের সমাধান হবে'— এমনটা ভাবা পুরোপুরি বোকামি। এমনকি মৃত্যুর আগে আধিপত্যবাদের সমর্থক স্ফিগনিফ ব্রজেন্সকিও মেনে নেন যে 'বুশ ও ওবামার আমলেই যুক্তরাষ্ট্র সীমা অতিক্রম করেছিল।' এমতাবস্থায় সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে মিলে বন্ধুরাষ্ট্রগুলোকে আইন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে যথা শিগগির পিছু হটা উচিত ছিল।[৪]

যুক্তরাষ্ট্রের আফগান যুদ্ধের শিক্ষা একটাই। সেটা হলো, এই যুদ্ধ শুরু করাটাই উচিত হয়নি। এমনকি সব আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরও ওসামা বিন লাদেন, আইমান আল-জাওয়াহিরি এবং তাদের কয়েক শ মিত্রের পেছনে সেনা পাঠানো ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোনো উপায় না থাকলেও, শুধু ৯/১১ হামলাকারীদের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করলে হয়তো ২০০১-এর শেষ নাগাদই তাদেরকে আটক কিংবা হত্যা করা সম্ভব হতো। বিন লাদেন হাতছাড়া হওয়াটা বাদ দিলে ২০০১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের সফলই বলা চলে। আল-কায়েদার বিরুদ্ধে ২০০১ সালের প্রারম্ভিক হামলায় অংশ নেওয়া একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা সাংবাদিক রবার্ট ড্রেফাসকে বলেন, 'আমরা বি-৫২ ও এফ-১৬ দিয়ে তোরাবোরায় ১৫ হাজার পাউন্ড বোমা নিক্ষেপ করছিলাম। আমরা তাদেরকে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিলাম যে, লাশ গুনতে গেলে বিচ্ছিন্ন দেহাবশেষ একত্র করা লাগত।' আল-কায়েদার ১৮০-র কাছাকাছি সদস্য পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলেও তাদের তাৎক্ষণিক পরাজয়ের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। র‍্যান্ড করপোরেশনের সাবেক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ব্রায়ান জেনকিন্সের মতে, ২০০৬ সাল নাগাদ আল-কায়েদার নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি বলতে '১০ জনের মতো ব্যক্তিই অবশিষ্ট ছিল।' বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা ছিল মূলত বিন লাদেন এবং তার সহযোগীবৃন্দ। সিআইএ আফগান যুদ্ধের শুরুর দিকে আল-কায়েদার কম্পিউটার, ফাইল এবং সাংগঠনিক রেকর্ডসহ বিরাট তথ্যভান্ডার জব্দ করেছিল। সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে এবং নিরাপত্তা বাহিনী দক্ষতার সঙ্গে আদি ও মূল আল-কায়েদাকে 'সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবে নির্মূল করা হয়েছিল।' সিআইএ'র একজন অবসরপ্রাপ্ত স্টেশনপ্রধান জানান, 'আল-কায়েদার হার্ডড্রাইভগুলো পাওয়ার পরই আমাদের তথ্যের পরিসীমা অনেক দূর প্রসারিত হয়।' এই তথ্যভান্ডারের সাহায্যে আমাদের কর্মকর্তারা পৃথিবীর নানা প্রান্তের আল-কায়েদা সদস্যদের চিহ্নিত করতে পেরেছে। সিআইএ'র

আরেকজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা জানান, 'পৃথিবীজুড়ে পাঁচ বছর যাবৎ আমরা দৈনিক কয়েকজন করে জঙ্গিকে হত্যা কিংবা আটক করেছি। এই সংখ্যাটি প্রায় ৪ হাজার পৌঁছাচ্ছে।'[৫]

৯/১১ হামলার মূল পরিকল্পনাকারী খালিদ শেখ মুহাম্মদ এবং তার সহযোগী রামজি বিন আল-সিবহকেও পাকিস্তানে আটক করা হয়েছিল।[৬] আল-কায়েদার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদেরও হত্যা করা হতে থাকে। বুশের ভাষায়, এতে করে 'বিন লাদেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।' সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে এভাবেই বিজয় অর্জিত হয়েছিল এবং সহজ ভাষায় সেটাই ছিল লড়াইয়ের সমাপ্তি।

কিন্তু বুশ প্রশাসন কথিত জঙ্গিবাদকে সম্ভাব্য বিরাট বিপদ হিসেবে উপস্থাপন করতে থাকে। তারা বলে, এই জঙ্গিরা 'স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত' বিস্তৃত অঞ্চলে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়।[৭] প্রকৃতপক্ষে সৌদি ও পারস্য উপকূলীয় দেশগুলোর গুটিকয়েক রাজপুত্র ব্যতীত কোনো রাষ্ট্রই আল-কায়েদাকে সমর্থন করেনি। এমনকি সেই রাজপুত্রদের সমর্থনও ছিল অতিগোপনীয়। ইরানের শিয়া শাসনব্যবস্থা,[৮] ইরাকের বাথিস্ট সেক্যুলার সমাজতান্ত্রিক সরকার[৯] এবং মধ্যপ্রাচ্যের সকল দুর্নীতিবাজ বাদশাহ, আমির, সুলতান ও প্রেসিডেন্ট আল-কায়েদার শত্রুর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরাই ছিল আল-কায়েদার ক্ষোভের অন্যতম জায়গা। কিন্তু ২০০২ সালে এসেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টেলিভিশনে বারবার 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করছিল। তারা বলছিল, যেকোনো মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে বা আমাদের মিত্র দেশগুলোতে হামলা হতে পারে।[১০]

যাহোক, জঙ্গিদের হত্যা ও আটক করা সত্ত্বেও সর্বত্র তাদের উপস্থিতি ছিল এবং যুদ্ধ তখন কেবলই শুরু হচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট বুশ এমনভাবে কথা বলতেন, যেন আল-কায়েদা পৃথিবীর বিরাট অংশ দখল করে নিয়েছে। তবে প্রেসিডেন্ট বুশও একবার স্বীকার করেছিলেন যে, আল-কায়েদা 'অসংখ্য শাখাবিশিষ্ট একটি দুর্বল নেটওয়ার্কে'[১১] পরিণত হয়েছে। আল-কায়েদাকে তখন সাধারণ পুলিশ ও গোয়েন্দা কার্যক্রমের মাধ্যমেই শেষ করে দেওয়া যেত। এটাই যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানে আল-কায়েদা নেতাদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমে করা হয়েছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশ কয়েকজন অপরাধীকে খুঁজে বের না করে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে একটি বৈশ্বিক রূপ দিতে চাইলেন। এর শেষ হয়েছে ইরাকে সাদ্দাম হুসাইন, লিবিয়ায় মুয়াম্মার গাদ্দাফি প্রমুখের পতন কিংবা সিরিয়ায় বাশার আল আসাদের মতো আল-কায়েদার শত্রুদের পতন ঘটানোর চেষ্টার মাধ্যমে। অর্থাৎ, জর্জ ডব্লিউ বুশ ও বারাক ওবামা প্রশাসন মার্কিন জনগণের শত্রু আল-কায়েদার অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিন লাদেনের লক্ষ্য ছিল, আমাদের চোরাবালিতে আটকে ধীরে ধীরে শেষ করে দেওয়া, মুসলিম বিশ্বকে চরমপন্থার দিকে ঠেলে দিয়ে দল ভারী করা এবং মার্কিন মদদপুষ্ট স্বৈরশাসকদের পতন ঘটিয়ে আরব, মেসোপটেমিয়া ও লেভান্তে নয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় এখন পর্যন্ত ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। এটা আমাদের ও বৈশ্বিক অর্থনীতির ভগ্নদশার জন্য দায়ী। অন্যদিকে, আল-কায়েদা ও এর নেতা জাওয়াহিরির প্রতি স্থানীয় বিদ্রোহী দলগুলোর সমর্থন বেড়েই চলছে। ইরাক, ইয়েমেন, লিবিয়া এমনকি পশ্চিম সাহারার মালিতেও আল-কায়েদার উপস্থিতি রয়েছে।[১২] ইরাক ছাড়াও ইয়েমেন, মিসর, তিউনিসিয়া, বাহরাইন, সিরিয়া প্রমুখ সরকারের পতন হয়েছে কিংবা অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সৌদি আরবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও ২০১৪-২০১৭-র মাঝে সুন্নি অধ্যুষিত পশ্চিম ইরাক ও সিরিয়ার পূর্বাঞ্চল স্বঘোষিত ইসলামিক স্টেইটের কবলে পড়েছিল।[১৩]

২০০৩ সালে ইরাকের সংখ্যালঘু সুন্নি ক্ষমতাসীনদের হটিয়ে ওই অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র যে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছে, তা ভবিষ্যতে আরও কয়েক দশক ধরে চলমান থাকবে। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের ফলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে মিসরে ২০১১-র গণ-অভ্যুত্থানে যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের পতন ঘটে। এরপর ইসলামি রক্ষণশীল দল মুসলিম ব্রাদারহুডের পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে অভ্যুত্থানের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু এক বছর পরেই মিসরের সেনাবাহিনীতে থাকা যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মিত্ররা এক সহিংস ও রক্তাক্ত বিদ্রোহের মাধ্যমে নতুন সরকারের পতন ঘটায়।[১৪] আল-কায়েদা নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরি সে সময় মন্তব্য করেন, 'এই ঘটনা আমাদের দাবিকেই সত্য প্রমাণ' করেছে।... যুক্তরাষ্ট্র কখনোই আরব দেশগুলোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে দেবে না। কারণ, সেটা তাদের "স্বার্থের" বিরুদ্ধে যাবে।...পশ্চিমা নির্বাচনি পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে শরিয়াহ কায়েমের স্বপ্ন দেখাই মুসলিম ব্রাদারহুডের জন্য চরম বোকামি হয়েছে।' একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন, 'দূরবর্তী শত্রুরা এখনো আল-কায়েদার লক্ষ্যবস্তু।'[১৫] এর পর থেকে মিসরে সন্ত্রাসী হামলা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সিনাই উপদ্বীপে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিচ্ছে।[১৬] সংক্ষেপে বলতে গেলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব দিক থেকেই আল-কায়েদার পেতে রাখা ফাঁদে পা দিয়েছে।

মার্কিন রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দ ৯/১১ হামলার ঘটনাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন অ্যাজেন্ডা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের অতি-সম্প্রসারণের ফলে উল্টো তাদেরকে নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমেরিকাকে এই ফাঁদে ফেলতেই ওসামা বিন লাদেন ও আইমান আল-জাওয়াহিরি ঝুঁকি নিয়েছিলেন। আজকের এই ভয়ানক সময়ে মার্কিন জনগণ 'নিজেদের নিরাপদ রাখতে' এই নেতৃবৃন্দের হাতে যে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে, সেই ক্ষমতা উল্টো তাদেরকেই বিপদে ফেলেছে। আমাদের সরকারই বিশ্বব্যাপী জঙ্গি আন্দোলন সৃষ্টিতে ইন্ধন জুগিয়েছে এবং মার্কিন জনগণের বিরুদ্ধে তাদের খেপিয়ে তুলেছে। এরপর জঙ্গিদের পাল্টা আক্রমণকে পুঁজি করে তারা এমন দেশগুলোতে আগ্রাসন চালিয়েছে, যাদের সঙ্গে আল-কায়েদার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকায় নেমে মার্কিন নেতৃবৃন্দ মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বিন লাদেনের সমর্থক বৃদ্ধি করেছে। একই সঙ্গে তাদেরকে হিরো হিসেবে উপস্থাপন করার সুযোগ করে দিয়েছে। কারণ, বিন লাদেনের লোকেরা যেন বিপদের আঁচ পেয়ে সবার আগে এই অপরাজেয় সামরিক শক্তির মোকাবিলা করতে নেমে গেছে। এভাবে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের ওপর আরও অধিক পাল্টা আঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আর এই সবই করা হয়েছে জঙ্গিবাদের অজুহাতে আমাদের থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া এবং নিরাপত্তার নাম ভাঙিয়ে।

শত্রুরা যেভাবে চেয়েছে, সেভাবে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ছিল বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করা। শুধু আফগানিস্তানে লুকিয়ে থাকা বিন লাদেনের প্রকৃত সহযোগীদের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক কিংবা সামরিক অভিযান চালিয়েই সবকিছুতে সমাপ্তি টানা যেত। প্রেসিডেন্ট বুশ হয়তো বলতে পারতেন যে, 'মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক উপস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল সোভিয়েত কমিউনিজমের কালো থাবা থেকে তোমাদের রক্ষা করা। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিদেশি ঘাঁটিগুলোর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। বর্তমানে আমাদের প্রত্যাবর্তন করার সময় চলে এসেছে'। মার্কিন জনগণও তাকে এই কথা বলতে চাপ প্রয়োগ করতে পারত। ওই মুহূর্তে এবং ওই অবস্থায় বিশ্বের কাছে যুক্তরাষ্ট্র চাইলেই তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করতে পারত।

কিন্তু ৯/১১-এর হামলার ফলে আমাদের প্রতি জন্মানো সহানুভূতির অপব্যবহার করা উচিত হয়নি। আমাদের অসীম সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে এই হামলার

সঙ্গে সম্পর্কহীন উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করাও উচিত হয়নি। আমরা চাইলে মধ্যপ্রাচের সামরিক ঘাঁটিগুলো বন্ধ করে আমাদের সেনাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে পারতাম। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় অবস্থানের কারণে সেখানে তারা সমস্যা তৈরি করছে। যুক্তরাষ্ট্র এসবের বিনিময়ে আফগানিস্তান ও অন্যান্য জায়গায় একের পর এক ভিয়েতনামের জন্ম দিয়েছে। বুশ ও ওবামা প্রশাসন একত্রে ওসামা বিন লাদেন ও তার কয়েক শ সহযোদ্ধার অলীক স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর-আফ্রিকাজুড়ে নতুন করে অসংখ্য যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। সিরিয়ার বাথিস্ট সরকার ও ইরানের বিপ্লবী শিয়া সরকার পতনের ঝুঁকিতে রয়েছে। যদি যুক্তরাষ্ট্রের হাতে এদের পতন হতো, তাহলে ওসামা বিন লাদেন খুশিই হতেন।[১৭]

দিনশেষে আমাদের ব্যাপারে জঙ্গিদের ধারণাকেই আমাদের সরকার সত্য প্রমাণ করেছে। তারা এই অভিযোগে হামলা করেছিল যে, 'মার্কিনিরা হচ্ছে ভণ্ড ও বর্বর। তারা নিজেদের মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের রক্ষক দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা মিথ্যাবাদী, খুনি এবং স্বৈরাচারীদের সমর্থক।' অসংখ্য দেশে আগ্রাসন, সরকারের পতন, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, স্থানীয় ও আঞ্চলিক গৃহযুদ্ধ এবং অগণিত লোকের মৃত্যুর জন্য কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই দায়ী।[১৮] অধিকন্তু, উপরি পাওনা হিসেবে বিন লাদেনের স্বপ্ন এখন বাস্তবে রূপ নেওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।[১৯] চূড়ান্তভাবে, এই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ বর্তমানে পশ্চিমা বনাম ইসলামি সভ্যতার দ্বন্দ্বে রূপ নিচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১. "Bush: 'You Are Either with Us, or with the Terrorists,'" Voice of America News, October 27, 2009.

২. George W. Bush, "Address to a Joint Session of Congress and the American People."

৩. Manuel Perez-Rivas, "Bush Vows to Rid the World of 'Evil-Doers,'" CNN, September 16, 2001.

৪. Zbigniew Brzezinski, "Toward a Global Realignment," American Interest, April 17, 2016.

৫. Dreyfuss, "The Phony War."

৬. Terry McDermott and Josh Meyer, "Inside the Mission to Catch Khalid Sheikh Mohammed," Atlantic, April 2, 2012; Maria

Ressa et al., “Top Al Qaeda Operative Caught in Pakistan,” CNN, March 1, 2003.

৭. George W. Bush, “Remarks to the Woodrow Wilson International Center for Scholars,” 41 Weekly Comp. Pres. Doc. 1855 (December 14, 2005).

৮. Philip Giraldi, “Shaping the Story on Iran,” Antiwar, May 20, 2010; Gareth Porter, “Burnt Offering,” American Prospect, May 21, 2006; Robert Windrem, “US, Iran Secretly Discussed Swap of al Qaeda Detainees for Iranian Dissidents,” NBC News, March 15, 2003.

৯. Matt Barganier, “Scheuer Corrects National Review, Weekly Standard,” Antiwar, April 18, 2007.

১০. Tom Vanden Brook, “Waterboarding Didn’t Work, Committee Report Finds,” USA Today, December 9, 2014.

১১. George W. Bush, “Remarks to the National Endowment for Democracy,” 41 Weekly Comp. Pres. Doc. 1502 (October 6, 2005).

১২. Jeremy Keenan, “How Washington Helped Foster the Islamist Uprising in Mali,” New Internationalist, December 2012.

১৩. Patrick Cockburn, The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution, rev. ed. (New York: Verso, 2015).

১৪. Cheryl K. Chumley, “John Kerry: Egypt’s Army Was Only ‘Restoring Democracy,’” Washington Times, August 2, 2013.

১৫. Ayman al-Zawahiri Says US Behind Coup Against Mohamed Morsi,” Guardian, August 3, 2013; “Al-Qaeda Head Ayman al-Zawahiri Accuses US of Plotting Removal of Mohammed Morsi in Egypt,” Telegraph, August 3, 2013.

১৬. Yusri Mohamed et al., “Islamic State Kills 12 Military Personnel in Egypt’s Sinai,” Reuters, October 14, 2016; Omar Fahmy, “Egypt Says Air Strikes Kill Islamic State Leaders in Sinai,” Reuters, April 20, 2017.

১৭. Paul Richter, “US Designates Anti-government Iran Militant Group as Terrorist,” Los Angeles Times, November 4, 2010; Brian Murphy and Kareem Fahim, “Islamic State Claims New

Reach into Iran with Twin Attacks in Tehran," Washington Post, June 7, 2017; "Al-Qaeda's Zawahiri Calls for 'Guerrilla War' in Syria," alJazeera, April 24, 2017.

১৮. International Physicians for the Prevention of Nuclear War et al., "Casualty Figures After 10 Years of the 'War on Terror,' Iraq, Afghanistan, Pakistan."

১৯. Syed Saleem Shahzad, Inside al Qaeda and the Taliban: Beyond bin Laden and 911 (Chicago: Pluto, 2011); 137-139.

ম্যাটিস বনাম ম্যাকমাস্টার

প্রেসিডেন্ট হওয়ার ন্যূনতম পাঁচ বছর আগে থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্প আফগান যুদ্ধের সমালোচনা করতেন।[১] প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প জেনারেলদের কাছে হার মেনে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে আরও অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনে বাধ্য হন। এর আগপর্যন্ত অসম্ভব এই অভিযানে আরও অর্থ এবং প্রাণবিসর্জন দিতে ট্রাম্প স্পষ্টতই ইতস্তত করছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আফগানিস্তানে লড়াইরত সেনাদের শক্তিশালী করতে আরও সেনা পাঠানোর মানে হলো কেবল মনকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং এই অপ্রয়োজনীয় ভয়াবহ এই যুদ্ধকে আরও দীর্ঘায়িত করা।

নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়ের অন্যতম একটি কারণ ছিল বিগত দশকের যুদ্ধ নিয়ে অনুশোচনা এবং নতুন কোনো সংঘাতে জড়ানোর প্রতি অনীহা। ট্রাম্পের মতে, ২০০১ সালে আফগানিস্তানে না গেলেই ভালো হতো। এটিই প্রকৃত সত্য। যেখানে আমাদের নিজেদের অবকাঠামোই দৈন্যদশায় ও অবক্ষয়ের মাঝে পতিত, সেখানে আমরা বহির্বিশ্বে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছি। এত কিছুর পরও মধ্যপ্রাচ্যে ১৫ বছর আগের চেয়ে বর্তমানের পরিস্থিতি অনেক বেশি ভয়াবহ। আমাদের প্রেসিডেন্টরা যদি এই ১৫ বছরের জন্য ছুটিতে চলে যেতেন, তাহলে সম্ভবত আমাদের অবস্থা এর চেয়ে ভালো থাকত। আমি জোর দিয়ে বলতে পারব, বাস্তবে এরূপ কিছু ঘটলে নিঃসন্দেহে আমাদের অবস্থা বর্তমানের চেয়ে ভালো হতো। কারণ, এই অর্থ দিয়ে আমাদের দেশকে তিনবার পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব ছিল।[২]

তবে ট্রাম্প একবার এটিও বলেছিলেন যে, 'আমি আফগানিস্তানে থেকে যাব। মধ্যপ্রাচ্যের (?) একমাত্র এই স্থানেই আমাদের গমন করা যুক্তিযুক্ত ছিল। এর পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। তাই আমার মতে, সেখানে থেকে নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত। যদিও আমি জানি যে পরিস্থিতি

কখনোই খুব ভালো একটা হবে না। কিন্তু আমাদের হাতে অন্য কোনো বিকল্পও নেই। নিঃসন্দেহে ইরাকে যাওয়ার পরিবর্তে কেবল আফগানিস্তানে যাওয়া উচিত ছিল। আমি আফগানিস্তানে শুধু এ কারণেই থাকতে চাই যে এটি পাকিস্তানের পাশে অবস্থিত। এই কাজ যদিও আমার পছন্দনীয় নয়। কিন্তু অত্যন্ত অপছন্দ সত্ত্বেও আমি এটা করব। কেননা পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে।'[৩] অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতে, পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র যাতে চরমপন্থিদের হাতে না যায়, সে জন্য উপযুক্ত দূরত্বে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি জরুরি। তাত্ত্বিকভাবে এই পাকিস্তানে আশপাশে থাকার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিলেও, ভারত মহাসাগরীয় পাকিস্তানের উপকূলে বিমানবাহী জাহাজে মার্কিন স্পেশাল ফোর্স, মেরিন এবং নেভির বৈমানিকেরা স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে পারে। আফগানিস্তানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন।

আফগানিস্তানে তালেবানের মোকাবিলায় অতিরিক্ত ১০-১৫ হাজার সেনা মোতায়েনের ফলাফল প্রায় শূন্য। কিন্তু সামরিক কর্মকর্তারা নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলেন না। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের আগেই হেলমান্দ প্রদেশের লস্করগহ শহরের নিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করা আফগান সেনাদের 'পরামর্শ ও সহায়তার' জন্য সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৪] ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অবহিত করা ছাড়াই ফেব্রুয়ারি মাসে আফগান যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল জন নিকলসন সিনেটর জন ম্যাককেইনের আর্মড সার্ভিসেস কমিটিকে বলেন, 'হেলমান্দ প্রদেশে তালেবান ও আফগান ন্যাশনাল আর্মির মধ্যকার অচলাবস্থা দূর করতে তাৎক্ষণিকভাবে কয়েক হাজার সেনা হেলমান্দে প্রেরণ করা প্রয়োজন।'[৫] কয়েক সপ্তাহ পরেই সেন্ট্রাল কমান্ডের বর্তমান অধিনায়ক জেনারেল জোসেফ ভোটেল জনসমক্ষে এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। এটা ছিল ২০০৯ সালে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মতো ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও 'আটকানোর লক্ষ্যে' সেনাবাহিনীর প্রচেষ্টার কেবল সূচনা।

অথচ, এসবের আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই পদক্ষেপগুলো সামরিক নেতৃবৃন্দের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নির্বাচনি ইশতেহারে মধ্যপ্রাচ্যের সেক্যুলার সরকারগুলোর অপসারণ ও জাতিরাষ্ট্র নির্মাণপ্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি দ্রুততম সময়ে 'ইসলামপন্থি উগ্রবাদী জঙ্গিদের' সম্পূর্ণ নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা করেন।

এ জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই মধ্যপ্রাচ্যে আল-কায়েদা ও আইএস ঘাঁটিগুলোতে আরও ব্যাপকভাবে বিশেষ অভিযানের অনুমোদন দেন।[৬] তিনি আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্কিত আল-শাবাবের বিরুদ্ধে লড়তে সেনাবাহিনীকে সোমালিয়ায় এবং আইএসের বিরুদ্ধে লড়তে পশ্চিম ইরাক ও সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে প্রেরণ করেছেন। তার নির্দেশে আল-কায়েদা ও সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে সরকারি স্থাপনাকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানো হয়। তিনি লিবিয়ায় আইএস ঘাঁটিতেও বোমা হামলার আদেশ দেন।[৭] ডোনাল্ড ট্রাম্প আল-কায়েদার পাশাপাশি তাদের শত্রু ইয়েমেনের হুতিদের বিরুদ্ধেও বড় ধরনের অভিযান পরিচালনা করেছেন।[৮] ধারণা করা হয়, এরূপ আরও অনেক অজ্ঞাত অঞ্চলে এই ধরনের অভিযান চলমান রয়েছে।

আফগান যুদ্ধে অনীহা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের একমাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্টিভঙ্গি। সামরিক পরামর্শকদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রতিক্রিয়ায় তিনি তার শাসনামলের প্রথম কয়েক মাস সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করেন। পাশাপাশি তিনি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদকে বারবার নতুন পরিকল্পনা হাজির করতে নির্দেশ দেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের নীতিনির্ধারক কমিটির প্রত্যেকেই আফগানিস্তানে ব্যর্থতার জন্য দায়ী অথবা কোনো না কোনোভাবে জড়িত। প্রতিরক্ষাসচিব ম্যাটিস আফগানিস্তান আগ্রাসনের সময় নেভি জেনারেল ছিলেন।[৯] তিনি কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি বা বিদ্রোহ প্রতিরোধের কর্মসূচি প্রণয়নে প্যাট্রিয়াসকে সহায়তা করেন।[১০] পরবর্তী সময়ে তিনি যুদ্ধের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে থাকা সেন্ট্রাল কমান্ডের অধিনায়কের পদ লাভ করেন।[১১] জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক, সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ আর ম্যাকমাস্টারও কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি নীতিমালা পুনঃপ্রণয়নে পেট্রিয়াসকে সহায়তা করেন।[১২] তিনি প্রেসিডেন্ট ওবামার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনকালে কাবুলে দুর্নীতি দমনের দায়িত্বে ছিলেন। জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান মেরিন কোর জেনারেল জোসেফ ডানফোর্ড ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত ISAF এবং আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন।[১৩] চিফ অব স্টাফ মেরিন কোর জেনারেল (অব.) জন কেলির ছেলে রবার্ট ২০১০ সালে হেলমান্দ প্রদেশে টহলরত অবস্থায় বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিল। সাবেক প্রতিনিধি ও বর্তমানে CIA ডিরেক্টর মাইক পম্পে এবং সাবেক সিনেটর ও বর্তমানে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক ড্যাম কোটস উভয়ই কংগ্রেসে যুদ্ধের পক্ষে কথা বলে আসছেন।

সুস্পষ্টভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই দীর্ঘতম যুদ্ধটি সবদিক দিয়ে ব্যর্থ। এই নীতিনির্ধারকদের জন্য সেখানে চিরকাল থাকার অর্থ সুস্পষ্ট পরাজয় নয়। কিন্তু চলে আসার অর্থ তালেবানের কাছে পরাজয় স্বীকার করে অপমানিত হওয়া এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর অনুপস্থিতিতে পশতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় তাদেরকে প্রকাশ্যে শাসন করতে দেওয়া। এগুলো মেনে নেওয়া এই ঊর্ধ্বতন লোকজনের পক্ষে অসম্ভব।

কেলির ভাষ্যমতে, 'কয়েকজন পরামর্শক আর গুজববাজ "লড়াইয়ে ক্লান্ত" হয়ে আফগানিস্তান কিংবা ইরাক ত্যাগ করতে চাচ্ছে। এই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে ভাবলে আপনারা ভুল করছেন। শত্রুরা আমাদের ধ্বংসের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রজন্মান্তরে তারা আমাদের মোকাবিলা করবে। এই সংঘাতের নানারূপে ফিরে আসবে। ৯/১১-এর পর থেকে এটাই ঘটছে।'[১৪] সংঘাত চিরদিন চলমান রাখার সিদ্ধান্ত নিলে সেই সংঘাত থামানোর কার্যকর পরিকল্পনা মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে না।

সবকিছুর মাঝে আসল লড়াই ঠিকই চলছিল। ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে নাঙ্গারহার প্রদেশে আইএসের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় একজন গ্রিন বেরেট মারা গেলে প্রতিশোধ হিসেবে মার্কিন স্পেশাল ফোর্স ২১ হাজার পাউন্ডের MOAB বোমা ('ম্যাসিভ অরড্যান্স এয়ার ব্লাস্ট' বা 'মাদার অব অল বম্বস') নিক্ষেপ করে।[১৫] B-52 বোমারু বিমানগুলো এখনো তালেবান ও আইএস লক্ষ্যবস্তুতে নিয়মিত হামলা চালাচ্ছে। মার্কিন সেনারা ২০১২ সালের পর থেকে যেকোনো মাসের তুলনায় ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ বোমা নিক্ষেপ করেছে।[১৬] এই MOAB ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের অশনিসংকেত দেওয়া। সেনাবাহিনীর মতে, মাটির নিচের সুড়ঙ্গে লুকিয়ে থাকা যোদ্ধাদের মারতে রাসায়নিক বোমার প্রয়োজন ছিল। তারা জানায়, আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে শত শত আইএস যোদ্ধা টিকে রয়েছে। এই যোদ্ধারাই মূলত সেইফ হ্যাভেন গল্পটির পুনর্জন্মের নায়ক। মৃত আল-কায়েদা নেতাদের পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার অলীক সম্ভাবনা না থাকলেও কাবুল সরকার দখলদারবিরোধী আফগান ও পাকিস্তানি পশতুনদের আইএস তকমা দিয়েছে। এভাবে মার্কিনরা অনাগত ভবিষ্যতের জন্য নতুন নতুন শত্রুর জন্ম দিচ্ছে।[১৭]

যাহোক, এর কিছুকাল পরেই একজন সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞ জানান, তালেবানের তুলনায় ভাবমূর্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায় আইএসের প্রধান লক্ষ্য হবে সম্ভাব্য ও সক্রিয় জিহাদিদের কাছে নিজেদের প্রচারণা। তাদের প্রচারণার পক্ষে

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই বোমা বেশ ভালোই কাজে দিয়েছে। এখনো জিহাদি গোষ্ঠীতে নাম না লেখানো মৌলবাদী ও অন্যান্য দলের সদস্যদের আকৃষ্ট করার জন্য সুড়ঙ্গের নেটওয়ার্ক ধ্বংসের খবর তাদের হয়ে প্রচারণার কাজ করে দিয়েছে। বোমা হামলা ও সামরিক অভিযান পরবর্তী সময়ে নাঙ্গারহারে খোরাসান ইসলামিক স্টেটের বেতারকেন্দ্রে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়। আইএসকে জিহাদি দল প্রমাণ করতে সাহায্য করায় এমনকি একজন নেতা এই বোমাকে আল্লাহর রহমত হিসেবে উল্লেখ করেছিল। তরুণ মৌলবাদীদের আকৃষ্ট করার উপযোগী করেই এই বার্তা প্রস্তুত করা হয়। আমেরিকা যে দলের শত্রু, এই তরুণদের কাছে সে দলই বিশ্বাসযোগ্য জিহাদি দল। একটা দল যত বেশি মার্কিন হামলার শিকার হবে, সেটা তত বেশি জিহাদি প্রমাণিত হবে। এভাবে মার্কিন সেনাবাহিনীর তৎপরতা আরও বেশি ভিনদেশি যোদ্ধাদের আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে আফগানিস্তানে টেনে আনবে। বিপরীতে, যুদ্ধক্ষেত্রে মার্কিনরা কম ভূমিকা পালন করলে এবং আবেগময় বক্তব্য দেওয়া কমালে হয়তো আফগান সেনাবাহিনীর আইএসকে পরাস্ত করার সক্ষমতা বাড়বে। কিন্তু, সবকিছু ছাপিয়ে বাড়তি সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্তই নীতিনির্ধারকদের পছন্দনীয়। গত ১৬ বছরে মার্কিন সেনাবাহিনী 'ক্ষণস্থায়ী ও অস্থায়ী' সাফল্য ব্যতীত আর কিছু অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবু এই ঠুনকো অর্জনই নীতিনির্ধারকদের একমাত্র পছন্দ।

ম্যাকক্রিস্টালের বিশিষ্ট উপদেষ্টা পররাষ্ট্র পরিষদের স্টিফেন বিডল ২০১৭ সালের এপ্রিলে গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, আফগানিস্তানে জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় সর্বজনীন অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন ব্যর্থ হয়েছে। তিনি এর কারণ হিসেবে এই অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনকে দীর্ঘস্থায়ী না করাকে দায়ী করেন। তিনি আরও অতিরিক্ত ৯০ হাজার সেনাকে আফগানিস্তানে মোতায়েনের দাবি জানান।[১৮]

এর মাধ্যমে সেনাসংখ্যা অনির্দিষ্টকালের জন্য ২০১০-১১ সালের মতো ১ লাখে উন্নীত হতো। শেষবার সেনাসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যর্থতার কোনো দায় না নিয়ে সাবেক প্রতিরক্ষা নীতির উপসচিব মিশেল ফ্লরনয় উল্টো দাবি করেন যে 'তার এবং ওবামার এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। কিন্তু সমস্যা হলো, সাবেক প্রেসিডেন্ট নিজ হাতে জয়ের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছিলেন। সেনা প্রত্যাহারের তারিখ ঘোষণা করে তিনি শত্রুদের সে পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছেন। এ কারণেই তালেবানরা লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।' ফ্লরনয় জোর দিয়ে

বলেন যে সফলতার একমাত্র উপায় হচ্ছে সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কোনো প্রশ্ন ছাড়াই আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের অবস্থান। ‘অভিজ্ঞ’(?) পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষকদের অধিকাংশই এর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন! তারা যে ভুল নীতিকে সমর্থন করছিলেন, সেটাকে তারা কখনোই স্বীকার করেন না। তারা উল্টো দাবি করেন যে সেনাবাহিনীই তাদের পরিকল্পনা অনুসরণ করেনি। অর্থাৎ, ‘সেনা বৃদ্ধি’ দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ায় অভিযানটি ব্যর্থ হচ্ছে।

যাহোক, ৯০ হাজার সেনা প্রেরণের বদলে জেনারেলরা এর চেয়ে সহজ কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছিলেন। যদিও, বিডেলের পরামর্শ ছিল ‘আর্ট অব দ্য ডিল’-এর মতো। জেনারেলরা পরবর্তী সময়ে আরও অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের কথা বললে নতুন এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি পুরো বিষয়টিকে আরও যৌক্তিক প্রমাণ করেন।[১৯] যদিও নিকলসন এবং ম্যাটিস স্পষ্টভাবে জানান, তারা ২০১৭ সালের বসন্ত নাগাদ ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার সেনা চাচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে এটি ছিল খুবই ক্ষুদ্র একটি সংখ্যা এবং চলমান ব্যর্থতা নিরসনের শেষ প্রচেষ্টা। তারপর গ্রীষ্ম নাগাদ পেন্টাগনে বহুল আলোচিত পরিকল্পনা ছিল, তালেবানের অগ্রগতি প্রতিহত করে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত ২০ হাজার সেনা মোতায়েন করা হবে।[২০] এটা এখনো অজানা যে যুদ্ধ পর্যবেক্ষকদের ঘাবড়ে যাওয়ার কারণেই এই পরিকল্পনা নাকি প্রেসিডেন্টকে আরেকটা যুদ্ধে জড়ানোর চেষ্টা?

এত কিছুর পরও একজন কর্মকর্তা অভিযোগ করেন, ওবামা প্রশাসন আফগান সরকারকে ধীরগতিতে পরাজয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত না নিলে তালেবান একসময় সরকারকে উৎখাত করবে।[২১] অন্যদিকে ন্যাটো জোটের ইউরোপীয় কমান্ডার জেনারেল কার্টিস স্ক্যাপারট্টি জানান, ‘লড়াই চালাতে সক্ষম করে গড়ে তোলা এবং তালেবানকে আলোচনায় আনতে আফগান ন্যাশনাল আর্মিকে সমর্থ করে তুলতে’ যে সময় প্রয়োজন, ততক্ষণের জন্য হলেও অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করতে হবে। তবে এই কাজে কত সময় লাগবে, তা জানানোর মতো ভুল তিনি করেননি।[২২] শোনা যাচ্ছে, জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক ম্যাকমাস্টারের একান্ত ইচ্ছা পুনরায় তালেবানের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে জড়ানো। তার রণকৌশল ‘চার বছর মেয়াদি’ একটি পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে সাজানো। কিন্তু সব পরিকল্পনার মতো এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হবে। অতীতের মতো এবারও তালেবানকে আলোচনায় আনা সম্ভব হবে না। এই পরিকল্পনায়

আগামী ১৮ মাসেও ফলাফল পাওয়ার কোনো প্রতিশ্রুতিও নেই। অতএব, আপাত পরিকল্পনা হলো, শুধু লড়াই চালিয়ে যাওয়া এবং হয়তো বহু বছর পর সুবিধাজনক কোনো অবস্থানে (যা অর্জন করা অসম্ভব) গিয়ে তালেবানের সঙ্গে আপস করা।

তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করতে আমেরিকা মে মাসে আফগান ন্যাশনাল আর্মিকে ১৫৯টি অত্যাধুনিক ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি হয়তো সম্ভাব্য অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের একটি ইঙ্গিত অথবা একটি সম্পূর্ণ বোকামি। মিলিটারি টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে একজন সামরিক বিশেষজ্ঞ বলেন, 'আফগান বিমানবাহিনীর কাছে থাকা বিমানগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতেই ব্যাপক মার্কিন সহায়তার প্রয়োজন হয়। সে বিবেচনায় এটা স্পষ্ট যে ন্যাটোর সহায়তা ছাড়া তারা এত ব্ল্যাক হক চালুই রাখতে পারবে না।' রয়টার্স জানায়, 'আফগান বিমানবাহিনীর (AAF) উড্ডয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী এবং বিমানের সংখ্যা বাড়াতে চার বছর মেয়াদি সাত বিলিয়ন ডলারের সম্প্রসারিত পরিকল্পনার অংশ ছিল এটা।'[২৩] একই সময়ে সেনাবাহিনীও তাদের মিশনের নিয়মে অনেক শিথিলতা আনে। উদ্দেশ্য, মার্কিন পদাতিক সেনাদের প্রত্যক্ষভাবে তালেবানের মোকাবিলায় ব্যবহার করা। চার-পাঁচ হাজার সেনা মোতায়েন প্রাথমিকভাবে বড় কিছু মনে না হলেও ভবিষ্যৎ সেনাসংখ্যা নির্ধারণের দায়িত্ব হোয়াইট হাউসের পরিবর্তে পেন্টাগনকে দেওয়া হয়েছিল।[২৪] আর পেন্টাগনের জেনারেলরা একেবারে শুরু থেকেই অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের পক্ষে।[২৫]

মধ্যম-বামপন্থি ব্রুকিংস ইনস্টিটিউটের মাইকেল ও'হ্যানলন ২০১৭ সালের মে মাসে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের পক্ষে মত দেন। তিনি বলেন, 'যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে আফগান যুদ্ধ শেষ হচ্ছে না, তাই যুদ্ধের আকার ও ঝুঁকির পরিমিত মাত্রা অনুসারে ডোনাল্ড ট্রাম্প অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করলে পরিস্থিতি সহনীয় হয়ে উঠবে। সকল দিক বিবেচনায় এটাই সঠিক।' পাশাপাশি ও'হ্যানলন বলেছিলেন, 'ভিয়েতনামে আমেরিকার মতো আফগান বাহিনীও সাম্প্রতিককালে বছরে ৫ হাজারের অধিক হতাহতের শিকার হচ্ছে। অথচ আমাদের আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হচ্ছে না। এই অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের অনেক কাজ অবশিষ্ট রয়েছে।'[২৬]

আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে নিয়োজিত পররাষ্ট্র বিভাগের বিশেষ প্রতিনিধি লরেল মিলার (ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক বরখাস্ত) হস্তক্ষেপবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি

সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি সংবাদমাধ্যমে স্বীকার করেন, 'আফগানিস্তান পরিস্থিতিতে কোনো বিশেষজ্ঞই মনে করেন না যে, এই যুদ্ধে আদৌ কখনো জয়লাভ সম্ভব। আফগান সরকারের পরাজয় এবং তালেবানের সামরিক বিজয় সাময়িকভাবে ঠেকানো গেলেও ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বলা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব।' এটাই সর্বজনীন মত এবং প্রশাসনও নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করছিল। কিন্তু তারপরও তারা যুদ্ধের মাত্রা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২৭]

একজন সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাদের 'জয়লাভের' প্রতিবন্ধকতা দূর হচ্ছিল না। তিনি আরও বলেন, সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা; বরং সমস্যার কারণ চিহ্নিত করতে গিয়েই তারা একমত হচ্ছিলেন না। 'লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সমস্যা সমাধানের উপায় বের করতে গিয়েও আমাদের মতভেদ হয়। এমনকি কোনো পরিকল্পনা নির্ধারণের পরও সবাই একমত হয় না।' অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের জন্য মে মাসের ১২ তারিখে সিনেটের ইন্টেলিজেন্স কমিটির সঙ্গে আলোচনার সময় জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক ড্যান কোটস স্বীকার করেন, 'তালেবানের হামলা, যুদ্ধে হতাহতের ঘটনা, পলায়ন, অপর্যাপ্ত রসদ সরবরাহ এবং দুর্বল নেতৃত্বের কারণে আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যকারিতা আরও হ্রাস পাবে।... আমেরিকা ও তার মিত্রদের অতিরিক্ত সামরিক সহায়তার পরেও ২০১৮ সালজুড়ে অবশ্যম্ভাবীভাবেই নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে।'

অবশেষে জেনারেলরা স্বীকার করতে বাধ্য হন, তালেবানকে পরাজিত করার প্রশ্নই ওঠে না। এ জন্য তালেবানকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসার জন্যই তারা পুনরায় যুদ্ধের মাত্রা বাড়াতে চাইছিলেন। জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান ডানফোর্ড এই ফলাফলের ব্যাপারে প্রচণ্ড আশাবাদী ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য তালেবানকে পরাজিত করা নয়; বরং তাদেরকে উপলব্ধি করানো যে এই যুদ্ধে তারা কখনো জিততে পারবে না। তাই আপসে যুদ্ধে সমাপ্তি টানাই উত্তম।... আপসে কারা আগে রাজি হবে তা এখন দেখার বিষয়। আমরাও ক্লান্ত হয়ে যেতে পারি। কিন্তু যুদ্ধ হচ্ছে মনের লড়াই। এই যুদ্ধে কার হারজিত হবে? যে পক্ষের মনোবল আগে ভাঙবে, তারাই পরাজিত হবে।' ডানফোর্ড বলেন, তালেবান যদি দেখে যে আমেরিকা এক বছরের মাঝেই চলে যাবে; তাহলে তখন তারা আরও সুসংগঠিত লড়াই চালিয়ে যাবে। 'তালেবানদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য যত দিন দরকার, যা করা দরকার, তাই করার প্রতিশ্রুতি যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নেয়, তাহলে গল্পটা

হয়তো অন্য রকম হবে।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাস্তবে গল্পটা অন্য রকম হয়নি। ডানফোর্ডের কথার পরিপ্রেক্ষিতেই যেন তালেবান বসন্তকালীন আক্রমণের ঘোষণা দেয়। অনেকটা এমন যে তারা কোনো কিছু নিয়েই চিন্তিত নয়![২৮]

কাবুলে ১৯৭০-এর দশকের স্কার্ট পরা নারীদের ছবি দেখিয়ে একদা ম্যাকমাস্টার বোঝাতে চেয়েছিলেন, সাবেক সোভিয়েত আমলই প্রকৃত আফগানিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করে। তালেবানদের দমন করতে আরেকটু সময় ব্যয় করলেই আফগানিস্তানে আধুনিক পশ্চিমা পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার এই পরিকল্পনায় সায় দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের। 'ইতিহাসজুড়ে বিভিন্ন পরাশক্তি যেমন, মেসিডোনিয়ার আলেক্সান্ডার থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই দেশকে কাবু করতে ব্যর্থ হয়েছে' এই মন্তব্য করে ট্রাম্প সহকর্মীদের কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন।[২৯]

'অতিরিক্ত সেনা প্রেরণ করলে পরিস্থিতির পরিবর্তন নিশ্চিত কি না, ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলো কত সংখ্যক সেনা প্রেরণ করবে এবং পাকিস্তানে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা তালেবানকে বাধা দিতে পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগ করা উচিত কি না'— এসব নিয়ে হোয়াইট হাউসে মতবিরোধের কারণে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনে বিলম্ব হয়। প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের কয়েকজন জেনারেলদের পরিকল্পনার বিরোধিতা করছিলেন। অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের বদলে তারা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত কৌশল অবলম্বনের পরামর্শ দিচ্ছিলেন। রাজনৈতিক উপদেষ্টারা বর্তমান সেনাসংখ্যা বজায় রেখেই যুদ্ধে আমেরিকার সংশ্লিষ্টতা সীমিত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্টতা সীমিত করলে, সংকট নিরসনের ভার আফগান সরকার ও তালেবানের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। তবে আফগান সরকারকে সীমিত প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেওয়া হবে। এটা চলমান পরিকল্পনার চেয়ে সময় সাপেক্ষ হলেও ব্যয় অনেক কমাবে। একজন কর্মকর্তার ভাষ্যে,'আমরা অন্যের যুদ্ধে লড়াই করি না। আমরা মিত্রদের যুদ্ধ জয়ে সহায়তা করি।'[৩০]

যাহোক, আফগানিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ পশতুনদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম কোনো সেনাবাহিনী তৈরি করা অসম্ভব। আমেরিকার সীমাহীন সহায়তার পরও আফগান ন্যাশনাল আর্মি তালেবানের পুনরুত্থান ঠেকাতে পারেনি। আফগান ন্যাশনাল আর্মি নিজেরা যে জায়গা দখল করতে পারে না, সেটা তারা নিয়ন্ত্রণও করতে পারবে না। এটাই তো বাস্তব। সীমিত সংশ্লিষ্টতা প্রস্তাব করা বেসামরিক উপদেষ্টারা এই সত্যকে মেনে নিয়েই আলোচনা করছিলেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক উপদেষ্টাগণ, তার জামাতা ও প্রধান উপদেষ্টা জেরাড কুশনার এবং সাবেক প্রধান কুশলী স্টিফেন ব্যানন আফগানিস্তান নিয়ে ভিন্ন একটি পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল। এই পরিকল্পনা মোতাবেক, আমেরিকা সকল সেনা প্রত্যাহার করবে এবং স্টিভ ফেইনবার্গের 'ডাইনকর্প ইন্টারন্যাশনাল'[৩১] এবং কুখ্যাত ব্ল্যাকওয়াটারের প্রতিষ্ঠাতা এরিক প্রিন্সের নতুন প্রজেক্ট 'ফ্রন্টিয়ার সার্ভিসেস গ্রুপ'-এর মতো ভাড়াটে খুনিদের মোতায়েন করা হবে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে সিআইএ ভাড়াটে খুনিদের ব্যবহার করেছিল বলে এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয় 'লাওস অপশন'।[৩২] ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক লেখায় এরিক প্রিন্স বলেছিলেন আমেরিকার উচিত অতীতের ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো আফগানিস্তান শাসনের জন্য 'ভাইসরয়' নিয়োগ দেওয়া।[৩৩] কিন্তু, দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধে ব্ল্যাকওয়াটার বাহিনীর ইতিহাসকে মাথায় রেখে ম্যাটিস এবং ম্যাকমাস্টার উভয়েই এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধে ব্ল্যাকওয়াটার বাহিনী সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড অমান্য করে এত বেশি বেআইনি কাজ করেছিল যে এটি মার্কিন সেনাবাহিনীর জন্য ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। সাংবাদিক মার্ক পেরির মতে, এই পরিকল্পনা অনুসারে 'ডাইনকর্প কোম্পানি'র সিআইএ'র অধীনে কাজ করার কথা ছিল, সেনাবাহিনীর অধীনে নয়।[৩৪] স্টিভ ফেইনবার্গকে জড়ানোর কারণেই ট্রাম্পের মত পরিবর্তন হয় এবং প্রেসিডেন্টের সামরিক ও বেসামরিক উপদেষ্টাদের মাঝেও মধ্যস্থতা হয়।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একবার মন্তব্য করেছিলেন, '২০০৩ সালে ইরাকে হামলা চালানোর পর তাদের তেল কেড়ে নেওয়া উচিত ছিল।' এ রকম অসংখ্য বক্তব্যে তার 'জোর যার মুল্লুক তার' মনোভাব ফুটে ওঠে। তার এই মনোভাবের জন্য উপদেষ্টারা এমনকি আগ্রাসন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আফগানিস্তানের সম্ভাব্য খনিজ সম্পদের লোভ দেখিয়েছিল। খনিজ উত্তোলনের জন্য একটি কোম্পানি ইতোমধ্যেই প্রস্তুত রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ফাইনবার্গের ডাইনকর্প তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে চায়। নিউইয়র্ক টাইমসের ভাষ্যমতে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও বাস্তবে মার্কিন বাহিনীকে আফগানিস্তানে রাখার 'অজুহাত' খুঁজছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই খনিজ সম্পদের তথ্যে তিনি খুশি হয়েছিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে একটি সমস্যা ছিল। সেটা হলো, অধিকাংশ খনিজই তালেবানের ঘাঁটি হেলমান্দ প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পাওয়া যায়! রাজধানী দখলে রাখতে হিমশিম খাওয়া সেনা এবং আফগান ন্যাশনাল আর্মি যেখানে অস্ত্র সজ্জিত বিদ্রোহীদের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে, সেখানে এ অঞ্চল থেকে কোনো খনিজ সম্পদ

আহরণ করা অকল্পনীয়ই বটে। তা সত্ত্বেও আফগানিস্তানে ঠিকাদারের সংখ্যা বাড়াতে চাওয়া এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর উপযোগী কাজের সন্ধান চালানোর প্রস্তাবে উভয় দলই সন্তুষ্ট হয়েছিল।[৩৫]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না। জেনারেলদের চাপ সত্ত্বেও এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করছিলেন। ট্রাম্পের রাজনৈতিক উপদেষ্টারা আফগানিস্তানে অবস্থানরত সেনাদের পরিবর্তে ভাড়াটে খুনি মোতায়েনের প্রস্তাবও করেছিল। এটা স্পষ্ট করে, মে মাসে প্রস্তাবকৃত লেফটেন্যান্ট জেনারেল ম্যাকমাস্টারের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কতটা দ্বিধাবোধ করছিলেন।[৩৬] কিন্তু ঠিক আট বছর আগের মতো এবারও গণমাধ্যমের সহায়তায় জেনারেলরা প্রেসিডেন্টের ওপর চাপ প্রয়োগ করে।

জেনারেল পেট্রিয়াসের গুরু, ২০০৭ সালে ইরাক এবং ২০১০-২০১২ সালে আফগানিস্তানে সেনাসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষের অন্যতম মুখপাত্র জেনারেল (অব.) জ্যাক কিন ফক্স নিউজকে বলেন, 'আফগানিস্তান অভিযানকে জোরদার করা এবং সম্প্রসারণের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ন্যূনতম ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার সেনা মোতায়েন করতে হবে। এমনকি, সৈন্যসংখ্যা ২০১০ সালের পর্যায়ে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।' কিনের দৃষ্টিতে এই যুদ্ধে একমাত্র ভুল ছিল বারাক ওবামার সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত। তার মতে, 'মাত্র ৮ হাজার জনকে রেখে ১ লাখের অধিক সেনা প্রত্যাহার করে আমরা অ্যাটাক হেলিকপ্টার, গোয়েন্দা তথ্য, যোগাযোগমাধ্যম, রসদসহ আফগান সেনাবাহিনীর সমস্ত সহায়তা অকেজো করে নিয়েছি। তাদের শতভাগ সক্ষমতার জন্য এগুলো অত্যাবশ্যকীয়।'[৩৭]

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সেনা মোতায়েনের জন্য রাজি করানোর লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর উসকানির অংশ হিসেবে পেন্টাগন ও কাবুলে ঘানি সরকার নতুন অপপ্রচার শুরু করে। তারা বলে, রাশিয়ানরা তালেবানকে রসদ জোগাচ্ছে।[৩৮] মার্চে হাউস আর্মড সার্ভিসেস কমিটির কাছে সাক্ষ্য প্রদানকালে সেন্ট্রাল কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল জোসেফ ভোটেল বলেন, 'তালেবানকে অস্ত্র বা অন্য কিছুর মাধ্যমে রাশিয়ানরা সহায়তা করছে ভাবা আমার মতে মোটেই অনুচিত নয়'। তবে তার সম্পূর্ণ বক্তব্য ছিল অনিশ্চিত ও সন্দেহজনক কথায় ভরপুর এবং অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ২০০১ সাল থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রাশিয়ার মিত্র আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের উপজাতিদের সাহায্য করে আসছে। পাশাপাশি রাশিয়াও

আমেরিকান ও ন্যাটো সেনাদের রসদ সরবরাহের জন্য নিজেরদের সীমান্তে প্রবেশাধিকার দিয়ে আসছে।[৩৯] রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে ধোঁকাবাজি ও তালেবানকে সহযোগিতার অভিযোগকারীদের হাতে কোনো প্রমাণই ছিল না। শুধু অনুমান কিংবা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের দাবির ওপর ভিত্তি করে সংবাদমাধ্যমে এই অভিযোগ আনা হয়। রাশিয়া[৪০] এবং তালেবান[৪১] উভয়ই তাৎক্ষণিকভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও তালেবান রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের কথা স্বীকার করে। তারা বলে, নিজেদের স্বার্থেই আঞ্চলিক পরাশক্তিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ জরুরি। আমেরিকা সত্যিকার অর্থেই আফগানিস্তান ছেড়ে যাবে এই আশঙ্কায় রাশিয়া ইতিপূর্বে আফগানিস্তানের বিভিন্ন দল এবং আগ্রহী বিভিন্ন দেশের সরকারকে নিয়ে মস্কোতে শান্তি আলোচনার আয়োজন করেছিল। কিন্তু আমেরিকা এবং তালেবান কেউই এই প্রস্তাবে আগ্রহ দেখায়নি। আমেরিকা জানায়, এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতেই রাশিয়া এই উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তালেবান এবং আইএসের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী বিভিন্ন দলকে রাশিয়া চাপে ফেলতে চেয়েছিল।[৪২] এই লক্ষ্যে রাশিয়া মার্কিন মদদপুষ্ট আফগানিস্তানের সরকারকে সহায়তার পরিবর্তে তাজিকিস্তান ও মধ্য এশিয়ার বাফার স্টেটগুলোর সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

যাহোক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং ভারত সরকার একমত হয় যে রাশিয়ার ডাকা এই আলোচনায় আমেরিকার অংশগ্রহণ প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের কথার পুনরাবৃত্তি করে তালেবান জানায়, 'আয়োজক দেশগুলো নিজেদের স্বার্থে এই বৈঠকের আয়োজন করেছে। এর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং আমরা একে সমর্থনও করছি না।' প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, 'তালেবানের মুখপাত্র তাদের আগের প্রস্তাবই পুনর্ব্যক্ত করেছেন: যুদ্ধ থামানোর যেকোনো ধরনের আলোচনার পূর্বে মার্কিন জোটকে সব সেনা প্রত্যাহার করতে হবে।' এই খেলার প্রধান প্রতিপক্ষদের বাদ দিয়ে তারাও (রাশিয়া) খুব বেশি অগ্রগতি করতে পারেনি। অবশ্য এক আলোচক ভারতের দ্য ওয়্যার ওয়েবসাইটে পুরোপুরি অনিয়ন্ত্রণযোগ্য এক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। আফগানিস্তানের সব দল এবং বিদেশি হস্তক্ষেপকারীরা যদি প্রকৃতপক্ষেই শান্তি ও সবার জন্য ন্যায্য চুক্তি চায়, তারপরও ১০০ বছরেও সবাই একমত হতে পারবে না।[৪৩]

উদাহরণস্বরূপ, আফগানিস্তানে ভারতের অর্জন ও পরিকল্পনা যেমন চীন ও পাকিস্তানের জন্য চিন্তার বিষয়, তেমনি এর উল্টোটাও সত্য।[৪৪] ১৯৮০ এবং ৯০-এর দশকজুড়ে এবং ২০০০ সালের শুরুতেও ভারতের মিত্রদের

বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চীন আফগান মুজাহিদদের সাহায্য করেছে। ভারত ও আমেরিকাও উইঘুর মুসলিম যোদ্ধাদের আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং প্রদেশে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা দিয়েছে। এদের মাঝে কয়েকজনকে পরবর্তী সময়ে গুয়ানতানামোবে কারাগারে বন্দি করা হয়।[৪৫] এগুলো আমেরিকার সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে আফগানিস্তানের সমস্যা সমাধান না হওয়ার প্রমাণ।

আমেরিকার মিত্র এবং যুদ্ধের সকল পক্ষের কুশীলবদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ, সমস্যা ও ইতিহাস রয়েছে। ৮০০ পাউন্ড ওজনের আমেরিকান দানব বোমাগুলো সবকিছু লন্ডভন্ড না করলে এই সমীকরণের সমাধান হয়তো কিছুটা দ্রুত হবে। কিন্তু, প্রশাসন তা বিশ্বাস করে না। ট্রাম্প প্রশাসন বুঝতে পারল যে, তালেবান, হক্কানি নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের সহায়তা বন্ধে পাকিস্তানকে রাজি করাতে ওবামা প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। বাড়তি সাহায্যের প্রলোভন ও আলোচনার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। এ সময় সাবেক সিআইই অ্যানালিস্ট রক্ষণশীল হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের বিশেষজ্ঞ লিজা কার্টিস এবং আমেরিকায় নিযুক্ত সাবেক পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত হুসাইন হক্কানি একটি যৌথ আর্টিকেল প্রকাশ করেন। তাদের মতে, এখন কঠোরতা অবলম্বনের সময় এসেছে। এই লেখার পুরস্কারস্বরূপ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ম্যাকমাস্টার হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক পদে কার্টিসকে নিয়োগ দেন। উদ্দেশ্য ছিল, কার্টিসকে নতুন কলাকৌশল প্রণয়নে কাজে লাগানো।

আফগানিস্তানে নিজেদের মিত্রদের সহায়তা করাই পাকিস্তানের মুখ্য জাতীয় স্বার্থ। উপরিউক্ত লেখকদ্বয়ের তুলনামূলক লঘু প্রস্তাবনা পাকিস্তানকে এই স্বার্থ ত্যাগে রাজি করাতে পারেনি। কার্টিস এবং হুসাইন বলেন, পাকিস্তান যদি তালেবান, হাক্কানি নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য আফগান বিদ্রোহী দলকে সাহায্য করা বন্ধ না করে কিংবা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে আমেরিকা ও তালেবানের মধ্যকার সংলাপে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে আমেরিকার উচিত পাকিস্তানকে দেওয়া সামরিক সহায়তা ও ন্যাটো জোটের বাইরে প্রধান মিত্রের মর্যাদা বাতিলের হুমকি দেওয়া। তারা আরও পরামর্শ দেন, আমেরিকা ভ্রমণে কয়েকজন উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে। এ ছাড়া, প্রশাসন চাইলেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তালেবান লক্ষ্যবস্তুতে ড্রোন হামলা করতে পারে। তারা পাকিস্তানকে দেওয়া অর্থ সহায়তা বন্ধ করে দিতে পারে এবং এমনকি সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পাকিস্তানকে

তালিকাভুক্ত করার হুমকি দিতে পারে। কিন্তু এতেও কাজ না হলে কার্টিস ও হুসাইনের মতে, পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চীনকে অনুরোধ করা যেতে পারে। অথচ আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ এসব দলকে সহায়তা করার পেছনে পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থ জড়িত। কিন্তু এই বিষয়টা কখনোই বিবেচনায় আনা হয় না। আর বিবেচনায় আনলেও উপযুক্ত প্রসঙ্গ ও যুক্তি উত্থাপন ছাড়াই বাদ দেওয়া হয়। তাদের ভাষ্যে, আফগানিস্তানে ভারতের উল্টো ভূমিকা পালনের যে আশঙ্কা পাকিস্তান লালন করে, সেটি আমেরিকার স্বার্থের সঙ্গে 'অসংগতিপূর্ণ'। কিন্তু, চীন তাহলে কেন পাকিস্তানকে আমাদের হয়ে চাপ প্রয়োগ করবে, যখন চীনের বিরোধিতা করতে আমরা ভারতকে সমর্থন করি?

যাহোক, আগস্টে ট্রাম্প নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করলেও ম্যাটিস এর আগে থেকেই কার্টিসের কৌশলের বাস্তবায়ন শুরু করেছিলেন। আফগান বিদ্রোহীদের সমর্থনের অভিযোগে ম্যাটিস জুলাইয়ের শেষ দিকে পাকিস্তানের ৫০ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা আটকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[৪৬] ২০১৬ সে ওবামা প্রশাসন একই কাজ করলেও আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। এরপর প্রশাসন জানাল যে আফগানিস্তানে 'স্থিতিশীলতা' আনতে বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তারা ভারতের ভূমিকা বৃদ্ধির কথাও ভাবছে।[৪৭] অবশেষে ট্রাম্পও ম্যাটিস ও ম্যাকমাস্টারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা ঘোষণা করেন। তিনি পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ভারতকে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির কথা বলেন। একই সঙ্গে আফগান প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাহায্য করা বন্ধের জন্য পাকিস্তানকে অনুরোধ করেন।

কিন্তু এই ধরনের পরিকল্পনা মাধ্যমে কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। উল্টো পাকিস্তান সরকার সেনাবাহিনীর কট্টরপন্থিদের দিকে ঝুঁকে পড়বে। তারা তালেবান ও হাক্কানি নেটওয়ার্ককে দেওয়া সহায়তা আরও বৃদ্ধি করবে। প্রশাসন ও পেন্টাগন সব সময় আফগান সমস্যার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমাধানের কথা বললেও ২০১৭ সালের জুনে সেক্রেটারি ম্যাটিস তালেবানের সঙ্গে যেকোনো চুক্তির ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানান। ম্যাটিসের ধারণা ছিল, তালেবান সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় আমেরিকার দাবি মেনে নেওয়ার কোনো ইচ্ছা তাদের না থাকলেও স্থানীয় জনগণ তো আর তালেবান নয়। তাই স্থানীয়রা আমেরিকাকেই সমর্থন করে। এরূপ ভুল ধারণার কারণেই তিনি চুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তার মতে, আফগান জনগণের পক্ষে আমেরিকার লড়াই চালিয়ে যাওয়া উচিত।

ম্যাটিস বলেন, 'আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের প্রতিপক্ষ ব্যালটের যুদ্ধে কখনোই জয়লাভ করবে না। শত্রুরা এই বিষয়ে ভালোভাবেই অবগত। তাদের পক্ষে আফগান জনগণের সমর্থন, ভালোবাসা, সম্মান আদায় করা সম্ভব নয় বলে তারা কখনোই নির্বাচনে জিতবে না। এ কারণেই তারা বোমা ব্যবহার করে। আমরা আফগান জনতার পাশে আছি। রক্তাক্ত ও দীর্ঘ এই লড়াই চলবে। মূলকথা হচ্ছে, গণতন্ত্রবিরোধী লোকজনের হাতে আমরা আফগান জনগণকে ছেড়ে যাব না।'[৪৮]

ম্যাটিসের সহকর্মীরা 'আপস-মীমাংসা'কে এই সহিংসতার একমাত্র সমাধান দাবি করলেও, ওপরের বক্তব্যটির মাধ্যমে তিনি তা নাকচ করে দেন। তবে তিনি অন্তত সততার পরিচয় দিয়েছেন। কাবুলের কোনো রাজনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক জোট কিংবা আমেরিকা এই মুহূর্তে তালেবান বা অন্য কোনো বিদ্রোহী দলের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তি করবে, এমনটা ভাবা অকল্পনীয়। এ রকম কোনো চুক্তি বাস্তবায়ন হলে বর্তমান সরকার টিকতে পারবে না। মার্কিন রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকেরা আফগানিস্তানের সমস্যার 'কূটনৈতিক সমাধানের' কথা বলেন ঠিকই। কিন্তু, এর রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত কিছুই তারা বলতে পারেন না। তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে গণতান্ত্রিক সরকার ও দেশের পুলিশ বাহিনী গঠনের মাধ্যমে তারা আফগান জনতার মন জয় করবেন এবং শত্রুদের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেবেন।

কংগ্রেসের আলোচনা শেষ হওয়ার প্রায় এক মাস পর জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে সেক্রেটারি ম্যাটিস জানান, সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিতে প্রশাসন পুনরায় কালক্ষেপণ করছে। পরবর্তীতে জানা গেল, ট্রাম্প তখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। মূল কমিটির ১৯ জুলাইয়ের বৈঠকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর ট্রাম্প জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের পরিকল্পনার অনুমোদন দিতে অস্বীকৃতি জানান।[৪৯] প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বরং জেনারেল নিকলসনকে বরখাস্ত করতে বারবার ম্যাটিসকে আদেশ দিচ্ছিলেন।[৫০] জনসমক্ষেও ট্রাম্প ম্যাকমাস্টারের পরিকল্পনার প্রতি তার সংশয়ের কথা জানান। 'আমরা আফগানিস্তানে ১৭ বছর ধরে কী করছি' জানতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কয়েকজন আফগান ফেরত সেনাকে হোয়াইট হাউসে ডাকেন।[৫১] সেনা মোতায়েনের ব্যাপারে এক সাংবাদিকের প্রশ্নে তিনি বলেন, 'সেটা ভবিষ্যতে দেখা যাবে'। এর বেশি কিছু বলতেও তিনি নারাজ। এমনকি জুলাইয়ের শেষ দিকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানায়, ট্রাম্প তার পরামর্শকদের সবচেয়ে শিথিল পরিকল্পনা করতে বলেছেন। অর্থাৎ, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের মাত্রা কমাতে ড্রোন ও বিশেষ বাহিনী ব্যতীত

সব সেনা প্রত্যাহারের কথা ভাবছিলেন। একজন ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা পত্রিকাটিকে জানান, 'আমরা যদি আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন না থাকি, তাহলে দেশব্যাপী পুনর্গঠন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। আর যদি সেখানে থাকার কোনো ইচ্ছাই আমাদের না থাকে, তাহলে সব ছেড়ে আসাই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত।'

অবশেষে দায়ভার এড়াতে ট্রাম্প তার প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে সৈন্যসংখ্যা ৫ হাজারে উন্নীত করার নির্দেশ দেন।[৫২] কিন্তু ম্যাটিস নতুন পরিকল্পনা ঘোষণার আগপর্যন্ত সেনা মোতায়েন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন।[৫৩] সেনাসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রেসিডেন্টের ওপর চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। চিরাচরিত কঠোরতা ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হার মানতে বাধ্য হন। তিনি অতিরিক্ত ৪ হাজার সেনা মোতায়েন ও সেনাবাহিনীর প্রস্তাবিত বৃহত্তর আঞ্চলিক পরিকল্পনার অনুমোদন দেন।[৫৪] ট্রাম্প যে এতটা দৃঢ়চেতা হবে, তা কেউ আশা করতে পারেনি। কিন্তু দিনশেষে ট্রাম্পও তার পূর্বসূরি ওবামার মতোই সেনাবাহিনীর কাছে হার মানতে বাধ্য হন। ২১ আগস্ট তিনি নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। সেই ভাষণে তিনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার উল্লেখযোগ্য কোনো কারণ দেখাননি।[৫৫] অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের পরও ওবামার ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে তিনি ম্যাকমাস্টারের বয়ান মেনে নেন। তিনি বলেন, আমেরিকা এখন থেকে সময় বেঁধে দেবে না। কেননা, এর অর্থ প্রতিপক্ষকে আমাদের পরিকল্পনা আগাম জানিয়ে দেওয়া। এতে করে তারা সেই সময় শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকে।

কিন্তু অন্যদিকে তালেবানের হাতে রয়েছে অফুরন্ত সময়। ট্রাম্পের ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় তারা জানায়, শব্দের পরিবর্তন তাদের কাছে কিছুই না। তালেবানের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ম্যাকমাস্টারের কথা মেনে নিয়ে বলেন, 'এটা কবে হবে কিংবা আদৌ সম্ভব কি না, সেটা কেউই জানে না'। তিনি 'স্পষ্ট বিজয়ের' শপথ করেন ঠিক। কিন্তু, কখন যুদ্ধ শেষ হবে সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলেননি। বরং 'শত্রুদের ওপর হামলা করা, আইএস দমন করা, আল-কায়েদাকে ধ্বংস করা, তালেবানকে প্রতিহত করা এবং বিজয়ের আগপর্যন্ত সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধ করা' ইত্যাদি নিত্য-বর্তমান কালের কিছু কাজের কথা তিনি বলেন। যেগুলো আদতে স্লোগান ছাড়া কিছুই না। প্রকৃতপক্ষে, ২০১২ সালের অতিরিক্ত সেনা প্রত্যাহারের পর থেকে চলমান পরিকল্পনার সঙ্গে নতুন পরিকল্পনার কোনো তফাত নেই। আল-কায়েদার প্রত্যাবর্তনের যে ভয় দেখানো হচ্ছিল, তা বাস্তবে ঘটেনি। কিন্তু স্থানীয় পশতুনদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে জেনারেল ম্যাকক্রিস্টালের 'বিদ্রোহ

সমীকরণ’ এখনো প্রযোজ্য। সমীকরণটি হলো— যত বেশি লোকজন মারা হবে, তত বেশি লোক আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্ত হবে। তাই সামরিক শক্তি বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে, নতুন প্রজন্মকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরও উসকে দেওয়া। এর ফলে সার্বিক পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে মোড় নিবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুদ্ধের নিয়মে শিথিলতা আনলে এই সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।[৫৬] ক্ষমতায় থেকে সেনাবাহিনীকে পরিপূর্ণভাবে লড়াই করতে দেননি— এই সমালোচনা হয়তো ট্রাম্পকে শুনতে হবে না। কিন্তু সেনাবাহিনীর কাজকে তিনি আরও কঠিন করে দিয়েছেন।

আফগান ন্যাশনাল আর্মি আগের যেকোনো সময়ের মতো এখনো অদক্ষ, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অকার্যকরই রয়ে গেছে। তারা সবখানেই বিরোধীদের উসকে দেয়। সেনাবাহিনীর জোরাজুরির পরও সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি না করার ব্যাপারে ট্রাম্পই সঠিক ছিলেন। এমনকি প্রেসিডেন্ট যদি সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে ১ লাখ করার অনুমতিও দেন, তাহলেও তারা আমেরিকার লক্ষ্য পূরণে ঠিক কতটুকু সমর্থ হবে? ওবামার সেনাসংখ্যা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ পর্যায়ে আফগানিস্তানে লক্ষাধিক সেনা, নৌ এবং বিশেষ বাহিনীর পাশাপাশি ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলোর ৪০ হাজার সৈন্য ছিল। তারপরও ‘উচ্ছেদ, দখল, পুনর্গঠন ও রূপান্তরের’ মাধ্যমে পশতুন নিয়ন্ত্রণাধীন দক্ষিণাঞ্চলকে কাবুলের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। ২০০৯ ও ২০১৪-এর নির্বাচনে ভরাডুবিও আফগানদের গণতন্ত্র প্রত্যাখ্যানকেই প্রমাণ করে।

জেনারেল প্যাট্রিয়াসের নিশ্চয়তা সত্ত্বেও সেনাসংখ্যা বৃদ্ধির পর মার্কিন জোট তালেবানকে আলোচনায় আনতে পারেনি। বাগরাম বিমানঘাঁটি সচল রাখা, নাঙ্গারহার ও হেলমান্দে বোমা হামলা করা এবং কাবুলে অর্থ পাঠানোই কি পেন্টাগনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা? তারচেয়ে বরং লাভ-লোকসানের চিন্তা না করে সবকিছু বাদ দিয়ে আফগানিস্তান ছেড়ে আসাই সবদিক থেকে ভালো হবে।

তথ্যসূত্র

১. Twitter search results, “Afghanistan from:realdonaldtrump,”

২. Donald Trump, “Remarks at the Conservative Political Action Conference in National Harbor, Maryland,” DCPD-201700137 (February 24, 2017).

৩. “Donald Trump On His Foreign Policy Strategy,” interview with Bill O’Reilly, Fox News, April 29, 2016; Greg Jaffe and

Missy Ryan, "In Afghanistan, Trump Will Inherit a Costly Stalemate and Few Solutions," Washington Post, January 18, 2017.

৪. Hope Hodge Seck, "300 Marines Will Deploy to Helmand This Spring, Corps Confirms," Military, January 6, 2017; Hope Seck, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, January 11, 2017.

৫. Kevin Baron, "Afghanistan Needs 'Thousands' More Troops, US General Says," Defense One, February 9, 2017; Joshua Fatzick, "Top US General: Afghanistan War Still a 'Stalemate,'" Voice of America News, February 9, 2017.

৬. James Gordon Meek, "US Special Ops Step Up Strikes on Al-Qaeda and ISIS, Insiders Say," ABC News, March 3, 2017.

৭. Gordon Lubold and Shane Harris, "Trump Broadens CIA Powers, Allows Deadly Drone Strikes," Wall Street Journal, March 13, 2017.

৮. Eric Schmitt, "United States Ramps Up Airstrikes Against Al Qaeda in Yemen," New York Times, March 3, 2017.

৯. Travis J. Tritten, "Retired Green Beret Says Mattis Left 'My Men to Die' in Afghanistan," Stars and Stripes, December 2, 2016.

১০. Dan Lamothe, "Mattis: The Man, the Myths and the Influential General's Deep Bond with His Marines," Military Times, April 5, 2013.

১১. Jim Garamone, "Mattis Discusses Afghan Transition at Marine Symposium," American Forces Press Service, August 31, 2001.

১২. Mackubin Thomas Owens, "Counterinsurgency from the Bottom Up: Colonel H.R. McMaster and the 3rd Armored Cavalry Regiment in Tel Afar, Spring-Fall 2005," Foreign Policy Research Institute, March 17, 2017.

১৩. David Feith, "H.R. McMaster: The Warrior's-Eye View of Afghanistan," Wall Street Journal, May 12, 2012.

১৪. Scarborough, "General: Millennial Marines Shun Self-absorbed Culture."

১৫. Meghann Myers, “DoD Identifies Green Beret Killed While Fighting ISIS in Afghanistan,” Army Times, April 10, 2017.

১৬. Emily Dreyfuss, “That ‘Mother of All Bombs’ Was Just Waiting for the Right Target,” Wired, April 13, 2017.

১৭. Lucas Tomlinson, “US Drops Largest Non-Nuclear Bomb in Afghanistan After Green Beret Killed,” Fox News, April 13, 2017; Jawad Sukhanyar and Rod Nordland, “ISIS, Aided by Ex Taliban Groups, Makes Inroads in Northern Afghanistan,” New York Times, June 28, 2017.

১৮. Alex Pfeiffer, “After More Than a Decade and a Half in Afghanistan the US Needs to Deploy More Troops to Win, Experts Say,” Daily Caller, April 17, 2017.

১৯. Alex Pfeiffer, “After More Than a Decade and a Half in Afghanistan.”

২০. Mark Perry, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, June 28, 2017.

২১. Eli Lake, “Trump Has to Decide,” Bloomberg News, May 17, 2017.

২২. Marcus Weinberger, “NATO Laying Groundwork to Send More Troops to Iraq, Afghanistan,” Defense One, May 18, 2017.

২৩. James Mackenzie, “As US Weighs Afghan Strategy, Hopes Set on Fledgling Air Force,” July 23, 2017, Reuters.

২৪. Missy Ryan and Greg Jaffe, “US Poised to Expand Military Effort Against Taliban in Afghanistan,” Washington Post, May 8, 2017.

২৫. Carlo Muñoz, “Pentagon Set to Send More US Troops to Afghanistan,” Washington Times, July 19, 2017.

২৬. Michael E. O’Hanlon, “Time for a (Mini) Surge in Afghanistan,” USA Today, May 17, 2017.

২৭. Susan B. Glasser, “The Trump White House’s War Within,” Politico magazine, July 24, 2017.

২৮. “Taliban Announce Start of Spring Offensive,” New York Post, April 27, 2013.

২৯. Eli Lake, “Trump Has to Decide.”
৩০. Kristina Wong, “Exclusive: Trump Has ‘Less Kinetic’ Option in Afghanistan,” Breitbart, May 11, 2017.
৩১. Tim Shorrock, “Kushner and Bannon Team Up to Privatize the War in Afghanistan,” Nation, July 14, 2017.
৩২. Mark Landler, “Trump Aides Recruited Businessmen to Devise Options for Afghanistan,” New York Times, July 10, 2017.
৩৩. Erik Prince, “The MacArthur Model for Afghanistan,” Wall Street Journal, May 31, 2017.
৩৪. Mark Perry, “Bannon & Kushner Want to Outsource Afghanistan to Mercenaries.”
৩৫. Mark Landler and James Risen, “Trump Finds Reason for the US to Remain in Afghanistan: Minerals,” New York Times, July 25, 2017.
৩৬. Susan B. Glasser, “The Trump White House’s War Within,” Politico magazine, July 24, 2017.
৩৭. Cristina Corbin, “Gen. Keane: 10,000 to 20,000 Additional Troops Needed in Afghanistan,” Fox News, June 16, 2017.
৩৮. “US General: Russia May Be Supplying Taliban Fighters,” al Jazeera, March 24, 2017.
৩৯. “Northern Distribution Network [NDN],” GlobalSecurity.org.
৪০. “Russia Denies Supplying Taliban After NATO Claim,” News International, March 24, 2017.
৪১. “Claims of Russian Assistance Towards the Mujahideen are Baseless,” Taliban statement, posted on al Emarah English, April 14, 2017.
৪২. Dan Simpson, “Vietnam Redux?,” Pittsburgh Post-Gazette, February 23, 2016.
৪৩. Devirupa Mitra, “At Russia-Led Regional Talks, Afghanistan Says Talks with Taliban Can Only Be Held on Its Soil,” Wire (India), April 15, 2017.
৪৪. “Pakistan Fears Indian Influence in Afghanistan, May Rope in China to Balance New Delhi’s Sway: US Intel,” First Post, May 29, 2017.

৪৫. Eric Margolis, interviewed by the author, Scott Horton Show, radio archive, March 25, 2008.

৪৬. Carla Babb, “Pentagon Withholds $50 Million in Pakistan Military Aid,” Voice of America, July 21, 2017.

৪৭. “US Looking into Potential Role of India in Afghanistan, says Daniel Coats,” Financial Express, July 25, 2017.

৪৮. “Press Availability with Secretary of Defense James Mattis, Australian Foreign Minister Julie Bishop, and Australian Defense Minister Marise Payne,” delivered in Sydney, Australia, June 5, 2017.

৪৯. Susan B. Glasser, “The Trump White House’s War Within.”

৫০. Carol E. Lee and Courtney Kube, “Trump Says US ‘Losing’ Afghan War in Tense Meeting with Generals,” NBC News, August 2, 2017.

৫১. Susan B. Glasser, “The Trump White House’s War Within.”

৫২. Joe Gould, “Mattis: Trump Authorized Military to Set Troop Levels in Afghanistan,” Defense News, June 14, 2017.

৫৩. Michael Callahan et al., “Mattis on Afghanistan Troops Decision: ‘We are Working to Get It Right,’” CNN, July 21, 2017.

৫৪. “Trump Approves Sending 4,000 More Troops to Afghanistan, Senior Official Says,” Fox News, August 21, 2017.

৫৫. “Full Transcript: Donald Trump Announces His Afghanistan Policy,” Defense One.

৫৬. Full Transcript: Donald Trump Announces His Afghanistan Policy,” Defense One.

ঘরে ফিরতেই হবে

আফগানিস্তানে দখলদারিত্ব কেবল আমেরিকার দীর্ঘতম বৈদেশিক যুদ্ধই নয়। এই যুদ্ধটি এ কারণেও স্বতন্ত্র হতে পারে যে এটি আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে কম সমর্থন পাওয়া যুদ্ধ।[১] ওয়াশিংটন ডিসির যুদ্ধনীতি কোনো পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া একটি বৃহদাকার তুষার গোলকের মতোই। আমাদের নীতিমালাগুলো যুদ্ধকে চিরকালের জন্য অব্যাহত রাখার জন্যই তৈরি। এর একটি কারণ হলো, নীতিনির্ধারকদের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নমনীয় হওয়ার কিংবা আমেরিকার জনগণের সুরক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা। 'কোনো কিছু করা' সব সময়ই 'কোনো কিছু না করা' থেকে উত্তম। এমনকি 'কোনো কিছু করা' কোনো কাজে না আসলেও করা উচিত!

বাস্তবতা হলো, মার্কিন জনগণ বর্তমানে যুদ্ধ নিয়ে যথেষ্ট ক্লান্ত। প্রচলিত রয়েছে, 'কেবল নিক্সনই চীনে যেতে সক্ষম'। নিক্সন ১৯৭২ সালে চীন সফরে গিয়েছিলেন। কিন্তু যদি কোনো ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রপতি স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি টানতে চীনে যেতেন, তখন নিক্সন (রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট) নিজেই তাদের ওপর কমিউনিস্ট ট্যাগ চাপানোর চেষ্টা করতেন। নয়তো অন্তত কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নমনীয়তার অভিযোগ আনতেন। কিন্তু রিপাবলিকান এবং সুপরিচিত কমিউনিস্টবিরোধী নিক্সন যখন চীন ভ্রমণে যান, তখন বলা হতে থাকে: 'প্রেসিডেন্ট এই কাজটি করছেন কারণ তিনি স্মার্ট। তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠা করার সময় এসেছে।' তাঁর এই পদক্ষেপকে দুর্বলতা কিংবা কোনোভাবে কোনো ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। এই ভ্রমণের ফলে কমিউনিস্ট ব্লক উপকৃত হলেও এটি আমেরিকার নিরাপত্তা স্বার্থের কল্যাণে একটি দেশপ্রেমিক সিদ্ধান্ত হিসেবে খ্যাতি পায়।

যাহোক, অন্যান্য রিপাবলিকান রাজনীতিবিদের মতো ট্রাম্পও শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম। ইরাক থেকে সাময়িকভাবে সরে আসা কিংবা ইরানের

সঙ্গে পারমাণবিক পরিদর্শন চুক্তি করার জন্য ওবামার মতো একজন ডেমোক্র্যাট নেতা তার সমস্ত রাজনৈতিক মূলধন ব্যয় করেছেন। সেখানে একজন রিপাবলিকান, বিশেষত একজন স্বদেশকেন্দ্রিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে খ্যাত ট্রাম্পেরও শান্তি স্থাপনে সক্ষম হওয়া উচিত। পরাজয় স্বীকার না করেই ট্রাম্প প্রশাসন আফগানিস্তান সম্পর্কিত 'আমেরিকা ফার্স্ট' বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করতে পারে। যেমন: এই দরিদ্র দেশটির পশতুন জঙ্গিরা এখন আর আমাদের জন্য কোনো হুমকি নয়। এ ছাড়া বুশ-ওবামা প্রশাসনের কাবুল সরকারের প্রতিও আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আমাদের তরুণদের ভিনদেশে হত্যাকাণ্ড চালানো কিংবা নিজের জীবন খুইয়ে আসার জন্য এবং আরও পিতামাতাকে তাদের সন্তান হারাতে বলা মারাত্মক অন্যায়। বিশেষত সূচনালগ্ন থেকেই ভুলের ওপর চলা একটি অভিযানের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি সত্য।

প্রকৃতপক্ষে আফগানিস্তানকে পুনর্গঠন করা পুরোপুরি অসম্ভব। সেখানে চলমান লড়াইটি জঙ্গিবাদ দমন তো করছেই না; বরং এটি জঙ্গিবাদকে উসকে দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সত্যিকারের জাতীয় স্বার্থ মধ্য এশিয়া থেকে অনেক দূরে। মুসলিম বিশ্বজুড়ে আগ্রাসন, শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন, দখলদারত্ব ও হস্তক্ষেপ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোনো উপায় হতে পারে নয়। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায় হলো এই অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। এখন সময় এসেছে শান্তিতে ফিরে আসার। এখন সময় এসেছে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসার। সময় এসেছে এখন ঘরে ফিরে আসার।

তালেবানরা সমস্ত আফগানিস্তানকে দখল করে নিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইমেজ ছাড়া হারানোর আর কিছুই নেই। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বিষয়ে এত উদ্বিগ্ন কেন? আমাদের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিয়মিত তার অবস্থান পরিবর্তনের জন্য সুপরিচিত। বলা হয়ে থাকে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সামরিক উপদেষ্টারা ক্যাম্প ডেভিডে তাদের বৈঠকে নতুন কৌশল অনুমোদনের সময় থেকে ঘোষণা দেওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে আতঙ্কিত থাকেন।[২] প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই সময়ের মধ্যে কৌশল বদলিয়ে ফেলতে পারেন আশঙ্কায় তারা আতঙ্কিত থাকতেন। ট্রাম্প আফগানিস্তান নিয়ে পূর্বসূরিদের থেকে পৃথক নীতিমালা গ্রহণের প্রথম সুযোগটি হাতছাড়া করেছেন। কিন্তু তবু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চাইলে ঘুরে দাঁড়াতে পারেন এবং ব্যর্থতার দায়ভার সুচারুরূপে আগের প্রশাসনের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন।

২০০৯ সালে ওবামা পেট্রিয়াস এবং ম্যাকক্রিস্টালের প্রস্তাবিত সেনা বৃদ্ধি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, সব রাজনৈতিক চাপই পেন্টাগন, কংগ্রেসের রিপাবলিকান অংশ এবং গণমাধ্যম থেকে এসেছিল। মার্কিন জনগণ মোটের ওপর বিরোধী থাকলেও রিপাবলিকান পার্টি এই সিদ্ধান্তের যথেষ্ট সমর্থন করেছিল। তারা এই নতুন মিশনের বিরুদ্ধে খুব একটা তীব্র আপত্তি জানায়নি। অন্যদিকে ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্যরা নতুন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে মোহাবিষ্ট থাকায় তারাও এর বিরোধিতা করেনি। রাজনৈতিকভাবে বললে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু 'জনগণ মূলত এই বিষয়ে নীরব ছিল'— তাই এই সেনা বৃদ্ধিতে কোনো সত্যিকারের বিরোধিতা ছিল না। কিন্তু ২০১৩ সালের গ্রীষ্মে সিরিয়ার দামেস্কে বাশার আল-আসাদের সরকারি বাহিনী রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করার পর ওবামা সরকার তাদের বিরুদ্ধে বিমান হামলার হুমকি দিয়েছিল। তখন কার্যত সমগ্র আমেরিকান জনসাধারণ এই দাবিতে এককাট্টা হয়েছিল যে কংগ্রেসের উচিত তাকে নিবারণ করা। আমেরিকান রক্ষণশীল রেডিওর শ্রোতারা উদারপন্থি, বামপন্থি কিংবা ডানপন্থি গোষ্ঠীগুলোর প্রতিটি বর্ণনার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল। রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি এবং সিনেটরদের নেতিবাচক কথা এবং চিঠির বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জনগণ দেশব্যাপী বিভিন্ন টাউন হল এবং মিটিংয়ে উপস্থিত হয়। অবশেষে জনগণ তাদের দাবি শুনতে ওবামা প্রশাসনকে বাধ্য করে। ফলস্বরূপ, সিরিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপের তীব্রতা বৃদ্ধির শুরুতেই এটি বন্ধ হয়ে যায়। এটি যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন এবং ওয়াশিংটন ডিসির আরও যুদ্ধে যাওয়ার বিরুদ্ধে জনসাধারণের একটি অসাধারণ বিজয় ছিল।[৩]

অতএব, তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের নির্ধারণ করা বৈদেশিক নীতিমালা পরিবর্তন করে দেওয়া মার্কিন জনগণের পক্ষে সম্ভব। ট্রাম্প প্রশাসন যদি নিশ্চিত হতে পারত যে, মার্কিন জনগণ যুদ্ধের চূড়ান্ত বিরোধিতা করে, তাহলে তিনি জেনারেলদের ব্যাগ গুছিয়ে বাড়ি ফিরে আসার নির্দেশ দিতে পারবেন। জনগণ রুখে দাঁড়ালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পেয়ে যেতেন।

সর্বশেষ কথা এটাই যে, মার্কিনরা দৈনন্দিন অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে তারা শতদলে বিভক্ত। যেমন অর্থনৈতিক সমস্যা, সংহতির অভাব ও অসচ্ছলতা, বাম ও ডান সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পার্থক্যের গভীরতা বৃদ্ধি, অসংখ্য নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় সরকারের পুলিশি হস্তক্ষেপ ইত্যাদি তাদের বিভক্ত করে রেখেছে। তবে সব

সময় যুদ্ধে লিপ্ত থাকার নীতি ও জনগণের টাকায় এগুলোকে জিইয়ে রাখা এই ইস্যুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব পাওয়ার অধিকার রাখে। এগুলো এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আগেই মার্কিন জনগণকে দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করতে হবে। আফগানিস্তান থেকে পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহারের জন্য একটি অপ্রতিরোধ্য জনমত তৈরি করতে হবে। এই মুহূর্ত থেকেই এটির অবসান ঘটাতে আমাদের সবার একত্রে কাজ করা উচিত।

তথ্যসূত্র

১. Steven Shepard, “Trump’s Challenge: A Wall of Public Skepticism on Afghanistan War,” Politico, August 21, 2017.

২. Kimberly Dozier and Spencer Ackerman, “Team Trump Worried He’ll Change His Mind Again on Afghanistan War Plan,” August 21, 2017, Daily Beast.

৩. John Harwood, “House Republicans Say Voters Oppose Intervention,” New York Times, September 6, 2013; Kevin Liptak, “McCain Gets an Earful from Voters on Syria,” CNN, September 5, 2013; “The Hill’s Syria Whip List: Obama Seeks to Turn Tide with House, Public,” Hill, September 9, 2013.

পরিশিষ্ট ১

শেষ কথা

আফগানরা বীরের জাতি। আজ অবধি আফগানদের বিদেশি কোনো শক্তি বেশি দিন পদানত করে রাখতে পারেনি। পরপর তিনটি আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী সুপার পাওয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সর্বশেষ আমেরিকাকে তারা আফগানিস্তান ত্যাগে বাধ্য করেছে। খ্রিষ্টের জন্মের ৩৩০ বছর আগে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে ভারতে আগমন করেন। কিন্তু আফগানিস্তান দখল করে রাখার সাহস তিনিও করেননি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সুপারপাওয়ার ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। তাদের বিশালতা বোঝাতে বলা হয় যে, এই সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যেত না। কিন্তু ১৮৩৯ সালে তাদের ভারত প্রতিনিধি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আফগানিস্তান দখলের দুঃসাহস দেখালে আফগান গেরিলাদের প্রতিরোধের মুখে ১৮৪২ সালেই তাদের পাততাড়ি গুটাতে হয়। অন্যদিকে তারা ভারতে উপনিবেশ বজায় রেখেছিল প্রায় দুইশত বছর। ব্রিটিশরা এরপর আরও দুবার আফগান দখলের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। প্রথম প্রচেষ্টায় তারা আংশিক সফল হলেও দ্বিতীয়বার চিরতরে তাদেরকে আফগানিস্তান ছাড়তে হয়েছিল।

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন ১ লাখ ৪০ হাজার সেনাসদস্য নিয়ে আফগানিস্তানে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। তারা পাহাড়-পর্বতে এবং গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত স্থানে এক কোটি শক্তিশালী মাইন পুঁতে রাখে এবং ১৫ লাখ আফগানকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে। এত কিছু করেও কমপক্ষে ১৫ হাজার সৈন্যের লাশ ফেলে সোভিয়েত পরাশক্তিকে আফগানিস্তান ছাড়তে হয়।

সর্বশেষ ২০ বছরের দীর্ঘ যুদ্ধ শেষে অবশেষে পুরোপুরিভাবে আফগানিস্তান ছেড়েছে আমেরিকান সেনারা। এর মধ্য দিয়ে আবারও বিদেশি দখলমুক্ত হলো

দেশটি। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সামরিক কমান্ডার জেনারেল কেনেথ ম্যাকেঞ্জির কাছ থেকে এই দখলদারি অবসানের চূড়ান্ত ঘোষণা আসে। তিনি জানান, ৩০ আগস্ট সোমবার দিবাগত মধ্যরাতের পর, মঙ্গলবার ভোর রাতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে সঙ্গে করে সর্বশেষ সি-১৭ বিমানটি কাবুল ছেড়েছে। জেনারেল ফ্রাঙ্ক ম্যাকেঞ্জি বলেন, 'আমি আফগানিস্তান থেকে আমাদের সেনা প্রত্যাহার সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি। আমেরিকার সব নাগরিক সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে সেখানে আমাদের সামরিক অভিযানের সমাপ্তি হলো।' যুক্তরাষ্ট্র গত ১৭ দিনে কত সংখ্যক মানুষ সরিয়ে নিয়েছে তারও হিসাবে দেওয়া হয়েছে। জেনারেল ম্যাকেঞ্জি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এবং জোট বাহিনীর বিমানগুলোয় করে সব মিলিয়ে ১ লাখ ২৩ হাজার বেসামরিক ব্যক্তিকে আফগানিস্তান থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। প্রতিদিন সাড়ে ৭ হাজারের বেশি বাসিন্দা কাবুল ছাড়ার সুযোগ পেয়েছেন।

আমেরিকান দখলদারি অবসানের পর বিজয় উৎসব করছে আফগানরা। সর্বশেষ বিমানটি আমেরিকার উদ্দেশে চলে যাওয়ার পর কাবুলে তালেবানের বিজয়সূচক গুলির আওয়াজ শোনা গেছে। ১৫ আগস্ট তারিখে কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল তালেবান। সেই সময় থেকেই মূলত কাবুলের হামিদ কারজাই বিমানবন্দর দিয়ে আমেরিকান ও তাদের সহযোগী আফগানরা দেশ ছাড়ছিল। ৩১ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র কাবুল ছাড়ার পর তালেবান বিমানবন্দরে ঢুকে দ্রুত মার্কিন সামরিক সরঞ্জামগুলোর দখল নিয়েছে।

আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেনের কথা শুনে মনে হলো, আফগানিস্তান ছাড়ার মাধ্যমে তারা ঘাড় থেকে তিনি একটি বিশাল বোঝা নামাতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। তিনি বলেন, 'নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। সামরিক মিশন সমাপ্ত হয়ে নতুন এক কূটনৈতিক মিশন শুরু হলো। তবে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এও বলেছেন, তালেবানকে বৈধতা অর্জন করতে হবে। সেই সঙ্গে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে কি না এবং নাগরিকদের ভ্রমণে স্বাধীনতা দেওয়া, নারীদের অধিকার রক্ষা এবং সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে দমন করছে কি না, এসব বিষয় বিশ্ববাসীর নজরে থাকবে।

কিন্তু তাদের কাটা গায়ে নুনের ছিটা দিয়ে তালেবান মন্ত্রিপরিষদ নাইন-ইলেভেনের ২০তম বার্ষিকীতেই শপথ নিয়েছে, যে ৯/১১ হামলার অজুহাতে বিশ বছর পূর্বে মার্কিন দখলদার বাহিনী আগ্রাসন চালিয়ে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। পাশাপাশি চুক্তির চারটি বিষয়বস্তু, যেগুলোর একটি মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল এবং তিনটিই ছিল তালেবানের সঙ্গে সম্পর্কিত, এর মধ্যে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু তথা মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সম্পূর্ণ প্রত্যাহারই বাস্তব রূপ লাভ করেছে। আন্তঃআফগান সংলাপ এবং যুদ্ধবিরতির শর্ত তালেবান মোটেই পরোয়া করেছে বলে মনে হয় না। বারবার আন্তঃআফগান সংলাপ এবং সবার অংশগ্রহণে অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকারের কথা বললেও মন্ত্রিপরিষদের সর্বোচ্চ পদগুলোতে আসীন হয়েছে মোল্লা ওমরের সাথিরাই। এমনকি আমেরিকা ও জাতিসংঘের কালো তালিকাভুক্ত অনেকেই জায়গা পেয়েছে নতুন মন্ত্রণালয়ে, যাদের মধ্যে সিরাজুদ্দিন হাক্কানি অন্যতম এবং তার মাথার মূল্যই ৫০ লাখ ডলার। পাশাপাশি যুদ্ধবিরতির কথা থাকলেও সব দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে সর্বশেষ প্রদেশ পানশিরের পতন বিশ্ববাসীর চোখের সামনেই রয়েছে। চুক্তির সর্বশেষ বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে আফগানিস্তানকে পশ্চিমা বিশ্বে আক্রমণ চালানোর লঞ্চপ্যাড হিসেবে ব্যবহার না করতে দেওয়ার জন্য তালেবানের প্রতিশ্রুতি কতটুকু পূরণ করা হবে, সেটা ভবিষ্যৎই বলে দেবে।

পরিশিষ্ট ২

শান্তি চুক্তি

[আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান (যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত) বনাম যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী শান্তি চুক্তি; ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২০; রজব ৫, ১৪৪১ (হিজরি চন্দ্র বর্ষপঞ্জি); হুত ১০, ১৩৯৮ (হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জি)]

চারটি অংশে গঠিত একটি সর্বাঙ্গীণ শান্তিচুক্তি:

১. আফগানিস্তানের মাটিকে যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ব্যবহারে বাধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম।

২. আফগানিস্তান থেকে সব বিদেশি সৈন্যের প্রত্যাহার বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার প্রতিশ্রুতি, ঘোষণা এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম।

৩. আন্তর্জাতিক সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিদেশি সৈন্য প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি ও নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক সাক্ষীর উপস্থিতিতে আফগানিস্তানের মাটিকে যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ব্যবহার না হওয়ার প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণার পর ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত— আফগান পক্ষের সঙ্গে মার্চ ১০, ২০২০ যেটা হিজরি চান্দ্র বর্ষপঞ্জি মোতাবেক রজব ১৫, ১৪৪১ এবং হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জি মোতাবেক হুত ২০, ১৩৯৮ তারিখে আন্তঃআফগান সংলাপ শুরু করবে।

৪. স্থায়ী ও সর্বাঙ্গীণ যুদ্ধবিরতি আন্তঃআফগান সংলাপ এবং সমঝোতা আলোচ্যসূচির একটি বিষয়বস্তু থাকবে। আন্তঃআফগান আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা একটি স্থায়ী এবং সর্বাঙ্গীণ যুদ্ধবিরতির তারিখ এবং

পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবে, যার মধ্যে যৌথ বাস্তবায়ন কর্মপদ্ধতিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং ভবিষ্যৎ আফগানিস্তানের রাজনৈতিক রোডম্যাপের সম্মতি এবং পূর্ণতার সঙ্গে এটি ঘোষিত হবে।

উপরিউক্ত চারটি অংশ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং প্রতিটি বিষয় এর নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং নির্ধারিত শর্তের আলোকে বাস্তবায়িত হবে। পরের দুটি অংশের ওপর সম্মতি আগের দুটি অংশের সম্মতির ওপর সম্মতির ওপর নির্ভরশীল।

উপরিউক্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃত চুক্তির পাঠ্য নিম্নোক্ত উল্লিখিত হয়েছে। উভয় পক্ষই সম্মত যে, এই দুটি অংশ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তান, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত, তাদের জন্য এই চুক্তির বাধ্যবাধকতা তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে বাস্তবায়িত হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আন্তঃআফগান সংলাপ এবং সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা-পরবর্তী আফগান ইসলামি সরকার গঠিত হচ্ছে।

প্রথম অংশ

এই চুক্তি স্বাক্ষরের ১৪ মাসের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে তাদের নিজেদের, মিত্রদের এবং জোট সহযোগীদের সব সামরিক ব্যক্তিত্বকে প্রত্যাহারের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং তাদের মধ্যে সব অ-কূটনৈতিক বেসামরিক ব্যক্তি, বেসরকারি নিরাপত্তা চুক্তিকারী, প্রশিক্ষক, পরামর্শদাতা এবং সহযোগী পরিষেবাকর্মীও অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এই লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হবে:

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এর মিত্র এবং জোট সহযোগীরা প্রথম ১৩৫ দিনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে:

১. তারা আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাসংখ্যা ৮ হাজার ৬০০-তে কমিয়ে আনবে এবং সমানুপাতিক হারে এর মিত্র এবং জোটের সেনাসংখ্যা হ্রাস করবে।

২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এর মিত্র এবং জোট সহযোগীরা পাঁচটি ঘাঁটি থেকে তাদের সব সৈন্য প্রত্যাহার করবে।

খ. এই চুক্তির দ্বিতীয় অংশে ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তানের, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত,

বাধ্যবাধকতার প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমের শর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এর মিত্র এবং জোট সহযোগীরা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিষ্পন্ন করবে:

১. পরবর্তী সাড়ে ৯ মাসের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এর মিত্র এবং জোট সহযোগীরা তাদের অবশিষ্ট সব সৈন্য প্রত্যাহার করবে।

২. যুক্তরাষ্ট্র, এর মিত্র এবং জোট সহযোগীরা অবশিষ্ট সামরিক ঘাঁটিগুলো থেকে তাদের সব সৈন্য প্রত্যাহার করবে।

গ. সব প্রাসঙ্গিক পক্ষের সমন্বয় এবং অনুমোদনসাপেক্ষে আস্থা নির্মাণের একটি মাধ্যম হিসেবে দ্রুত যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব প্রাসঙ্গিক পক্ষের সঙ্গে অবিলম্বে কাজ শুরু করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে। আন্তঃআফগান সংলাপের প্রথম দিন অর্থাৎ মার্চ ১০, ২০২০ যেটা হিজরি চান্দ্র বর্ষপঞ্জি মোতাবেক রজব ১৫, ১৪৪৪ এবং হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জি মোতাবেক হুত ২০, ১৩৮৮ তারিখের মধ্যে ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তানের, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত, ৫ হাজার অবধি বন্দি এবং অপর পক্ষের ১ হাজার অবধি বন্দি মুক্তি পাবে। পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে সব বন্দির মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই লক্ষ্যটি পূরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত, অঙ্গীকারবদ্ধ যে তাদের মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিরা এই চুক্তিতে উল্লিখিত বাধ্যবাধকতাসমূহের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে, যাতে করে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের প্রতি কোনোরূপ নিরাপত্তা হুমকি ধারণ না করে।

ঘ. আন্তঃআফগান সংলাপ সূচনার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগস্ট ২৭, ২০২০; যেটা হিজরি চান্দ্র বর্ষপঞ্জি মোতাবেক মুহাররম ৮, ১৪৪২ এবং হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জি মোতাবেক সাউনবোলা ৬, ১৩৯৯ সময়সীমার মধ্যে তাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তানের, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত, সদস্যদের বিরুদ্ধে পুরস্কারের তালিকা বিষয়ে প্রশাসনিক পুনর্বিবেচনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ঙ. আন্তঃআফগান সংলাপ সূচনার সঙ্গে সঙ্গে মে ২৯, ২০২০ যেটা হিজরি চান্দ্র বর্ষপঞ্জি মোতাবেক শাওয়াল ৬, ১৪৪৪ এবং হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জি মোতাবেক জাওজা ৯, ১৩৯৯ সময়সীমার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামিক আমিরাত অব

আফগানিস্তান, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত, সদস্যদের নিষেধাজ্ঞা তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কূটনৈতিক পদক্ষেপের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

চ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্ররা আফগানিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা অথবা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপের হুমকি প্রদান অথবা বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকবে।

দ্বিতীয় অংশ

এই চুক্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত, আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি রোধকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে:

১. ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত, আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করে তাদের কোনো সদস্য অথবা আল-কায়েদাসহ অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলতে দেবে না।

২. ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত, যারা যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের নিরাপত্তার ব্যাপারে হুমকি ধারণ করে তাদের স্পষ্ট বার্তা পাঠিয়ে দেবে যে আফগানিস্তানে তাদের কোনো জায়গা নেই এবং ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত, সদস্যদের এই নির্দেশনা দেবে যে, তারা যাতে এমন কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে সহযোগিতার না করে, যারা যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের জন্য হুমকিস্বরূপ।

৩. ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত, আফগানিস্তানের যেকোনো গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের নিরাপত্তা বিরুদ্ধে কাজ করা থেকে প্রতিরোধ করবে এবং সেসব গোষ্ঠী বা ব্যক্তি কর্তৃক সৈন্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ এবং তহবিল সংগ্রহ প্রতিরোধ করবে এবং এই চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদের কোনো প্রকার আশ্রয় প্রদান করবে না।

৪. ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত, আন্তর্জাতিক অভিবাসন আইন এবং এই চুক্তির শর্তসমূহের আলোকে যারা আফগানিস্তানে আশ্রয় অথবা বাসস্থান গ্রহণে ইচ্ছুক, তাদের সঙ্গে লেনদেনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যাতে করে এসব ব্যক্তিবর্গ যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের প্রতি কোনো হুমকি ধারণ না করে।

৫. ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে পরিচিত, যারা যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ তাদের আফগানিস্তানে প্রবেশের জন্য ভিসা, পাসপোর্ট, ট্রাভেল পারমিট অথবা অন্য কোনো বৈধ ডকুমেন্ট প্রদান করবে না।

তৃতীয় অংশ

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তির স্বীকৃতি এবং অনুমোদনের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করবে।

২. যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান, যেটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তালেবান হিসেবে পরিচিত, একে অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক কামনা করে এবং এই আশা রাখে যে, আন্তঃআফগান সংলাপ এবং সমঝোতার মাধ্যমে গঠিত মীমাংসা-পরবর্তী আফগান ইসলামি সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে আন্তঃআফগান সংলাপ এবং সমঝোতার মাধ্যমে গঠিত মীমাংসা-পরবর্তী আফগান ইসলামি সরকারের সঙ্গে আর্থিক সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক এবং তাদের অভ্যন্তরীণ কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে।

কাতারের দোহায় ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২০; রজব ৫, ১৪৪১ (হিজরি চান্দ্র বর্ষপঞ্জি); হুত ১০, ১৩৯৮ (হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জি) স্বাক্ষরিত এবং পাস্তো, দারি এবং ইংরেজি ভাষায় অনূদিত এবং প্রতিটি অনুলিপি সমভাবে স্বীকৃত।

পরিশিষ্ট ৩

আফগানিস্তান: একটি ঐতিহাসিক সময়সূচি

প্রচলিত আছে, আল্লাহ যখন কোনো পরাক্রমশালী জাতিকে ধ্বংস করতে চান তখন তার মাথায় আফগানিস্তান আক্রমণের চিন্তা ঢুকিয়ে দেন। ইসা (আ.)-এর জন্মের ৩২৬ বছর আগে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ৪১ হাজার দুর্ধর্ষ গ্রিক মেসিডোনিয়ান সেনাবাহিনী নিয়ে ভারত আক্রমণের জন্য রওনা হয়েছিল। পথমধ্যে আলেকজান্ডার প্রথম রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এই আফগানিস্তানের মাটিতে। আফগানদের হাতে মাসাজার উপত্যকার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নাস্তানাবুদ বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডার প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পায়। জানা যায়, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের পর ভারতবর্ষের মৌর্য রাজবংশ আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়েছিল দখলদারি কায়েমের লক্ষ্যে, কিন্তু আফগানের পাহাড়ের সন্তানরা যথারীতি পর্বত কঠিন প্রতিরোধের মাধ্যমে তাদের আতিথেয়তা করতে কার্পণ্য করেনি। মৌর্যরাজের আশার গুড়ে বালি পড়ে। এরপর পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ আসেন আফগানিস্তান জয় করতে। পানিপথ যুদ্ধজয়ী আফগান শাসক আহমদ শাহ আবদালির হাতে তারও শোচনীয় পরাজয় ঘটে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না, সেই ব্রিটিশ বাহিনী দুবার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে আফগানিস্তানের মাটিতে। ব্রিটিশদের সমর ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম পরাজয় ঘটেছিল আফগানিস্তানে। প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে গান্দমাক গিরিপথের অ্যাম্বুশে সাড়ে চার হাজার যোদ্ধার একটা ব্রিটিশ রেজিমেন্টের একজন মাত্র সৈন্য বাদে বাকি সবাই নিহত হয়েছিল। এরপর আসে সুপার পাওয়ার রাশিয়ান লজ্জাজনক পরাজয়ের পালা। সেটা ছিল এমন পরাজয়, যা পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছিল। এর পর এলো মানবেতিহাসের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি আমেরিকা। এরা ঘোষণা দিয়ে এক দীর্ঘ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। নাইন-ইলেভেনের পর জর্জ ডব্লিউ বুশ তার ভাষণে স্পষ্ট বলেছিল, আমরা এক

দীর্ঘ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছি, যা আমেরিকার জনগণ কখনো দেখেনি। যদিও আমেরিকা তার জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে আছে, তবু তাদের সবচেয়ে লম্বা লড়াইটি ছিল ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে; দীর্ঘ ১০ বছর। সেই আমেরিকা যখন তার নাগরিকদের বলছিল এমন এক যুদ্ধে নামার কথা, যা তারা আগে দেখেনি, তখন বোঝাই যায় যে তারা জানত, ১০-১৫ বছরের যুদ্ধে আফগানদের হারানো সম্ভব নয়। আফগানদের আড়াই হাজার বছরের লড়াইয়ের ইতিহাস তারা খুব ভালো করেই পাঠ করেছিল। তাদের ধারণা সঠিকই প্রমাণিত হয়েছে। ১০-১৫ বছর নয়, আজ প্রায় ২০ বছরের যুদ্ধ শেষে আমেরিকাও আজ ক্লান্ত-শ্রান্ত; পর্যদুস্ত ও পলায়নপর।

অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধসমূহ

উনিশ শতকজুড়ে ব্রিটেন এর ভারতীয় সাম্রাজ্যকে রাশিয়ার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানকেও এর ভারতীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ফলাফলস্বরূপ ব্রিটিশ এবং আফগানদের মধ্যে পরপর অনেক যুদ্ধ (১৮৩৮-৪২, ১৮৭৮-৮০, ১৯১৯-২১) সংঘটিত হয়।

জুলাই ১৮৩৯–অক্টোবর ১৮৪২: ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং এমিরেটস অব আফগানিস্তানের মধ্যে প্রথম অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ সংঘটিত হয় (ব্রিটিশদের কাছে আফগানিস্তানের বিপর্যয় নামেও পরিচিত)। গ্রেট গেমের সময় সংঘটিত সংঘর্ষের মধ্যে এটি অন্যতম প্রধান যুদ্ধ; যেখানে কিনা এশিয়ার আধিপত্য নিয়ে ব্রিটিশ ও রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশরা আমির দোস্ত মোহাম্মদ (বারাকজাই) এবং সাবেক আমির শাহ শুজা (দুররানি)-এর মাঝের সিংহাসনের লড়াইয়ে সফলভাবে সামরিক হস্তক্ষেপ করে এবং ব্রিটিশপন্থি শাহ সুজাকে সিংহাসনে বসায়। এরপর অধিকাংশ ব্রিটিশ সৈনিক ভারতে ফিরে এলেও সুজার শাসন ও অবশিষ্ট ব্রিটিশদের উপস্থিতিতে ক্ষুব্ধ আফগানরা দোস্ত মুহাম্মদ খানের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ও তাদের সহযোগীদের ওপর একটি ব্যর্থ আক্রমণ চালায়। কিন্তু পরাজিত হয়ে দোস্ত মুহাম্মদ খান আত্মসমর্পণ করলে তাকে ভারতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। কিন্তু ব্রিটিশদের উপস্থিতিতে অসন্তুষ্ট আফগানরা দোস্ত মুহাম্মদ খানের পুত্র ওয়াজির আকবর খানের নেতৃত্বে ক্রমাগত শক্তিশালী সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। অবশেষে ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি ওয়াজির আকবর খানের সঙ্গে ব্রিটিশরা একটি চুক্তিতে সম্মত হয়। চুক্তিতে আফগানিস্তান থেকে ব্রিটিশ গেরিসন ও এর ওপর

নির্ভরশীলরা নিরাপদে দেশত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই চুক্তির পাঁচ দিন পর ব্রিটিশ প্রত্যাহার শুরু হয়। ব্রিটিশ পক্ষে লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১৬ হাজার ৫০০ যার মধ্যে ৪ হাজার ৫০০ জন সৈনিক (৪৪তম রেজিমেন্ট অব ফুট) ও ১২ হাজার আফগান মিত্র। কিন্তু তুষারাবৃত গান্দমাক গিরিপথ অতিক্রমের সময় গিলাজাই যোদ্ধাদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। গান্দামাক গিরিপথে ব্রিটিশ বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে কেবল ড. উইলিয়াম ব্রাইডন জালালাবাদ ঘাটিতে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। পাশাপাশি ক্যাপ্টেন জেমস সুটার, সার্জেন্ট ফেয়ার ও সাতজন সৈনিক বন্দি হওয়ায় বেঁচে যান। কিন্তু গান্দমাক গিরিপথের লড়াইয়ে ৪৪তম রেজিমেন্ট অব ফুটের বাদবাকি সবাই নিহত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে পরাজিত হলেও সর্বশেষ লড়াইয়ে ব্রিটিশরা আফগানদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ব্রিটিশরা গান্দমাকে নিহতদের প্রতিশোধ নিতে কাবুলে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করে। বন্দিদের উদ্ধার করার পর, তারা বছর শেষে আফগানিস্তান থেকে নিজেদের পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেয়। অবশেষে দোস্ত মোহাম্মদ নির্বাসন থেকে ভারতে ফিরে এসে পুনরায় সিংহাসনে বসেন।

নভেম্বর ১৮৭৮–সেপ্টেম্বর ১৮৮০: দ্বিতীয় অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধটি ছিল ব্রিটিশরাজ এবং আফগানিস্তানের আমিরাতের মধ্যে ১৮৭৮ থেকে ১৮৮০-এর মধ্যে সংঘটিত একটি সামরিক দ্বন্দ্ব। এ সময় বারাকজাই গোত্রের সাবেক আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের পুত্র শের আলী খান ছিলেন আফগানিস্তান শাসক। এই যুদ্ধটিও ব্রিটিশ এবং রাশিয়ান সাম্রাজ্যের মধ্যকার গ্রেট গেমের অংশ ছিল। ব্রিটিশ ভারত কর্তৃক এটি ছিল দ্বিতীয়বারের মতো আফগানিস্তান আক্রমণ। এই যুদ্ধে ব্রিটিশরা বিজয়ী হয়েছিল। যুদ্ধশেষে আফগান গোত্রগুলোকে অভ্যন্তরীণ শাসন ও স্থানীয় প্রথা বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হলেও বৈদেশিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশদের হাতে চলে যায় এবং পাশাপাশি আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী গোত্রীয় এলাকাকে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে একীভূত করে নেওয়া হয়।

যুদ্ধটি দুটি অভিযানে বিভক্ত ছিল, প্রথমটি ১৮৭৮ সালের নভেম্বরে আফগানিস্তানে ব্রিটিশ আক্রমণের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশরা দ্রুত বিজয় লাভ করে এবং আমির শের আলী খানকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। আলীর উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ ইয়াকুব খান অবিলম্বে শান্তির আবেদন করেন এবং ১৮৭৯ সালের ২৬ মে গান্দমাক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ব্রিটিশরা স্যার লুই কাভাগনারির নেতৃত্বে একজন দূত এবং একটি মিশন কাবুলে প্রেরণ করে।

কিন্তু ১৮৭৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কাবুলে সংঘটিত একটি অভ্যুত্থানে ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার লুইস কাভাগনারি তার দেহরক্ষী, কর্মচারীসহ নিহত হন। এর ফলে যুদ্ধের দ্বিতীয় দফা শুরু হয়। এর জন্য দায়ী ছিল মুহাম্মদ ইয়াকুব খানের ভাই মুহাম্মদ আইয়ুব খান এবং এর ফলে ইয়াকুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৮৮০ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটিশরা কান্দাহারের বাইরে আইয়ুব খানকে নিষ্পত্তিমূলকভাবে পরাজিত করলে দ্বিতীয় অভিযানের সমাপ্তি ঘটে। এরপর আইয়ুব খানের চাচাতো ভাই আবদুর রহমান খানকে ব্রিটিশরা সিংহাসনে বসায়। তিনি গান্দমাক চুক্তিকে আরও একবার অনুমোদন ও নিশ্চিত করেন। গান্দমাকের চুক্তির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের পর ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। আফগানরাও ব্রিটিশদের সকল ভূরাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশরাজ এবং রাশিয়ান সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি বাফার তৈরি করতে সম্মত হয়েছিল।

৬ মে–৮ আগস্ট ১৯১৯: তৃতীয় অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ, যা তৃতীয় আফগান যুদ্ধ কিংবা ১৯১৯ সালের ব্রিটিশ-আফগান যুদ্ধ নামেও পরিচিত। আফগানিস্তানে এটি স্বাধীনতার যুদ্ধ নামে পরিচিত। আফগানিস্তানের আমিরাত ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করলে ১৯১৯ সালের ৬ মে যুদ্ধের সূচনা হয় এবং ১৯১৯ সালের ৮ আগস্ট একটি যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটেছিল। যুদ্ধের ফলাফল ছিল আফগানদের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের একটি চুক্তি, যাতে আফগানরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ও বৈদেশিক বিষয়াবলির নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং ব্রিটিশরা ডুরান্ড লাইনকে আফগানিস্তান এবং ব্রিটিশ ভারতের সীমান্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে আফগানিস্তানের পিছিয়ে পড়া নিয়ে সচেতন আমির আমানুল্লাহ খান আর্থসামাজিক সংস্কারের একটি কঠোর অভিযান শুরু করেন।

স্বাধীন আফগানিস্তানের যাত্রা এবং অভ্যন্তরীণ উত্থান-পতন

১৯২৬: আমানউল্লাহ আফগানিস্তানকে আমিরাতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং নিজেকে রাজা ঘোষণা করেন। তিনি আধুনিকায়নের অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং জাতীয় কাউন্সিল লয়া জিরগার ক্ষমতা সীমিত করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু এতে করে আমানউল্লাহর নীতিতে হতাশ বিরোধীরা ১৯২৮ সালে অস্ত্র হাতে তুলে নেয় এবং ১৯২৯ সালে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং দেশত্যাগ করেন।

১৯৩৩: নতুন রাজা হিসেবে জহির শাহ সিংহাসনে আসীন হন। তিনি দেশে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসার ঘোষণা দেন এবং পরবর্তী ৪০ বছর তিনিই আফগানিস্তান শাসন করেছিলেন।

১৯৩৪: যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে আফগানিস্তানকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৪৭: ব্রিটেন ভারত ত্যাগ করে এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারত বিভক্ত হয়ে প্রধানত হিন্দু কিন্তু সেক্যুলার রাষ্ট্র ভারত এবং ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। বিভাজনকালে আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের একটি দীর্ঘ এবং অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণহীন সীমান্ত অন্তর্ভুক্ত হয়, যা ডুরাল্ড লাইন দিয়ে চিহ্নিত ছিল।

১৯৫৩: জহির শাহর চাচাতো ভাই সোভিয়েতপন্থি জেনারেল মুহাম্মদ দাউদ খান প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তার জন্য কমিউনিস্ট সোভিয়েতের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি নারী-স্বাধীনতাসহ অনেক সামাজিক সংস্কার পত্তন করেন।

১৯৫৬: সোভিয়েত প্রিমিয়ার (প্রধানমন্ত্রী) নিকিতা ক্রুশ্চেভ আফগানিস্তানকে সাহায্য করতে সম্মত হন এবং দুই দেশ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ মিত্র হয়ে ওঠে।

১৯৫৭: আফগান প্রধানমন্ত্রী জেনারেল মুহাম্মদ দাউদ খানের সংস্কারের অংশ হিসেবে নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা এবং চাকুরিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

১৯৬৫: অতি গোপনে আফগান কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন বাবরাক কারমাল এবং নুর মুহাম্মদ তারাকি।

১৯৭৩: জেনারেল মুহাম্মদ দাউদ খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আফগানিস্তানের শেষ রাজা মুহাম্মদ জহির শাহকে উৎখাত করেন। দাউদ খানের পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আফগানিস্তান সরকার গঠন করে। জেনারেল দাউদ খান রাজতন্ত্র বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষিত করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত আফগানিস্তান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৫–১৯৭৭: জেনারেল দাউদ খান একটি নতুন সংবিধান প্রস্তাব করেন, যেখানে পশ্চিমা আদলের নারী অধিকার এবং মূলত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রটিকে আধুনিকীকরণ করার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। তিনি বিরোধীদের কঠোরভাবে দমন করেন এবং তাকে সমর্থন না করার সন্দেহে অনেককে সরকার থেকে বহিষ্কৃত করেন।

১৯৭৮: কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যুত্থানে জেনারেল মোহাম্মদ দাউদ খান নিহত হন। আফগান কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নুর মোহাম্মদ তারাকি রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশটির নিয়ন্ত্রণ নেন এবং বাব রক কারমালকে ডেপুটি-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেন। তারা সোভিয়েত প্রভাব থেকে মুক্তির ঘোষণা দেন এবং ইসলামি নীতিমালা, আফগান জাতীয়তাবাদ এবং আর্থসামাজিক ন্যায্যতার ভিত্তিতে তাদের নীতিমালা প্রণয়নের ঘোষণা দেন।

কিন্তু অন্যদিকে তারাকি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। পাশাপাশি একসময়ের মিত্র তারাকি এবং প্রভাবশালী কমিউনিস্ট নেতা হাফিজুল্লাহ আমিনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের রূপ নেয়। একই সময়ে জেনারেল দাউদ খানের প্রবর্তিত সংস্কারে আপত্তিকারী রক্ষণশীল ইসলামি এবং উপজাতীয় নেতারা গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে। জুন মাসেই সোভিয়েত সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গেরিলা আন্দোলন মুজাহিদিন গোষ্ঠী সংগঠিত হওয়া শুরু করে।

সোভিয়েত যুদ্ধের দিনগুলো

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯: অজ্ঞাতপরিচয়ের চারজন ব্যক্তি আফগানিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আদোলফ ডাবসকে অপহরণ করে। এদিনই আফগান পুলিশের উদ্ধার অভিযানে আদোলফ ডাবস নিহত হয়। এর ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানকে সহায়তা প্রদান বন্ধ করে দেয়।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯: তারাকি এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী হাফিজুল্লাহ আমিনের মধ্যে চলমান ক্ষমতার লড়াইয়ে হাফিজুল্লাহ আমিন সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষে তারাকি নিহত হন।

২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৯: সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৪ ডিসেম্বর তারিখে পতনোন্মুখ কমিউনিস্ট শাসনকে সহায়তার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ করে। এর মাধ্যমেই সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধ শুরু হয়।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৯: সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক ২৭ ডিসেম্বর তারিখে হাফিজুল্লাহ আমিন এবং তার অনেক অনুসারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। উপ-প্রধানমন্ত্রী বাব রক কারমাল নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৯৮৩: প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ১৯৮৩ সালে কয়েকজন আফগান মুজাহিদিন নেতার সঙ্গে হোয়াইট হাউসে সাক্ষাৎ করেন। পরে মুজাহিদিন নেতা ইউনুস খালিস ১৯৮৭ সালে ওভাল অফিস পরিদর্শন করেছিলেন।

১৯৮৪: সৌদি ইসলামিস্ট ওসামা বিন লাদেনের দাবি মোতাবেক সোভিয়েত আক্রমণের পরপরই তিনি আফগানিস্তান ভ্রমণে গেলেও, এই বছরে সোভিয়েতবিরোধী মুজাহিদিন যোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য আফগানিস্তানে প্রথম নথিভুক্ত সফরের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৯৮৬: CIA মুজাহিদিনদের অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট স্টিংগার মিসাইল সরবরাহ করে। ফলে মুজাহিদিন যোদ্ধারা সোভিয়েত গানশিপ হেলিকপ্টার ভূপাতিত করার সক্ষমতা অর্জন করে।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭: সোভিয়েতরা মুহাম্মদ নাজিবুল্লাহকে কারমালের স্থলাভিষিক্ত করে।

১৪ এপ্রিল ১৯৮৮: আফগানিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তান জেনেভা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির মাধ্যমে আফগানদের স্বাধীনতা এবং ১ লাখ সোভিয়েত সৈন্যের প্রত্যাহার নিশ্চিত হয়।

এ বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে ওসামা বিন লাদেন এবং তার ১৫ জন ইসলামপন্থি সহযোগী আল-কায়েদা গঠন করেছিল। সোভিয়েত এবং আফগানিস্তানের অন্যান্য ইসলামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে তাদের জিহাদ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি তাদের মনোযোগ আমেরিকার দিকে সরিয়ে নিতে শুরু করে; যেহেতু তাদের মতে, এই অবশিষ্ট পরাশক্তিটি কোনো ইসলামভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রধানতম একটি বাধা ছিল।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯: সর্বশেষ সোভিয়েত সেনা হিসেবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল বরিস গ্রোমোভ আফগানিস্তান ত্যাগ করেন। তিনি তার ছেলের সঙ্গে আমু দরিয়া নদীর ওপর দিয়ে আফগানিস্তানকে উজবেকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তকারী সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে আফগানিস্তান ত্যাগ করেছিলেন।

১৯৯০-এর দশক থেকে ২০০১: গৃহযুদ্ধ এবং তালেবান শাসন

১৬ এপ্রিল ১৯৯২: সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহার এবং ১৯৯১ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং কাবুলের দিকে মুজাহিদিন যোদ্ধাদের অগ্রযাত্রার ফলে নাজিবুল্লাহ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফলস্বরূপ আফগানিস্তানের কমিউনিস্টপন্থি সরকারের চূড়ান্ত পতন ঘটে। তাকে আফগানিস্তান ত্যাগে বাধা দেওয়া হয় এবং তিনি কাবুলের জাতিসংঘ কম্পাউন্ডে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি চার বছরেরও বেশি সময় অবস্থান করেছিলেন।

৩০ এপ্রিল ১৯৯২: মুজাহিদিন, অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং স্বপক্ষত্যাগী সরকারি সৈন্যরা রাজধানী পুরোপুরিভাবে কাবুলের দখল নেয়। কিংবদন্তি গেরিলা নেতা আহমদ শাহ মাসুদ রাজধানীতে প্রবেশের সময় সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রাজধানীর পতনের পর জাতিসংঘ নাজিবুল্লাহকে নিরাপত্তা প্রদান করে।

আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধ চলাকালীনও রাজধানী কাবুল অনেকাংশেই সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু রাজধানীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে বহুমুখী লড়াইয়ে শহরের বিস্তৃত অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এ সময় মুজাহিদিন নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার এবং উজবেক যুদ্ধবাজ আবদুল রশিদ দোস্তমের অনুগত বাহিনীর হাতেই মূলত এটি নির্মম আক্রমণের শিকার হয়। জাতীয় জাদুঘরে রকেট হামলা করা হয় এবং লুট করা হয়। এই লড়াইয়ে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ নিহত হয়।

৩ জানুয়ারি ১৯৯৩: জামায়াত-ই-ইসলামি প্রধান ইসলামিক স্টেট অব আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

৫ নভেম্বর ১৯৯৪: পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মুজাহিদিন গোষ্ঠী এবং মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসা অতি রক্ষণশীল আফগান ছাত্র-যোদ্ধাদের দল তালেবান আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর কান্দাহারকে পুরোপুরি নিজেদের দখলে নেয় এবং শৃঙ্খলা ও বৃহত্তর নিরাপত্তা কায়েম করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরপর তারা দক্ষিণাঞ্চলের একের পর এক এলাকা নিজেদের দখলে নিতে থাকে।

১৮ মে ১৯৯৬: সৌদি বংশোদ্ভূত আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন সুদান থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আফগানিস্তানে আগমন করেন। বিমানবন্দরে তাকে ইসলামিক ইউনিয়ন কমান্ডার সানজুর এবং ইউনুস খালিসের হিজব-ই-ইসলামির পক্ষ থেকে ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ স্বাগত জানান। তার এই আগমনে তৎকালীন আফগান রাষ্ট্রপতি বুরহানউদ্দিন রব্বানি এবং প্রধানমন্ত্রী হেকমতিয়ারের অনুমোদন ছিল। পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনাচক্রে বিন লাদেন এক চক্ষুবিশিষ্ট তালেবান প্রধান মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের অনুগ্রহভাজন হয়ে ওঠেন।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬: তালেবালের হাতে কাবুলের পতন ঘটে। এর দুই দিন পর ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে তারা জাতিসংঘ কম্পাউন্ড থেকে সাবেক রাষ্ট্রপতি নাজিবুল্লাহকে আটক করে, তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং তার মৃতদেহ একটি ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেয়।

৭ আগস্ট ১৯৯৮: আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকার দেশ তাঞ্জানিয়ার দারুস সালাম এবং কেনিয়ার নাইরোবিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে ট্রাকবোমা হামলা চালালে ২২৪ জন নিহত হয়। এই হামলার জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট

বিল ক্লিনটনের আদেশে ২০ আগস্ট তারিখে আফগানিস্তান ও সুদানে বিন লাদেনের প্রশিক্ষণ শিবিরে ক্রুজ মিসাইল হামলা চালানো হয়। কিন্তু হামলার মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়নিই; বরং এতে সুদানের সবচেয়ে বড় ওষুধ ফ্যাক্টরি পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯: কাঠমান্ডু থেকে নয়াদিল্লিগামী ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ৮১৪ আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী হরকত-উল-মুজাহিদিন এর পাঁচজন সদস্য হাইজ্যাক করে এবং সেটিকে জোরপূর্বক কান্দাহারে অবতরণ করায়। তালেবান হাইজ্যাকার এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। মধ্যস্থতার ফলাফল হিসেবে যাত্রীদের নিরাপত্তার বিনিময়ে ভারত সরকার ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তাদের কারাগার থেকে তিনজন জঙ্গিনেতা মোস্তাক আহমেদ জারগার, সাঈদ শেখ এবং মাসুদ আজহারকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

এ বছরই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালেবান ও আল-কায়েদার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

২০০০: জাতিসংঘ আফগানিস্তানের ওপর বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে।

২ মার্চ ২০০১: আন্তর্জাতিক চাপকে উপেক্ষা করেই তালেবান বামিয়ানের একটি পাহাড়ে খোদাই করা ১৫০০ বছরের পুরোনো দুটি বিশাল বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করার কাজ শুরু করে। এই দিন থেকে থেকে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে বেশ কয়েক ধাপে মূর্তিগুলোকে ডায়নাইটে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করা হয়।

৪ সেপ্টেম্বর ২০০১: আটজন আন্তর্জাতিক সহায়তা কর্মীকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তারের এক মাস পর তালেবান তাদেরকে বিচারের অধীনে নিয়ে আসে। তালেবান শাসনের অধীনে ইসলাম থেকে ভিন্নধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। এই দলটিকে বিভিন্ন আফগান কারাগারে কয়েক মাস বন্দি রাখার পর ১৫ নভেম্বর তারিখে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

৯ সেপ্টেম্বর ২০০১: টিভি সাংবাদিকের ছদ্মবেশে দুজন ফরাসি বংশোদ্ভূত আলজেরিয়ান আল-কায়েদা সদস্য ক্যামেরার ভেতর লুকিয়ে রাখা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তালেবানবিরোধী নর্দার্ন অ্যালায়েন্স প্রধান আহমদ শাহ মাসুদকে আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে হত্যা করে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১: এ দিন সকালে আল-কায়েদার ১৯ জন হাইজ্যাকার চারটি বাণিজ্যিক বিমান (দুটি বোয়িং ৭৫৭ ও দুটি বোয়িং ৭৬৭) হাইজ্যাক

করে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। বিমান চারটি ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনের লোগান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর; নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের নিউইয়র্কের নিউইয়র্ক লিবার্টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর; ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের লাউডেন কাউন্টি ও ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির ওয়াশিংটন ডালস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেসের ল্যাক্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও সান ফ্রান্সিস্কোর এসএফও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। হাইজ্যাককৃত বিমানগুলোর মধ্য থেকে আমেরিকান এয়ারলাইনস ফ্লাইট ১১ (বোয়িং ৭৬৭) দিয়ে স্থানীয় সময় সকাল ৮টা বেজে ৪৬ মিনিটে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার কমপ্লেক্সের নর্থ টাওয়ারে আঘাত হানা হয়। এর ১৭ মিনিট পর ৯টা বেজে ৩ মিনিটে সাউথ টাওয়ারে ফ্লাইট ১৭৫ (বোয়িং ৭৬৭) আছড়ে পড়ে। এই উভয় ১১০ তলা বিল্ডিংই ১ ঘণ্টা ৪২ মিনিটের মাঝে ধসে পড়ে। তৃতীয় হামলা হিসেবে ফ্লাইট ৭৭ (বোয়িং ৭৫৭) দিয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের পশ্চিম বাহুতে বেলা ৯টা বেজে ৩৭ মিনিটে আঘাত হানা হয় এবং এতে পেন্টাগনের পশ্চিম দিক আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চতুর্থ এবং সর্বশেষ বিমান ফ্লাইট ৯৩ (বোয়িং ৭৫৭) ওয়াশিংটন ডিসির দিকে উড়িয়ে নেওয়ার সময় যাত্রীরা বিমানের কন্ট্রোল নেওয়ার চেষ্টা চালালে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার পূর্বে পেনিসিলভানিয়ার একটি মাঠে সকাল ১০টা বেজে ৩ মিনিটে বিধ্বস্ত হয়। তদন্তকারীদের দাবি মোতাবেক ফ্লাইট ৯৩-এর লক্ষ্য ছিল ইউএস ক্যাপিটল কিংবা হোয়াইট হাউস। টুইন টাওয়ার হামলায় ২ হাজার ৭৬৩ জন, পেন্টাগনে ১৮৯ জন এবং পেনিসিলভানিয়ায় বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ৪৪ জনসহ নাইন-ইলেভেনের হামলায় সর্বমোট ২ হাজার ৯৯৬ জন মারা যায়। হামলায় মৃতদের মধ্যে সব বিমানের যাত্রীসংখ্যা ছিল ২১৩ জন, বিমান ক্রু ৩৩ জন এবং হাইজ্যাকার ছিল ১৯ জন। এই হামলায় মৃতদের মধ্যে ৯৩টি দেশের নাগরিক অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাশাপাশি হামলার ফলে আহত হয় প্রায় ৬ হাজার জন্য এবং ১০ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের অবকাঠামো এবং সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০২ সালের নভেম্বরে বিন লাদেনের ‘লেটার টু আমেরিকা’তে তিনি আল-কায়েদার এই হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করেন:

- ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন
- সোমালিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন
- মরো সংঘাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনকে সমর্থন
- লেবাননে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনে ইসরায়েলকে সমর্থন

- চেচনিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুশদের সমর্থন
- মুসলমানদের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে প্রো-মার্কিন সরকার
- ভারতকে কাশ্মীরি মুসলমানদের শোষণকে সমর্থন
- সৌদি আরবের মার্কিন সামরিক উপস্থিতি
- ইরাকের ওপর অবরোধ

আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন

(৭ অক্টোবর ২০০১–৩০ আগস্ট ২০২১; সর্বমোট ১৯ বছর, ১০ মাস, ৩ সপ্তাহ এবং ২ দিন)

৭ অক্টোবর ২০০১: তালেবান বিন লাদেনকে হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানালে (স্থানীয় সময় রাত ৯টা) মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী আফগানিস্তানে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালায়। মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো আল-কায়েদা ঘাঁটি এবং তালেবানের সামরিক অবকাঠামোর ওপর বোমা হামলা শুরু করে। তালেবানও ঘোষণা করে যে তারা জিহাদের জন্য প্রস্তুত।

১৩ নভেম্বর ২০০১: তালেবান সৈন্যদের সঙ্গে তীব্র লড়াইয়ের পর নর্দার্ন অ্যালায়েন্স কাবুলে প্রবেশ করে। পশ্চাদপসরণকারী তালেবান দক্ষিণে কান্দাহারের দিকে পালিয়ে যায়।

১৬ নভেম্বর ২০০১: মার্কিন বিমান হামলায় আল-কায়েদার সামরিক প্রধান মোহাম্মদ আতেফ নিহত হন।

৬ ডিসেম্বর ২০০১: তোরা বোরা (পশতু ভাষায় তোরা বোরা অর্থ 'কালো গুহা', যা হিন্দুকুশ পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত) যুদ্ধ শুরু হয় যা একই মাসের ১৭ তারিখ অবধি অব্যাহত থাকে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল আল-কায়েদা প্রধানকে আটক কিংবা হত্যা করা। অভিযানে প্রচণ্ড বিমান হামলা চালানো হয় এবং ডেইসি কার্টারের মতো বোমা নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং বিন লাদেন পাকিস্তানে পালিয়ে যান।

৭ ডিসেম্বর ২০০১: তালেবান যোদ্ধারা কান্দাহারে তাদের সর্বশেষ শক্তিশালী ঘাঁটি পরিত্যাগ করে। এর দুই দিন পরে তালেবান নেতারা তালেবান নিয়ন্ত্রিত সর্বশেষ আফগান ভূখণ্ড জাবুল প্রদেশও পরিত্যাগ। এর ফলে পাকিস্তানভিত্তিক আফগান ইসলামিক প্রেস ঘোষণা করতে বাধ্য হয় যে 'আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের পুরোপুরি সমাপ্তি ঘটেছে'।

২২ ডিসেম্বর ২০০১: হামিদ কারজাই আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। কারজাই পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানে বহু বছর নির্বাসিত থাকার পর আফগানিস্তানে আগমন করেন। জাতিসংঘ পৃষ্ঠপোষিত অন্তর্বর্তী সরকার নির্ধারণের সম্মেলনের আগেই কারজাই যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পেয়েছিলেন এবং সম্মেলন শেষে তিনিই ছয় মাস মেয়াদি সরকারের প্রধান নির্বাচিত হন।

৪ জানুয়ারি ২০০২: প্রতিপক্ষের গুলিতে প্রথম মার্কিন সেনা নিহত হয়।

১ মার্চ ২০০২: পাকতিয়া প্রদেশের শাহি-কোট ভ্যালিতে আল-কায়েদা এবং তালেবান যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অপারেশন অ্যানাকোন্ডা শুরু হয়, যা এই মাসের ১৮ তারিখ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। আনুমানিক ৫০০-১০০০ আল-কায়েদা এবং তালেবান যোদ্ধার বিপরীতে ১ হাজার ৭০০ মার্কিন সেনা এবং ১ হাজার সরকারপন্থি আফগান মিলিশিয়া লড়াই করে। মার্কিন সেনারা প্রতিপক্ষের প্রায় ৫০০ সেনাকে হত্যা করার দাবি করলেও, সাংবাদিকদের তথ্য মোতাবেক কেবল ২৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল।

১৭ এপ্রিল ২০০২: ৮৭ বছর বয়সী নির্বাসিত রাজা মোহাম্মদ জহির শাহ আফগানিস্তানে ফিরে আসেন।

১১ জুন ২০০২: বাদশাহ জহির শাহ তালেবান-পরবর্তী প্রথম লয়া-জিরগা চালু করেন।

১ মে ২০০৩: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড আফগানিস্তানে 'মুখ্য যুদ্ধ অভিযান' সমাপ্তির ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, 'আমরা স্পষ্টভাবে প্রধান যুদ্ধ অভিযান থেকে স্থিতিশীলতা এবং স্থিতিশীলকরণ এবং পুনর্গঠন কার্যক্রমের দিকে চলে এসেছি।'

১১ আগস্ট ২০০৩: ক্রমবর্ধমান সহিংসতার মাঝে ন্যাটো কাবুলের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এটি ছিল ইউরোপের বাইরে ন্যাটোর প্রথম কোনো দায়িত্ব গ্রহণ।

১৪ ডিসেম্বর ২০০৩: লয়া জিরগাকে প্রস্তাবিত আফগান সংবিধান বিবেচনা করার জন্য আহ্বান করা হয়।

৪ জানুয়ারি ২০০৪: প্রায় ৫০ হাজার আফগানদের মতামত নিয়ে লয়া জিরগা একটি নতুন সংবিধান অনুমোদন দেয়। নতুন সংবিধানে একজন রাষ্ট্রপতি এবং দুজন উপ-রাষ্ট্রপতির কথা বলা হয়, কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অপসারণ করা হয়। সংবিধান অনুসারে সরকারি ভাষা নির্ধারিত হয় পশতু এবং দারি। এ ছাড়া, নতুন সংবিধানে নারীদের জন্য সমতার কথা বলা হয়।

২৬ জানুয়ারি ২০০৪: লয়া জিরিগা অনুমোদিত সংবিধানে অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই স্বাক্ষর করেন।

৯ অক্টোবর ২০০৪: রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১০.৫ মিলিয়নের বেশি আফগান জনগণ ভোটের জন্য নিবন্ধন করে এবং অন্তর্বর্তী নেতা কারজাইসহ ১৮ জন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অবশেষে হামিদ কারজাই ৫৫ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫: দেশটিতে ৩০ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদের অধিকাংশ আসনে সাবেক ওয়ারলর্ড এবং তাদের অনুসারীরা নির্বাচিত হয়।

৪ আগস্ট ২০০৬: একের পর এক দক্ষিণ আফগানিস্তানের এলাকা তালেবানের দখলে চলে যাওয়ার প্রেক্ষিতে ন্যাটোর আইএসএএফ (ISAF) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে দক্ষিণের কমান্ড গ্রহণ করে। এটিকে ন্যাটো মহাসচিব ‘ন্যাটোর এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা অন্যতম চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব’ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু মার্কিন নেতৃত্বাধীন সৈন্যদের দায়িত্ব গ্রহণের পরও তালেবান যোদ্ধারা আন্তর্জাতিক জোটের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলা এবং অন্যান্য আক্রমণের রক্তাক্ত অভিযান চালু রাখে।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৭: মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির সফরের সময় বাগরাম বিমানঘাঁটিতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সময় সকাল প্রায় ১০টার দিকে, একজন আত্মঘাতী হামলাকারী বিমানঘাঁটির বাইরের গেটে হামলা চালালে ২৩ জন নিহত এবং কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়।

১৩ মে ২০০৭: আফগান সরকার এবং ন্যাটো নিশ্চিত করে যে, আর আগের দিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ আফগানিস্তানের হেলমান্দে মার্কিন নেতৃত্বাধীন অভিযানের সময় তালেবান কমান্ডার মোল্লা দাদুল্লাহ আখুন্দ নিহত হয়েছেন।

১০ জুন ২০০৮: পাকিস্তানে গোরা প্রায়ই বিমান হামলায় ১১ জন পাকিস্তানি আধা সামরিক সেনা নিহত হয়।

৭ জুলাই ২০০৮: কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসে বোমা হামলায় চারজন ভারতীয় নাগরিকসহ ৫৮ জন নিহত হয়। ভারত এই হামলার জন্য পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (ISI)-কে দায়ী করে।

১৯ আগস্ট ২০০৮: উজবিন উপত্যকায় তালেবানের অ্যাম্বুশে হামলায় ১০ জন ফরাসি সৈন্য নিহত হয়।

১৫ আগস্ট ২০০৯: কাবুলের ন্যাটো হেডকোয়ার্টারে তালেবানের আত্মঘাতী হামলায় কমপক্ষে ৭ জন নিহত হয় এবং ৯১ জন আহত হয়। তবে তালেবানের দাবি মোতাবেক, এই হামলায় মার্কিন দূতাবাসের ২৪ জন কর্মী নিহত হয়েছিল।

১ ডিসেম্বর ২০০৯: প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বিশেষ দূত হিসেবে রিচার্ড হলব্রুকের নাম ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট ওবামা আফগানিস্তান যুদ্ধের জন্য নতুন কৌশল আফ-পাক নীতি ঘোষণা করেন, যেখানে সন্ত্রাস দমনে আফগানিস্তানের পাশাপাশি পাকিস্তানেও অভিযান বিস্তৃত করা এবং পাকিস্তান সরকারকে সহায়তার কথা বলা হয়। এ ছাড়া আফগানিস্তানে পূর্বনির্ধারিত ১৭ হাজার সৈন্যের সঙ্গে আরও সামরিক ও বেসামরিক প্রশিক্ষক প্রেরণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২ নভেম্বর ২০০৯: কারজাইকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এর পূর্বে ২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত ভোটে কারজাই অল্প ব্যবধানে বিজয়ী হলেও নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে ৭ নভেম্বর পুনরায় ভোট গ্রহণের দিন ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু ২ নভেম্বর কারজাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ এই প্রক্রিয়া থেকে সরে দাঁড়ালে কারজাইকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় মেয়াদে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত তিনি আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।

২৩ জুন ২০১০: রোলিং স্টোন ম্যাগাজিনের একটি আর্টিকেলে ম্যাকক্রিস্টাল কর্তৃক একটি সমালোচনামূলক মন্তব্যে নানারূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জেরে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আফগানিস্তানের প্রধান সামরিক কমান্ডার জেনারেল স্ট্যানলি ম্যাকক্রিস্টালের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। তার বদলি হিসেবে ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান জেনারেল ডেভিড পেট্রিয়াসকে মনোনীত করা হয়। এ বছরের বসন্ত-গ্রীষ্মে অতিরিক্ত ২০ হাজার সেনা মোতায়েন করা হলে আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাসংখ্যা সর্বোচ্চ সংখ্যায় পৌঁছায়।

২৫ জুলাই ২০১০: উইকিলিকস আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধসংক্রান্ত ৯০ হাজার ফাঁস হওয়া নথি প্রকাশ করে।

২ মে ২০১১: স্থানীয় সময় রাত ১টায় আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অ্যাবোটাবাদ শহরে মার্কিন নৌবাহিনীর সিল সদস্যদের চালানো অভিযানে (অপারেশন জেরোনিমো) নিহত হন। মার্কিন কমান্ডোরা ২টি হেলিকপ্টারযোগে লাদেনের বাসভবনে হামলা চালায়। পাকিস্তান

সেনাবাহিনীর পাকিস্তান মিলিটারি অ্যাকাডেমির মাত্র ১ হাজার ফুট দূরে লাদেনের এই গোপন আস্তানাটি ২০০5 সালে নির্মাণ করা হয়েছিল। বিন লাদেনের মরদেহ মার্কিন কমান্ডোরা হেলিকপ্টারযোগে প্রথমে আফগানিস্তানে এবং পরে মার্কিন রণতরিতে নিয়ে যায় এবং দেহ ডিএনএ প্রযুক্তির সাহায্যে শনাক্ত করা হয়। শনাক্তকরণের শেষে ইসলামি প্রথা মেনে তার মরদেহ আরব সাগরে দাফন করা হয়।

৬ আগস্ট ২০১১: ৩০ জন মার্কিন সেনা (যাদের মধ্যে ১৭ জন নৌবাহিনীর সিল সদস্য), ১ জন বেসামরিক দোভাষী এবং ৭ জন আফগান সেনাকে বহনকারী একটি CH-47 চিনুক হেলিকপ্টার ওয়ার্দাক প্রদেশের টাঙ্গি উপত্যকায় তালেবানের আরপিজি (RPG) হামলায় ভূপতিত হয় এবং এই দুর্ঘটনায় সেখানকার সবাই মারা যায়। ২০০১ সালে আগ্রাসন শুরুর পর থেকে আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর জন্য এই হামলাটি এককভাবে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ছিল।

১১ মার্চ ২০১২: মার্কিন আর্মি স্টাস সার্জেন্ট রবার্ট বেলস কান্দাহারের পাঞ্জওয়াই জেলায় ১৬ জন নিরস্ত্র আফগান বেসামরিক নাগরিককে তাদের বাড়িতে ঢুকে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে ৯ জন ছিল শিশু এবং ১১ জন একই পরিবারের সদস্য ছিল। এই ঘটনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং প্রেসিডেন্ট হামিদ ১৬ মার্চ আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই মার্কিন সেনাদের আফগান গ্রামগুলো ছেড়ে তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান এবং আফগান সেনাবাহিনীর হাতে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণভার তুলে দিতে বলেন।

১৬ মার্চ ২০১৩: যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তুরস্ক সেনাবাহিনীর একটি সিকোরস্কি হেলিকপ্টার কাবুলের একটি বাড়ির ওপর গিয়ে বিধ্বস্ত হয়। এই ঘটনায় ১২ জন তুর্কি সেনা এবং ২টি শিশু নিহত হয়। ন্যাটো জোটের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তুরস্ক সেনাবাহিনীর জন্য এককভাবে সবচেয়ে প্রাণঘাতী দিন ছিল এটি।

২৭ মে ২০১৪: মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তালেবানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক শান্তি আলোচনা শুরু করার পরিকল্পনা এবং ২০১৬ সালের মধ্যে আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার ঘোষণা দেন।

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪: দুই দফা ভোট গ্রহণের পর আশরাফ ঘানি আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নির্বাচনী জালিয়াতি এবং প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ আবদুল্লাহর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তি হওয়ার দাবি ওঠে। আশরাফ ঘানি এর পূর্বে আফগান সরকারের অর্থমন্ত্রী এবং কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

২৮ ডিসেম্বর ২০১৪: ন্যাটো আনুষ্ঠানিকভাবে আফগানিস্তানে এর কমব্যাট মিশন শেষ করে। তবে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো সৈন্যরা আফগান বাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শের জন্য আফগানিস্তানে অবস্থান অব্যাহত রাখে।

১৫ অক্টোবর ২০১৫: মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার প্রেসিডেন্সির শেষ দিকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের পরিকল্পনা থেকে সরে আসার ঘোষণা দেন।

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬: সোভিয়েত পরবর্তী গৃহযুদ্ধের বছরগুলোতে 'কাবুলের কসাই' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া সাবেক মুজাহিদিন নেতা এবং এবং হিজব-ই-ইসলামি প্রধান গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার বিদেশি জোট সেনা প্রত্যাহারের কোনো পূর্বশর্ত ছাড়াই আফগান সরকারের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং বিনিময়ে তাকে নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়।

২ নভেম্বর ২০১৬: ছদ্মবেশী এক তালেবান সদস্য বাগরাম বিমানঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং আত্মঘাতী হামলা চালায়। ইতিপূর্বে সে বাগরাম বিমানঘাঁটিতেই কর্মরত ছিল। হামলায় তাৎক্ষণিকভাবে দুজন মার্কিন সেনা এবং দুজন মার্কিন কন্ট্রাক্টর নিহত হয়। পাশাপাশি আরও ১৭ জন আহত হয়, যাদের ১৬ জন ছিল মার্কিন সেনা এবং আরেকজন ছিল পোলিশ সেনা। আহতদের মধ্যে এক মাস পর আরেকজন মার্কিন সেনা মারা যায়। হামলার পর তালেবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ একটি বিবৃতিতে হামলার দায় স্বীকার করে বলেন যে, চার মাস যাবৎ এই হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

২১ আগস্ট ২০১৭: 'সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্য'-এর উত্থান রোধে ট্রাম্প সামরিক হস্তক্ষেপ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন।

২ এপ্রিল ২০১৮: আফগান বিমানবাহিনী কুন্দুজের একটি মাদরাসার ধর্মীয় সমাবেশে বিমান হামলা চালায়। মাদরাসাটিতে একটি স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান হচ্ছিল, যেখানে কোরআনের হাফেজদের পাগড়ি প্রদান করা হচ্ছিল এবং বিমান হামলার সময় শত শত লোক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। আফগানিস্তানে জাতিসংঘের সহায়তা মিশন (ইউএনএএমএ)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, হামলায় প্রায় ৩৬ জন (৩০ শিশু এবং ৬ প্রাপ্তবয়স্ক) নিহত এবং ৭১ জন (৫১ শিশু এবং ২০ জন প্রাপ্তবয়স্ক) আহত হয়। এই হামলায় বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠলেও আফগানিস্তানের বিশিষ্ট নাগরিকেরা আফগান সরকার কর্তৃক আফগান শিশুদের হত্যাকে সমর্থন দেয়। তাদের মতে, এই হামলা তালেবানকে উদ্দেশ্য করেই চালানো হয়েছিল এবং সেখানে কেবল তালেবান জঙ্গিরাই

নিহত হয়েছে। হামলার ৪৪ দিন পর আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি বিমান হামলায় নিহতদের জন্য ক্ষমা চান।

৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তালেবানের সঙ্গে আলোচনার জন্য আফগানিস্তানে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জালমে খলিলজাদকে তার বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেন।

৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯: রাজধানী কাবুলে তালেবানের একটি আত্মঘাতী হামলায় এলিস এ ব্যারেটো অর্টিজ নামক এক মার্কিন আর্মি সার্জেন্ট নিহত হলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হঠাৎ করেই শান্তি আলোচনা স্থগিত করার ঘোষণা দেন। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট তালেবান এবং আফগান রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিডে পরিকল্পিত গোপন বৈঠককেও বাতিল করে দেন। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য ছিল কোনো চুক্তিতে না পৌঁছানো। কিন্তু আলোচনা পণ্ড করে দেওয়ার পর তালেবান তাদের আক্রমণসমূহ আরও তীব্রতর করে এবং ২০১৯ সালের শেষ এক-চতুর্থাংশটি ২০০১ সালে মার্কিন আগ্রাসনের পর থেকে সবচেয়ে রক্তাক্ত সময়ে পরিণত হয়। আল জাজিরাকে দেওয়া এক বিবৃতিতে তালেবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, আলোচনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে ওয়াশিংটনকে আফসোস করতে হবে।

১১ ডিসেম্বর ২০১৯: তালেবান বাগরাম বিমানঘাঁটিতে দুটি আত্মঘাতী গাড়িবোমা হামলা চালালে ২ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয় এবং কমপক্ষে ৮০ জন আহত হয়।

২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০: বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তালেবান ২৯ ফেব্রুয়ারি (লিপ ইয়ার) কাতারের দোহায় একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। উভয় পক্ষ ২০২১ সালের মে মাসের মধ্যে সব সেনা প্রত্যাহার এবং অপরদিকে তাদের ওপর তালেবানের হামলা বন্ধ করাসহ বিভিন্ন শর্তে সম্মত হয়।

১৭ নভেম্বর ২০২০: প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনের শপথ গ্রহণের আগেই ওয়াশিংটন জানুয়ারির মধ্যে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে ২ হাজার ৫০০ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করে।

১৪ এপ্রিল ২০২১: নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একতরফাভাবে এই বছরের ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব মার্কিন সেনা প্রত্যাহার সম্পন্ন করার নতুন লক্ষ্য ঘোষণা করেন।

৫ জুলাই ২০২১: ঘাঁটির নতুন আফগান কমান্ডারকে না জানিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাগরাম বিমানঘাঁটি ত্যাগ করে।

১০ আগস্ট ২০২১: হোয়াইট হাউস বিবৃতি দেয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত প্রত্যাহারের কারণে তালেবানের পুনরায় ক্ষমতা দখল মোটেই 'অবধারিত নয়'।

১৫ আগস্ট ২০২১: কাবুল সরকারের পতন হয় এবং তালেবান কাবুল দখল করে নেয়।

২৬ আগস্ট ২০২১: কাবুল বিমানবন্দরের বাইরে দুটি আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা ঘটে, যখন কিনা তালেবানের ক্ষমতা দখলের কারণে হাজার হাজার আফগান দেশ ছেড়ে যাচ্ছিল। বোমা হামলায় কমপক্ষে ১৬৯ জন আফগান এবং ১৩ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়। সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ISIS-এর শাখা ISIS-K, যারা আফগানিস্তানের পুরোনো নাম খোরাসানের উল্লেখ করতে 'কে' ব্যবহার করে, এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে।

এদিন সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউস থেকে দেওয়া একটি ভাষণে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, ৩১ আগস্টের মধ্যে প্রত্যাহার সমাপ্ত করার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পাশাপাশি তিনি এই আত্মঘাতী হামলার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন: 'আমরা তোমাদের ক্ষমা করব না। আমরা তোমাদের ভুলে যাব না। আমরা তোমাদের খুঁজে খুঁজে বের করে চড়া মূল্য আদায় করব।'

৩০ আগস্ট ২০২১: মার্কিন সেনাদের সর্বশেষ দলটি কাবুল বিমানবন্দর ত্যাগ করে, যা আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকার দীর্ঘতম যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায়। সর্বশেষ সেনা হিসেবে মার্কিন সেনাবাহিনীর ৮২তম বিমানবাহী বিভাগের ১৮তম এয়ারবোর্ন কর্পসের অধিনায়ক ক্রিস ডোনাহু আফগানিস্তান ত্যাগ করেন। কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সি-১৭ কার্গো বিমানে করে স্থানীয় সময় ৩১ আগস্ট ভোররাত ৩টা ১৫ মিনিটে কাবুল ত্যাগ করেন তিনি।

পরিশিষ্ট ৪

ক্ষমতার মসনদ পুনরুদ্ধারে তালেবানের অগ্রযাত্রা

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ১০ আগস্ট তারিখে সতর্ক করেছিল যে, এক মাস থেকে তিন মাসের মধ্যেই তালেবানের হাতে কাবুল সরকারের পতন হতে পারে। কিন্তু এই সতর্কবার্তার মাত্র পাঁচ দিন পরই রাজধানীর পতন হয়। প্রথমে ধীরগতিতে এবং তারপর যেন হঠাৎ করেই সবকিছু ঘটে যায়। প্রেসিডেন্ট বাইডেন আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণার মাত্র চার মাসের মাথায় তালেবান ২০ বছর পর পুনরায় কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এটা যে এত দ্রুত ঘটবে, সেটা কেউই কল্পনা করতে পারেনি। মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের পর তালেবানের পুনরুত্থান ঘটতে পারে— এরূপ সতর্কবার্তা সব সময়ই ছিল। কিন্তু মার্কিন বাহিনীর সামগ্রিক প্রত্যাহারের আগেই তালেবান একের পর এক প্রাদেশিক রাজধানী দখলে নিতে থাকে এবং প্রথম প্রাদেশিক রাজধানী দখলের মাত্র ৯ দিনের মধ্যেই তারা কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষিত দুর্নীতিগ্রস্ত আফগান সেনাবাহিনীর তালেবানকে প্রতিরোধ তো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে তারা কোনো গুলি না চালিয়েই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে।

এপ্রিলে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ঘোষণার পর থেকে কীভাবে দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে থাকে, তার একটি সংক্ষিপ্ত কালক্রম এখানে তুলে ধরা হলো:

এপ্রিল ১৪: মে মাসের মধ্যে মার্কিন বাহিনীকে আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য ট্রাম্প প্রশাসন এবং তালেবানদের মধ্যকার চুক্তিটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বাইডেন ঘোষণা করেন যে ১ মে থেকে মার্কিন সেনাদের আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া শুরু হবে এবং ১১ সেপ্টেম্বর মধ্যেই এটি শেষ করা হবে। চুক্তিতে উল্লিখিত প্রত্যাহার সময়সীমা ১ মে তারিখকে একতরফাভাবে বৃদ্ধি করে এই তারিখে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

হোয়াইট হাউসে এক ভাষণে বাইডেন বলেন, 'আমেরিকার দীর্ঘতম যুদ্ধ শেষ করার সময় এসেছে।' প্রশাসন পরবর্তী সময়ে এই সময়সীমা ৩১ আগস্টে নিয়ে এসেছিল।

মে ৪: তালেবান যোদ্ধারা দক্ষিণাঞ্চলীয় হেলমান্দ প্রদেশে আফগান বাহিনীর ওপর বড় ধরনের আক্রমণ শুরু করে। পাশাপাশি তারা আরও অন্তত ছয়টি প্রদেশে অভিযান শুরু করে।

জুন ৭: উচ্চপদস্থ আফগান সরকারি কর্মকর্তারা জানায় যে, যুদ্ধপরিস্থিতির অবনতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিগত ২৪ ঘণ্টায় ১৫০-এরও বেশি আফগান সেনা নিহত হয়েছে। তারা আরও জানায় যে আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশের মধ্যে ২৬টিতেই লড়াই চলছে।

জুন ২২: তালেবান যোদ্ধারা দক্ষিণে তাদের ঐতিহাসিক শক্ত ঘাটি দক্ষিণাঞ্চল থেকে বহুদূরে দেশের উত্তরাঞ্চলে ধারাবাহিক আক্রমণ শুরু করে। আফগানিস্তানে জাতিসংঘের দূত জানায়, তালেবান ৩৭০টি জেলার মধ্যে ৫০টির বেশি জেলা দখলে নিয়েছে।

জুলাই ২: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাবুলের ৪৫ মাইল উত্তরের বাগরাম ঘাঁটি থেকে সবকিছু প্রত্যাহারের কথা জানায়। এটি ছিল আফগানিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটি এবং এই প্রত্যাহার কার্যত যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতায় ইতি টানে। কিন্তু এই হস্তান্তরটি ছিল খুবই দৃষ্টিকটু। আফগান কর্মকর্তারা জানান, মার্কিনিরা তাদের কোনো কিছু অবগত না করেই রাতের আধারে ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে বিমানবন্দর ত্যাগ করেছে। অন্যদিকে পেন্টাগন বলে, এটি উচ্চপর্যায়ের আফগান কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করেই করা হয়েছে।

জুলাই ৫: তালেবান জানায় যে তারা আফগান সরকারের নিকট আগস্টের মাঝেই একটি লিখিত শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করতে ইচ্ছুক।

জুলাই ২১: উচ্চপর্যায়ের মার্কিন জেনারেলদের মতে, তালেবানরা আফগানিস্তানের প্রায় অর্ধেক জেলা নিয়ন্ত্রণ করছে, যা তাদের অগ্রযাত্রার মাত্রা এবং গতিকে নির্দেশ করে।

জুলাই ২৩: মার্কিন কর্মকর্তারা জানায়, তারা আফগান ন্যাশনাল আর্মিকে আক্রমণকারী তালেবান লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালিয়েছে। কিছু হামলা আফগানিস্তানের অন্যতম বড় শহর এবং তালেবানের জন্মস্থান কান্দাহারে পরিচালনা করা হয়।

আগস্ট ২: আফগানিস্তানের পার্লামেন্টে দেওয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি নিরাপত্তার অবনতির জন্য 'আকস্মিক' মার্কিন প্রত্যাহারকে দায়ী করেন।

আগস্ট ১০: চলমান বিশৃঙ্খলার মাঝেই প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রত্যাহারকে দ্বিগুণ করার ঘোষণা দেন এবং সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, 'আমি আমার সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত নই।' একই সঙ্গে পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহারের ছয় থেকে বারো মাসের মাঝেই কাবুলের পতনের সতর্কবাণী দেওয়া মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানায় যে, এক থেকে তিন মাসের মধ্যেই রাজধানীর পতন ঘটতে পারে। এই বিবৃতির এক সপ্তাহেরও পূর্বে কাবুলের পতন হয়।

আগস্ট ১২: পরিস্থিতির আরও অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন সরকার কূটনৈতিক, মার্কিন নাগরিক এবং যুদ্ধের সময় তাদেরকে সহায়তাকারী আফগানদের সরিয়ে আনার জন্য অতিরিক্ত ৩ হাজার সেনা প্রেরণের ঘোষণা দেয়।

আগস্ট ১৪: তালেবান কাবুলের উপকণ্ঠে চলে আসায় বাইডেন প্রশাসন অপসারণকে দ্রুততর করার লক্ষ্যে সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫ হাজারে উন্নীত করে। আরও প্রদেশ এবং প্রাদেশিক রাজধানীর পতন ঘটলে ঘানি মলিন বদনে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেন, তিনি আফগানিস্তানের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত আছেন, যা কিনা মারাত্মক অস্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে।

আগস্ট ১৫: পরদিনই তালেবান কাবুলে প্রবেশ করলে ঘানি আফগানিস্তান। ত্যাগ করে এবং সরকারের পতন সুস্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথম প্রাদেশিক রাজধানী দখলের ৯ দিনের মাথায় তালেবান কার্যত পুরো দেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।

মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন মার্কিন প্রত্যাহারের পক্ষাবলম্বন করে এবিসি নিউজকে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট এটা নিরূপণ করেছেন যে এখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে সমাপ্তি টানা, আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধের থেকে সরে আসে এবং বিশ্বব্যাপী আমাদের স্বার্থ নিশ্চিত করার সময় হয়েছে।' ব্লিঙ্কেন জানান, নিরাপত্তাজনিত কারণে মার্কিন দূতাবাস কর্মকর্তাদের গ্রিন জোন থেকে কাবুল এয়ারপোর্টে সরিয়ে আনা হয়েছে।

অবশেষে বিশ্ব দেখতে পায়, একজন তালেবান সদস্য প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে টানানো আফগানিস্তানের জাতীয় পতাকা নামিয়ে এনে সেটাকে পেঁচিয়ে একপাশে রেখে দেয়। সেই দিনের শুরুতেই ঘানি আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়েছিল। আল-জাজিরা প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসের অভ্যন্তরের তালেবান যোদ্ধাদের ছবি সম্প্রচার করে। তারা সেই টেবিলে বসে, যেটা কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও ঘানির টেবিল ছিল।

পরিশিষ্ট ৫

যেদিন যে এলাকা মুক্ত হলো

আগস্ট ৬: মে মাসের শুরু থেকে আফগান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ ত্বরান্বিত করার পর থেকে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে তালেবান নিমরুজের জারাঞ্জ শহর দখলে নেয়। এই নিমরুজ প্রদেশের সঙ্গে ইরান এবং পাকিস্তানের সীমানা রয়েছে। পাশাপাশি জারাঞ্জ শহরটি যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের অন্যতম একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান।

আগস্ট ৭: এই দিনে তালেবান ঘোষণা করে যে তারা রাজধানী শেবারঘান সহকারে উত্তরাঞ্চলীয় জাওজান প্রদেশের সম্পূর্ণ দখল নিয়েছে। শহরে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তালেবান গভর্নর বিল্ডিং দখল করে নেয়। এই শহরেই কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী আবদুর রশিদ দোস্তমের বাড়ি ছিল, যে কিনা তুরস্কে চিকিৎসা শেষে সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তানে ফিরে এসেছিল। তালেবান যোদ্ধারা দোস্তমের বাড়ি দখলে নেওয়ার পর তার সামরিক পোশাক পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি প্রচার করে।

আগস্ট ৮: এ দিন তালেবান তিনটি প্রাদেশিক রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তালেবানদের কবজায় চলে যাওয়া তিনটি প্রাদেশিক রাজধানীর প্রথমটি ছিল উত্তরাঞ্চলীয় শের-এ-পুল প্রদেশের রাজধানী শহর। এরপর তারা উত্তরাঞ্চলেই আফগানিস্তানের পঞ্চম বৃহত্তম শহর কুন্দুজ দখল করে, যার জনসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ ৭০ হাজার। কুন্দুজের কৌশলগত অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি মধ্যএশিয়া থেকে খনিজসমৃদ্ধ উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর প্রবেশপথ। এদিন সন্ধ্যাতেই তালেবান উত্তরাঞ্চলীয় তকহারের প্রাদেশিক রাজধানী তালুকানের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

আগস্ট ৯: চতুর্থ দিনে ষষ্ঠ প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে এ দিনে সামাঙ্গানের রাজধানী শহর আয়বাকের পতন ঘটে। সামাঙ্গান একসময় আফগানিস্তানের

সবচেয়ে নিরাপদ প্রদেশগুলোর একটি ছিল, যেখানে তালেবানের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে।

আগস্ট ১০: এ দিনে তালেবান প্রথমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ফারাহ প্রদেশের রাজধানী শহর দখল করে নেয়। এর ফলে তালেবান ইরানের সঙ্গে আফগানিস্তানের আরেকটি বর্ডার ক্রসিং দখল করে নেয়। এরপর দুই ঘণ্টা লড়াইয়ের পর উত্তরাঞ্চলীয় বাঘলান প্রদেশের রাজধানী শহর পুল-ই-খুমরিও তালেবানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি কাবুলের ২০০ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত।

আগস্ট ১১: ষষ্ঠ দিনে নবম প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে তালেবান উত্তরাঞ্চলের বাদাখশান প্রদেশের ফাইজাবাদ দখলে নেয়। বাদাখশানের সঙ্গে তাজিকিস্তান, পাকিস্তান এবং চীনের সীমান্ত রয়েছে।

আগস্ট ১২: তীব্র লড়াই শেষে আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গজনি প্রদেশের রাজধানী শহর তালেবানের হস্তগত হয়, যা কাবুলের ১৩০ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। একই দিনে তালেবানের হাতে আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহত্তম শহরের পতন ঘটে। প্রথমে দুই সপ্তাহ লড়াই শেষে আফগানিস্তানের তৃতীয় বৃহত্তম শহর উত্তরের হেরাত শহরের রাজধানী শহর তালেবানের হস্তগত হয়। এদিনেই তালেবানের জন্মস্থান এবং সাবেক রাজধানী আফগানিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কান্দাহার তালেবানের দখলে যায়।

আগস্ট ১৩: শুক্রবারে সর্বমোট ছয়টি প্রাদেশিক রাজধানীর পতন হয়। তালিকার প্রথম প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে হেলমান্দের রাজধানী শহর লস্করগাহর পতন ঘটে। তালেবানের সঙ্গে সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে চুক্তি শেষে তারা শহর ছেড়ে চলে যায়। এরপর তালেবান পশ্চিমাঞ্চলের বাদঘিস প্রদেশের রাজধানী কালা-ই-নাও দখলে নেয়। এরপর কোনো লড়াই ছাড়াই এই তালুকায় যুক্ত হয় ঘোর প্রদেশের রাজধানী ফিরোজ কোহ শহর। এরপর একে একে পতন ঘটে লোগার প্রদেশের রাজধানী পুল-ই-আলম এবং উরুজঘান প্রদেশের রাজধানী তেরাকোত শহরের। শুক্রবারের এই তালিকায় সর্বশেষ যোগ হয় জাবুল প্রদেশের রাজধানী কালাত।

আগস্ট ১৪: এদিন তালেবান শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সংবলিত আফগানিস্তানের চতুর্থ বৃহত্তম শহর বলখ প্রদেশের রাজধানী মাজার-ই-শরিফ দখলে নেওয়ার মাধ্যমে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এর তিন দিন পূর্বে রাষ্ট্রপতি ঘানি মাজার-ই-শরিফে সফরে এসেছিলেন

এবং দোস্তম ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মাজার-ই-শরিফে আসলে তালেবানদের অতীতের মতো কনটেইনারে ভর্তি করে মারার হুমকি দেওয়া দোস্তম উজবেকিস্তানে পালিয়ে যায়। এ দিনেই ফারিয়াবের রাজধানী মায়মানাও তালেবানের হস্তগত হয়।

আগস্ট ১৫: এ দিন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের পতনের পূর্বে একে একে পানশির ছাড়া (মাত্র তিন দিন লড়াইয়ের পর তালেবান ৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে পানশির দখল করে নেয়) বাকি সব প্রাদেশিক রাজধানীর পতন ঘটে। সেগুলো হলো দাইকুন্দি প্রদেশের রাজধানী নিলি, ওয়ার্দাক প্রদেশের রাজধানী মাইদান, লগমন প্রদেশের রাজধানী মেহতারলান, কুনার প্রদেশের রাজধানী আসাদাবাদ, নাঙ্গাহার প্রদেশের রাজধানী জালালাবাদ, খোস্তের রাজধানী শহর খোস্ত এবং পাকতিকা প্রদেশের রাজধানী শাহরান, কাপিসা প্রদেশের রাজধানী রাব্কি, বামিয়ানের রাজধানী শহর বামিয়ান, পারওয়ান প্রদেশের (বাগরাম জেলা এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত) রাজধানী চারিকার, নুরিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী পারুন এবং পাকতিয়া প্রদেশের রাজধানী ঘার্দেস।

পরিশিষ্ট ৬

আফগান যুদ্ধে আমেরিকার লাভ-ক্ষতি

> আফগানিস্তানের যুদ্ধ ২০ বছর ধরে প্রতিদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩০০ মিলিয়ন ডলার খসিয়েছে, যদিও এর চেয়ে বড় মূল্য ভবিষ্যতে অপেক্ষা করছে।
>
> — *ফোর্বস ম্যাগাজিন*, ১৬ আগস্ট ২০২১

ঝটিকা অভিযানে তালেবান মাত্র এক মাসেই পুরো আফগানিস্তান দখলে নিয়েছে। তিন লাখ সদস্যের আফগান সেনাবাহিনী তাদেরকে কোনোরূপ বাধা দিতে পারেনি এবং কাবুল দখলের আগেই আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি তাজিকিস্তানে পালিয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, তালেবান বিজয়ী হয়েছে 'তাদের তলোয়ার ও বন্দুকের জোরে এবং তারাই এখন নিজ দেশের মানুষের সম্মান, প্রতিপত্তি এবং আত্মরক্ষার জিম্মাদার।'

তাহলে আফগানিস্তানের এযাবৎকালের দখলদার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মান ও প্রতিপত্তির কী হলো? বলা যায়, এগুলো পুরোপুরি খোয়া গেছে। আজকে যখন হাজার হাজার দোভাষী ও তাদের পরিবার যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য অপেক্ষমাণ, তখন জব্দকৃত ট্যাংক ও হামভিতে চড়ে তালেবান যোদ্ধারা বিজয়ীবেশে টহল দিচ্ছে। এগুলোর পয়সাও কিন্তু আঙ্কেল স্যামের পকেট থেকেই খসেছে।

৯/১১-এর পর থেকে গত ২০ বছর যাবৎ আফগানিস্তানের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ ব্যয় করেছে। অর্থাৎ দুই দশক ধরে প্রতিদিনের ব্যয় ৩০০ মিলিয়ন ডলার। অথবা বলা যেতে পারে, ৪ কোটি আফগান নাগরিকের প্রত্যেকের জন্য ৫০ হাজার ডলার। আরও অপমানজনক ভাষায় বললে, তালেবানকে ঠেকিয়ে রাখতে আঙ্কেল স্যামের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ জেফ বেজোস, ইলন মাস্ক, বিল গেটস এবং যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ধনী ৩০ ব্যক্তির মোট সম্পদের সমষ্টির চেয়েও বেশি।

শিরোনামের ওই সংখ্যার মধ্য থেকে ৮০০ বিলিয়ন ডলার হচ্ছে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ব্যয়। অন্যদিকে পরাজিত আফগান সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যয় হয়েছে সর্বমোট ৮৫ বিলিয়ন। পেন্টাগন আকাশসীমা থেকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি ভেঙে জুলাইয়ের শুরুতে হঠাৎ করেই বাগরাম বিমানঘাঁটি বন্ধ করলে, পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে এই বাহিনী অগ্রসর তালেবানের আক্রমণে গুটিয়ে পড়ে। মার্কিন করদাতারা আফগান সেনাদের বেতন বাবদ বাৎসরিক ৭৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে চলেছে। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির কস্ট অব ওয়ার প্রজেক্টের হিসেবে সকল প্রকারের খরচ নিয়ে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২.২৬ ট্রিলিয়ন ডলার।

আর হারানো জীবনের কথা চিন্তা করলে এই যুদ্ধের মূল্য অনেক বেশি। আফগানিস্তানে সামরিক বাহিনীর প্রায় ২ হাজার ৫০০ সদস্য প্রাণ হারিয়েছে। পাশাপাশি প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ৪ হাজার বেসামরিক কন্ট্রাক্টর। কিন্তু নিহত ৬৯ হাজার আফগান সামরিক পুলিশ, ৪৭ হাজার বেসামরিক ব্যক্তি এবং ৫১ হাজার বিপক্ষীয় যোদ্ধার পাশে এই সংখ্যাকে কিছুই মনে হয় না। আহত ২০ হাজার মার্কিনের চিকিৎসার খরচ ইতোমধ্যে ৩০০ বিলিয়ন ছাড়িয়েছে এবং ধারণা করা হচ্ছে, এই খাতে আরও অর্ধট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবেই ধারকৃত অর্থ দিয়ে আফগান যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির গবেষকদের ধারণা মোতাবেক, ইতোমধ্যে সুদ বাবদ ৫০০ বিলিয়নেরও বেশি (২.২৬ ট্রিলিয়ন ডলার মোট ব্যয়ে এটি অন্তর্ভুক্ত) অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। সরকারি হিসাব বলছে, ২০৫০ সাল নাগাদ শুধু আফগান যুদ্ধের ঋণের সুদের পরিমাণই ৬.৫ ট্রিলিয়নে পৌঁছাবে। যার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক মার্কিন নাগরিকের ঘাড়ে এখন ২০ হাজার ডলার দেনা রয়েছে।’

পরিশিষ্ট ৭

মুখ্য চরিত্রসমূহ

আল-কায়েদা

আইমান আল-জাওয়াহিরি: আল-কায়েদায় ওসামা বিন লাদেনের উত্তরসূরি (২০১১-২০২২)। মিসরের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কায়রো ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন। পেশায় ছিলেন সার্জন। তিনি সাইয়্যেদ কুতুবের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। যুবক বয়সেই মিসরীয় সরকারকে উৎখাতের জন্য কাজ শুরু করেছিলেন। মিসরীয় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত হত্যাকাণ্ডে ভূমিকার জন্য ১৯৮১ থেজ ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন। তিনি ছিলেন ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের সাবেক প্রধান। এরপর সোভিয়েত জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আফগানিস্তানে গমন করেন। সেখানেই সম্ভবত বিন লাদেনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। যুদ্ধের শেষ দিকে তারা উভয়ে আল-কায়েদার ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৯৫ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে মিসরীয় দূতাবাসে হামলার জন্য মিসরীয় আদালতে তার মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়। ২০০১ সালে তার ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ আল-কায়েদার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। ২০০৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে আল-কায়েদার ডেপুটি ঘোষণা করা হয়। ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর পর তিনি আল-কায়েদার আমিরের পদে আসীন হন। ২০২২ সালের ৩১ জুলাই আফগানিস্তানের কাবুলে মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত হন।

আনওয়ার আল-আওলাকি: ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত প্রখ্যাত মার্কিন আল-কায়েদা তাত্ত্বিক। আল-কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুয়ালার নেতা। ক্যারিশম্যাটিক এবং বাগ্মী হিসেবে সুপরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি এবং এডুকেশন লিডারশিপ মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবনেই মুসলিম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ২০০৪ সাল

অবধি যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইয়েমেনে ফেরার পর গ্রেপ্তার হলেও আওলাকি গোত্রের চাপে সরকার তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। ২০০৯ সালের মার্চে ইয়েমেনে আত্মগোপন চলে যান। ইয়েমেনের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর সরাসরি বৈশ্বিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সমর্থন দেওয়া শুরু করেছিলেন। ২০১১ সালে ইয়েমেনে মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত হন। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তাকে হত্যার অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং তিনিই ড্রোন হামলায় নিহত প্রথম মার্কিন নাগরিক।

আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম: ফিলিস্তিনি আলেম এবং তাত্ত্বিক। ১৯৬৭ সালের তৃতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে তার পরিবারকে পশ্চিম তীর থেকে উচ্ছেদ হতে হয়। তিনি জর্ডান, সিরিয়া এবং মিসরে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। কৈশোরে মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও পিএলওর সেক্যুলার এবং জাতীয়তাবাদী আদর্শে হতাশ হয়ে পরবর্তীতে অধ্যাপনার জন্য সৌদি আরবে চলে আসেন। সেখানে কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটিতেই ওসামা বিন লাদেন তার সাক্ষাৎ পেয়েছিল। ১৯৭৯ সালে তিনি আফগান জিহাদের পক্ষে ফতোয়া প্রচার করেন এবং জিহাদে যোগ দিতে পাকিস্তানে চলে আসেন। সেখানে তিনি মাকতাব আল-খিদমাত প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে আফগানিস্তানে বিদেশি যোদ্ধাদের প্রধান সমন্বয়ক হয়ে ওঠেন। সোভিয়েত জিহাদের শেষ দিকে তিনি গ্লোবাল জিহাদের একজন প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। কিন্তু ১৯৮৯ সালে গাড়িবোমা বিস্ফোরণে গুপ্তহত্যার শিকার হন তিনি।

আবদুল হাকিম মুরাদ: পাকিস্তানি নাগরিক। রমজি ইউসুফের সহযোগী। তার কাছ থেকে বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ লাভ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারটি ফ্লাইং স্কুলে প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং পাইলট লাইসেন্সও অর্জন করেন। বোমা তৈরির সময় দুর্ঘটনার পর ফিলিপাইন পুলিশের হাতে আটক হন। তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হয়। বোজিঙ্কা প্লটে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বর্তমানে সেখানেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

আবু মুস'আব আল-জারকাভি: ইরাকে আল কায়েদার সাবেক প্রধান। জর্ডানিয়ান। সোভিয়েত যুদ্ধের শেষ দিকে আফগানিস্তানে আসেন। জর্ডানে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৯২ সালে বিস্ফোরক আইনে আটক হন। ১৯৯৯ সালে

জর্ডানের বাদশার সাধারণ ক্ষমার অধীনে মুক্তি লাভ করেন। এরপর পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তান এসে হেরাতে তার জামাত আত-তাওহিদ ওয়াল-জিহাদ সংগঠনের প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করেন। নাইন-ইলেভেনের পর ইরাকে চলে আসেন। সেখানে ২০০৩ সাল থেকে মার্কিনদের সঙ্গে যুদ্ধ এবং শিয়া লক্ষ্যবস্তুতে হামলার জন্য সকলের নজরে আসেন। ফাল্লুজার যুদ্ধের পর ২০০৪ সালে তিনি আল-কায়েদার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তার সংগঠন আল-কায়েদা ইন ইরাক হিসেবে পরিচিতি পায়। এরপর তার হামলার প্রকোপ এবং ধরন আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০৫ সালে ইরাকের শিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। বলা হয়, তিনি মার্কিনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে শিয়া-সুন্নি লড়াইয়ে রূপান্তরিত করেছেন। অবশেষে ২০০৬ সালের ৭ জুন তিনি মার্কিন বিমান অভিযানে মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাদ সালেম: মিসরীয় আর্মি অফিসার এবং এফবিআইয়ের চর। তার সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বোমা হামলার জন্য রমজি ইউসুফ, আবদুল হাকিম মুরাদ এবং ওয়ালি খান আমিন শাহ দোষী সাব্যস্ত হয়। তিনি একজন গুপ্তচর হিসেবে এফবিআইয়ের হয়ে অন্ধ শাইখ ওমর আব্দুর রহমানের সার্কেলে অনুপ্রবেশ করেছিলেন।

ওমর আবদুর রহমান: মিসরীয় নাগরিক। অন্ধ শাইখ নামে পরিচিত। আল-আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে তাফসির বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। ১৯৮০-এর দশকে আল-জামাত আল-ইসলামিয়ার প্রধানের পদে নিযুক্ত হন। তবে তিনি আল-জাওয়াহিরির ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ সদস্যদের নিকটও সমানভাবে অনুকরণীয় ছিলেন। ১৯৮১ সালে আনোয়ার সাদাতকে হত্যার উসকানিমূলক একটি ফতোয়ার জন্য তিনি তিন বছর কারাবন্দি ছিলেন। সোভিয়েত জিহাদের মাঝামাঝি সময়ে তিনি আফগানিস্তানে গমন করেন এবং মাকতাব আল-খিদমাতের সঙ্গে যুক্ত হন। আব্দুল্লাহ আযযামের মৃত্যুর পর সংগঠনটির আন্তর্জাতিক বিষয়াদি দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পর এফবিআই তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। এই তদন্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং মিসরের বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উসকানিসহ অনেক প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার তথ্যও উঠে আসে। ১৯৯৫ সালে তাকে মার্কিন আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ২০১৭ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন কারাগারেই তার মৃত্যু হয়।

ওমর বিন লাদেন: ওসামা বিন লাদেনের ছেলে। ২০০০ সাল পর্যন্ত পিতার সাহচর্যে থাকলেও তিনি কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নন। একজন ধনকুবের। একই সঙ্গে শিল্পী এবং ব্যবসায়ী। বর্তমানে ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে বসবাস করছেন।

ওয়ালী খান আমিন শাহ: উজবেক বংশোদ্ভূত সৌদি নাগরিক। সোভিয়েত জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে রমজি ইউসুফের সহযোগী হিসেবে বোজিঙ্কা প্লটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বর্তমানে মার্কিন কারাগারে রয়েছেন।

ওসামা বিন লাদেন: আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান (১৯৯০–২০১১)। বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের পোস্টার-বয়। সৌদি আরবে জন্ম এবং শিক্ষালাভ। একজন ধনকুবের। আফগান যুদ্ধে প্রাথমিকভাবে আর্থিক সহায়তার দেখভাল করলেও পরবর্তী সময়ে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেন। সোভিয়েত জিহাদে তার বীরত্বের জন্য সৌদি আরবেও ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন। যুদ্ধের শেষ দিকে আইমান আল-জাওয়াহিরির সঙ্গে মিলে আল-কায়েদার মূলভিত্তি রচনা করেছিলেন। সৌদি আরবে ফিরে সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলে আহলে সাউদদের রোষানলে পড়ে দেশ ছাড়তে হয়। এরপর আফগানিস্তানে ফিরে এলেও মুজাহিদদের অন্তর্কোন্দলের মুখে সুদানে চলে আসেন। সুদানে তিনি তার প্রায় সব সঞ্চয় বিনিয়োগ করেছিলেন। সেখানে থাকাকালীনই তিনি সোমালিয়ার ব্ল্যাক হক ডাউনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শেষমেশ সুদানও তাকে বিতাড়িত করলে তিনি আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন। আফগানিস্তানে তিনি শুরুতে মুজাহিদিন কমান্ডার ইউনুস খালিসের নিরাপত্তায় থাকলেও কিছুদিন পর তালেবান প্রধান মোল্লা ওমরের হাতে বায়াত হন। তিনি ১৯৯৬ সালে আরব উপদ্বীপের মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফতোয়া প্রচার করেন। এরপর ১৯৯৮ সালে ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট গঠনের ঘোষণা দেন এবং বৈশ্বিক জিহাদের ফতোয়া প্রচার করেন। এই সময়ের মাঝে সৌদি আরবে বিভিন্ন মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা, কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ার মার্কিন দূতাবাসে হামলা, ইউএসএস কোল যুদ্ধজাহাজে হামলা করে মোস্ট-ওয়ান্টেড টেরোরিস্ট হয়ে ওঠেন। সবশেষ নাইন-ইলেভেন হামলার পর সবার চোখে ধুলো দিয়ে তোরাবোরা থেকে আত্মগোপনে চলে যান। এরপর সময়ে সময়ে বিভিন্ন ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বৈশ্বিক জিহাদকে উৎসাহিত করে গিয়েছেন। প্রায় এক দশক সার্চ অভিযানের পর ২০১১ সালের ২ মে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে মার্কিন নেভি সিল অপারেশনে নিহত হন। তাকে আরব সাগরে সলিল সমাধি দেওয়া হয়।

খালিদ শেখ মোহাম্মদ: রমজি ইউসুফের চাচা। আল-কায়েদার মিডিয়া উইং প্রধান। বোজিঙ্কা প্লটসহ অসংখ্য সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিই নাইন-ইলেভেন হামলার মূল পরিকল্পনাকারী। ২০০৩ সালের ১ মার্চ আইএসআই এবং সিআইএ'র যৌথ অভিযানে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে আটক হন। বর্তমানে গুয়ানতানামো কারাগারে বন্দি রয়েছেন।

পাশা খান জাদরান: আফগান মিলিশিয়া নেতা। সাবেক সোভিয়েত যোদ্ধা। ২০০১ সালে মার্কিন সেনাদের সহায়তায় তালেবানের হাত থেকে পাকতিয়া প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেন এবং পরবর্তীকালে প্রদেশটির গভর্নর নিযুক্ত হন।

মুহাম্মাদ আত্তা: প্রধান হাইজ্যাকার, নাইন-ইলেভেন হামলার হোতা। মিসরীয় নাগরিক। কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে স্থাপত্যবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর জার্মানির হামবুর্গ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। হামবুর্গ সেলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৯৯ শেষ দিকে এবং ২০০০ সালের শুরুতে আফগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেন এবং অন্যান্য আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের সাহচর্যে আসেন। এরপর জার্মানি হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে হামবুর্গ সেলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বিমান চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ফ্লাইট ১১ হাইজ্যাক করে টুইন টাওয়ারের উত্তর ভবনে হামলা করেন।

মুহাম্মাদ আল-কাহতানি: সৌদি নাগরিক এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আল-কায়েদা সদস্য। বিশতম হাইজ্যাকার হওয়ার কথা থাকলেও পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট না থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারেননি। নাইন-ইলেভেন হামলাপরবর্তী তোরাবোরা যুদ্ধে আটক হন। গুয়ানতানামো কারাগারে নির্যাতনের শিকার হন এবং নাইন-ইলেভেন সংশ্লিষ্টতার কথা শিকার করেন। ২০২২ সালের ৬ মার্চ কাহতানিকে গুয়ানতানামো কারাগার থেকে বিমানে করে সৌদি আরবের একটি মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়।

রমজি ইউসুফ: আসল নাম আবদুল বাসিত মাহমুদ আবদুল করিম। কুয়েতে জন্মগ্রহণকারী পাকিস্তানি নাগরিক। ওয়েলস থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নেন। বোমা প্রস্তুতকারক। ১৯৯৩ সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হামলা এবং পরবর্তীতে বোজিঙ্কা প্লটের মূল পরিকল্পনাকারী। ১৯৯৪ সালে ফিলিপাইন এয়ারলাইনস ৪৩৪-এ বোমা পেতে রেখেছিলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোকেও হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। বোমা তৈরির সময় ১৯৯৫ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে আটক হন। তাকে দুটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

এবং ২৪০ বছর কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে বন্দি রয়েছেন।

রামজি বিন আল শিব: ইয়েমেনি। মুহাম্মাদ আত্তার বন্ধু এবং হামবুর্গ সেলের সদস্য। ১৯৯৯ সালে আফগানিস্তানে আল-কায়েদার ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা না পাওয়ায় পাইলটের প্রশিক্ষণ নিতে ব্যর্থ হন। তবে শুরু থেকেই নাইন-ইলেভেন হামলার পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন। ২০০২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের করাচিতে আটক হন। বর্তমানে গুয়ানতানামোতে বন্দি। মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ায় তার বিচারকার্য শেষ হয়নি।

আইএসআইএস

আবু বকর আল-বাগদাদি: ইসলামিক স্টেট প্রধান (২০১৪-২০১৯)। ইরাকি নাগরিক। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৬ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক স্টেট অব ইরাকে যোগদান করেন এবং ২০১০ সালে এর প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হন। ২০১৩ সালে সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড লেভান্ত রাখা হয়। তিনি সিরিয়ার আন-নুসরা ফ্রন্টকে এই দলের সঙ্গে একীকরণ করেন। এ সময় আল-কায়েদার সেন্ট্রাল কমান্ড থেকে তিনি পৃথক হয়ে যান। ইরাক এবং সিরিয়ার উল্লেখযোগ্য অংশ দখলের পর ২০১৪ সালে সংগঠনটি ইসলামিক স্টেট নামধারণ করে এবং নিজেদের খিলাফত হিসেবে ঘোষণা দেয়। আল-বাগদাদি নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। তার অনুগত ব্যক্তিরা ভ্রা বিশ্বব্যাপী অসংখ্য সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী। অবশেষে ২০১৯ সালের ২৭ অক্টোবর সিরিয়ার ইদলিবে মার্কিন অভিযানের সময় আত্মঘাতী বেল্টে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আল-বাগদাদি মৃত্যুবরণ করেন।

আফগান তালেবান

ওয়াকিল আহমাদ মুতাওয়াকিল: তালেবানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ১৯৯৯ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আরব আমিরাতে আত্মসমর্পণ করেন। ২০০৩ সালের অক্টোবরে তাকে তালেবান থেকে বহিষ্কার করা হয়। তালেবানের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংবাদের একজন অন্যতম রেফারেন্স তিনি।

মোল্লা ওমর: তালেবানের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান। আফগানিস্তানেই জন্ম এবং শিক্ষালাভ। সোভিয়েত জিহাদে মোল্লা মোহাম্মদ নবির অধীনে লড়াইয়ে অংশ নেন। যুদ্ধে তিনি তার এক চোখ হারান। সোভিয়েত জিহাদের পর পুনরায় স্থানীয় মাদরাসার শিক্ষকতা শুরু করেন। কিন্তু আইনশৃঙ্খলার অবনতি তাকে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য করে। মাদরাসার ছাত্রদের নিয়ে তিনি তালেবান প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে কান্দাহার এবং ধীরে ধীরে প্রায় সমগ্র আফগানিস্তান দখলে নিয়ে ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠা করেন। ওসামা বিন লাদেন তাকে আনুগত্যের শপথ দিয়েছিল। নাইন-ইলেভেনের আগে এবং পরে অসংখ্যবার তিনি বিন লাদেনকে হস্তান্তরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মার্কিন আগ্রাসনের পরপরই আত্মগোপনে চলে যান এবং তালেবানের বিষয়াদি দেখাশোনা করতে থাকেন। ২৩ এপ্রিল ২০১৩ সালে আত্মগোপনে থাকাবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তালেবান ২০১৫ সালে তার মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছিল। তার ছেলে মোল্লা ইয়াকুব বর্তমান তালেবান সরকারের ডেপুটি প্রধান এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

মোল্লা মোহাম্মদ আখতার মনসুর: মোল্লা ওমর পরবর্তী তালেবান প্রধান। ১৯৮৫ সালের দিকে মোল্লা মোহাম্মদ নবীর অধীনে সোভিয়েত জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি এই লড়াইয়ে ১৭ বার আহত হয়েছিলেন। মোল্লা ওমরও মোল্লা মোহাম্মদ নবির একটি দলের কমান্ডার ছিলেন। সোভিয়েত জিহাদের পর দারুল উলুম হাক্কানিয়া থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। তালেবানের কাবুল দখলের পর তিনি কাবুল এয়ারপোর্টের ডাইরেক্টর জেনারেল পদে নিয়োগ পান। কাবুল দখলের পর তাকে বিমান এবং পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০০১ সালে তালেবানের পতনের পর তিনি হামিদ কারজাইয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু মার্কিন সেনারা গভীর রাতে তার বাসায় হামলা চালালে তিনি পাকিস্তানে গিয়ে তালেবানকে পুনরায় সংগঠিত করার কাজে নামেন। এ সময় তিনি কান্দাহারে তালেবানের ছায়া গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। ২০০৭ সালের দিকে তিনি কোয়েটা শুরার সদস্য এবং পরবর্তী সময়ে এর প্রধান হন। ২০০৯ সালে তালেবান সুপ্রিম কাউন্সিলের ডেপুটি হন। এরপর তাকে তালেবানের ডেপুটি বানানো হয়েছিল। মোল্লা ওমরের মৃত্যুর পর ৩০ জুলাই, ২০১৫ সালে তাকে তালেবান প্রধানত পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০১৬ সালের ২১ মে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত হন।

মোল্লা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা: তালেবানের বর্তমান প্রধান। সোভিয়েত জিহাদে হিজব-ই-ইসলামি খালিসের হয়ে লড়াই করেন। ১৯৯৪ সালে তালেবান আন্দোলনের সূচনালগ্নেই সংগঠনটিতে যোগদান করেছিলেন। তালেবানের

প্রথম শাসনামলে শরিয়াহ আদালতের প্রধান বিচারক ছিলেন। তালেবান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফতোরয়ার জন্য সুপরিচিতি লাভ করেন। তালেবানের পতনের পরও এর ছায়া আদালত পরিচালনা করেছেন। তালেবানের দ্বিতীয় আমির মোল্লা মোহাম্মদ আখতার মনসুরের ডেপুটি নির্বাচিত হন। মোল্লা মনসুরের মৃত্যুর পর তালেবানের হাল ধরেন।

আফগান মুজাহিদিন এবং মিলিশিয়া প্রধান

আবদুর রশিদ দোস্তম: কুখ্যাত উজবেক যুদ্ধবাজ নেতা। সুযোগ বুঝে পক্ষ পরিবর্তনের জন্য সুপরিচিত। আফগানিস্তানে অসংখ্য যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বজাতি উজবেকদের কাছে পাশা নামে পরিচিত। সোভিয়েত যুদ্ধের সময় আফগান ন্যাশনাল আর্মির হয়ে লড়াই করেন। সে সময় উত্তরাঞ্চলের অনেক মুজাহিদিন নেতা তার হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। সোভিয়েত পরাজয়ের পর তিনি মুজাহিদিনদের পক্ষে চলে আসেন এবং নাজিবুল্লাহর সরকার পতনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তার অনুগত যোদ্ধাদের মাধ্যমে তিনি আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেন। এরপর আহমাদ শাহ মাসুদের সঙ্গে কাবুলের দখল নেন। প্রথমত বোরহানুদ্দিন রাব্বানির সরকারকে সমর্থন দিলেও ১৯৯৪ সালে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের সঙ্গে জোটবদ্ধ হন। ১৯৯৬ সালে পুনরায় রাব্বানির দলে চলে আসেন। এই সবটুকু সময় তিনি মিলিশিয়া বাহিনীর মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছিলেন। ১৯৯৮ সালে তালেবানের হাতে মাজার-ই-শরিফের পতনের পর তিনি আফগানিস্তান থেকে পলায়ন করেন। ২০০১ সালে তিনি পুনরায় আফগানিস্তান ফিরে আসেন এবং তার নর্দার্ন অ্যালায়েন্স মার্কিন বাহিনীর প্রধান সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে থাকে। তালেবানের পতনের পর তিনি হামিদ কারজাই প্রশাসনের ডেপুটি প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ২০০৮ সালে তাকে তুর্কিতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে যেতে হয়। ২০০৯ সালে তিনি আফগানিস্তান প্রত্যাবর্তন করেন। ২০১৪ সালে আশরাফ ঘানির উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হওয়া অবধি একাধিক পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনি আফগানিস্তানের উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন। এরপর তিনি মার্শাল পদবি লাভ করেন। তালেবান আফগানিস্তানের দখল নিতে শুরু করলে তিনি পুনরায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। কিন্তু তালেবানের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বললেও মাত্র তিন দিন লড়াইয়ের পর তিনি উজবেকিস্তানে পালিয়ে যান।

আবদুর রাজ্জাক: পশতু রাজনীতিবিদ। ১৯৯৭ সালে হেরাতের গভর্নর নিযুক্ত হন। তাকে তালেবান সদস্য মনে করা হয়।

আবদুল হক: আফগান মুজাহিদিন কমান্ডার। সোভিয়েত যুদ্ধের এ সময় কাবুলে লড়াই করেন এবং 'কাবুলের সিংহ' হিসেবে পরিচিতি পান। সোভিয়েত যুদ্ধের শুরুতে যে অল্প কয়েকজন নেতার সঙ্গে সিআইএ যোগাযোগ শুরু করেছিল, তিনিও ছিলেন তাদের একজন। সোভিয়েত পরাজয়ের পর তিনি রাব্বানি সরকারের মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করলেও কিছুকাল পর পদত্যাগ করে দুবাই চলে যান। ১৯৯৯ সাল থেকে তিনি নর্দার্ন অ্যালায়েন্সে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। নাইন-ইলেভেনের পর আফগানিস্তানে একটি তালেবানবিরোধী অভ্যুত্থানের অংশ হিসেবে ২০০১ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তালেবানের হাতে আটক হন এবং তাকে হত্যা করা হয়।

আহমদ শাহ মাসুদ: আফগান গেরিলা কমান্ডার। সোভিয়েত জিহাদে বীরত্বের জন্য 'পানশিরের সিংহ' নামে পরিচিত। তিনিই একমাত্র আফগান নেতা, যিনি সোভিয়েত জিহাদ এবং পরবর্তী গৃহযুদ্ধ ও তালেবানবিরোধী যুদ্ধে কখনোই আফগানিস্তান ত্যাগ করেননি। সোভিয়েত জিহাদের পর তিনি আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে তালেবানরা কাবুল দখলে নিলেও তিনি তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। নর্দার্ন অ্যালায়েন্স গঠন করে তিনি তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন। নাইন-ইলেভেন হামলার মাত্র দুই দিন আগে আল-কায়েদার আত্মঘাতী হামলায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার প্রতিষ্ঠিত নর্দার্ন অ্যালেয়েন্স মার্কিন আগ্রাসনে প্রধান আফগান সহযোগীর ভূমিকা পালন করে।

আহমেদ ওয়ালি কারজাই: সাবেক আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের সৎভাই। রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী ওয়ালি কারজাই ২০০১ সালে তালেবান শাসনের অবসানের পর আফগান রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ২০০৫ সালে তিনি কান্দাহার প্রাদেশিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং সিআইএ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ছিল। ২০১১ সালের ১১ জুলাই ব্যক্তিগত গুলিতে নিহত হন।

গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার: মুজাহিদিন নেতা এবং রাজনীতিবিদ। তাকফিরি সংগঠন হিজব-ই-ইসলামির প্রধান। আফগান জিহাদে তিনি সিআইএ থেকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা আদায় করেছিলেন। সোভিয়েতদের পরাজয়ের পর

তিনি আফগান গৃহযুদ্ধের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েন। কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নিলেও আহমাদ শাহ মাসুদের কাছে কাবুলের নিয়ন্ত্রণ হারান। আহমাদ শাহ মাসুদের সঙ্গে তিনি শান্তিচুক্তি করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ ভাগিয়ে নেন। কিন্তু কাবুলের দখল নিয়ে দ্রুতই অন্যান্য মুজাহিদিন গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের লড়াই শুরু হয় এবং কাবুল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে থাকে। এই লড়াইয়ে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার কাবুলে নির্বিচারে রকেট হামলা চালান। প্রায় ৫০ হাজার কাবুল অধিবাসী নিহত হয়। তাকে এ জন্য 'কাবুলের কসাই' বলা হয়ে থাকে। অবশেষে ১৯৯৬ সালে বোরহানুদ্দিন রাব্বানির সঙ্গে জোট সরকার গঠন করার মাধ্যমে হেকমতিয়ার পুনরায় আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন। কিন্তু কয়েক মাস পরই তালেবানের হাতে কাবুলের পতন হয় এবং হেকমতিয়ার ইরানে পালিয়ে যান। নাইন-ইলেভেন হামলা অবধি আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কিন্তু মার্কিন জোট আফগানিস্তানে অভিযান শুরু করলে তিনি আমেরিকা এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন। তিনি একই সঙ্গে আল-কায়েদা ও তালেবানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেন এবং তার মিলিশিয়ারা ন্যাটো জোটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে। তিনি একাধিকবার তালেবান এবং আল-কায়েদার সঙ্গে জোট গড়ার হুমকিও দেন। তাকে জাতিসংঘ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ২০১৬ সালে হিজব-ই-ইসলামি এবং আফগান সরকারের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয় এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে সাধারণ ক্ষমার পাশাপাশি তার অসংখ্য মিলিশিয়াকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। দ্রুতই জাতিসংঘ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাদের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। অবশেষে দুই দশক আত্মগোপনে থাকা পর ২০১৭ সালের ৪ মে তিনি কাবুলের মাটিতে পা রাখেন। তিনি এরপর তালেবানকে অস্ত্র ছেড়ে আলোচনার টেবিলে আসার আমন্ত্রণ জানান। ২০১৭ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও তৃতীয় স্থান নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তালেবান আফগানিস্তানের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিলে হেকমতিয়ার কোনো দেনা-পাওনার হিসেবে না গিয়েই তাদের সঙ্গে সমঝোতা করেন। বর্তমানে তিনি কাবুলেই অবস্থান করছেন।

জান মুহাম্মদ খান: হামিদ কারজাইয়ের বিশেষ উপদেষ্টা এবং উরুজগান প্রদেশের সাবেক গভর্নর। সোভিয়েত জিহাদের সময় বোরহানুদ্দিন রাব্বানীর হয়ে লড়াই করেছিলেন। সোভিয়েত জিহাদের পর উরুজগানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান। তালেবান তাকে পদচ্যুত করে এবং সাবেক রাজা জহির শাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তাকে কারাগারে যেতে হয়। তালেবানের পতনের

পর ২০০২ সালে পুনরায় উরুজগানের গভর্নর নিযুক্ত হন। ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, আফিম ব্যবসা এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। ২০১১ সালের ১৭ জুলাই তালেবানরা তার কাবুলের বাসায় হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে।

জালালুদ্দিন হাক্কানি: বরেণ্য আফগান মুজাহিদিন কমান্ডার এবং হাক্কানিয়া নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা। পাকিস্তানের দারুল উলুম হাক্কানিয়ায় পড়াশোনার সুবাদে মৌলভি জালালুদ্দিন হাক্কানি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুবাদে যৌবনেই তিনি আফগানিস্তানের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর তিনি ইউনুস খালিসের হিজব-ই-ইসলামি আন্দোলনে যোগ দেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় সোভিয়েত যুদ্ধের শুরু থেকেই সক্রিয় লড়াইয়ে অংশ নেন। সোভিয়েত যুদ্ধের সময় তিনি সিআইয়ে এবং আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিলেন। সোভিয়েত জিহাদের সময়কালেই হাক্কানি এবং ওসামা বিন লাদেনের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সোভিয়েতদের পরাজয়ের পরও তিনি লড়াই অব্যাহত রাখেন এবং নাজিবুল্লাহ সরকারের কাছ থেকে খোস্তের নিয়ন্ত্রণ নেন। রাব্বানি সরকারে তাকে আইনমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে তিনি মুজাহিদিন গোষ্ঠীগুলোর কোন্দল এবং গৃহযুদ্ধে কোনো পক্ষাবলম্বন না করে লড়াই থেকে নিবৃত্ত থাকেন। এই পদক্ষেপ তাকে সবার চোখে আরও সম্মানিত করে তোলে। তালেবান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও কাবুল দখলের আগেই তিনি তালেবানের সঙ্গে জোটবদ্ধ হন। তিনি কাবুলের উত্তরে তালেবানের হয়ে লড়াই করেন। ২০০১ সালের অক্টোবরে তাকে তালেবানের মিলিটারি কমান্ডার হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। তিনি সম্ভবত ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে সহায়তাও করেছিলেন। মার্কিনরা তাকে তালেবানের বিরুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং উল্টো সাবেক সহযোগীর বিরুদ্ধেই নতুন জিহাদ শুরু করেন। ২০১১ সালে ন্যাটো জোট হক্কানি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্ত অঞ্চলে বিশেষ অভিযান শুরু করেছিল। তিনি এবং তার ছেলে সিরাজুদ্দিন হাক্কানি এসময় তালেবানে আত্মঘাতী হামলার প্রচলন ঘটান। ২০১৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তার মৃত্যুর সংবাদ জানা যায়।

সিরাজুদ্দিন হাক্কানি: জালালুদ্দিন হাক্কানির ছেলে এবং হাক্কানি নেটওয়ার্কের বর্তমান প্রধান। তালিকাভুক্ত গ্লোবাল টেরোরিস্ট। ২০১৫ সাল থেকে তালেবানের ডেপুটি এবং বর্তমান তালেবান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

হাজি জামান: পশতু মিলিশিয়া নেতা। সোভিয়েত জিহাদের একজন জুনিয়র কমান্ডার। তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করলে তিনি ফ্রান্সে পালিয়ে যান। নাইন-ইলেভেনের পর আফগানিস্তানে ফিরে আসেন এবং মার্কিনদের সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে থাকেন। হানিদ কারজাইয়ের সমর্থক হাজি জামানকে নাঙ্গাহার প্রাদেশিক পুলিশের ডেপুটি চিফ হিসেবে নিয়োগ পান। ২০১০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি একটি আত্মঘাতী হামলায় নিহত হন।

আঞ্চলিক রাজনীতিবিদ

আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ: পশতুন রাজনীতিবিদ এবং চক্ষু ডাক্তার। আহমাদ শাহ মাসুদের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তালেবানে পতনের পর ২০০৫ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ২০০৯, ২০১৪ ও ২০১৯ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও প্রতিবারই পরাজিত হন। ২০১৪ সালে আশরাফ ঘানির সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে আফগানিস্তানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৯ সালের নির্বাচনে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দিলেও মার্কিন চাপের মুখে পুনরায় আশরাফ ঘানির সঙ্গে সমঝোতা করেন। তালেবানের কাবুল দখলের পর তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেও তার এই প্রস্তাব আমলে নেওয়া হয়নি। বর্তমানে তিনি আফগানিস্তানেই অবস্থান করছেন।

আশরাফ ঘানি: আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট (২০১৪–২১)। অর্থনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবী। হামিদ কারজাই সরকারে অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ২০১৪ সালে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তির মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করেন। ২০১৯ সালেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট তালেবানের কাবুল দখলের পর সংযুক্ত আরব আমিরাতে পালিয়ে যান।

জাবের আল-আহমাদ আল-সাবাহ: কুয়েতের সাবেক আমির (১৯৭৭–২০০৬)। কুয়েতে ইরাকি আগ্রাসনের সময় সৌদি আরবে আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকে সরকার পরিচালনা করেন। উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের পরাজয়ের পর পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ২০০৩ সালের ইরাক আগ্রাসনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কুয়েতকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছিলেন। ২০০৬ সালের ১৫ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

পারভেজ মোশাররফ: পাকিস্তানের সাবেক আর্মি জেনারেল এবং প্রেসিডেন্ট (২০০১–৮)। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে উৎখাত করে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। মার্কিন নেতৃত্বাধীন ওয়ার অন টেররের অন্যতম কুশীলব হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত পেয়েছেন। তার সময়েই লাল মসজিদ গণহত্যা সংঘটিত হয়। ২০০৭ সালে পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনে পুনরায় জয়লাভ করেন। একই বছর অভিশংসন এড়াতে পদত্যাগ করেন এবং স্ব-লন্ডনে নির্বাসনে চলে যান। ২০০৭ সালে সংবিধান অবমাননার জন্য তার অবর্তমানে পাকিস্তানের আদালত তার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিলেও উচ্চ আদালত এই রায় স্থগিত করে। ২০২৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরাতে মৃত্যুবরণ করেন।

ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ আল সাউদ: সৌদি আরবের পঞ্চম এবং সর্বাধিক সময় সিংহাসনে থাকা বাদশাহ (১৯৮২–২০০৫)। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ক্রাউন প্রিন্স ছিলেন। ক্ষমতায় আরোহণের পর সৌদি আরবে ইরান বিপ্লবের রপ্তানি বন্ধ করতে সাদ্দাম হুসাইনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধে কুয়েতকে মুক্ত করতে প্রথমত মার্কিন সেনাদের সৌদিতে আমন্ত্রণ জানান এবং যুদ্ধ সমাপ্ত হলেও সৌদির নিরাপত্তার অজুহাতে তাদেরকে ঘাঁটি নির্মাণ অনুমোদন দেন। এটি ব্যাপক জনরোষের জন্ম দেয়। বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার প্রথম অভিযোগই এটি। তিনি সৌদির সংস্কারপন্থি সাহওয়া আন্দোলনকেও কঠোর হাতে দমন করেন। নিজেকে ইসলামের স্বপক্ষে প্রমাণ করতে ১৯৮৬ সালে 'মহামান্য' সম্বোধনের পরিবর্তে 'দুই পবিত্র মসজিদের খাদেম' সম্বোধন চালু করেছিলেন। ১৯৯৫ সালে তিনি স্ট্রোক করেন এবং ক্রাউন প্রিন্স আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ আল-সাউদ তার অধিকাংশ দায়িত্ব পালন করা শুরু করেন। ২০০৫ সালের ১ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রুহুল্লাহ খোমেনি: ইরান বিপ্লবের নায়ক এবং ইরানের সাবেক ধর্মীয় নেতা। তিনি রেজা পাহলভিকে উৎখাত করে ইরানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান। আমৃত্যু তিনি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন। ক্ষমতায় আরোহণের পরের বছরই ইরাকের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৮৯ সালের ৩ জুন মৃত্যুবরণ করেন। প্রায় ১ কোটি লোক তার জানাজায় অংশগ্রহণ করেছিল।

সাদ্দাম হুসাইন: ইরাকের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান (১৯৭৯–২০০৩)। কৈশোরে বাথ পার্টিতে যোগদান করেন এবং পরবর্তী সময়ে একটি রক্তপাতহীন বিপ্লবের

মাধ্যমে ১৯৬৬ সালে ইরাকের উপরাষ্ট্রপতি হন। এ সময় তিনি ইরাকি পেট্রোলিয়ম কোম্পানিকে জাতীয়করণ করেন। ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের পর আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। পরের বছরই ইরানে আগ্রাসনের মাধ্যমে দীর্ঘ আট বছরব্যাপী ইরাক-ইরান যুদ্ধের সূচনা ঘটান। যুদ্ধে অন্যান্য আরব রাষ্ট্র থেকে অনেক সহায়তা পেলেও আট বছরে কোনো স্থাবর অর্জন ছাড়াই যুদ্ধবিরতিতে যেতে হয়। যুদ্ধের শেষ দিকে ইরাকি কুর্দিদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান শুরু করেছিলেন। যুদ্ধের পর সাবেক মিত্র কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকের তেলসম্পদ আত্মসাতের অভিযোগ এনে কুয়েত দখল করেন। সূচনা ঘটে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের। এই যুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক জোটের কাছে ইরাকের পরাজয় ঘটে। এর পরপরই জাতিসংঘ ইরাকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ২০০৩ সালে গণবিধ্বংসী অস্ত্র এবং আল-কায়েদা সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট সাদ্দাম হুসাইনের ইরাকে বিশেষ অভিযান শুরু করে। ১৩ ডিসেম্বর তাকে আটক করা হয়। ইরাকের অন্তর্বর্তী সরকার তার বিচার শুরু করে। প্রহসনমূলক বিচার শেষে ২০০৬ সালের ৫ নভেম্বর তাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়। ৩০ ডিসেম্বর তারিখ ঈদুল আজহার দিনে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

হামিদ কারজাই: আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট (২০০১–১৫)। কান্দাহারের পোপালজাই দুররানি গোত্রের প্রধান। ভারতে সোভিয়েত জিহাদের সময় পাকিস্তানে মুজাহিদিনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। সোভিয়েত যুদ্ধের পর কান্দাহার থেকে নাজিবুল্লাহর সেনাদের বিতাড়িত করায় ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি রাব্বানি সরকারে ডেপুটি ফরেন মিনিস্টার ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তালেবান তাকে মুখপাত্র করতে চাইলেও তিনি এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি তালেবানের হয়ে জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্ব করতে চাইলেও তার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। পারিবারিকভাবে তিনি আফগানিস্তানের শেষ রাজা জহির শাহের সমর্থক ছিলেন। তালেবান থেকে হতাশ হয়ে তিনি নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ শুরু করেন। নাইন-ইলেভেনের পর তালেবান শাসনের পতনের পর প্রথমত তিনি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের চেয়ারম্যান এবং পরবর্তী সময়ে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ২০০৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি আফগানিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন। ২০০৯ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও তিনি জয়লাভ করেন। প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তালেবানদের সঙ্গে সমঝোতার পদক্ষেপ নিলেও ব্যর্থ হন। ২০২১

সালের ১৭ আগস্ট তালেবান কাবুলের দখল নিলে তিনি তাদের সাধুবাদ জানিয়েছিলেন এবং তালেবানের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি কাবুলেই অবস্থান করছেন।

মার্কিন রাজনীতিবিদ, জেনারেল, গোয়েন্দা কর্মকর্তা, সাংবাদিক

প্রেসিডেন্ট

জিমি কার্টার (১৯৭৭-৮১, ডেমোক্রেটিক পার্টি): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯তম প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট থাকাবস্থায় বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সংঘাত নিরসনের উদ্যোগ নেন, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে। তার নেতৃত্বেই মিসর ও ইসরায়েলের মাঝে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে প্রেসিডেন্সির শেষ দিকে তিনি নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হন। যেমন, ইরানে জিম্মি সংকট, নিকারাগুয়ান বিপ্লব, আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন ইত্যাদি। শেষোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে কার্টার ডকট্রিন ঘোষিত হয়। বলা হয়, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে প্রয়োজনে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মূলত ইরানে জিম্মি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী নির্বাচনে তার শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

রোনাল্ড রিগ্যান (১৯৮১-৮৯, রিপাবলিকান পার্টি): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০তম প্রেসিডেন্ট। তার প্রেসিডেন্সির প্রথম মেয়াদে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নতুনভাবে গতিসঞ্চার হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের প্রশমিত অবস্থাতেও পরিবর্তন আসে। ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র গ্রেনাডায় সামরিক অভিযান চালান। বিভিন্ন বৈশ্বিক ঘটনাবলি তার দ্বিতীয় মেয়াদেও প্রভাবশালী ছিল। যেমন, গাদ্দাফির লিবিয়ায় বিমান হামলা, ইরানে গোপন এবং অবৈধভাবে অস্ত্র চোরাচালান, ইরাক-ইরান যুদ্ধের সমাপ্তি এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত পরাজয়। রিগ্যানের গৃহীত নীতিই স্নায়ুযুদ্ধ এবং সোভিয়েত কমিউনিজমের সমাপ্তিতে ভূমিকা রাখে।

জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ (১৯৮৯-৯৩, রিপাবলিকান পার্টি): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪১তম প্রেসিডেন্ট। তার সময়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মাধ্যমে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং একটি ইউনিপোলার বিশ্বে একক মার্কিন কর্তৃত্বের সূচনা হয়। দুই জার্মানির একত্রকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পানামা আক্রমণ করেন এবং উপসাগরীয় যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

বিল ক্লিনটন (১৯৯৩-২০০১, ডেমোক্রেটিক পার্টি): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪২তম প্রেসিডেন্ট। পূর্ব-ইউরোপে ন্যাটোর সম্প্রসারণ ঘটান। বসনিয়া ও কসোভোর যুদ্ধে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর ফলাফলস্বরূপ ডেইটন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং বসনিয়ান যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। ইরাক লিবারেশন অ্যাক্ট স্বাক্ষর করেন। এর আওতায় সাদ্দাম হুসাইনের বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে সহায়তা প্রদান শুরু হয়। তার উপস্থিতিতে অসলো-১ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের শান্তিপ্রক্রিয়ায়ও ভূমিকা রাখেন। তবে প্রেসিডেন্সির দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা সামলাতেই অধিক ব্যস্ত ছিলেন।

জর্জ ডব্লিউ বুশ (২০০১-০৯, রিপাবলিকান পার্টি) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩তম প্রেসিডেন্ট। মার্কিন ভূখণ্ডে নাইন-ইলেভেনের হামলা তার প্রশাসনে আমূল পরিবর্তন আনে। ওয়ার অন টেররের সূচনা ঘটান। ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি প্রতিষ্ঠা করেন। সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের ওপর নজরদারির জন্য প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট অনুমোদন করেন। তালেবানকে উৎখাত, আল-কায়েদার মূলোৎপাটন এবং ওসামা বিন লাদেনকে আটক করার লক্ষ্যে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করেন। গণবিধ্বংসী অস্ত্র এবং আল-কায়েদা সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুলে ইরাক আগ্রাসন শুরু করেন। ২০০৭ সালে ইরাকে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেন।

বারাক ওবামা (২০০৯-১৭, ডেমোক্রেটিক পার্টি): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট। ২০০৯ সালের ৪ জুন কায়রো ইউনিভার্সিটি ভাষণে মুসলিম বিশ্ব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে সম্পর্কের ‘একটি নতুন দিগন্ত’ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তার নির্দেশেই আনওয়ার আল-আওলাকিকে ড্রোন হামলার মাধ্যমে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করা হয়। লিবিয়ায় সামরিক অভিযান অনুমোদন করেন। মুয়াম্মার আল গাদ্দাফি ক্ষমতাচ্যুত এবং নিহত হয়। সিরিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে সহায়তা প্রদান করলেও প্রতিশ্রুত সামরিক অভিযান চালাননি। ইরানের সঙ্গে নিউক্লিয়ার চুক্তি করেন এবং আংশিক নিষেধাজ্ঞা অপসারণ করেন। ইয়েমেনে সৌদির সামরিক হস্তক্ষেপে লজিস্টিক এবং গোয়েন্দা সহায়তা প্রদান করেন। তিনি বিশ্বব্যাপী ড্রোন যুদ্ধের সম্প্রসারণ করেন, বিশেষভাবে আফ-পাক সীমান্ত অঞ্চলে। তিনি পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলকে ওয়ার অন টেররের অন্তর্ভুক্ত করেন। ২০০৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারিতে ১৮ মাসের মধ্যে ইরাক যুদ্ধে সমাপ্তি টানার ঘোষণা দেন। ১৯

আগস্ট ২০১০ সালে ১ লাখ ৪২ হাজার সেনা থেকে মাত্র ৫০ হাজার সেনা ইরাকে মোতায়েন রাখা হয়। তবে তাদেরও সম্মুখ সমরে তাদের অংশগ্রহণ বাতিল করে কেবল ইরাকের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ২০১০ সালের ৩১ আগস্ট ইরাক অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তবে ইসলামিক স্টেটের উত্থানের মুখে ২০১৪ সাল থেকে ধাপে ধাপে ইরাকে মার্কিন সেনাদের সক্রিয় করেন। অন্যদিকে নির্বাচনি প্রচারণার সময় থেকেই বারাক ওবামা ইরাক যুদ্ধের বিনিয়োগকেও আফগান যুদ্ধে প্রয়োগের পক্ষে ছিলেন। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাসংখ্যা ১৭ হাজারে উন্নীত করেন। একই বছরের ১ ডিসেম্বর তিনি অতিরিক্ত ৩০ হাজার সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দেন। এর ১৮ মাসের মধ্যে আফগান যুদ্ধ সমাপ্তির প্রতিশ্রুতি দিলেও ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেনাসংখ্যা হ্রাস করেন। ২০১৫ সালের অক্টোবরে হোয়াইট হাউস আফগানিস্তানে অনির্দিষ্টকালের জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখার ঘোষণা দিয়েছিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্প (২০১৭-২১, রিপাবলিকান পার্টি): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট। আফগান যুদ্ধ সমাপ্তির প্রতিশ্রুতি দিলেও অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছিলেন। অবশেষে ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি দোহা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তির শর্তানুসারে আফগান সরকার ৫ হাজার তালেবান বন্দিকে মুক্তি দেয়। তিনি ইয়েমেন সৌদি আগ্রাসনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন। সিরিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালেও সেখান থেকেও মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করে নেন। ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরে আসেন এবং পুনরায় অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। আইএসপ্রধান আবু বকর আল-বাগদাদিকে হত্যা করেন। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আইএসবিরোধী যুদ্ধে আমেরিকাকে জয়ী ঘোষণা করেন। তার নির্দেশে ইরানি জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করা হয়।

জো বাইডেন (২০২১-২০২৪, ডেমোক্রেটিক পার্টি): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট। ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট আফগানিস্তান থেকে সকল মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করেন। তালেবান পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী

ডিক চেনি (এইচ ডব্লিউ বুশ): জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশের এই প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডব্লিউ বুশের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাকে আমেরিকার

সবচেয়ে ক্ষমতাধর ভাইস প্রেসিডেন্ট মনে করা হয়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন উপসাগরীয় যুদ্ধে ভূমিকা রাখেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ওয়ার অন টেররের সূচনা এবং ইরাক আগ্রাসনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

ডোনাল্ড রামসফেল্ড (জেরাল্ড ফোর্ড ডব্লিউ বুশ): প্রেসিডেন্ট ডাব্লিউ বুশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে ওয়ার অন টেররের সূচনা এবং ইরাক আগ্রাসনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। ইরাকের বিরুদ্ধে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্টতা এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুত কাহিনির অবতারণায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ইরাকের আবু-গারিব কারাগারে বন্দি নির্যাতনের জন্য ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হন।

রবার্ট গেটস (ডব্লিউ বুশ, ওবামা): সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা এবং প্রধান। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির একটি উপাদান হিসেবে সামরিক হস্তক্ষেপের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন।

লিওন প্যানেটা (ওবামা): সাবেক সিআইএ প্রধান। সিআইএ প্রধান হিসেবে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার মিশন পরিচালনা করেন।

জেমস ম্যাটিস (ট্রাম্প): সাবেক ফোর স্টার জেনারেল। উপসাগরীয় যুদ্ধ, আফগানিস্তান এবং ইরাক আগ্রাসনের কমান্ডার ছিলেন। সিরিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার ইস্যুতে পদত্যাগ করার ঘোষণা দিলে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে বরখাস্ত করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ম্যাডেলিন আলব্রাইট (ক্লিনটন): জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে রুয়ান্ডা গণহত্যার কট্টর সমালোচনা করলেও ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং শিশুমৃত্যুর পক্ষে সাফাই গেয়েছেন।

কলিন পাওয়েল (ডব্লিউ বুশ): উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০০৩ সালে ইরাক আগ্রাসনে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেন। ২০২১ সালে তার মৃত্যুতে একটি সংবাদপত্রের শিরোনাম ছিল: Weapon of mass destruction found dead at 88

কন্ডোলিৎজা রাইস (ডব্লিউ বুশ): বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন, বিশেষভাবে আফগানিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যে।

হিলারি ক্লিনটন (ওবামা): বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সোচ্চার তিনি। আফগানিস্তানে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বোচ্চ সেনা মোতায়েনের পক্ষে ছিলেন।

জন কেরি (ওবামা): ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা: (কালানুক্রমিক ক্রমে)

স্ফিগনিফ ব্রজেনস্কি (কার্টার): ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছিলেন। সোভিয়েত যুদ্ধে মুজাহিদিনদের পক্ষাবলম্বন করেন।

জেনারেল জিম জোন্স (ওবামা): মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এইচআর ম্যাকমাস্টার (ট্রাম্প): জেনারেল ডেভিড পেট্রিয়াসের কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির একজন মুখপাত্র ছিলেন।

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ

রন পল (টেক্সাস, রিপাবলিকান): মার্কিন মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, ওয়ার অন টেরর, প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টসহ ফেডারেল সরকারের বিভিন্ন নীতির কট্টর সমালোচক ছিলেন।

মার্কিন সিনেট

লিন্ডসে গ্রাহাম (সাউথ ক্যারোলাইনা, রিপাবলিকান): শক্তিশালী জাতীয় সুরক্ষা এবং আক্রমণাত্মক হস্তক্ষেপবাদী পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক।

জন ম্যাককেইন (অ্যারিজোনা, রিপাবলিকান): পররাষ্ট্রনীতিতে নব্য-রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার পররাষ্ট্রনীতির সমালোচক ছিলেন।

সামরিক নেতৃবৃন্দ

এইচ আর ম্যাকমাস্টার: পেট্রিয়াসের ডান হাত। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের সমর্থক।

কার্ল আইকেনবেরি: আফগান যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। COIN-এর বিরোধী ছিলেন।

জন নিকলসন: আফগান যুদ্ধের দায়িত্বপ্রাপ্ত জেনারেল। ২০১৭ সালে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের সুপারিশ করেছিলেন।

জেমস কার্টরাইট: প্রেসিডেন্ট ওবামার কাছে ন্যূনতম সেনাসংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছিলেন।

জেমস ম্যাটিস: যুদ্ধের শুরুর দিককার মেরিন কর্পস জেনারেল। প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ২০১৭ সালে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

জোসেফ ভোটেল: সেন্টকম কমান্ডার।

জ্যাক কিন: ইরাক ও আফগানিস্তানে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

টমি ফ্রাঙ্কস: আফগান যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়েই বিভিন্ন গোলযোগের জন্য দায়ী।

ডেভিড পেট্রিয়াস: আফগান যুদ্ধে ব্যর্থতার পরও জিনিয়াস হিসেবে পরিগণিত হন।

মাইকেল ফ্লিন: ইরাক এবং আফগান যুদ্ধে ম্যাকক্রিস্টালের ডেপুটি। ট্রাম্পের প্রথম জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা।

মাইক মুলেন: জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান। প্রেসিডেন্ট ওবামার কাছে ভাইস-চেয়ারম্যান কার্টরাইটকে পরিকল্পনা উপস্থাপনকে বিঘ্নিত করেন।

স্ট্যানলি ম্যাকক্রিস্টাল: ওবামার সময় অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনকারী প্রথম জেনারেল। মারজাহ ব্যর্থতার পর COIN থেকে সরে আসেন।

স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের হুইসেলব্লোয়ার এবং ভিন্নমত পোষণকারী

অ্যান্থনি ওয়াকার: ২০০৯ সালের বিভিন্ন যুদ্ধাপরাধের সাক্ষী।

গ্যারি বার্নটসেন: আফগানিস্তানে ন্যাটো অভিযানের দ্বিতীয় কমান্ডার। তোরাবোরায় যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

জিয়ান জেন্টিল: COIN-এর বিরুদ্ধে অসংখ্য আর্টিকেল এবং বই প্রকাশ করেন।

ড্যানিয়েল এল ডেভিস: ২০১২ সালে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের সময় হুইসেলব্লোয়ারের ভূমিকা পালন করেন।

ম্যাথিউ হো: ২০০৯ সালের অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের আগে হুইসেলব্লোয়ারের ভূমিকা পালন করেন।

সিআইএ

ব্রুস রিডেল: অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। ওবামা সরকারের হয়ে আফগান নীতি পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন করেন।

রবার্ট গ্রেনিয়ার: যুদ্ধ শুরুর সময়কালে সিআইএ'র ইসলামাবাদ স্টেশনের প্রধান ছিলেন।

লিওন প্যানেটা: প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা নিযুক্ত প্রথম সিআইএ পরিচালক।

হেনরি ক্রাম্পটন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক হামলার সময় কমান্ডারের ভূমিকা পালন করেন।

নব্য রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ

জালমে খলিলজাদ: হামিদ কারজাইকে আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দোহা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

পল উলফভিটজ: ডব্লিউ বুশের প্রতিরক্ষা উপসচিব।

রিচার্ড পার্লে: মাইলরোয়ের 'সাদ্দাম হুসাইন বিন লাদেনের সহযোগী' তত্ত্বের সমর্থক।

লরি মাইলরোই: 'সাদ্দাম হুসাইন বিন লাদেনের সহযোগী' তত্ত্বের প্রবর্তক।

সাংবাদিক

এরিক মারগুলিস: মার্কিন সাংবাদিক। মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া এবং ইসলাম বিষয়ে লেখালেখি করেন। ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরবিষয়ক কাজের জন্য সুপরিচিত। তার বহুল আলোচিত বই *War at the Top of the World: The Struggle for Afghanistan, Kashmir and Tibet*।

অ্যান জোন্স: নারী এবং মানবাধিকারের পক্ষে সরব মার্কিন সাংবাদিক ও লেখক। ২০০২ সাল থেকে আফগানিস্তানের মানবাধিকার গবেষক, শিক্ষক ও নারী অধিকার কর্মী হিসেবে কাজ করে আসছেন।

অ্যান্ড্রু ককবার্ন: ব্রিটিশ সাংবাদিক, লেখক এবং ডকুমেন্টারি নির্মাতা। ড্রোন যুদ্ধ নিয়ে বহুল আলোচিত বই *Kill Chain: The Rise of High-Tech Assassins*।

অ্যালান কুলিসন: ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল রিপোর্টার। আফগান যুদ্ধ কাভার করার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তালেবানের পতনের পর কাবুলে আল-কায়েদার দুটি কম্পিউটার আবিষ্কার করেছিলেন।

অ্যালেক্স স্ট্রিক ভ্যান লিন্সকোটেন: লেখক ও গবেষক। ওয়ার স্টাডিজ বিষয়ে লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বহুল আলোচিত *The Taliban Reader: War, Islam and Politics* বইয়ের সহ-লেখক।

আনন্দ গোপাল: সংঘাত এবং বিপ্লব নিয়ে লেখালেখির জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। বহুল আলোচিত বই, *No Good Men Among the Living: America, the Taliban and the War through Afgan Eyes*।

আবদেল বারি আতওয়ান: ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ সাংবাদিক। আল-কুদস আল-আরাবি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তার এই পত্রিকায় ওসামা বিন লাদেনের বিভিন্ন বিবৃতি পাঠাতেন। তোরাবোরায় গিয়ে ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। বহুল আলোচিত বই *The Secret History of Al-Qa'ida*।

আহমেদ রশিদ: পাকিস্তানি সাংবাদিক। আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং মধ্য-এশিয়ায় বৈদেশিক নীতিমালা নিয়ে একাধিক বইয়ের রচয়িতা। তার বেস্টসেলার বই *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*।

গ্যারেথ পোর্টার: মার্কিন ইতিহাসবিদ, অনুসন্ধানী সাংবাদিক, লেখক। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় একজন অ্যান্টি-ওয়ার অ্যাকটিভিস্ট ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান বিষয়ে লেখালেখি করেন। তার বহুল আলোচিত বই *Perils of Dominence: Imbalance of Power and the Road to War in Vietnam*।

জিন ম্যাকেঞ্জি: বিবিসির আন্তর্জাতিক সংবাদদাতা এবং ডকুমেন্টারি নির্মাতা। মধ্যপ্রাচ্যে বিবিসির হয়ে কাজ করেছেন।

জেরেমি স্কাইল: মার্কিন অনুসন্ধানী সাংবাদিক, লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট। তার বই *Dirty Wars: The World is a Battlefield* নিয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারি ব্যাপক সাড়া ফেলে। তার অন্যান্য বহুল আলোচিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে, *Blackwater: The Rise of the World's Most Poweful Mercenary Army* এবং ড্রোন যুদ্ধ নিয়ে *The Assassination Complex: Inside the Government's Secret Drone Warfare Programme*।

প্যাট্রিক ককবার্ন: ১৯৭৯ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সংবাদদাতা হিসেবে কাজ শুরু করেন। বহুল আলোচিত বই, *The Ris of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revulsion* এবং *The Age of Jihad: Islamic State and thr Great War for the Middle East*।

ফেলিক্স কুয়েন: লেখক এবং গবেষক। ২০০৬ সাল থেকে তিনি তালেবানের পুনঃঅভ্যুদয় এবং দক্ষিণ আফগানিস্তানের বিগত চার দশকের ইতিহাস নিয়ে কাজ করছেন। তার বহুল আলোচিত বই, *An Enemy We Created: The Myths of the Taliban-Al Qaida Merger in Afghanistan*। তিনি মোল্লা আবদুস সালাম জায়েফের *My Life with The Taliban* বইয়ের সহ-লেখক।

ফ্রাঙ্ক লেডউইজ: রয়্যাল এয়ার ফোর্স কলেজের বিমানবাহিনী এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাবিষয়ক সিনিয়র ফেলো। বিগত ২০ বছর যাবৎ বিশ্বব্যাপী বিমান অভিযান পর্যালোচনা করে আসছেন। ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র সন্ধানকারী একটি গোয়েন্দা দলের কমান্ডার ছিলেন। যুক্তরাজ্য সরকারের হয়ে হেলমান্দ এবং লিবিয়ায়ও কর্মরত ছিলেন। ওয়ার অন টেররে ব্রিটিশ মিলিটারি পারফরম্যান্সের ওপর দুটি বেস্টসেলার বইয়ের লেখক, *Losing Small Wars* (2011) এবং *Investment in Blood* (2013)।

বেটি ড্যাম: ডাচ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট। মোল্লা ওমরকে নিয়ে তার বহুল আলোচিত বই *Looking for the Enemy: Mollah Omar and the Unknown Taliban*।

মাইকেল হেস্টিংস: সাংবাদিক এবং রোলিং স্টোন সম্পাদক। ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধের রিপোর্টিংয়ের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন।

ম্যাথিউ আইকিনস: আফগান যুদ্ধ কাভার করার জন্য সুপরিচিতি লাভ করেন। নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন এবং রোলিং স্টোন-এ লেখালেখি করেন। আফগানিস্তান, ইরাক এবং সিরিয়ায় মার্কিন বিমান হামলায় বেসামরিক হতাহতের ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টিং ক্যাটাগরিতে ২০২২ সালে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন।

সেবাস্টিয়ান জাঙ্গার: মার্কিন সাংবাদিক, লেখক এবং ডকুমেন্টারি নির্মাতা। সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বিভিন্ন সংবাদ তুলে আনার জন্য বিখ্যাত। আফগান যুদ্ধ নিয়ে তার মাস্ট ওয়াচ ডকুমেন্টারি ফিল্ম *Restrepo* (2010) এবং *Korengal* (2014)।

পরিশিষ্ট ৮

মার্কিন প্রশাসনের কারাবন্দি নির্যাতনবিষয়ক উল্লেখযোগ্য রচনাবলি

Akinyode, Funmi, Jason Leopold and Ky Henderson. ‘Unmasked: CIA Officially Identifies Architects of Its Post-9/11 Torture Program.’ Vice. November 7, 2016.

Apuzzo, Matt, and Sheri Fink. ‘Secret Documents Show a Tortured Prisoner’s Descent.’ New York Times. November 12, 2016.

Apuzzo, Matt, Sheri Fink and James Risen. ‘How US Torture Left a Legacy of Damaged Minds.’ New York Times. October 9, 2016.

Boumediene, Lakhdar and Mustafa Ait Idir. Witnesses of the Unseen: Seven Years in Guantanamo. Stanford: Redwood, 2017 Carle, Glenn L. The Interrogator: An Education. New York: Nation, 2011.

Clark, Kate. ‘Kafka in Cuba: The Afghan Experience in Guantánamo.’ Afghanistan Analysts Network. November 2016.

Camerino, Tony [Matthew Alexander], and John R. Bruning. How to Break a Terrorist: The U.S. Interrogators Who Used Brains, Not Brutality, to Take Down the Deadliest Man in Iraq. New York: Free, 2008.

Eviatar, Daphne. ‘Detained and Denied in Afghanistan.’ Human Rights First.

Fink, Sheri. ‘Where Even Nightmares Are Classified: Psychiatric Care at Guantánamo.’ New York Times. November 12, 2016.

Fink, Sheri and James Risen. ‘Psychologists Open a Window on Brutal CIA Interrogations.’ New York Times. June 21, 2017.

Gordon, Rebecca. American Nuremberg: The U.S. Officials Who Should Stand Trial for Post-9/11 War Crimes. New York: Hot, 2016.

Grey, Stephen. Ghost Plane: The True Story of the CIA Rendition and Torture Program. New York: St. Martin’s, 2006.

Hersh, Seymour M. Chain of Command: The Road from 9/11 to Abu Ghraib. New York: Harper Perennial, 2005.

‘The Gray Zone.’ New Yorker. May 24, 2004.

‘Torture at Abu Ghraib.’ New Yorker. May 10, 2004.

Hickman, Joseph. Murder at Camp Delta: A Staff Sergeant’s Pursuit of the Truth About Guantanamo Bay. New York: Simon & Schuster, 2015.

Hicks, David. Guantánamo: My Journey. New York: Random House, 2012.

Human Rights Watch. “CIA Activities.’ Landing page for articles related to the CIA.

Impey, Joanna, and Deutsche Welle. ‘Guantánamo Inmate Claims He Underwent Medical Experiments.’ Deutsche Welle. March 3, 2011.

International Committee of the Red Cross. ‘ICRC Report on the Treatment of Fourteen ‘High Value Detainees’ in CIA Custody.’ February 2007.

Kaye, Jeffrey S. Cover-up at Guantánamo: The NCIS Investigation into the ‘Suicides’ of Mohammed Al Hanashi and Abdul Rahman Al Amri. Independently published, 2017.

‘New Revelations Suggest DoD Cover-Up Over Detainee Drugging Charges.’ Truthout. September 21, 2012.

Kaye, Jeffrey S., and Jason Leopold. 'DoD Report Reveals Some Detainees Interrogated While Drugged, Others "Chemically Restrained."' Truthout. July 11, 2012.

Klippenstein, Ken, and Joseph Hickman. 'CIA Documents Expose the Failed Torture Methods Used on Guantánamo's Most Famous Detainee.' AlterNet.

Kurnaz, Murat. Five Years of My Life: An Innocent Man in Guantánamo. New York: St. Martin's, 2008.

Leopold, Jason. 'Revealed: Senate Report Contains New Details on CIA Black Sites.' Al Jazeera. April 9, 2014.

Leopold, Jason, and Jeffrey Kaye. 'CIA Psychologist's Notes Reveal True Purpose Behind Bush's Torture Program.' Truthout. March 22, 2011.

Mayer, Jane. The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on American Ideals. Norwell, MA: Anchor, 2009.

McCoy, Alfred. A Question of Torture: CIA Interrogation, from the Cold War to the War on Terror. New York: Metropolitan, 2006. Torture and Impunity: The U.S. Doctrine of Coercive Interrogation.

Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2014.

Otterman, Michael. American Torture: From the Cold War to Abu Ghraib and Beyond. London: Pluto, 2008.

Phillips, Joshua E.S. None of Us Were Like This Before: American Soldiers and Torture. New York: Verso, 2012.

Pitter, Laura. 'US: Ex-Detainees Describe Unreported CIA Torture.' Human Rights Watch. October 3, 2016.

Richardson, John H. 'Acts of Conscience.' Esquire. September 21, 2009.

Risen, James, and Bryan Denton. 'After Torture, Ex-Detainee Is Still Captive of "The Darkness."' New York Times. October 12, 2016.

Sands, Philippe. Torture Team: Rumsfeld's Memo and the Betrayal of American Values. New York: St. Martin's, 2008.

Savage, Charlie. 'CIA Torture Left Scars on Guantánamo Prisoner's Psyche for Years.' New York Times. March 17, 2017.

Takeover: The Return of the Imperial Presidency and the Subversion of American Democracy. Reprint. New York: Back Bay, 2008.

Somini Sengupta and Marlise Simons. 'US Forces May Have Committed War Crimes in Afghanistan, Prosecutor Says.' New York Times. November 14, 2016.

Slahi, Mohamedou Ould. Guantánamo Diary. Boston: Little, Brown, 2005.

United States Senate Select Committee on Intelligence. 'Committee Study of the Central Intelligence Agency's Detention and Interrogation Program.'

Worthington, Andy. The Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America's Illegal Prison. London: Pluto, 2007.

Yachot, Noa. 'Video: CIA Officials Forced to Testify About Torture Program.'

পরিশিষ্ট ৯

আফগানিস্তানবিষয়ক অবশ্যপাঠ্য রচনাবলি

Atwan, Abdul Bari. *The Secret History of al Qaeda*. Updated ed. Oakland: University of California Press, 2008.

Bacevich, Andrew J. America's War for the Greater Middle East: A Military History. New York: Random House, 2016.

Bamford, James. A Pretext for War: 9/11, Iraq, and the Abuse of America's Intelligence Agencies. New York: Doubleday, 2004.

Berntsen, Gary, and Ralph Pezzullo. Jawbreaker: The Attack on Bin Laden and Al-Qaeda; A Personal Account by the CIA's Key Field Commander. Portland: Broadway, 2006.

Bin Laden, Osama. Messages to the World: The Statements of Osama Bin Laden. Edited by Bruce Lawrence. Translated by James Howarth. Annotated, New York: Verso, 2005.

Quotations from Osama Bin Laden. Edited by Brad K. Berner. Oracle, AZ: Peacock, 2006.

Blum, William. Freeing the World to Death: Essays on the American Empire. Monroe, MN: Common Courage, 2004.

Bovard, James. Attention Deficit Democracy. New York: Palgrave MacMillan, 2005.

Brzezinski, Zbigniew. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. Lebanon, IN: Basic, 1997.

Clarke, Richard. Against All Enemies: Inside America's War on Terror. New York: Free, 2004.

Cockburn, Andrew. Kill Chain: The Rise of the High-Tech Assassins. New York: Henry Holt, 2015.

Cockburn, Patrick. The Age of Jihad: Islamic State and the Great War for the Middle East. New York: Verso, 2016.

Chaos and Caliphate: Jihadis and the West in the Struggle for the Middle East. New York: OR, 2016.

The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution. Revised ed. New York: Verso, 2015.

Coll, Steve. The Bin Ladens: An Arabian Family in the American Century. London: Penguin, 2008.

Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001. London: Penguin, 2004.

Crile, George. Charlie Wilsons War: The Extraordinary Story of the Largest Covert Operation in History. New York: Atlantic Monthly, 2003.

Dreyfuss, Robert. Devil's Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam. New York: Henry Holt, 2005.

Esposito, John L., and Dalia Mogahed. Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think. Washington, DC: Gallup, 2008.

Fairweather, Jack. The Good War: Why We Couldn't Win the Peace in Afghanistan. New York: Basic, 2014.

Fury, Dalton [Thomas Greer]. Kill Bin Laden: A Delta Force Commander's Account of the Hunt for the World's Most Wanted Man. New York: St. Martin's, 2009.

Gentile, Gian. Wrong Turn: America's Deadly Embrace of Counterinsurgency. New York: New, 2013.

Gerges, Fawaz A. The Far Enemy: Why Jihad Went Global. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Glantz, Aaron, and Anthony Swofford, eds. Winter Soldier: Iraq and Afghanistan. Chicago: Haymarket, 2008.

Gopal, Anand. No Good Men Among the Living: America, the Taliban, and the War through Afghan Eyes. New York: Metropolitan, 2014.

Gordon, Joy. Invisible War: The United States and the Iraq Sanctions. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.

Gould, Elizabeth, and Paul Fitzgerald. Crossing Zero: The AfPak War at the Turning Point of American Empire. San Francisco: City Lights, 2011.

Invisible History: Afghanistan's Untold Story. San Francisco: City Lights, 2009.

Gall, Carlotta. The Wrong Enemy: America in Afghanistan 2001-2014. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2014.

Grenier, Robert L. 88 Days to Kandahar: A CIA Diary. New York: Simon & Schuster, 2016.

Hastings, Michael. The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan. New York: Blue Rider, 2012.

Horton, Scott (no relation to the author). Lords of Secrecy: The National Security Elite and America's Stealth Warfare. New York: Nation, 2015.

Johnson, Chalmers. Blowback: The Costs and Consequences of American Empire. New York: Holt, 2004.

Nemesis: The Last Days of the American Republic. New York: Metropolitan, 2008.

The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic. New York: Metropolitan, 2004.

Dismantling the Empire: America's Last Best Hope. New York: Metropolitan, 2010.

Jones, Ann. Kabul in Winter: Life Without Peace in Afghanistan, New York: Metropolitan, 2007.

They Were Soldiers: How the Wounded Return from America's Wars; The Untold Story. Chicago: Haymarket, 2014.

Junger, Sebastian. War. New York: Twelve, 2010.

Kinzer, Stephen. Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq. New York: Times, 2006.

Kolhatkar, Sonali and James Ingalls. Bleeding Afghanistan: Washington, Warlords and the Propaganda of Silence. New York: Seven Stories, 2006.

Lance, Peter. 1,000 Years for Revenge: International Terrorism and the FBI— the Untold Story. New York: William Morrow, 2004.

Lando, Barry M. Web of Deceit: The History of Western Complicity in Iraq, from Churchill to Kennedy to George W. Bush. New York: Other, 2007.

Lean, Nathan. The Islamophobia Industry: How the Right Manufactures Fear of Muslims. London: Pluto, 2012.

Ledwidge, Frank. Investment in Blood: The True Cost of Britain's Afghan War. New Haven, CT: Yale University Press, 2013.

Margolis, Eric S. American Raj: Liberation or Domination? Resolving the Conflict Between the West and the Muslim World. Toronto: Key Porter, 2008.

War at the Top of the World: The Struggle for Afghanistan, Kashmir and Tibet. Oxford: Routledge, 2010.

McDermott, Terry. Perfect Soldiers: The 9/11 Hijackers: Who They Were, Why They Did It. New York: Harper Collins, 2009.

Mueller, John. Overblown: How Politicians and the Terrorism Industry Inflate National Security Threats, and Why We Believe Them. New York: Free, 2009.

Novinkov, Oleg. Afghan Boomerang: Notes of a Former Soviet Officer. Houston: Novinkov, 2011.

O'Connell, Aaron B., ed. Our Latest Longest War: Losing Hearts and Minds in Afghanistan. Chicago: University of Chicago Press, 2017.

Pape, Robert A. Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. New York: Random House, 2005.

Rashid, Ahmed. Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. New Haven, CT: Yale University Press, 2010.

Pakistan on the Brink: The Future of America, Pakistan and Afghanistan. New York: Penguin, 2012.

Scahill, Jeremy et al. The Assassination Complex: Inside the Government's Secret Drone Warfare Program. New York: Simon & Schuster, 2016.

Scheuer, Michael. Imperial Hubris: Why the West is Losing the War on Terror. Washington, DC: Potomac, 2007.

Shahzad, Syed Saleem. Inside al Qaeda and the Taliban: Beyond bin Laden and 911. Chicago: Pluto, 2011.

Soufan, Ali. The Black Banners: The Inside Story of 9/11 and the War Against al-Qaeda. New York: W. W. Norton, 2011.

Suhrke, Astri. When More is Less: The International Project in Afghanistan. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Turse, Nick, ed. The Case for Withdrawal from Afghanistan. New York: Verso, 2010.

van Linschoten, Alex Strick, and Felix Kuehn. An Enemy We Created: The Myth of the Taliban-Al Qaeda Merger in Afghanistan. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Wissing, Douglas A. Hopeless but Optimistic: Journeying through America's Endless War in Afghanistan. Bloomington: Indiana University Press, 2016.

Funding the Enemy: How U.S. Taxpayers Bankroll the Taliban. New York: Prometheus, 2012.

Woods, Chris. Sudden Justice: America’s Secret Drone Wars. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Woodward, Bob. Bush at War. New York: Simon & Schuster, 2002.

Obama’s Wars. New York: Simon & Schuster, 2010.

Wright, Lawrence. The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11. New York: Vintage, 2007.

Zunes, Stephen, and Richard Falk. Tinderbox: U.S. Foreign Policy and the Roots of Terrorism. Monroe, MN: Common Courage, 2002.